বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৬ সংখ্যা। | বৈশাখ ১২৯৮—মে ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ফল— এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার ২১৫১, এফ, এতে ৭৬১ এবং বি, এতে ২৩৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের নাম;—

এ এস্ ম্যাক্	১ম	দার্জিলীং গের্লস স্কুল
করসিফ	,,	,,
মিন্না টেলর	,,	,,
এন বার্টলেট	২য়	,,
জি ডাকষ্টা	,,	,,
মেরী মেল	,,	,,
ডি সুজা	,,	কলিকাতা ঐ
ইষ্ট য়ার্ট	,,	,,
প্রিয়বালা রায়	,,	,, বেথুন স্কুল
নগেন্দ্রবালা বন্দ্যোঃ	,,	,,
প্রভাবতী রায়	,,	,,
ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	২য়	ক্রাইষ্ট চর্চ্চ স্কুল
বিমলাবালা রাহা	৩য়	,,
এস কুসনার	১ম	ডবটন ইনঃ
জে উইদেরেল	,,	,,
আইডা ডিক্রুজ	২য়	,,
এলিস কাওোয়েল	১ম	,,
মার্থা হার্পার	,,	,,
লিলিয়ান বর্জেস	২য়	লোরেটো হাউস
,, মেরী ওয়েষ্ট	,,	লামার্টিনিয়ার
এমি ওয়াইড	,,	,,

বেথুন কলেজ হইতে বিএ পরীক্ষায় শ্রীমতী জীবনবালা দত্ত এবং এফ এ পরীক্ষায় কুমারী শশিবালা বন্দ্যোপাধ্যায়, এসেন চন্দ্র, চারুপ্রভা বসু ও সুরবালা ঘোষ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

লোক সংখ্যা—বর্ত্তমান বর্ষের গণনানুসারে ব্রিটিষ ভারতের অধিবাসী

সংখ্যা ২২ কোটী, ৪ লক্ষ, ৯০ হাজার। মিত্র [illegible] সহিত ধরিলে সমুদায় ভারতবাসীর সংখ্যা ২৮ কোটী ৫০ লক্ষ। ১০ বৎসরে ৩ কোটী ৫০ লক্ষ বাড়িয়াছে। বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৭ কোটী ১০ লক্ষ। কলিকাতায় ৬ লক্ষ, ৭৪ হাজার, বোম্বাইতে ৮ লক্ষ ৬ হাজার এবং মান্দ্রাজে ৪ লক্ষ, ৪৫ হাজার লোকের বাস।

ভারতেশ্বরীর হিন্দী শিক্ষা—৪ জন এদেশীয় এবং ১ জন হিন্দীভাষাজ্ঞ ইংরাজ ইঁহার শিক্ষক। মহারাণী হিন্দীতে চিঠীপত্র লিখিতে বেশ শিখিয়াছেন!

অহিফেনের বিরুদ্ধে আন্দোলন—বিলাতে কমন্স সভায় এই তর্ক উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের খৃষ্টধর্ম্মযাজক ও প্রচারকগণ এই আন্দোলনের মূল কারণ। সুরার ন্যায় এ মাদকেরও দমন আবশ্যক।

আনি বেজাণ্ট—এই বিদুষী রমণী নাস্তিক বলিয়া পরিচিতা ছিলেন, এখন থিওজফীর প্রচারিকা হইয়া আশ্চর্য্য উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। আমেরিকাস্থ থিওজফী সভার বার্ষিক অধিবেশনে ইনি ইংলণ্ড হইতে প্রতিনিধি হইয়া যাইতেছেন, ইংরাজদিগের সমাজ ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় সংস্কার বিষয়ে কতক গুলি বক্তৃতা করিবেন।

ডাকবিভাগে স্ত্রীলোক—লণ্ডন পোষ্ট আফিসে যত গুলি কর্ম্মচারী আছে, তাহার ষষ্ঠাংশ স্ত্রীলোক।

মণিপুরের ভীষণ কাণ্ড।—গত ২৪এ মার্চ্চ আসামের চিফকমিসনার কুইণ্টন সাহেব মণিপুরের সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎ সিংহকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ৪ শতাধিক গুরখা সৈন্য পাঠান, ৬০০ মণিপুরী সৈন্য তাহাদিগকে হটাইয়া দিয়া ইংরাজ রেসীডেন্সী ধ্বংস ও লুঠ করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক বড় বড় কয়েকটী ইংরাজের সহিত চিফ কমিসনরকেও বন্দী করে। দুর্বৃত্তেরা বন্দী ইংরাজদিগকে হত্যা করিয়াছে। মণিপুরের বর্ত্তমান মহারাজ কুলচন্দ্র সিংহ গবর্ণর জেনারেলকে পত্র লিখিয়াছেন, এই হত্যার জন্য তিনি তাঁহার সহোদর সেনাপতির মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছেন। এদিকে শুনা যায় গ্রাণ্ট সাহেবের সহিত যুদ্ধে সেনাপতি হত হইয়াছেন। চারিদিক্ হইতে ইংরাজ সৈন্য চলিয়াছে, মণিপুর কৃতাপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পাইবে সন্দেহ নাই।

পার্ব্বত্য যুদ্ধ—ভারতবর্ষের পশ্চিমে কৃষ্ণপর্ব্বতের অসভ্য পার্ব্বত্যদিগের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়াছে। কোহাটের নিকট ওরাকজাই নামক এক জাতি বিদ্রোহী হইয়া প্রায় ১০ হাজার লোক তাহাদিগের পক্ষে সমবেত করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টকে নানাদিকে বিব্রত হইতে হইয়াছে। আমরা আশা করি তাঁহাদিগের সাহস, কার্য্যদক্ষতা ও সুবিবেচনায় শীঘ্র শান্তি স্থাপিত হইবে।

নববর্ষ।

এক যায় আর আসে,
নহে কেহ আ[illegible];
কত পুরাতন গেল,
আসিল নব বরষ!

এ বরষ এই ভাবে,
রবেনাক চলে যাবে,
মহা বিবর্ত্তন ভবে করি সংঘটন,—
জন্ম মৃত্যু পরিণয়,
কত জয় পরাজয়;
সুখ দুঃখ, আশা ভয়, উত্থান পতন!

কালচক্রে বিশ্ব ঘোরে
কে ঘোরায় দেখা নাই,
ঘুর পাকে ঘুরে মরি
আঁধার সকল ঠাঁই।

"দে পাক চড়ক পাক;"
কাঁপে প্রাণে শুনি ডাক,
ভেঙ্গে ঘুম ঘোর সারা বছরের পর;
দেখি শূন্য আগা গোড়া,
শূন্যে ঘুরি পিট-ফোঁড়া,
চড়কীর মত দিন মাস সংবৎসর।

কত বার নব বর্ষে
প্রতিজ্ঞা করিনু নব;
জীবনের মহাব্রত
সাধিয়া মানব হব।

ঘুম্ পাড়ানে পিসী মাসী;
চুপে ঘুম্ পাড়ায় আসি;
ঘুরায় আপনি কালচক্র আবর্ত্তন;
[illegible] হয়ে দাস,
[illegible]
আত্ম ভুলে থাকি ঘোর মোহে অচেতন।

ক্ষুদ্র মানবের বল,
ক্ষুদ্র মানবের আশা,
সব বৃথা; কাল দস্যু
চেতায়ে দেখে তামাসা।

ব্রহ্মকৃপা করি সার,
জীবনের সব ভার,
জীবন দাতার করে যে করে অর্পণ;
অন্ধকারে আলো পায়,
ভববন্ধ ঘুচে যায়,
অটল পরশে হয় অটলজীবন।

কাল ভয়ে বৃথা কাল
হরিয়া কি ফল আর?
মৃত্যু ছাড়ি অমৃতের
লও জীব সমাচার।

কালের অতীত যিনি,
কালের নিয়ন্তা তিনি,
কালভয়নিবারণ নিত্য নিরঞ্জন,
কর তাঁর পদাশ্রয়,
হইবে নিত্য নির্ভয়,
পাইবে অপার শান্তি অনন্ত জীবন।

আর্য্যমহিলা।

গান্ধারী।

মহাভারতরূপ রত্নাকরের ভিতরে গান্ধারী দেবী এক উজ্জ্বল রত্ন। এ রত্ন চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় অনন্ত কাল পর্য্যন্ত, মর জগতে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবে। গান্ধারী পতিপ্রাণা সাধ্বী হইয়াও কঠোর কর্ত্তব্য-পরায়ণা দেবী, সংসার জালে জড়িতা হইয়াও ভোগ সুখে বিরতা তাপসী। অন্যান্য আর্য্যমহিলাগণ যাঁহারা ভারতে "রমণীরত্ন" খ্যাতি পাইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে কেবল পতিপরায়ণা হইয়া দেবীত্ব লাভ করিয়াছেন। যাঁহাদের স্বামী দেবতার ন্যায় চরিত্রবান্, তাঁহারা কেবল পতিপরায়ণা হইয়াই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারেন; এ পথ স্ত্রী মাত্রেরই অতি সুগম। অসদৃশ স্থলেই রমণীর অলৌকিক পরীক্ষা; যিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তিনি প্রকৃত দেবী, মর জগতের শিক্ষয়িত্রী। গান্ধারী দেবী এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। তিনি কেবল পতিপরায়ণা নহেন; পতিপরায়ণা, ধর্ম্মপরায়ণা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা হইয়া তাঁহাকে জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। তাই গান্ধারী-জীবন রমণী-জীবনের চরমোৎকর্ষ হইয়া আছে। আদর্শ সীতা দেবীর অলৌকিক জীবন, শিক্ষা ও সাহযোর ফল। যাঁহার প্রথম শিক্ষক "ব্রহ্মপরায়ণ রাজর্ষি জনক" দ্বিতীয় শিক্ষক, যিনি নিজ গুণে "ভগবান্" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন সেই মহাপুরুষ রামচন্দ্র, শেষ শিক্ষক নর-দেবতা বাল্মীকি, তিনি যে আদর্শ জীবন লাভ করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কিসে? গান্ধারী দেবীর জীবন এরূপ সহজ ভাবে গঠিত হইবার অবসর পায় নাই। ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ, কর্ত্তব্যপালনে প্রাণপণ এবং পাতিব্রত্যে হৃদয়োৎসর্গ করিয়া (বিশেষ শিক্ষা না পাইলেও) নিজ হৃদয়ের বলে বলবতী হইয়া গান্ধারী দেবী নিজ জীবন বিকাস করিয়াছিলেন। অনেককে এমন ঠেকিতে হয় নাই, এমন শিখিতেও হয় নাই।

গান্ধারী গান্ধারাধিপতি সুবল রাজার কন্যা*। সুবল রাজা ধন, মান, ক্ষমতা বা কোনও বিশেষ গুণের জন্য সুপ্রসিদ্ধ নহেন। তাঁহার কত গুলি সন্তান ছিল, পুরাণে তাহার উল্লেখ নাই। কেবল পুত্র শকুনি ও কন্যা গান্ধারীর বিষয় জানা যায়। শকুনি নিতান্ত অসচ্চরিত্র ছিলেন, তাঁহাকেই গৃহবিবাদের একজন প্রধান উদ্যোগী বলা যায়। যাহা হউক, গান্ধাররাজ স্বরাজ্যের নামে কন্যার নামকরণ করিয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয় গান্ধারী পিতার বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন।

* গান্ধার বর্ত্তমান কান্দাহার।

এতদ্ভিন্ন গান্ধারীর বাল্যজীবন বর্ণিত নাই। গান্ধারীর মত একটী আদর্শ জীবন গঠিত হইতে কি কি উপকরণ লাগিয়াছিল, এবং কাহার যত্ন ও শিক্ষায় তাঁহার মনুষ্যত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা জানিতে পারি না।

গান্ধারী বিবাহোপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে কুরুবংশীয় ধর্ম্মবীর ভীষ্মদেব নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব করেন। ধৃতরাষ্ট্র ধন মান কুলে বিখ্যাত হইয়াও অন্ধ। বোধ হয়, "প্রকৃত সাধ্বী না হইলে কেহ অন্ধ স্বামীর প্রকৃত অনুরাগিণী হইতে পারিবে না" এই মনে করিয়াই ভীষ্ম, জিতেন্দ্রিয়া, সদাচারিণী ও ধর্ম্মশীলা গান্ধারীকে এ বিবাহের যোগ্য পাত্রী মনে করেন।

ভীষ্মের প্রস্তাব প্রীতিকর না হইলেও সুবল তাহাতে অসম্মত হইতে পারিলেন না। সে সময়ে ক্ষত্রিয়কুলে রাক্ষস-বিবাহ প্রচলিত থাকাতে তিনি মনে করিলেন "কুরুবংশের মত মহাবংশে কন্যাদান করা আমার মত (যদুবংশীয়) ব্যক্তির বিশেষ সৌভাগ্য। বিশেষতঃ ধন মান ও বাহুবলে ভীষ্ম আমা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, আমি যদি ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ বলিয়া কন্যাদান করিতে অস্বীকৃত হই, তাহা হইলে তাহারা গান্ধারীকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াই যাইবে"। এই সকল মনে করিয়া সুবল ভীষ্মের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত থাকিলেও গান্ধারী দেবী পিতার আদেশানুরূপ পাত্রে পরিণীতা হইতে চলিলেন। রাজস্থান-কুসুম কৃষ্ণকুমারী স্বজাতির কল্যাণের জন্য আপন জীবন ত্যাগ করিয়াছেন, বিদেশীয় বীরাঙ্গনা জোয়ান অব্ আর্ক স্বদেশের কল্যাণের জন্য প্রাণ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্য-মহিলা গান্ধারী দেবী পিতার মঙ্গলের জন্য নিজ সুখ সাধ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। জীবন ত্যাগ করা বরং সহজ, কিন্তু জীবন থাকিতে জীবনের সুখ সাধ—(বিশেষতঃ তরুণ বয়সে) বিসর্জ্জন দেওয়া যে কিরূপ কঠিন কার্য্য, তাহা করিতে যে কিরূপ দেবোচিত ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক, তাহা হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

কেবল ইহাই হইলে গান্ধারীকে স্বর্গীয়া দেবী মনে করিতাম না। যদি গান্ধারী দেবী বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ-শাসিতা, স্বার্থপর পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, কাণ্ডজ্ঞানহীনা বালিকার মত অপাত্রে পরিণীতা হইতেন এবং প্রাপ্ত বয়সে অযোগ্য স্বামীর জন্য জীবন্মৃতা রহিতেন, আর কোনও রূপ ত্রুটি দেখিলেই সেই হতভাগ্যকে "বিলক্ষণ দশ কথা" শুনাইয়া দিতেন, তাহা হইলে গান্ধারী দেবীর জীবনকে স্বর্গীয় জীবন বা আদর্শ জীবন বলিতে ইচ্ছুক হইতাম না। গান্ধারী দেবী বুঝিয়াছিলেন "স্বামীই স্ত্রীলোকের অবলম্বন। তিনি অন্ধ হউন, খঞ্জ হউন, তথাপি তাঁহা

ব্যতীত রমণীর প্রীতিপাত্র আর কেহই নাই। স্বামীর সমদুঃখভাগিনী হওয়াই স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য", ইহা বুঝিয়াই গান্ধারী বিবাহের সময়ে স্বামীর দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী অন্ধ, কি আত্মীয় স্বজনের মধুর মূর্ত্তি, কি বাহ্য জগতের অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, এ সকল দর্শনে বঞ্চিত, তাঁহাকে সে সুখ হইতে বিধাতা বঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়া গান্ধারী দেবী সেই সকল সুখ কোন্ প্রাণে উপভোগ করিবেন? যদি স্বামীকে অন্ধ বলিয়া মনে অভক্তি হয়, তাহা হইলে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কোথায় রহিবে? এই সকল মনে করিয়া গান্ধারী দেবী চক্ষু বস্ত্রে আবৃত করিয়া অন্ধত্ব গ্রহণ করিলেন। কি গভীর পতিভক্তি! কি অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যপরায়ণতা! এ কার্য্য বালিকার কার্য্য নহে, এ হৃদয় মানবভয়ে ভীত হৃদয় নহে, এ শিক্ষা অন্ধবিশ্বাসজনিত "কুসংস্কার" নহে। তুমি আমি কে?—এই বিশ্ব জগতের একটি বিম্বমাত্র; পারিবারিক মঙ্গলের জন্য, সামাজিক মঙ্গলের জন্য অথবা জাতীয় মঙ্গলের জন্য যদি সুখ বলিয়া দুঃখ গ্রহণ করিতে পারি, দুঃখে যদি সন্তুষ্ট হইতে পারি, তাহা হইলেই এ জীবন সফল। গান্ধারী দেবী পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অমরত্ব লাভ হইয়াছে।

কালে গান্ধারী দেবী পুত্রবতী — বহু পুত্রের জননী হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী দেবীর ন্যায় ধার্ম্মিক, মনস্বী ও চরিত্রবান্ ছিলেন না বলিয়াই হউক, বা আর যে কারণে হউক, গান্ধারীতনয়েরা কেহই মাতৃপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন না। ধার্ম্মিকবর ভীষ্ম, বিদুর, সুশিক্ষক দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের দ্বারা পালিত ও শিক্ষিত হইয়াও গান্ধারী-তনয় দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি পরহিংসা, পরপীড়া, অধর্ম্মাচার প্রভৃতি অসদ্গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শকুনির সংসর্গে তাঁহাদের অধর্ম্মবৃত্তিসকল ক্রমে বিকাস পাইয়া থাকিবে। কুসংসর্গের ফলে মানুষ পিশাচ হইয়া থাকে, মানবহৃদয় নরককুণ্ড হইয়া থাকে। জগতে যদি পাপের প্রকৃত ইতিহাস দেখা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে তিন ভাগ পাপী কেবল কুসংসর্গের জন্যই পাপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

নিজের বিবাহ হইতে পুত্রগণের বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রকে কোনও অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হইতে দেখা যায় নাই। বরং তিনি ভীষ্ম বিদুর প্রভৃতি গুণবান্ আত্মীয়দিগকে উপযুক্ত সম্মাননা করিয়াছেন, স্বীয় অনুজ পাণ্ডুকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিয়াছেন, ইত্যাদি পারিবারিক কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন; ধর্ম্মশীলা গান্ধারীর সাহচর্য্যে ন্যায় ও ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। পরে পাণ্ডুর অকালমৃত্যু ঘটনা হওয়াতে বিধবা কুন্তী যখন পাঁচটী বালক লইয়া হস্তিনা-পুরে প্রবেশ

করিলেন, তখনই কুরুবংশের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।—যে অন্তর্বিবাদরূপ আগুনে ভারতবর্ষ ছারখার হইয়াছে, কুরুকুলে সেই অন্তর্বিবাদরূপ আগুনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল! কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে (১) সর্ব্বদা হিংসন ও পীড়ন করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র এত দিন কেবল দৃষ্টি-অন্ধ ছিলেন, এখন পুত্রগণের স্নেহান্ধ হইয়া ধর্ম্ম, ন্যায়, ও সাধুতার প্রতি অন্ধবৎ কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাপাশয় পুত্রগণ জননীর নিকটে কখনই মনের ইচ্ছা জানাইতে পারিত না, পুণ্যবতী সাধ্বীর নিকটে কোনও পাপেচ্ছা ব্যক্ত করা মহাপাপীর পক্ষেও সহজ নহে—তবে "অসাধ্য" এমন কথা বলিতেছি না। যাহা হউক তাহারা এ বিষয়ে পিতার নিকটে অনেক প্রশ্রয় পাইত। স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, এবং গান্ধারীর অজ্ঞাতে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের প্রতি বিপক্ষতাচরণ করিতেন।

এ জগতে "সুখ" বলিয়া একটী পদার্থ আছে, তাহা একটু আধটুও সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু হিংসক, কখনও তাহার ছায়া দেখিতে পায় না। এই এক বিশেষ আশ্চর্য্য, হিংসক যতই হিংসা করে, হিংসিত ব্যক্তি ততই উন্নতি লাভ করিতে থাকে। দুর্য্যোধনাদি যতই হিংসা করিয়া যুধিষ্ঠিরাদির বিনাশ চেষ্টা করিতে লাগিল, পাণ্ডবেরা ততই সহায়,সম্পত্তি, সুখ্যাতি ও গৌরব লাভ করিতে লাগিলেন। শেষে শত দুর্য্যোধনের অসাধ্য যে "রাজসূয় যজ্ঞ", তাহাও সম্পন্ন করিলেন!

ক্রূরমতি কৌরবেরা আর সহিতে পারিল না। মরণাধিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। অবশেষে উপায়ান্তর অভাবে, দুর্ব্বুদ্ধি শকুনির মন্ত্রণায় পাশা খেলা আরম্ভ করিল। কৌশলে পাণ্ডবেরা হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন ও দাসত্ব স্বীকার করিলেন; দ্রৌপদী দেবীকে সভায় আনিয়া তাঁহার প্রতি বীভৎস আচরণ করা হইল। দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবের সর্ব্বস্বের অধিপতি দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে আনন্দ ধরে না। আমাদের দেশে যেমন কোনও কোনও পিতা, জাল ফেরেবী বা মিথ্যাবাদী পুত্রকে বৈষয়িক উন্নতি করিতে দেখিয়া আনন্দে আকুল হন, কেবল রাজ-দণ্ড-ভয়ে প্রকাশ করিতে সাহসী হন না, ধৃতরাষ্ট্রও সেইরূপ পুত্রের উন্নতিতে অসীম আনন্দ পাইয়া, ভীষ্ম, দ্রোণ বিদুরাদির ভয়ে প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

সহসা সেই পাপসভায় পুণ্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল। যেন রাজার পাপাচারে ব্যথিত হইয়া রাজলক্ষ্মী স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব হইলেও এত বিস্ময়কর—এত শুভ-ফল-জনক ঘটনা হইত না।

(১) উভয়ে কুরুবংশীয় হইলেও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা কৌরব, পাণ্ডুপুত্রেরা পাণ্ডব নামে খ্যাত।

পুণ্যময়ী, ন্যায়পরায়ণা গান্ধারী দেবী পাপের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে, কুকার্য্যলিপ্ত স্বামীকে সুপথে আনিতে, কুরু-সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। রমণীর সর্ব্বস্ব হইতে স্বামী শ্রেষ্ঠ, স্বামী হইতে ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ। স্বামীর জন্যে রমণীর এ জগতের সকলই ত্যাজ্য—স্বামীর জন্যে রমণী রাজসম্পত্তি অবহেলা করিয়া বনচারিণী হইতে পারেন, স্বামীর নিন্দা শুনিয়া জীবন ত্যাগ করিতে পারেন, রাজার কন্যা হইয়াও ভিখারী স্বামীর পর্ণকুটীরে বাস করিয়া জীবন সফল মনে করিতে পারেন, স্বামীর জীবনের জন্যে যমের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন,—পতিপ্রাণা সতী এ সবই পারেন, কেবল স্বামীর জন্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না, কেবল স্বামীকে অধর্ম্মাচরণ করিতে দেখিতে পারেন না। ধর্ম্মের জন্যই স্ত্রী সহধর্ম্মিণী। তাই স্বামীকে অধর্ম্ম-পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করা স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রমণী স্বামীর অনুরোধে অধর্ম্মে নিযুক্ত হন, তাঁহার স্ত্রীত্ব বিফল; সে অন্ধ পতিপ্রাণতার কোনও মূল্য থাকে না। "ভালবাস, ভালবাসিয়া আত্মহারা হও, কিন্তু ধর্ম্মহারা হইও না" ইহা রমণীর পক্ষে অমূল্য উপদেশ। গান্ধারী-জীবনে এই উপদেশের কার্য্য দেখিয়াই আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। "অনুরাগ আছে, আসক্তি নাই!" তাই যিনি স্বামীর অন্ধত্বের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই স্বামীকে অধর্ম্মাচরণ করিতে দেখিয়া দৃঢ় ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! আপনার সাক্ষাতে কি পাণ্ডুপুত্রগণের এই দুরবস্থা হইয়াছে? দুর্য্যোধনের পাপেচ্ছা পূর্ণ করিতে কি আপনি অনুমতি দিয়াছেন? কুপুত্রের স্নেহে অন্ধ হইয়া কি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছেন না? আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন এমন মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন, তখন কুরু-বংশের সর্ব্বনাশের আর বাকি নাই; মহারাজ! আর মোহান্ধ থাকিবেন না, দুষ্ট শকুনির কুমন্ত্রণায় আর কর্ণপাত করিবেন না, এখনও পাণ্ডুপুত্রদিগকে রাজ্য ধনাদি প্রত্যর্পণ করুন, ভীমার্জ্জুনের ক্রোধ প্রশমিত হউক, মহারাজ! ধর্ম্মকে অতিক্রম করিবেন না।" পুণ্যশীলা সাধ্বীর মুখনিঃসৃত বাক্যাবলী শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; সেই গভীর বাক্য সকল তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যে হৃদয়ে পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পাপের স্রোত বহিতেছিল, পর মুহূর্ত্তে সেই হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইল। গান্ধারী দেবীর পবিত্র আজ্ঞা লঙ্ঘিত হইল না; অন্ধরাজ পাণ্ডবদিগকে মুক্ত করিলেন। সতীধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে।

"সংস্মরন্তমপি প্রেতং বিষমেষ্বেকপাতিনম্।
ভার্য্যৈবাম্বেতি ভর্ত্তারং সততং যা পতিব্রতা॥" *

---

* গত ৯৭ সালের মাঘ মাসের বামাবোধিনীতে "সতীধর্ম্ম" দেখ।

গান্ধারী দেবী, এ ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। নরক-পতিত পতিকে স্বর্গে আনিতে পাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন! এমন রমণীরত্ন যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশই প্রকৃত পুণ্যভূমি।

(ক্রমশঃ)

শিখ জাতি।

ভারতের উত্তর পশ্চিমে যে স্থান শতদ্রু প্রভৃতি পঞ্চ নদের দ্বারা বিধৌত, উহাকে পঞ্জাব বলে। এই স্থানে শিখদিগের বাস। রণকুশল বলবান্ শিখ ভারতের গৌরব। শিখদিগের রণদক্ষতার বিষয় কাহার নিকট পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, স্বয়ং বৃটিষ সিংহ শিখদিগের অসীম সাহস ও রণকুশলতার বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে শিখদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি। বেশী দিনের কথা নয়, সে দিন মিশরের যুদ্ধে শিখ সৈন্য যেরূপ সাহস ও রণনিপুণতার পরিচয় দিয়া ইংরাজের প্রশংসাভাজন হইয়াছে, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। যেমন ভারতের গৌরব শিখ, আবার শিখের গৌরব রণজিৎ। যে সাহসী বীরের নাম করিলে এবং কীর্ত্তিকলাপের বিষয় স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, সেই যুদ্ধগুরু রণজিৎ শিখদিগের মস্তক ছিলেন। বীরজগতে রণজিতের নাম যেরূপ, আবার ধর্ম্মজগতে নানকের নাম সেইরূপ ঘোষিত। এই মহাত্মার প্রচারিত ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর শিখ জাতির উন্নতিসোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। শিখদিগের আদি ইতিহাস বর্ণন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শিখগণ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় যুদ্ধের দিকে মন না দিয়া প্রথমতঃ জাতীয় একতা কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহারই সঙ্কল্প করিলেন। হিন্দুধর্ম্ম শুনিতে যদিও এক ধর্ম্ম, কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র ও আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা হেতু হিন্দুধর্ম্মকে সহস্রশাখা বৃক্ষ বলা যাইতে পারে। শিখেরা যদিও হিন্দু ছিলেন, কিন্তু নিজ জাতির স্বাতন্ত্র্য ও তৎ সূত্রে জাতীয় একতার জন্য হিন্দুধর্ম্মের শাখা নানকপন্থী ধর্ম্ম আবিষ্কার করিলেন। এই ধর্ম্মে এক এক জন গুরু ধর্ম্মের নেতা এবং আর সকলেই তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী। নানকবেদী ইঁহাদের প্রথম এবং গোবিন্দ সিং সোদী শেষ গুরু। "বেদী" ও "সোদী" এই দুই স্বতন্ত্র নামে শিখগণ কেন অভিহিত, তাহার বর্ণনা আবশ্যক।

রাম যখন সীতাকে বনবাস দিবার জন্য লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করেন, লক্ষ্মণ সীতাকে অমৃতসরের তিন ক্রোশ দূরে রামতীর্থে রাখিয়া আসেন। বলা বাহুল্য পূর্ব্বে এই স্থানের নাম রামতীর্থ

ছিল না এখন এই রামতীর্থ হিন্দুদিগের এক প্রধান তীর্থস্থান। সীতাকে বনে দিবার পর যাহা যাহা হইয়াছিল, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। সীতা লও (লব) এবং কুশ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। কালে ইঁহারা ধনী ও ক্ষমতা-শালী হইয়াছিলেন। লও নিজনামে যে নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম লাহোর এবং কুশ যে নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম কুশর রাখেন। লব ও কুশের বংশাবলী লাহোরে ও কুশরে রাজত্ব করেন। পরে যখন কুলরাও লাহোরে রাজা হন, তাঁহার ভ্রাতা কুলপৎ সে সময় কুশরের রাজা। রাজ্যবিস্তৃতি-লোভপর-বশ কুলপৎ নিজভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার করেন। কুলরাও অনন্যোপায় হইয়া দাক্ষিণাত্যের রাজা অমৃতের শরণাপন্ন হন। অমৃত তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া অতি যত্ন ও সমাদরে নিজ বাটীতে স্থান দেন এবং নিজ কন্যার সহিত কুলরাওর বিবাহ দেন। অমৃতের মৃত্যুর পর কুল রাও তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। পরে তাঁহার পুত্র সোদিরাও রাজা হইয়া অনেক রাজ্য জয় করেন। পিতার অপ-মান এবং পরাজয়ের কথা শুনিয়া তিনি কুলপতের সহিত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করেন এবং তাহাকে পরাস্ত করিয়া পুন-রায় লাহোরের পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন।

কুলপৎ কাশীতে পলায়ন করেন এবং বেদ পড়িতে আরম্ভ করেন। বেদে এই মর্ম্মে এক উপদেশ আছে দেখিতে পাইলেন "পীড়ন মহাপাপ; যে পীড়ন করে, তাহার নিকট দয়ার আশা করা অন্যায়।" কুলপৎ তাঁহার ভ্রাতার প্রতি পূর্ব্ব ব্যবহারের বিষয় স্মরণ করিয়া সোদিরাওর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন মনস্থ করিলেন। লাহোরে পৌঁছিয়া তিনি ভ্রাতস্পুত্রের নিকট বেদ পাঠ করিলেন। সোদিরাও বেদ শুনিয়া কুল-পতের ক্ষমা প্রার্থনা বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে সিংহাসন দিয়া নিজে জঙ্গলবাসী হইলেন। কুলপতের বেদ পাঠের জন্য সকলে তাঁহাকে বেদী বলিত। কুলপতের বংশাবলী সেই হইতে বেদী এবং সোদীরাওর বংশাবলী সোদী নামে অভিহিত। এখন পঞ্জাববাসী অধি-কাংশ শিখ সোদী।

(ক্রমশঃ)

সতীধর্ম্ম। (১)

(৪র্থ প্রবন্ধ, মনুসংহিতা ও মহাভারত প্রভৃতি হইতে।)

অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।
যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে ॥১॥

যে করে নিজেরি তরে ভক্ষ্য আয়োজন,
সে শুধু নরকভোগ, সে নহে ভোজন;
পঞ্চ যজ্ঞ করি, অবশিষ্ট যাহা রয়,
তাহাই সাধুর ভক্ষ্য ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়।১।(২)

(১) সতীধর্ম্মে এত গৃহস্থালির কথা কেন? যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন,—উত্তর এই যে,—গৃহস্থাশ্রমই সতীধর্ম্মের জন্মভূমি, এবং গৃহস্থাশ্রমই সতীধর্ম্মের কর্ম্মভূমি। গৃহস্থাশ্রম না থাকিলে সতীধর্ম্মের অস্তিত্বই থাকিত না। যেমন দ্রব্যের আশ্রয় ভিন্ন গুণের উপলব্ধি হয় না, তেমনি গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয় ভিন্ন সতীধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না। অনেকে এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এ প্রবন্ধে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর বিষয় এত অধিক বলা হইতেছে কেন? ইহার উত্তর স্বয়ং মনুই দিয়াছেন। "যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা"—যিনি পতি, তিনিই পত্নী, অর্থাৎ পতির মধ্যেই পত্নী এবং পত্নীর মধ্যেই পতি, দুয়ে এক, একে দুই। পতিপত্নী ভগবানের "অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি"—গঙ্গাসাগর-সঙ্গম;—

"দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ" ॥(মনু)

ভগবান আপনাকে দুই ভাগ করিয়া অর্দ্ধভাগে পুরুষমূর্ত্তি ও অর্দ্ধভাগে স্ত্রীমূর্ত্তি দেখাইলেন। সেই 'অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি' হইতেই প্রজাপতি বিরাট্ পুরুষ উৎপন্ন হইয়া লোকসৃষ্টি করিলেন।

(২) "আত্মার্থং ভোজনং যস্য রত্যর্থং যস্য মৈথুনম্।
বৃত্ত্যর্থং যস্য চাধীতং নিষ্ফলং তস্য জীবিতম্" ॥
(কূর্ম্মপুরাণ)

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥২॥
ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাবিধি ন হাপয়েৎ ॥৩॥

'ব্রহ্মযজ্ঞ,'—অধ্যয়ন আর অধ্যাপন,
'পিতৃযজ্ঞ,'—নিজ পিতৃলোকের তর্পণ,
'দেবযজ্ঞ,'—যথাবিধি দেবতা-পূজন,
'ভূতযজ্ঞ,'—পশু পক্ষী কীটের তর্পণ,
'নৃযজ্ঞ,'—অতিথি অভ্যাগতের সেবন,
এই পঞ্চ যজ্ঞ নিত্য করিবে পালন।২।৩।(৩)

দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ ॥৪॥

দেবতা, অতিথি, ঋষি, পিতৃলোকগণ,
এ সবারে ভক্তিভাবে করিয়া তর্পণ,

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবল আপনারই জন্য ভোজনের আয়োজন করে, যাহার স্ত্রী-সহবাস (ধর্ম্মমূলক নহে) কেবল কামমূলক, যাহার বিদ্যাশিক্ষা কেবল জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য, তাহার জীবনধারণ বিড়ম্বনামাত্র।

(৩) গৃহস্থমাত্রকেই প্রতিদিন এই পাঁচটি কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, নহিলে পিশাচ মধ্যে গণ্য হয়। দেবলোকের, ঋষিলোকের, ব্রাহ্মণ-সজ্জনের ও অতিথিগণের নিকট গৃহস্থমাত্রেই ঋণী থাকেন। সুপবিত্র ও সুবিনীত কর্ম্ম দ্বারা এই পাঁচটি ঋণ যথাক্রমে পরিশোধ করিয়া চলিলেই গৃহস্থধর্ম্ম পালন করা হয়;—

"ঋণমুন্মুচ্য দেবানামৃষীণাঞ্চ তথৈব চ।
পিতৄণামথ বিপ্রাণামতিথীনাঞ্চ পঞ্চমম্ ॥
পর্য্যায়েণ বিশুদ্ধেন সুবিনীতেন কর্ম্মণা।
এবং গৃহস্থঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ ধর্ম্মান্ন হীয়তে ॥"
(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব)

ভৃত্য পরিজনগণে করি তিরপিত,
শেষায় ভুঞ্জিবে গৃহী হয়ে সুস্থচিত।৪।(৪)

দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যদ্বিষ্ণোর্বিনিবেদিতম্।
তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈবহি ॥৫॥
পঞ্চযজ্ঞান্ সমাপ্যৈবমন্নৈর্বিষ্ণুনিবেদিতৈঃ।
ভুঞ্জীত স্বজনৈঃ সার্দ্ধং যথাভাগং গৃহী স্বয়ম্ ॥৬॥

সর্ব্ব অগ্রে নারায়ণে করি নিবেদন,
পরে তাহে পঞ্চ যজ্ঞ করি সমাপন,
অবশিষ্ট অন্ন গৃহী করিয়া বণ্টন,
আত্মীয় স্বজনে মিলি করিবে ভক্ষণ।৫।৬(৫)

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৄণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ সান জীবতি ॥৭॥

দেবাতিথি পিতৃলোক আদির তর্পণ,
যথাবিধি না করিয়া যে করে ভোজন,
সে অভাগা কামারের হাপর যেমন,
ফেলিছে নিশ্বাস কিন্তু ধরে না জীবন।৭।

নাশ্নীয়াৎ প্রেক্ষমাণানামপ্রদায়ৈব দুর্ম্মতিঃ।
নাযজ্ঞশিষ্টমন্নদ্ বা ন ক্রুদ্ধো নান্যমানসঃ ॥৮॥

কাহারও ভোজনকালে যদি অন্য জনে,
সে দিকে চাহিয়া থাকে সতৃষ্ণ নয়নে;

(৪) দেবলোক, ঋষিলোক ও পিতৃলোকের যথাবিধি তর্পণ করিয়া গৃহস্থ তাঁহাদের নিকট এই বর প্রার্থনা করিবে,—

"অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু গোত্রং নঃ পরিবর্দ্ধতাম্।
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ ॥
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি।
অন্নং চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি ॥
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিস্ম কঞ্চন।
অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু" ॥

পিতৃগণ আমাদের নিকট সদাই সৌম্যমূর্ত্তি হউন, আমাদের বংশপরম্পরা বিস্তীর্ণ হউক, দাতাদিগের সংখ্যা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি লাভ করুক, আমাদের পবিত্র জ্ঞান ও সন্তান সন্ততি পরিবর্দ্ধিত হউক, শ্রদ্ধা হইতে যেন আমরা কদাচ বিচলিত না হই, দানের বস্তু যেন আমরা প্রচুর লাভ করি, যেন প্রচুর অন্ন পান ও বহু অতিথি লাভ করি, আমরা যেন বহু ভিক্ষার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করি, যেন আমরা কাহারও নিকট ভিক্ষা না করি। নিত্যই গৃহে অন্নের বৃদ্ধি হউক, এবং দাতারা চিরজীবী

(৫) ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি সর্ব্বাগ্রে নারায়ণকে ভক্তিভাবে নিবেদন না করিয়া তাহা কোনও কার্য্যেই ব্যবহার করিবে না। এ বিষয়ে শ্রুতি অর্থাৎ বেদপ্রমাণ যথা;—"একএব নারায়ণ-আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশো দ্যাবাপৃথিব্যৌ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অশিতমশ্নন্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং জিঘ্রন্তি, বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি, তস্মাদ্বিদ্বাংসো বিষ্ণুপহৃতং ভক্ষয়েয়ুঃ"—অর্থাৎ একমাত্র সেই পরমব্রহ্ম নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা শিব, প্রভৃতি আর কেহই ছিলেন না; দ্যুলোক, ভূলোক, সমস্ত দেবগণ, মানবগণ, পিতৃগণ সকলেই নারায়ণের প্রসাদ ভক্ষণ করেন, নারায়ণের প্রসাদ আঘ্রাণ করেন, নারায়ণের প্রসাদ পান করেন। অতএব জ্ঞানীরা অগ্রে বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া কিছুই ভোগ করিবেন না।

বিষ্ণুধর্ম্মে ভগবানের আদেশ যথা;—

প্রাণেভ্যো জুহুয়াদন্নং মন্নিবেদিতমুত্তমম্।
তৃপ্যন্তি সর্ব্বদা প্রাণা মন্নিবেদিতভক্ষণাৎ।"

অর্থাৎ আমার প্রসাদীকৃত পরম পবিত্র অন্ন দ্বারাই পঞ্চ প্রাণবায়ুর তর্পণ করিবে। আমার প্রসাদ ভক্ষণেই সর্ব্বদা প্রাণবায়ুর তৃপ্তিসাধন হয়।

যে অন্ন ও জল অগ্রে বিষ্ণুকে নিবেদন না করা হয়, তাহা মল ও মূত্রের ন্যায় ঘৃণিত;—
"অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্

যে তাহারে নাহি দিয়া আপনিই খায়,
তার সম নরাধম না হেরি ধরায় ;
প্রশান্ত প্রফুল্ল ভাবে হোয়ে একমন,
পঞ্চ যজ্ঞ অবশিষ্ট করিবে ভোজন ।৮।

উপলিপ্তে সমে দেশে শুচিঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ।
পত্রৈর্ষথানুরূপেণ পুত্রশিষ্যাদিভির্বৃতঃ ॥
সুসংস্কৃতং হিতং স্নিগ্ধং ভুঞ্জীতান্নমকুৎসয়ন ॥৯॥

পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন সমতল স্থান,
তাহে বসি সেবন করিবে অন্নপান ;
আপন সঙ্গতি মত বিশুদ্ধ ভাজনে (৬)
পান ভোজনের দ্রব্য রাখিবে যতনে,
অনন্তর শুচিভাবে শ্রদ্ধাসহকারে,
পুত্র শিষ্য আদি সহ বসিবে আহারে ;
সুসিদ্ধ সুপথ্য সুখসেব্য পরিষ্কার,
ভক্ষ্য দ্রব্য যথাকালে করিবে আহার ।৯।

বিষ্ণুরত্তা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ তথা ।
সত্যেন তেন মে ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদং তথা ॥১০॥

ব্রহ্মই ভক্ষক, ব্রহ্ম ভোজনের ফল,
অন্নরূপী প্রাণময় ব্রহ্মই কেবল ;
এই সত্য জানিয়াই যে করে ভোজন,
ভোজনের শুভ ফল লভে সেই জন ।১০।

ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং চাতিথিপূজনম্ ॥১১॥

যে দ্রব্য অতিথি অগ্রে না করে সেবন,
গৃহী তাহা ভোগ না করিবে কদাচন ;
ধন মান আয়ু স্বর্গ আদি সুমঙ্গল,
অতিথি-সেবার ফল জানিবে সকল ।১১।

সংপ্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে ।
অন্নং চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্ ॥১২॥

অতিথি যদ্যপি গৃহে করে আগমন,
দিবে তারে পাদ্য অর্ঘ্য বসিতে আসন ;
পরম ভকতিভাবে করিয়া সম্মান,
পবিত্র ভোজন পান করিবে প্রদান ।১২।

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা ।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥১৩॥

তৃণ, ভূমি, জল আর সূনৃত বচন (৭)
ইহাও ত সাধু-গৃহে থাকে সর্ব্বক্ষণ ;
অতএব গৃহে যদি কিছুই না রয়,
এ সকল দিলেও অতিথি-সেবা হয় ।১৩

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ ॥১৪॥

নীচও আসিলে শ্রেষ্ঠ জাতির ভবনে,
তাহাকেও যথাবিধি পূজিবে যতনে,
গৃহস্থের অতিথিই সর্ব্বদেবময়,
অতিথি-পূজায় সর্ব্বদেবপূজা হয় ।১৪।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে ।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ ॥১৫॥

পরম শত্রুও গৃহে হৈলে উপস্থিত,
অতিথি-সৎকার তার করিবে উচিত ;
পাশে আসি কাঠুরিয়া করিছে ছেদন,
তবু তারে বৃক্ষ করে ছায়া বিতরণ ।১৫ (৮)

শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্ ।
বায়সানাং কৃমীণাং চ শনকৈর্নির্ব্বপেদ্ ভুবি ॥১৬॥

পতিত, গলিত কুষ্ঠী আদি রোগী জন,
শৃগাল, কুকুর, কাক, কৃমি কীটগণ,
এ সবারে অকাতরে করাবে আহার,
গৃহস্থই একমাত্র গতি সবাকার ।১৬।

---

(৬) 'ভাজন'—অন্ন জল প্রভৃতি রাখিবার পাত্র।

(৭) 'তৃণ'—তৃণের আসন ; অন্য আসন না থাকিলে তৃণ বিছাইয়া অতিথিকে বসিতে দিবে। 'সূনৃতবচন'—সত্য ও প্রিয় বাক্য।

(৮) ১৪নং. ১৫নং শ্লোক দুটি মহাভারত ও হিতোপদেশ হইতে গৃহীত হইল।

কৃত্বৈতদ্ বলিকর্ম্মৈবমতিথিং পূর্ব্বমাশয়েৎ।
ভিক্ষাং চ ভিক্ষবে দদ্যাদ্‌বিধিবদ্ ব্রহ্মচারিণে ॥১৭॥

অশরণ প্রাণিগণে করিয়া তর্পণ,
প্রীতিভরে অতিথিরে করাবে ভোজন;
ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক যদ্যপি আসে ঘরে,
সে সবারে ভিক্ষা দিয়া তুষিবে আদরে।১৭।

সুবাসিনীঃ কুমারাংশ্চ রোগিণো গর্ভিণীস্তথা।
অতিথিভ্যোঽগ্রএবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ন্ ॥১৮॥

নবোঢ়া, গর্ভিণী, রোগী, বাল, বৃদ্ধ যারা,
অতিথিসেবার অগ্রে খাইবে তাহারা;
এ সবারে সর্ব্ব অগ্রে করাবে আহার,
গৃহস্থ ইহাতে নাহি করিবে বিচার।১৮।

ইতরানপি সখ্যাদীন্ সংপ্রীত্যা গৃহমাগতান্।
সৎকৃত্যান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎ সহ ভার্য্যয়া ॥১৯॥

গৃহিণীর সখী কিম্বা আত্মীয় স্বজন,
যদ্যপি গৃহীর গৃহে করে আগমন,
পরম প্রণয়ে তার করিয়া সৎকার,
পত্নী সহ একসঙ্গে করাবে আহার।১৯।

বৈশ্বদেবে তু নির্বৃত্তে যদ্যন্যোঽতিথিরাব্রজেৎ।
তস্যাপ্যন্নং যথাশক্তি প্রদদ্যান্ন বলিং হরেৎ ॥২০॥

দেবাতিথি সকলের হইলে তর্পণ,
অপর অতিথি যদি করে আগমন,
না দিবে উচ্ছিষ্ট অন্ন গৃহী কদাচন, (৯)
পুনরায় পাক করি' করাবে ভোজন।২০।

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ ॥২১॥

বায়ুকে আশ্রয় করি' যত জীবগণ,
যেমতি জীবন সবে করিছে ধারণ;
তেমতি আশ্রম সব জানিবে নিশ্চয়,
জীবিত রয়েছে করি' গৃহীকে আশ্রয়
।২১।(১০)

যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্ ॥২২

যেথানে যে নদ নদী আছে এ ধরায়,
মহাসাগরের বক্ষে সবে স্থান পায়;
তেমতি যেথানে যত আছে জীবচয়,
গৃহস্থ-ভবনে আসি' লভয়ে আশ্রয়।২২

যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥২৩॥

ব্রহ্মচারী, যতি, ভিক্ষু যে আছে যথায়,
অন্ন জ্ঞান দিয়া গৃহী সবারে বাঁচায়;
তাই ত জগতে এই গৃহস্থ-আশ্রম,
সর্ব্ব আশ্রমের শ্রেষ্ঠ অতি অনুপম।২৩।

স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখং চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ।২৪

পবিত্র ঐহিক সুখ যে চায় সংসারে,
যে জন অক্ষয় স্বর্গ চায় লভিবারে;

---

(৯) ভগবান্ মনু স্থানান্তরে বলিয়াছেন,—
"নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
ন চৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্‌ব্রজেৎ॥"
কাহাকেও নাহি দিবে উচ্ছিষ্ট আহার,
অসময়ে আহার করিবে পরিহার;
উচ্ছিষ্ট শরীরে নাহি যাবে কোন স্থানে,
অত্যাচার কভু না করিবে অন্নপানে।

প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীনবীনচন্দ্র পাল সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন;—
"খাইলে অশেষ ব্যাধি, না খাইলে মরি,
অল্প নিদ্রা অল্পাহারে সর্ব্বকালে তরি।"

(১০) ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু, যথাক্রমে এই চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে; গৃহী অর্থাৎ গৃহস্থ আশ্রমকে অবলম্বন করিয়াই অপর তিনটি জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

সে পালিবে সাবধানে গৃহস্থ আশ্রম,
সে নারে পালিতে যার নাহিক সংযম ।২৪(১১)

(ক্রমশঃ)
শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা ।

ধন্যবাদ ।

ভারতের ইতিহাসে
ল্যান্‌সডন্ তব নাম
চিরস্মরণীয় হল আজ ;
অবলাবান্ধব বলি
পূজিবে তোমায় সবে
স্মরণ করিয়ে তব কাজ !
দুর্ব্বলা অবলাকুল
কি জঘন্য দেশাচারে
উৎপীড়িত হতেছিল হায় !
ভাবিতে শিহরে প্রাণ
শোণিত শুকায় স্মরি
অপবিত্র পাশব প্রথায় ।
সাগরে ছেলেডুবান
নিবারিল ওয়েলস্‌লি,
সতীদাহ তুলিলা বেন্‌টিক্,
তেমতি স্কোবেল বিল
পাস করি ধন্য হ'লে
'ল্যান্‌সডন্'—অটল-নির্ভীক !
উদার ইংরেজ জাতি—
(দয়া-ধর্ম্ম অবতার)
ঘুচাইতে দুর্দ্দশা নারীর—
করিলেন দৃঢ়পণ ;
আন্দোলনে ডরে কিরে
বীরশ্রেষ্ঠ যাঁরা অবনীর ?
শুনিলে ফেরুর ডাক
তুচ্ছ করি পশুরাজ
সেদিকে না তাকায় কখন,
নিরীহ প্রাণীর প্রতি
ভ্রূভঙ্গি নাহিক তার,
মহতের এই সে লক্ষণ !
মুখ-সরবস্ব-জীব
ভূতলে বাঙ্গালী জাতি
কি হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষায় ?
যেমন তেমনি আছে ;
কি হবে উন্নতি তার—
ছুতা যার কাজের বেলায় ?
হুজুকে পড়িলে আর
নাহি থাকে বিবেচনা
আন্দোলন-স্রোতে যায় ভেসে ;
জলমগ্ন তৃণ সম
তরঙ্গ আঘাতে ঘুরি
হাবুডুবু খায় অবশেষে !
সাধিবে দেশের শিব
সভা ও সমিতি করি,
সুললিত মধুর ভাষায়—

(১১) সংযম'—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দমন । কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু দমন করিয়া না চলিলে গৃহস্থাশ্রম রক্ষা হয় না ।

বক্তৃতা ঝাড়িছে কত,
সমাজের নেতা বলি—
বড় নাম হ'বে পত্রিকায়।
ব্যথায় পড়িলে হাত
ধরমের ভাণ করি
মিছামিছি করিবে চিৎকার;
চতুর ইংরেজ জাতি
জানিয়াছে গুহ্য কথা—
সত্য যাহা নহে লুকাবার!
তাই আজ অগ্রসর
তুলিতে কুরীত নীতি—
(সহজে তা উঠিবার নয়);
শিশু বিয়ে আদি করি
কত পাপ আবর্জ্জনা—
যুগে যুগে হয়েছে সঞ্চয়!
অবলার পক্ষ হ'তে
শত শত ধন্যবাদ
দিতেছি তোমারে ভিক্টোরিয়া।
আসুরিক অত্যাচার
সে কিরে দেখিতে পারে
দয়ায় গঠিত যাঁর হিয়া?

ওহে রাজ-প্রতিনিধি
ভারতের আশীর্ব্বাদ
দয়া করি করহ গ্রহণ,

ভাবীবংশ নরনারী
কোটিকণ্ঠে তব যশঃ
চিরদিন করিবে কীর্ত্তন।

সার্ এণ্ড্রু স্কোবল তুমি
লও এই উপহার—
অবলার ভকতি-প্রসূন—

গেলে পর মহাত্মন্,
দেখিয়ে ভারত নারী
ভক্তিভরে গা'ক তব গুণ;

সুসভ্য ইংরেজ জাতি
জগতের পূজ্য আজ—
অবলার দুঃখ করি দূর,

দিলা যে অমূল্য ধন
দুখিনী এ ভারতেরে,
কাছে তুচ্ছ 'কোহিনুর' তার।

বীরাঙ্গনা।

কৃষক

ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন—ইহারা এক একজন বড় বড় বীর। রণস্থলে ইহারা কত শত্রুর প্রাণ নাশ করিয়াছেন—কত রমণীকে বিধবা করিয়াছেন, বহু বালক বালিকাকে পিতৃহীন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদের বীরত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু যে আর একজনকে বাঁচাইতে গিয়া আপনি মরিয়াছে—আপনি মরিব ইহা নিশ্চয় জানিয়াও অপরের প্রাণ রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছে—সে ব্যক্তি বীর কি না, এসম্বন্ধে বোধ হয় অদ্যাপি অনেকের

সন্দেহ আছে। জগতে পশুবৃত্তি অদ্যাপি বড়ই প্রবল। সুতরাং যে মারে, সেই বীর; যে মরে, সে বীর নহে।

পুরাকালে স্কটলণ্ডের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। অত্যাচার, অশান্তি, ও রাজ-দ্রোহিতাবশতঃ তদ্দেশাধিবাসিগণ যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিত। তথাকার দুর্দ্দমনীয় সর্দ্দার গণ রাজ-শাসন গ্রাহ্য করিত না। তাহারা রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিত, সময় সময় রাজার প্রাণ নাশ পর্য্যন্ত করিত, এবং দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রজার সর্ব্বস্বাপহরণ করিত। স্কটলণ্ডের এই দুর্দ্দিনে আত্মোৎসর্গের—প্রকৃত বীরত্বের—একটি অতি সুন্দর কাহিনী বর্ণিত আছে। কি অবস্থায় এবং কাহার দ্বারা এই বীরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে বলিতেছি।

খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ডেভিড স্কটলণ্ডরাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য আলবানির ন্যায় প্রতাপশালী ব্যক্তি তৎকালে স্কটলণ্ডে কেহ ছিল না। আলবানির ক্ষমতা ও দুরাকাঙ্ক্ষা অসীম; তাঁহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। ডেবিড জীবিত থাকিলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, সুতরাং তিনি যে কোন প্রকারে হউক ডেভিডের প্রাণনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অচিরে নিষ্ঠুরহৃদয় আলবিন ডেভিডকে ফকলণ্ড নামক দুর্গে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে শুদ্ধ কারারুদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত থাকিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার প্রাণনাশ করা চাই, কারণ তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না। আলবানির আজ্ঞাক্রমে ডেভিডের আহার বন্ধ হইল। দুর্ভাগ্য ডেভিড ফক্লণ্ড দুর্গে আহারাভাবে মরিতে লাগিলেন। এই শোচনীয় ব্যাপারে ডেভিডের মিত্র ও শুভানুধ্যায়িগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন, এ সাহস কাহারও হইল না। আলবানির আজ্ঞাক্রমে পশুর অধম প্রহরিগণ দিবারাত্র ফক্লণ্ড দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। ডেভিডের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবে এমন দুঃসাহস কার? কেহই সাহস করিল না—কিঞ্চিৎ আহার দান করিয়া দুর্ভাগ্য ডেভিডের প্রাণ রক্ষা করে, এ সাহস কাহারও হইল না। অতীব দুঃসাহসিক কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্মুখ নহেন, এরূপ লোক জগতে নিতান্ত অপ্রাপ্য নহে। কিন্তু যাহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অণুমাত্রও আছে কিনা সন্দেহের বিষয়, অথচ নিজের মৃত্যু নিশ্চয়,—এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার লোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। হতভাগ্য ডেভিড ঠিক্ এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া মরিতেছেন। তাঁহাকে রক্ষা করা সাধ্যাতীত; কিন্তু যে তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইবে, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয়। সুতরাং তাঁহার

শুভানুধ্যায়িগণ যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াও তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য কোন উপায়াবলম্বন করিতে সাহসী হইলেন না।

এই সময় স্কটলণ্ডে এক কৃষকরমণী বাস করিত। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে যেরূপ দরিদ্র,নিরক্ষর, ঘৃণিত কৃষক-রমণী সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় সে তাহা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহার হৃদয়টি দয়ার সাগর ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডেভিডের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সকলেই ভীত, স্তম্ভিত, ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল; কিন্তু সেই দয়াবতী কৃষক-রমণীর প্রাণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে দয়ায় পাগল হইয়াছিল। যে দয়ায় পাগল, তাহার প্রাণে ভয় থাকে না, লজ্জা থাকে না, নিজের সম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকে না। নিজে বাঁচিব কি মরিব, যাহার জন্য মরিব তাহাকে বাঁচাইতে পারিব কিনা, ঈদৃশ কোন চিন্তাই এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। তাহার হৃদয়ের আবেগ এত প্রবল হইয়া উঠে যে তাহা নিবারণ করা, তাহার সাধ্যাতীত। সুতরাং সে নিজের মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও অপরকে বাঁচাইতে চাহে। বাঁচাইতে পারুক আর না পারুক, অন্ততঃ তাহার জন্য মরিতে চাহে, কারণ মরিতে পারিলেও সে সুখী হয়। এইজন্য সেই সামান্যা কৃষকরমণী ক্ষুধাতৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হতভাগ্য ডেভিডের অসহ্য যন্ত্রণা মোচন করিতে কৃতসংকল্পা হইল। উল্লিখিত হইয়াছে যে পশুর অধম প্রহরিগণ দিবারাত্র ফক্‌লণ্ড্‌ দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সে বিভীষিকায় সে ভীত হইল না। ফক্‌লণ্ড্‌ দুর্গের প্রত্যেক প্রহরী যদি এক একটা ব্যাঘ্র ভল্লুক, কি পিশাচ হইত, তাহা হইলেও সে ভীত হইত কিনা সন্দেহ। বিহঙ্গিনী যেমন শাবককে আহার যোগায়—মুখে আহার লইয়া দূরে প্রতীক্ষা করে, এবং সুযোগ পাইলেই এক বিন্দু আহার শাবকের কণ্ঠে ঢালিয়া দিয়া তাহার ক্ষুধা শান্তি করে—তদ্রূপ সেই কৃষক রমণী বস্ত্রের ভিতর আহার সামগ্রী লুকাইয়া দূরে অবস্থান করিত, এবং সুবিধা পাইলেই হতভাগ্য ডেভিডের কারাগারে লৌহদণ্ড রক্ষিত গবাক্ষ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভিতর দিয়া আহার সামগ্রী নিক্ষেপ করিত। এই প্রকারে সে ডেভিডের ক্ষুধা শান্তি করিতে লাগিল; কিন্তু তৃষ্ণা শান্তি হইবে কিসে? ভাবনা কি? বিধাতা নারীবক্ষে যে অমৃতবৎ পানীয়ের উৎস দিয়াছেন—যাহা পান করিয়া শিশু মানুষ হয়—যে অমৃতের বলে ভীষ্ম দ্রোণ বীর হইয়াছিলেন—সে অমৃত থাকিতে তৃষ্ণা শান্তির ভাবনা কি? কৃষক-রমণী ডেভিডকে আহার দিতে চলিল, এবং আহার সমাপ্ত হইলে নিজের বক্ষ অনাবৃত করিয়া অমৃতের উৎস হইতে অমৃত গালিয়া একটী নলের সাহায্যে

ডেভিডের শুষ্ককণ্ঠে ঢালিয়া তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন হতভাগ্য ডেভিডের প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু অচিরে সমুদয় রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রহরিগণ এক দিন তাঁহার রক্ষয়িত্রীকে ধরিয়া ফেলিল, এবং আল্‌বানির নিকট প্রেরণ করিল। পাষাণহৃদয় আল্‌বানি সেই কৃষক রমণীর চরিত্রের মহত্ত্ব বুঝিবে কেমন করিয়া? সে তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিল—দেবীসদৃশ—সেই কৃষকরমণী প্রফুল্ল-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়া দয়ার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

আমরা ভরসা করি তাহার নাম জগতে কখনও বিলুপ্ত হইবে না। ভরসা করি নরলোকে তাহার যথার্থ মর্য্যাদা হইবে। পাঠিকা! তুমি কি সেই সামান্যা কৃষক রমণীকে বীরাঙ্গনা বলিতে প্রস্তুত হইবে?

সঙ্গীতপ্রিয় জন্তু।

হরিণ সঙ্গীত বড় ভাল বাসে। বেহালার শব্দ বা বীণারধ্বনি শ্রবণ করিয়া হরিণের পাল নিঃশঙ্কচিত্তে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে। ব্যাধের সুমধুর বংশীরবে বিমোহিত হইয়া হরিণ আপনা হইতেই ধরা দিয়াছে, এরূপও শুনা গিয়া থাকে।

সীলমৎস্য খুব সঙ্গীতপ্রিয়। এক খানি নৌকাতে বাদ্যযন্ত্র সংযোগে মাঝিগণ গান করিতে করিতে গমন করিতে ছিল, দেখা গেল যে যতক্ষণ সেই বাদ্য ও সঙ্গীত হইতে লাগিল, ততক্ষণ বহুসংখ্যক সিল মৎস্য নৌকার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, এবং গান বাদ্য বন্ধ হইলে তাহারাও অদৃশ্য হইল।

মাকড়সাও সঙ্গীতপ্রিয়। একদা কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে দেখিতে পাইলেন যে ঘরের ছাদে যেখানে কতকগুলি মাকড়সা ছিল তাহারা সকলে একে একে তাঁহার সম্মুখস্থ দেয়ালে আসিয়া একত্রিত হইল; যতক্ষণ তিনি বাজাইলেন, ততক্ষণ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিল না।

বর্ফোঁ নামক প্রাণিতত্ত্ববিদের মতে হস্তীও সঙ্গীত ভালবাসে। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল হস্তী নীত হয়, তাহাদিগকে বাদ্যযন্ত্রের সহিত তালে তালে নাচিতে দেখা গিয়া থাকে।

উক্ত প্রাণিতত্ত্ববিদ বলেন যে তিনি কোন কোন কুকুরকে বিশেষরূপে সঙ্গীতপ্রিয় দেখিয়াছেন।

গৃহগোধিকা জাতীয় সরীসৃপগণ সঙ্গীতে বিশেষ মুগ্ধ হয়। একদা কোন ইংরাজ পরিব্রাজক মধ্য আফ্রিকার কোন অরণ্যের এক স্থানে গৃহগোধিকা জাতীয় নানা প্রকারের বহুসংখ্যক

সরীসৃপ দেখিতে পান। ঐ গুলি কি প্রকার জীব, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবার বাসনায় তিনি তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হন, কিন্তু তাঁহার পদশব্দে তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। পরিব্রাজকের সঙ্গে একটী বীণাযন্ত্র ছিল। তিনি উহা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, অনেকক্ষণ পরে সরীসৃপ গুলি স্থির হইল, এবং নিস্পন্দ ভাবে বীণা ধ্বনি শুনিতে লাগিল। ইত্যবসারে পরিব্রাজক তাহাদিগের আকার প্রকার বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পত্রোত্তর।

দাদা বাবু!

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্র পাইলাম। আপনি লিখিয়াছেন "নূতন আইন পাস হইয়াছে, ইহাতে তোমাদের মনের ভাব কি তাহা লিখিবে।" আপনার এ সদাশয়তা আমি চিরদিনই মনে রাখিয়া সুখী হইব। আমরা আজিও মানব সমাজের বাহিরে রহিয়াছি। আমাদের সুখ, দুঃখ, ইষ্ট, অনিষ্ট আজিও পুরুষদিগের অবহেলনীয়। আজিও আমরা তাঁহাদের মাথায় চিন্তা করি, তাঁহাদের রুচি-অনুসারে গঠিত হই, এবং তাঁহদের পায়ে হাঁটিয়া বেড়াই। তাঁহারা আমাদের রক্ষক ও অভিভাবক বলিয়া যে আমাদের জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ এ কথা সহস্রবার স্বীকার্য্য। কিন্তু—অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, বাড়াবাড়ির চোটে আমাদের হাড় পিষিয়া গেল! তাঁহারা আমাদিগকে সুশিক্ষা দিতে চাহেন না, পাছে আমরা আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারি। আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে রাখিতে চাহেন, পাছে দাসীত্বের বদলে সখীত্ব যাচ্ঞা করি। তাঁহারা আমাদিগের সহিত ভাল ব্যবহার করিতে চাহেন না, পাছে তাঁহাদিগকে যমের মত ভয় না করি!! এইতো আমাদের সামাজিক অবস্থা!—এরূপ স্থলে যাঁহারা সহস্র ত্যাগস্বীকার করিয়া আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন, যাঁহাদের শরীর মন ও অর্থ, নিঃস্বার্থভাবে আমাদের মঙ্গলের জন্যে অবিশ্রান্ত ব্যয়িত হইতেছে, যাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে আজি বঙ্গমহিলাদিগের মধ্যে কেহ কেহ "উচ্চশিক্ষা ও আদর্শ জীবন" প্রাপ্ত হইতেছেন, সেই নারীহিতৈষী, পরার্থপর, নর-দেবতাদিগকে কি করিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইতে হয়, তাহা আমরা কিছুই জানি না। যেমন মহাত্মা এব্রাহাম লিঙ্কন প্রভৃতি নরদেবতাদিগের পবিত্র নাম, হতভাগ্য নিগ্রোজাতির বুকে চিরদিনের মত লিখিত রহিবে, সেইরূপ বামাহিতার্থী দিগের পবিত্র নামও চিরকাল

অভাগিনী বঙ্গবাসিনীদিগের প্রাণে প্রাণে গাঁথা রহিবে। তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বরং নিগ্রোজাতির ক্ষমতা আছে, কিন্তু বঙ্গমহিলারা সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম। এই সকল কারণে, আপনার বালিকা-সম্বন্ধীয় আইনে আমাদের একটা মতামত থাকিতে পারে, এই বিশ্বাস দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম; এরূপ কথা কয়জনে জিজ্ঞাসা করেন?

এইতো গেল বিজ্ঞাপন, এখন কথার উত্তর করি। দাদাবাবু, আমাদের যেরূপ শিক্ষা ও জ্ঞান, তাহাতে ঘর কন্নার বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ই ভাল বুঝিতে পারি না—বিশেষতঃ যে আইনের বিষয়ে, দেশের বিখ্যাত লোকেরা অনেক অনুকূল প্রতিকূল যুক্তি দেখাইয়াছেন, যথাসাধ্য আত্ম-ক্ষমতা রক্ষা করিয়াছেন, আমি কোন্ ক্ষুদ্র কীটাণু যে সেই আইনের বিষয়ে একটী কথাও বলিব?—তবে যখন আমি বক্তা আপনি শ্রোতা, তখন ভয়ই বা কিসে, আর লজ্জাই বা কিসে? তাই আমাদের কার্য্যক্ষেত্র রান্নাঘরে বসিয়া, সোজা মাথায় সহজ জ্ঞানে যাহা উপলব্ধ হইল, লিখিতেছি; মনে রাখিবেন আমি বক্তা আপনি শ্রোতা।

এ জগৎ সুখ দুঃখময়। তাই নূতন আইন পাস হওয়াতেও কতক সুখের, কতক দুঃখের কারণ হইয়াছে। সুখ এই যে রাজার সদাশয়তা। গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্যে যেরূপ বহুল চেষ্টা করিতেছেন, সামাজিক অনিষ্টকারী বাল্যবিবাহ নিবারণ করিতেও সেইরূপ যত্নবান হইয়াছেন। আইনে ভুল অথবা ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু রাজার সদাশয়তার প্রশংসা কে না করিবে? তখনকার হিন্দু রাজাদের প্রজার মঙ্গলেই নিজের মঙ্গল ছিল, তখনকার রাজ-শক্তি কেবল প্রজা-শক্তির সমষ্টি ছিল।—কিন্তু "এখনকার বিদেশী রাজা"কে অনেকে স্বার্থপর মনে করেন, তাই এই আইন উপলক্ষে রাজার নিঃস্বার্থ হিতৈষণা, ত্যাগস্বীকার, স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি, জানিবেন।

সুখের কথা বলিলাম, এখন দুঃখের কথা বলি। রাজার আইন করার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীদিগের মঙ্গল হইবে বলিয়া, এদিকে রক্ষণশীল (১) ও উদার নৈতিক (২) দুইদলে ভয়ানক ঝগড়া বাধিয়া গেল, একদল অপর দলকে জব্দ করিতে পারিলেই যেন বাঁচেন! ঝগড়া ঝগড়ী কিছু বাঙ্গালির মধ্যেই গুরুতর হইল! (তাঁহারাই আবার বলেন মেয়ে গুলো ভারি ঝগড়া করে!) এই রকম বিবাদ বিষম্বাদ দেখিলে কার না দুঃখ হয়?

আমার বিশ্বাস ছিল দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই বাল্য-বিবাহের অপকারিতা বুঝিয়াছেন; আইনের নাম শুনিলে তাঁহারা আপ-

(১) Conservative.

(২) Liberal.

নারাই বাল্যবিবাহ নিবারণ করিবেন। বাল্য বিবাহ কেন অপকারী, তাহা এ ক্ষুদ্র পত্র মধ্যে বিশেষরূপ বলিতে পারিব না, দেশে অনেক আন্দোলন হইয়াছে, আমি আবার তাহার এক সংস্করণ বাহির করিব কেন? তবে আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে বালিকাদের হইয়া দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ও উন্নতিশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাপ্তবয়স্কা বালিকারা বিবাহের পরেই স্বামী ও স্বামি-গৃহ কেমন আপন করিয়া লয়; দুই দিনের মধ্যেই স্বামী স্ত্রীতে কেমন হৃদ্যতা জন্মে। আর হিন্দু গৃহের কাণ্ডজ্ঞানহীনা বালিকা বিবাহিতা হইলে "স্বামী ও স্বামিগৃহ" শুনিতেই তাহার গায়ে জ্বর আইসে। অন্ততঃ ১৩।১৪ বৎসর বয়সের না হইলে, সে স্বামীকে ভাল বাসিতেই পারে না। এ কারণটী সামান্য বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে।

দ্বিতীয়তঃ যাহারা অতি অল্পবয়সে বিবাহিতা হয়, বিবাহের দুই এক বৎসর পরে যদি তাহাদের "বৈধব্য" ঘটনা হয়, তবে কি ভয়ানক কাণ্ড হয় একবার মনে করুন দেখি!—বৈধব্যাবস্থা কাহারও সুখের নহে সত্য, তবে যাহারা সজ্ঞানে স্বামীকে একদিনও দেখিয়াছে, তাহাদের ত্যাগস্বীকারের পথ অনেক সহজ—একথা একটু ভাবিয়া দেখিলেই অনুভব করা যায়। কিন্তু বিবাহের মর্ম্ম না বুঝিয়া, কেবল কঠোর শাসনে, কেবল পর-বল পীড়ায় যাহারা "বৈধব্য" গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাহারা আত্মবিস্মৃত হইবে কি করিয়া?—যে শিক্ষা-বলে শিক্ষিতা রমণীগণ "কৌমার্য্য" অবলম্বন করিতে সক্ষমা হন, সে পবিত্র শিক্ষা বিধবা বালিকার স্বপ্নেরও অগোচর।—বিশেষতঃ অনেক গৃহে তাহাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা "অসহনীয়" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগের পরিণাম—বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর অবলাদিগের পরিণাম যে কি শোচনীয় কি ভয়ানক, তাহা একবার বিবেচনা করুন্।—ধরিয়া বাঁধিয়া পাঁচী তেলিনীকে "ভগিনী ডোরা" সাজাইতে যাওয়া কি পাগলের কার্য্য নহে? *—তাই আমরা বলি যে যদি বাল্য-বিবাহ নিবারিত হয়, তাহা হইলে আর "কুমারী বিধবা" দেখিতে হইবে না—বঙ্গভূমিও অশান্তির স্রোতে ভাসিবে না!!

যাহাহউক রক্ষণশীল সম্প্রদায় বাল্য-বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতে যেরূপ বাগ্‌যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গিয়াছি! তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বাল্যবিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহা-

* বড় দুঃখের বিষয় আমাদের শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীও একথা বুঝেন নাই। তিনিও প্রাপ্তবয়স্কা অপ্রাপ্তবয়স্কা সকল বিধবার পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন।

দিগকে আমরা কিছুই বলিতে পারি না, কারণ হিন্দুশাস্ত্রে বাল্যবিবাহের সপক্ষে বিপক্ষে দুই রকম যুক্তিই আছে। যাহা সত্য, যাহা শুভ, তাহাই গ্রহণীয়। কেহ কেহ মনে করেন বাল্যবিবাহ রহিত হইলে, রমণীগণ স্বামীর আদর্শে গঠিত হইবে না এবং স্বামীর বশীভূতা রহিবে না। বড় দুঃখের বিষয় ইহাঁরা হিন্দুশাস্ত্র ওলট পালট করিয়া, আর্য্যদিগের ইতিবৃত্ত সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়াও ভুল বিশ্বাস করেন। যাঁহারা পতিব্রতা কুলের আদর্শ, সেই সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, দময়ন্তী প্রভৃতি আর্য্য মহিলাগণ কি বর্ত্তমান হিন্দু বালিকার মত নয় দশ বৎসর বয়সে বিবাহিতা হইয়াছিলেন? যাহাহউক এই সম্প্রদায় আগে বহুবিধ যুক্তি দিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে (কেহ কেহ) বঙ্গ মহিলার ধর্ম্মনৈতিক জ্ঞান সম্বন্ধে এমন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিলেন, যে তাহা শুনিয়া ভদ্র লোকে কানে হাত না দিয়া থাকিতে পারে না!—ছি! ছি! ছি! আপনাদেরই মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যা; আপনাদেরই আশ্রিতা, পালিতা, রক্ষিতা; আপনাদেরই সম্মান, লজ্জা ও আদরের জিনিস; স্বার্থের অনুরোধে তাহাদিগকে কি এমনি করিয়া গড়িতে হয়?" 'প্রতিবাদ করিতে পারিবে না' ভাবিয়া কি এমনি অকথ্য কথা কহিতে হয়? শত্রুকে জব্দ করিবার আশয়ে কি সত্যসত্যই নিজের গলায় দড়ি দিতে হয়? ছি! ছি! ছি!—এতদূর গড়াইয়া শেষে দেবতার কাছে অনেক প্রার্থনা করিলেন, তার পর আইন পাস হইলে, কেহ কেহ দেবতার উপরেও কত "অভিমান" ঢালিলেন!—ইহাঁদের ভক্তি ও বিশ্বাস অবশ্য প্রশংসনীয়, কিন্তু এত বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের এত ভ্রম কেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুমান হইল না। দেবতা তো সকলেরই দেবতা, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেবতা, তিনি পক্ষপাতিতা করিবেন কেন? আর আমরা ক্ষুদ্রতম কীটাণু আমাদের কলঙ্কে দেবতাকে কলঙ্কিত করিতে যাই কেন? তাই বলিতেছি, দাদা বাবু, যাঁহারা হিন্দু সমাজ রক্ষা করিতে অগ্রসর, আমাদের সেই শ্রদ্ধাস্পদ রক্ষণশীল দলের এইরূপ কার্য্যে আমরা বিশেষ মনোবেদনা পাইয়াছি।

তারপর উদারনৈতিক দলের কথা। ইহাঁদের মত অনেকটা নিরপেক্ষ ও সত্য, কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি। ইহাঁরা একেবারেই "গাধা পিটিয়া ঘোড়া" বানাইতে চাহেন। যদি এতই বোঝেন—যদি স্বদেশের মহিলার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকেন, তবে একটু ধৈর্য্য ধরিতে চাহেন না কেন? দেশকাল পাত্র মনে রাখেন না কেন? তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহাদের মধ্যে আইন পাস হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ আহ্লাদে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন!—আইন পাস হইয়া যে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল

হইয়াছে, আমাদের তো এরূপ বোধ হয় না। যতদিন দেশে কুসংস্কার থাকিবে, যতদিন দেশে ছেলে বিক্রয়, মেয়ে বিক্রয় চলিবে, যতদিন লোকে জাতীয় মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগ করিতে সক্ষম না হইবে, ততদিন যে বাল্যবিবাহ নিবারিত হইবে, এরূপ আশায় বিশ্বাস করা যায় না। যদি বাল্যবিবাহই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে আইন পাসের ফল হয়তো "অমৃতে বিষ" হইয়া উঠিবে। আর এক কথা, যাঁহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইন পাস হওয়ার সহায়তা করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই আইনকেই দেশের শান্তি ও উন্নতি-বর্দ্ধক বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস করিতেছেন, তাঁহারাই বা আনন্দে "আত্মহারা" কেন? কাজ করিয়া অহঙ্কারের উদ্রেক হইলে, সে কাজ কি "মাটী" হইয়া যায় না? ভাল কাজ করিবার তুমিই বা কে, আমিই বা কে, আর স্বয়ং রাজাই বা কে? যিনি রাজার রাজা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট্‌, তাঁহার কাজ তিনিই করাইতেছেন, তবে যে সময়ে সময়ে অসত্য প্রবল হয় সে কেবল সত্যের জয় হইবে বলিয়া। মহাত্মা খৃষ্টকে ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল, খৃষ্ট-নীতি প্রচার হইবে বলিয়া, রাজা রামমোহন রায় দেশের লোকের হাতে অসহনীয় কষ্ট পাইয়াছিলেন, সত্য ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া। * তাই বলিতেছি, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতেই হউক, আর তর্কচূড়ামণি মহাশয় হইতেই হউক, যাঁহার কাজ তিনিই করাইতেছেন, মানব কেবল উপলক্ষ মাত্র। (এই জন্যে গালিগালাজ শুনিলে ও অহঙ্কারের ভাব দেখিলে আমাদের প্রাণে বড় ব্যথা লাগে।) বিশ্বজগতের দিকে চাহিয়া দেখিলে আপনাআপনি মনে আসে,

"—আনন্দে বিহ্বল ;
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রথে,
চলেছে উন্নতি পথে ;
মহান্ উদ্দেশ্য মূলে অনন্ত মঙ্গল।"

তাই বলিতেছি কাজ করিয়া মানুষের বাহাদুরী কিসে? যদি দেখিতাম, রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দুই দলেই, জগদীশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বদেশের কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে দাদা বাবু, এই মর জীবনে স্বর্গসুখ ভোগ করিতাম, তাই না দেখিয়াই বড় দুঃখ হয়।

রক্ষণশীল, উন্নতিশীল, দুই দলের কাছেই মা জন্মভূমি অনেক আশা রাখেন। দুই দলই আমাদের ভক্তি-ভাজন। তাই তাঁহাদের মধ্যে কোন রকম ভুল বা ত্রুটি দেখিলে আমাদের অসহ্য কষ্ট হয়। এই কারণেই আপনার নিকটে এসকল কথা বলিলাম।

* ব্রাহ্ম সম্প্রদায় যাহা বলেন, নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ও তাহাই "সত্য" বলেন। সদ্ভাব প্রথম ভাগ ও ধর্ম্ম তত্ত্ব প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য। আরও অনেক দেখাইতে পারি।

আশা করি আপনার অনুগ্রহ "ক্ষমা" বিতরণে কৃপণ হইবে না।

আইন পাস হইয়াছে সে মন্দের ভাল।—ভারতবাসীরা যদি আইনের অতীত হইতেন, তাঁহদের জন্যে যদি কঠোর রাজবিধির আবশ্যক না হইত, তাহাহইলেই সকল দিকে ভাল হইত। বাঙ্গালিদিগের "সুসভা, সুরুচিমান, কুসংস্কারহীন" বলিয়া একটা বড় গৌরব ছিল, এখন তাহা অনেক কমিয়া গেল, ভারতের অন্যান্য জাতি এখন বাঙ্গালির উপরে উঠিয়াছেন। যাহা হউক এই আইনে যদি বাঙ্গালির চোক ফোটে, যদি দেশের উন্নতির মূল দৃঢ় হয়, যদি রমণীগণের শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা হইলেই জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিব। রাজার উদ্দেশ্য সৎ ও মহৎ বলিয়াই রাজা আমাদিগের ধন্যবাদার্হ। এসম্বন্ধে আর নিষ্প্রয়োজন।

আপনার মঙ্গল সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করি। জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদের মঙ্গল। নিবেদন ইতি।

আপনার স্নেহের

গরিব ভগিনী * * *

প্রাণিরহস্য

কতকগুলি সমুদ্রচর পক্ষী আছে, তাহারা সমুদ্রের তরঙ্গের উপর বসিতে পারে, তরঙ্গগুলি যেমন এক একটী করিয়া উঠিতে পড়িতে থাকে, তাহারাও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠিতে পড়িতে পড়িতে চলিয়া যায়।

উষ্ট্রগণ ক্রন্দন করিয়া থাকে। উষ্ট্র অতি সহিষ্ণু, কিন্তু মরুভূমির উপর দিয়া যাত্রা করিতে করিতে যখন তাহারা কোন বিপদে পতিত হয়, তখন তাহাদিগকে ক্রন্দন করিতে দেখা যায়।

মাকড়সা নীচে নামিবার সময় স্বীয় মুখ হইতে সুতা বাহির করিয়া তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক নামিয়া থাকে, আবার উপরে উঠিবার সময় সেই সুতাটী উদরসাৎ করিতে করিতে উঠিয়া যায়।

কতকগুলি জন্তু বায়ুমান যন্ত্রের কাজ করে। তাহাদের কার্য্য ও গতি পরীক্ষা করিয়া ঝড় বৃষ্টি হইবে কিনা তাহা অবগত হওয়া যায়। এক জাতীয় শামুক আছে, তাহারা বৃষ্টির পূর্ব্বে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া থাকে। কিয়দ্দিবস পরে যে বৃষ্টিপাত হইবে, তাহা যদি দুই চারিদিনের অধিককালব্যাপী হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে শামুকগুলি বৃক্ষের পাতার নীচের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করে, নচেৎ পাতার উপর দিকে অবস্থিতি করে। অপর এক জাতীয় শামুক আছে, বৃষ্টির পূর্ব্বে তাহাদিগের গাত্র পীতবর্ণ ধারণ করে। মাকড়সার গতি ও কার্য্য পরীক্ষা করিয়াও ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্ব সংবাদ পাওয়া যায়। যখন দেখা যায়, মাকড়সাগুলি

নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে অনধিককাল মধ্যেই বৃষ্টিপাত হইবে। বৃষ্টির সময় যদি মাকড়সাকে বিশেষ কার্য্যশীল হইতে দেখ, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে অবিলম্বে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যাইবে।

আখ্যান মালা।

(১৪ শ সঙ্খ্যা।)

১। একজন বিখ্যাত পারস্য দেশাধিপতি মৃগয়ায় গমন করিয়া ভৃত্যগণকে মৃগমাংস ভোজনের আয়োজন করিতে আদেশ দেন। সঙ্গে লবণ না থাকায় এক বালক লবণানয়নার্থে এক গ্রামে প্রেরিত হইতেছে দেখিয়া তিনি বালকটিকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ লবণের মুল্য লইয়া যাইও।" তাঁহার ভৃত্যেরা প্রভুর কথাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "সামান্য লবণ বিনামূল্যে গ্রহণ করিলে দোষ কি?" সম্রাট উত্তর করিলেন "পৃথিবীতে যত অমঙ্গল দেখা যায়, সকলি একটু একটু করিয়া এতটুকু হইয়াছে। আমি যদি লবণ লই, আমার ভৃত্যেরা হয়ত একটি গাভী লইবে।"

মানব জীবনে সর্ব্বদাই তিল হইতে তাল পরিমাণ অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২। একদা এক ব্যক্তি আল্‌ভার ডিউককে জিজ্ঞাসা করেন, "অমুক বৎসরের সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়াছিলেন কি?" তিনি উত্তর দেন, "আমি সংসারের কার্য্যে এত লিপ্ত যে আকাশের দিকে দৃষ্টি করিবার সময় পাই না।"

অধিকাংশ লোকেরই এই অবস্থা। আমরা সংসারে এত লিপ্ত যে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে আসন পাতিতেই পান না।

৩। রোম-সম্রাট ভেস্পেসিয়ান্ নিশাকালে আত্মানুসন্ধান করিতেন। যে দিবস কোন হিতকর কার্য্য না করিতেন সে দিবস দৈনন্দিন লিপিতে "আমি এক দিন হারাইয়াছি" লিখিতেন। মহাত্মাগণ আত্মানুসন্ধান দ্বারা চরিত্র সংশোধন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ উহা উন্নতি ও পবিত্রতা লাভের উৎকৃষ্ট উপায়। দৈনন্দিন লিপিতে প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী ও দোষাদোষ সংক্ষেপে লেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

৪। মেসিডনাধিপতি সেকেন্দার সাহ একদা জ্বর-রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসক ফিলিপ্ তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। সেকেন্দার সাহ একখানি পত্র পাইলেন, তাহাতে একব্যক্তি ফিলিপকে

বিশ্বাসঘাতক, ও ঘুস লইয়া স্বীয় প্রভুর প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিল। ফিলিপ্ ঔষধ হস্তে সেকেন্দারের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সেকেন্দার চিকিৎসকের হস্তে পাঠার্থে পত্রখানি দিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে ঔষধ পান করিতে লাগিলেন। এই বিশ্বাস ব্যর্থ হইল না, কারণ সেই ঔষধেই রোগীর বিশেষ উপকার হইল। সরল অকপট বিশ্বাসের নিকট যেমন মনুষ্য, তেমনি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরও পরাজিত।

৫। একজন রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রী সাগরবক্ষে ভয়ানক ঝড়ের সময় স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রিয়তম! তুমি এত ঝড়ের সময় কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছ?"

তাঁহার স্বামী উঠিয়া তরবারি নষ্কাশিত করিয়া স্ত্রীর বক্ষের দিকে তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোমার ভয় হইতেছে না?"

তাহার স্ত্রী অমনি বলিলেন,—"না, কখনই না।" কর্ম্মচারী—কেন?"

স্ত্রী,—"কারণ আমি জানি উহা আমার স্বামীর হস্তে রহিয়াছে এবং তিনি আমাকে এত ভাল বাসেন যে কখন ও আমার অনিষ্ট করিতে পারেন না।"

কর্ম্মচারী,—"স্মরণ রেখ, আমি ও জানি আমি কাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। তাঁহারই হস্তে ঝড় বায়ু রহিয়াছে। তাঁহারই হস্তে সমুদ্রের বারি রহিয়ছে, ভয় ভাবনা কিসের?"

"ধন্য সেই জন তোমার হাতে প্রাণ করিয়াছে যেই দান!"

মুক্তিফৌজের জয়।

মুক্তিফৌজের অভ্যুদয় উনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশেষ ঘটনা। সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎ যে গভীর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া হতাশ হইয়াছেন—পাপভারাক্রান্ত দারিদ্র্যনিপীড়িত হতভাগ্য নরনারীগণের দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য জ্ঞান শিক্ষার উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া হার্বার্ট স্পেন্সার, ম্যাথু আর্ণল্ড, ফ্রেডারিক হ্যারিসন্ প্রভৃতি জ্ঞানীগণ বহু চেষ্টা দ্বারাও যে লক্ষ্য স্থানে পৌছিতে পারেন নাই, মুক্তিফৌজের প্রবর্ত্তক মহাত্মা জেনারেল বুথ কার্য্যগত জীবনের বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া চলিতে চলিতে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ও সেই লক্ষ্য স্থানে পৌছিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা অপনয়ন করা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ "সবলের জয়, দুর্ব্বলের পরাজয়" এই যে নীতি প্রচার করিতেছেন, জেনারেল বুথ সেই নীতির অসারতা হাতে কলমে প্রমাণ করিয়াছেন। "মুক্তিফৌজ" ও ইহার প্রবর্ত্তক সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিলে তাহা অতি

রঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সহিষ্ণুতার সহিত মুক্তিফৌজের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে এসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

"মুক্তিফৌজ" এই নাম শুনিলেই অনেকের হাস্য ও অবজ্ঞার উদয় হইয়া থাকে। আমরা জানি উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সভ্যতার বাহ্য চাক্‌চিক্যে যাহাদের দৃষ্টি বিকৃত হইয়াছে, তাহাদের মনে এইরূপ অবজ্ঞার ভাব হওয়াই সম্ভব। পৃথিবীতে যখনই কোন ধর্ম্মের প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে, তথনই সতর্ক বিষয়ী লোকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণকে বাতিকগ্রস্ত বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে পাগ্‌লামি জ্ঞানে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু মহৎ ভাবের নিকট আত্মবিসর্জ্জন করিয়া যে সকল মহাপুরুষ সংসারের লোকের দ্বারা পাগল পাগল বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছেন, অজ্ঞ লোকের দ্বারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, সেই সকল সাধু মহাজনের অটল বিশ্বাসের কার্য্য দেখিয়াই ভবিষ্যতে জ্ঞানীগণ অবাক্ হইয়াছেন, সংসারাসক্ত সান্দিগ্ধচিত্ত নরনারীগণ মহত্ত্বের সম্মাননা করিতে ও মহৎকার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছে। মুক্তিফৌজ জিনিসটা কি? ইহা কোন পার্থিব ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। ইহা বর্ত্তমান যুগে একটী অলৌকিক ক্রিয়া। মুক্তিফৌজ এই পরিদৃশ্যমান জগতে সেই অব্যক্ত অদৃশ্য ঐশীশক্তির প্রকাশ। মুক্তিফৌজ জড়ের মধ্যে চৈতন্যের একটী লীলা মাত্র। পঁচিশ বৎসর অতীত হইল অর্থহীন সহায়হীন বুথ্ একমাত্র সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া "মুক্তিফৌজের" সৃষ্টি করেন। যেরূপ আয়োজন থাকিলে মহৎ কার্য্যে হাত দিয়া মানুষ সংসারে কৃতকার্য্য হয়, বুথের তাহার কিছুই ছিল না। অধিক কি, বুথের একটী উপাসনালয় পর্য্যন্ত ও ছিল না। কিন্তু আজ সংসারের দরিদ্র, হীন ও অকর্ম্মণ্য নরনারী সকল কুড়াইয়া লইয়া বুথ্ মুক্তিফৌজকে এক প্রবল শক্তি করিয়া তুলিয়াছেন। আজ পৃথিবীর ২,৮৬৪ স্থানে প্রচার ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে মুক্তিফৌজের ৯০০০ সহস্র কর্ম্মচারী নরনারীর মুক্তির সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছে। আজ মুক্তিফৌজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বৎসরে প্রায় ৭,৫০,০০০পাউণ্ড(প্রায় ৭৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা) অর্থাগম হইয়া থাকে। একদিন যে মুক্তিফৌজের হাতে এক কড়া কাণা কাড়ও ছিল না, সেই মুক্তিফৌজ পঁচিশ বৎসরের চেষ্টায় আজ ১৮ কোটী পাউণ্ড (১৮০০০০০০০ টাকা) নগদ সম্পত্তির অধিকারী, একি সামান্য কথা!

সচরাচর ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে যে সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়ার কথা শুনা যায়, তাহা অপেক্ষা এই ঘটনাটী কি কম আশ্চর্য্য!

বর্ত্তমান সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে বোধ হয় আর কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ই মানব সমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্য এরূপ অদ্ভুত আয়োজন করিতে সক্ষম হন নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই জানেন উনবিংশ শতাব্দীর গতি কোন্‌দিকে। ভোগসুখের দিকেই মানবের লক্ষ্য ও চেষ্টা। দৈহিক সুখ লাভ করিতে পারিলেই জীবন কৃতার্থ হইল বলিয়া মানুষ মনে করে। দৈহিক সুখের উপরে আর যে কোনও প্রকার শ্রেষ্ঠতর সুখ থাকিতে পারে, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার উপরে আর যে কোন অতীন্দ্রিয় নিত্য সুখ সম্ভব, উনবিংশ শতাব্দীর পৌনে-ষোল আনা লোকেই তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয়। ঘটনার স্রোতে মানুষ ভাসমান, ঘটনার নিয়ন্তা আধ্যাত্মিক শক্তিকে মানুষ চিনিতেও পারে না, চিনিবার জন্য ব্যস্তও নয়।

মহাত্মা বুথ্ এই বর্ত্তমান মানব সমাজের গতি ফিরাইয়াছেন। নাস্তিকতার ও স্বার্থপরতার কঠিন পাষাণ গালিয়া বিশ্বাস ও প্রেমের স্রোত বহাইয়াছেন। যে মহৎ ভাবে প্রণোদিত হইয়া মহাত্মা বুথ্ এই মহৎ কার্য্যে হাত দিয়াছেন, তাহার দোষ গুণ বিচার করা এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়, জেনারেল বুথের মত ও বিশ্বাসের মধ্যে কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি আছে কি না তাহাও আমাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। অপূর্ণ মানব কখনই ভুল ভ্রান্তির অতীত হইতে পারে না। অসাধারণ মহত্ত্ব ও অলোকসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইলেও বুথ্ অপূর্ণ মানব বই আর কিছুই নন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ভুল ভ্রান্তির সম্পূর্ণ অতীত হওয়া কখনই সম্ভব নহে! যাহাহউক জনসমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত নগণ্য বুথ্ ও তাঁহার পত্নী লণ্ডন সহরের পূর্ব্বদিকে অতি দীনভাবে জীবন কাটাইতেছিলেন। তাঁহারা উভয়েই মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি-প্রভাবে এমন সামান্য দুটী লোক এই মহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি করিলেন!

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। ইন্দোরের মহারাজা তাঁহার রাজ্যের মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থে লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজার উদারতা ও বিদ্যোৎসাহিতাকে ধন্যবাদ।

২। কুমারী এ ফ্রামজী নাম্নী এক পারসী রমণী চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থে লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভারত হইতে যাইতেছেন। ভারতে এরূপ দৃষ্টান্ত এই প্রথম।

৩। কাশীতে জলের কলের জন্য এক দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া পথ করা হইবে, এই জনরবে বহু লোক ক্ষেপিয়া সহর তোলপাড় ও অনেক উপদ্রব করে। ৫০০ লোক গ্রেপ্তর হইয়া শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

৪। গত চৈত্র সংক্রান্তিতে হরিদ্বারে যে কুম্ভমেলা হয়, তাহাতে এত যাত্রী সমবেত হইয়াছিল যে লোক প্রতি /০ আনা করিয়া মাসুল লইয়া ২৫,০০০ টাকা উঠিয়াছে। পুলিসের ভাল বন্দোবস্ত থাকাতে কোন গোলযোগ হয় নাই, তবে কয়েকটী সন্ন্যাসী ইচ্ছাপূর্ব্বক গঙ্গার গর্ভে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে।

৫। বঁয়চীর এক পতিব্রতা যুবতীর কথা শুনা যায় তিনি স্বামীর মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে গায়ে কাপড় জড়াইয়া তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কেবল এই মাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন, স্বামীর শ্মশানে যেন তাঁহার দেহ নিহিত হয়।

৬। ইংরাজ সৈন্য মণিপুর রাজ-বাটী দখল করিয়াছে। মহারাজ ও সেনাপতি পলায়ন করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কলিকাতা পথপ্রদর্শক—সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীপ্যারীমোহন দাস, মূল্য ।/০ আনা মাত্র। কলিকাতার ছোট বড় সকল রাস্তা এবং বাটী ও বাসিন্দার নাম একখানি মানচিত্রের সহিত যেরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পুস্তকখানি বিশেষ উপকারে আসিবে। গ্রন্থকার বিবরণগুলি সংগ্রহে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন।

২। কুইনাইন ব্যবহার—শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, এম, বি, প্রণীত, মূল্য ৵০ মাত্র। কুইনাইন জ্বর রোগের যেরূপ প্রচলিত ঔষধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহার প্রয়োগ প্রণালী জানা নিতান্ত আবশ্যক। ইহা না জানাতে অনেক স্থলে হিতে বিপরীত ঘটে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কুইনাইন ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়।

৩। দম্পতি সুহৃদ্—ললনা সুহৃদ প্রণেতা শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। যদিও গ্রন্থকার অনেক ভাল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ পুরাতন কথা। স্বামী স্ত্রীর পত্রগুলি যেন কিছু বাড়াবাড়ী রকমের ও বাহ্যিকতায় পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। সাধারণ বিষয় ছাড়া এ পুস্তকে নূতন শিখিবার আর কিছুই নাই। ফলতঃ গ্রন্থকার ললনা সুহৃদ লিখিয়া যেরূপ প্রশংসনীয় হইয়াছেন, ইহাদ্বারা সেরূপ হইতে পারেন নাই। রূপতৃষ্ণা ও সুখ তৃষ্ণা প্রবন্ধ দুটী মন্দ নহে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৭ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮—জুন ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ডেশ্বরীর দেশভ্রমণ।—মহারাণী ভিক্টোরিয়া ফরাসীদেশ ভ্রমণ করিয়া গত ১লা মে লণ্ডননগরে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ভ্রমণকালে তাঁহার সহিত কয়েকজন হিন্দুস্থানী ভৃত্য ছিল। ইহাদের মধ্যে একজন তাহার বিশেষ প্রিয় ও বিশ্বাসী। সে তাঁহার গাড়ীর পশ্চাতে বসে; তিনি যেখানে যান, পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় এবং আবশ্যক হইলে তিনি তাহার বাহুর উপর ভর দিয়া পদব্রজে চলিয়া থাকেন। এই ব্যক্তি মহারাণীর ভূতপূর্ব্ব প্রিয়তম অনুচর জন ব্রাউনের স্থান অধিকার করিয়াছে।

মণিপুর অধিকার।—যুবরাজ কুলচন্দ্র ও সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎ পাত্রমিত্রগণ সহ পলায়ন করাতে ইংরাজ সৈন্য বিনাযুদ্ধে মণিপুর অধিকার করিয়াছে। পথে ২০০ মণিপুরীর সহিত একদল ইংরাজ সেনার যুদ্ধ হয়, তাহাতে কয়েকজন ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ গুরুতর রূপে আহত হন, কিন্তু শত্রুগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। ইংরাজসৈন্য এখন মণিপুর প্রাসাদে। জেনারল কলেট মণিপুরের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া কার্য্য করিতেছেন। হত ইংরাজদিগের শব সমারোহে কবরে সমাহিত হইয়াছে। মণিপুরীরা অবাধে ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিতেছে। এখন দোষীদিগের দণ্ডবিধান অবশিষ্ট আছে। কয়েকজন অপরাধী ধৃত হইয়া বিচারাধীন আছে। কুলচন্দ্রও ধরা পড়িয়াছেন। টীকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতিকে ধরিবার জন্য লোক সকল

প্রেরিত হইয়াছে। মণিপুর শীঘ্রই সুশাসিত হইবার সম্ভাবনা।

দান।—গৌরীপুরের রাণী মণিপুরে বিপদ্‌গ্রস্ত ইংরাজ ও দেশীয়দিগের সাহায্যার্থে ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

সুরাপান নিবারণ।— প্রশান্ত মহাসাগরের সামোয়া দ্বীপের রাজা ঘোষণা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন প্রকার মাদক পানীয় বিক্রয় বা বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিবে, তাহার গুরুতর দণ্ড হইবে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এ সাহস নাই!

স্ত্রীলোকের সাহস—ভূতপূর্ব্ব মণিপুর রেসীডেণ্টের পত্নী বিবি গ্রিমউড পাহাড়িয়ার পোষাক পরিয়া আশ্চর্য্য সাহস ও বুদ্ধি কৌশলে ইংরাজসৈন্যদিগকে পথ দেখাইয়া মণিপুর হইতে আনেন, পরে তাহারা সেনাপতি কাউলীর সৈন্যদলের সহিত মিলিত হয়। তাঁহার শ্রমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, তেজস্বিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়।

ঘূর্ণাবায়ু।—গত ২০এ এপ্রেল যশোহরের পুরলম নামক গ্রামে হঠাৎ এক ঘূর্ণাবায়ু উঠে, তাহাতে ৮টী লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং কতক স্থানের সমুদায় গৃহ, বৃক্ষ প্রভৃতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর লোক সংখ্যা।—পৃথিবীর অধিবাসী ১৫১ কোটী ২ লক্ষ ৮১ হাজার। তন্মধ্যে এসিয়ায় প্রায় ৮৩ কোটী, ইউরোপে ৩৫ কোটী, আফ্রিকায় ২০ কোটী এবং আমেরিকায় ১১ কোটী, সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৪৫ লক্ষ লোকের বাস।

ম্যাডাম ব্ল্যাভাস্কীর মৃত্যু।—থিওজফীর অধিনেত্রী অশেষ গুণবতী এই রমণীর মৃত্যু সংবাদে আমরা অত্যন্ত বিষাদিত হইলাম। ইনি রুসীয় মহিলা হইয়াও ভারতের পরম হিতৈষিণী ছিলেন এবং ইহার গৌরব বৃদ্ধির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন।

ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়া ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন;—

শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র।
,, বসন্তকুমারী গুপ্ত।
,, কিরণশশী মুখোপাধ্যায়।
,, কৈলাসবাসিনী গুহ।
,, ক্ষীরোদাসুন্দরী রায়।
,, যাদুমণি দেবী।
,, হেমাঙ্গিনী দেবী।
,, শশীমুখী নাথ।
,, এগ্নেস্ সিসিলিয়া ব্যাষ্টিন।
,, শান্তমণি বিশ্বাস।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম উত্তীর্ণাদিগের প্রথম স্থানীয় শরৎকুমারী মিত্র কলিকাতার ৮১ নং কলেজ ষ্ট্রীটে অবস্থিতি করিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

মণিপুরের পতন।

মহাভারতে বর্ণিত আছে অর্জ্জুন তীর্থভ্রমণকালে চিত্রসেন নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাঁহার যে সন্তান হয়, তিনি বভ্রুবাহন নামে অভিহিত হন এবং মাতামহ-প্রদত্ত মণিপুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পাণ্ডবেরা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য অশ্ব লইয়া নানা দেশ পর্য্যটন করেন, তখন মণিপুর-রাজ সেই অশ্বমেধের ঘোড়াকে বাঁধিয়া রাখেন। মহাভারতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের এইরূপ বর্ণনা আছে ঃ—

"মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি,
তিনবৃন্দ সেনা তার নবলক্ষ হাতী.
এক লক্ষ নৃপতি রাজার সেবা করে,
নানা রত্ন আনে সেই ভূপতি গোচরে,
চিত্রাঙ্গদা পুত্র সেই অর্জ্জুন-নন্দন,
নবলক্ষ রথ যার আছে সুশোভন।
ষাটী কোটী অশ্ব আছে রণেতে যাহার,
মহাবল বভ্রুবাহ বীর অবতার।"

অশ্বরক্ষক বীরাগ্রগণ্য স্বয়ং অর্জ্জুন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে পাণ্ডব-চমূ, রথী ও মহারথী সকল ছিলেন। বভ্রুবাহন মাতৃ-উপদেশে প্রথমতঃ অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়া অর্জ্জুনকে সন্তুষ্ট করিতে চান, কিন্তু তাঁহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে অপ্রস্তুত হওয়াতে এবং তাঁহার মাতার প্রতি নানা প্রকার কটুকাটব্য প্রয়োগ করাতে তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। পুরাণে লিখিত আছে এই যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রাণবিনাশ হয়, কিন্তু পরে পাতাল হইতে মণি আনিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করা হয়। তখন অর্জ্জুন বভ্রুবাহনকে বীরপুত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন এবং সদ্ভাবে তাঁহার নিকট হইতে যজ্ঞের অশ্ব লইয়া প্রস্থান করেন।

দ্বাপরযুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত মণিপুরে সেই বভ্রুবাহনের বংশ রাজত্ব করিতেছিলেন, ১৮৯১ সালের ২৭এ মে বৃটিষ কেশরীর গ্রাসে সে রাজত্ব কবলিত হইয়াছে এবং মণিপুর রাজপ্রাসাদের উপর বৃটিষ জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে।

এই রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। মণিপুরের সিংহাসনে গত ৬ বৎসর সুরচন্দ্র সিংহ অধিরূঢ় থাকিয়া পূর্ব্ব পুরুষদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক বৃটিষরাজের সহিত মিত্রভাব রক্ষা করিতে ছিলেন। ৫০।৬০ বৎসর হইল মণিপুরের সহিত ইংরেজের মিত্রতা এবং পরস্পরে পরস্পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী। ব্রহ্মদেশীয়দিগের হইতে মণিপুরকে ইংরাজেরা অনেকবার রক্ষা করিয়াছেন এবং গত ব্রহ্মযুদ্ধে মণিপুরীরাও ইংরাজদিগের প্রচুর সহায়তা করিয়াছেন। গত আশ্বিন মাসে মণিপুর

রাজবাটিতে এক ভয়ানক রাজদ্রোহ হয়। সুরচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুলচন্দ্র যুবরাজ ও তৎকনিষ্ঠ টীকেন্দ্রজিৎ সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারা রাজ্য লাভের বাসনায় হঠাৎ এক রজনীতে রাজাকে আক্রমণ করেন। রাজা প্রাণ লইয়া পলাইয়া কলিকাতায় আশ্রয় লন। এদিকে কুলচন্দ্র সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। পদচ্যুত রাজা সুরচন্দ্র রাজপ্রতিনিধির নিকট আত্মকাহিনী সবিস্তার বর্ণন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজপ্রতিনিধি জানি না কি অভিপ্রায়ে গত মার্চ্চমাসে চারি পাঁচশত গুর্খা সৈন্য সহিত চিফ কমিসনার কুইণ্টন সাহেবকে মণিপুরে পাঠাইয়া একটী দরবার করিতে আদেশ করেন। কুইণ্টনের দরবারে যুবরাজ আসেন, সেনাপতি উপস্থিত হন না। সেনাপতি রাজ্যের যত গোলযোগের মূল, এই জন্য তাহাকে বন্দী করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাহউক যুবরাজ আসিলেন না দেখিয়া ইংরাজসৈন্য তাহার বাটী আক্রমণ করেন। রাজবাটী রক্ষার্থ ৬০০০ মণিপুরী নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহারা স্বল্পপরিমিত ইংরাজসৈন্যকে পরাস্ত করে। ইংরাজসৈন্য রেসিডেন্সীতে ফিরিয়া আসিলে রাজবাটী হইতে তাহার উপর অসংখ্য গোলাগুলি বর্ষিত হয়। সুবিধা নাই দেখিয়া চিফ কমিসনার সন্ধির প্রস্তাব করেন। উভয় [illegible] সংগ্রাম স্থগিত হয়। পরে চিফ কমিসনার রেসিডেণ্ট গ্রিমউড ও আরও কয়েকটী সহচর সমভিব্যাহারে যেমন রাজবাটী উপস্থিত হইলেন, মণিপুরীদিগের দ্বারা তাঁহারা বন্দীকৃত ও হত হইলেন। তৎপরে মণিপুরীরা পুনরায় ভয়ঙ্কররূপে রেসিডেন্সী আক্রমণ করেন। কর্ণেল বয়লো ও বিবী গ্রিমউড উপায়ান্তর না দেখিয়া সৈন্যদলসহ কাছাড় অঞ্চলে পলাইয়া যান।

ইংরাজসৈন্য সুসজ্জিত হইতে যে ২।৩ সপ্তাহ বিলম্ব হয়, কুলচন্দ্র ও টীকেন্দ্রজিৎ সেই স্বল্প মাত্র কাল মণিপুরের উপর একাধিপত্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে গত ২৭ শে মে তারিখে কাছাড়, টামু ও কোহিমা তিনদিক্ হইতে ৩ দল সৈন্য মণিপুরে উপনীত হইয়া দেখেন রাজধানী শূন্য, যুবরাজ সেনাপতি প্রভৃতি পলায়িত। পথে দুই স্থানে সামান্য যুদ্ধ হয়, কিন্তু ৩ দল সৈন্য আসিয়া অবাধে রাজধানী অধিকার করিয়াছে। মণিপুরবাসীরা ইংরাজদিগের প্রতি যথোচিত রাজভক্তি প্রদর্শন করিতেছে। এখন পলায়িত রাজবংশীয়দিগকে ধৃত ও দণ্ডিত করিবার জন্য ইংরাজ সৈন্য ব্যস্ত।

মণিপুর লইয়া কি করা হইবে, তাহার প্রসঙ্গ চলিতেছে। যাহাই হউক ইহার চিরন্তন স্বাধীনতা যে বিলুপ্ত হইল এবং ইহা যে ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহাভারতের বর্ণনার সহিত এখন এই

বর্ণনার তুলনা কর:—

মণিপুরে কুলচন্দ্র নামে নরপতি,
কুক্ষণে ইংরাজ সনে যুঝিবারে মতি,
কুমন্ত্রী টীকেন্দ্রজিতে করিয়া সহায়,
বধিল মৃগেন্দ্র পঞ্চ দুষ্ট ছলনায়।
আইল ব্রিটিষচমূ করিবারে রণ,
প্রাণভয়ে কাপুরুষ করে পলায়ন।
মণিপুর স্বাধীনতা-রবি অস্তমিল,
কুলচন্দ্র কুলাঙ্গার সবংশে মজিল।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা। *

প্রথম প্রস্তাব।

এই বিশাল জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে সর্ব্ব সমাজেই পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে হীনতর অবস্থায় জীবনাতিপাত করিতে হইতেছে। পূর্ব্বতন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকেরা বেদ পাঠের অনধিকারিণী; খৃষ্টান ও য়িহুদী সম্প্রদায়েরা ধর্ম্মানুশীলন হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন; মুসলমানেরা তো ইহাদিগের আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন; এইরূপ জন-সমাজে অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের অবস্থার হীনত্ব অনুভূত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে বাঙ্গালী রমণীদিগের অবস্থা আবার অধিকতর নিকৃষ্ট দেখা যায়। অন্যান্য সমাজের ললনাগণ পুরুষজাতির নিম্নস্তরে থাকিয়া, কোথাও বিপুল বিদ্যা বুদ্ধি উপার্জ্জন করিতেছেন, কোথাও "স্ত্রী পুরুষের সমানাধিকার" দেখাইতে পুরুষজাতির প্রতিপক্ষে তুমুল আন্দোলন করিতেছেন, কোথাও মহাসভার সভ্য হইতে চেষ্টা করিতেছেন, কোথাও যুদ্ধ বিদ্যা শিখিতেছেন; মেথডিষ্ট খৃষ্টান মহিলাগণ ধর্ম্মোপদেষ্ট্রী ও ধর্ম্ম-কারিণীরূপে ব্রতী হইয়াছেন এবং আমেরিকার ইউনাইটেড প্রদেশীয় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত পরিতেছেন। আমরা বঙ্গমাতার কন্যা— এই সকল ঘটনার কোন কোনওটী শুনিয়া বিস্ময়াপন্না হই এবং কোন কোনওটী স্ত্রীলোকের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া মনে করি। বোধহয় আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় জানেন যে, বঙ্গরমণী চিরদিনই পুরুষের ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছেন। পুরুষদিগের আদেশ ও ইচ্ছাক্রমে ইহাদিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম, রুচি ও কার্য্য-কলাপ বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে। মনুষ্য, পশু, ক্রীত দাসী, কিংবা রাজ্ঞী পুরুষেরা

* ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক প্রবন্ধ উপলক্ষে লিখিত।

ইচ্ছামত যখন যাহা সাজাইতেছেন, বঙ্গ মহিলাকে তাহাই সাজিতে হইতেছে। বলবানের সহিত দুর্ব্বলের, প্রভুর সহিত ভৃত্যের ও ইংরেজের সহিত বাঙ্গালীর যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালী পুরুষদিগের সহিত বঙ্গরমণীগণেরও সেই সম্বন্ধ। অত্যাচারী বা ক্রূরপ্রকৃতি ইংরেজ রাজপুরুষ হইলে বাঙ্গালীকে যেরূপ তাঁহার দুর্ব্যবহার সহিতে হয়, স্বার্থপর কি হৃদয়হীন পুরুষের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া বাঙ্গালা রমণীকেও সেইরূপ পদে পদে দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে যেমন ভারতের প্রকৃতহিতৈষী বন্ধু আছেন, দেশীয় পুরুষদিগের মধ্যেও সেইরূপ স্ত্রীজাতির যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী হিতকারী ব্যক্তিগণও রহিয়াছেন; এই সকল মহোদয় আছেন বলিয়াই আজি উপস্থিত প্রবন্ধ লিখিতে ও জন সমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। আর বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে যিনি যতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহা এই নারী-হিতৈষী মহাত্মাদিগের একান্ত ন্যায়পরায়ণতা, অলৌকিক ত্যাগ স্বীকার ও অসাধারণ মহত্ত্বের ফল। আশা করি আমার জাতীয় ভগিনীগণ, কৃতজ্ঞ চিত্তে ও একবাক্যে এই কথা স্বীকার করিবেন।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইলে ইহাদিগের শিক্ষা, জ্ঞান, রুচি, কার্য্য ও ক্ষমতা আলোচনীয় [illegible] স্থলে বঙ্গমহিলাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগে পারিবারিক অবস্থা ও অপর ভাগে সামাজিক অবস্থা প্রকাশ করা যাইতে পারে। পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের যে অবস্থা তাহাকে পারিবারিক অবস্থা এবং পরিবারের বাহিরে অর্থাৎ সাধারণ লোকসমাজে যে অবস্থা তাহাকে সামাজিক বা লৌকিক অবস্থা বলিলাম।

১ম পারিবারিক অবস্থা—পরিবার ভুক্ত রমণীদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীস্থ দেখা যায়। ১ম কুমারী, ২য় সধবা, ৩য় বিধবা। কুমারী—সাধারণতঃ বালিকাগণই বাঙ্গালাদেশে কৌমার্য্যাবস্থায় কালযাপন করেন।* বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র বালিকা প্রকৃতিমাতার হস্তে সংসারের ভাবী স্ত্রীলোক গঠিত হইতেছে। যে শিশু-বালা সংসার কাননে কুসুম কলিকা, যে কয়টী মুকুতা দন্তে প্রবাল হাসি হাসে, যে মধুমাখা আধ আধ আধ কথা বলিয়া শ্রোতার কানে অমৃত ঢালিয়া দেয়, যাহার অঙ্গভঙ্গি সমস্তই স্বর্গীয়—এই শিশুবালাই একসময়ে ভগ্নীরূপে ভ্রাতার সাহায্য করিবে, ভার্য্যারূপে স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবে, বধূরূপে পতি-গৃহ-সেবিকা হইবে, মাতৃরূপে ঈশ্বরের প্রদত্ত সন্তান প্রতিপালন করিবে, গৃহিণী-রূপে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিবে এবং কন্যা-রূপে মাতাপিতার চরণে আজীবন ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিতে থাকিবে; এই কলিকা

* কুলীন ব্রাহ্মণদিগের গৃহে যুবতী ও বৃদ্ধাও কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা থাকেন।

প্রস্ফুটিত হইলে ইহা দ্বারা এতগুলি কার্য্যের সম্ভাবনা আছে। যাহাদ্বারা ভবিষ্যতে এতগুলি গুরুতর কার্য্য সাধিত হইবে, তাহাকে তদুপযোগী করিয়া পালন করা মাতার একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেশীয় জননীরা অজ্ঞতা-নিবন্ধন শিশুপালনের গুরুতর দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহারা সন্তানের মানসিক বা আধ্যাত্মিক মঙ্গলার্থে ততদূর যত্নবতী হন না, শারীরিক সুস্থতার জন্যেই বিশেষ ব্যগ্র হন। সন্তানের বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট হইতেছে কি না, তাহার মনে ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তির বীজ নিহিত হইতেছে কিনা, সে দিকে মাতার দৃষ্টি নাই ; সন্তান হৃষ্টপুষ্ট হইল কি না, তাহার শরীর সবল সুস্থ রহিল কি না, সেই দিকেই তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি। এই কারণে বালিকা বাল-স্বভাব-সুলভ কোনও অন্যায় কাজ করিতে গেলে মাতা কাল্পনিক ভয় ও মিথ্যালোভ দেখাইয়া তাহাকে প্রতি-নিবৃত্ত করেন ; সময়ে মিথ্যা কথা বলিতেও বাধ্য করেন, কখনও অযথা স্নেহ ও আদরের অনুরোধে সন্তানকে গুরুতর দোষের লঘুদণ্ড দিয়া তাহাকে নিঃশঙ্ক ও স্বেচ্ছাচারী করেন, কখনও বা লঘু দোষে গুরুদণ্ড দিয়া মাতৃস্নেহের প্রতি সন্তানের অবিশ্বাস জন্মাইতে থাকেন। বালিকা জ্ঞানের উদ্রেক হইলে তাহার ঠাকুরমা, দিদীমা প্রভৃতি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক বিবাদ কলহ করাইতে অভ্যস্ত করেন, এবং তামাসারূপে কতকগুলি অশ্রাব্য এবং অকথ্য কথা শিক্ষা দেন। অপরিণামদর্শিনীগণের হস্তে বালিকা-জীবনের প্রথমাবস্থা, পরম-রমণীয় শৈশবকাল এইরূপ কুশিক্ষায় ও কুদৃষ্টান্তে অতিবাহিত হয়।

বালিকা বিদ্যাশিক্ষার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা মাতা ও অভিভাবকগণ তাহাকে বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এই ঘটনাটী সম্পূর্ণ আধুনিক। গত পঁচিশ কি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী বালিকারা রীতিমত লেখা পড়া শিখিতে পাইত না। গত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শতকরা দশজন রমণীর বর্ণজ্ঞান ছিল কি না সন্দেহ ; এখনকার সময় অনুপাতে ভদ্র পরিবারের মধ্যে, বোধ হয় শতকরা দশজন নিরক্ষরা পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত যুবকেরা বর্ণজ্ঞানহীনা কুমারীর পাণিগ্রহণে অনিচ্ছুক বলিয়া অনেক পিতা মাতা কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি কত মাতা কন্যাকে বলিয়া থাকেন "ওরে হতভাগা, পোড়্‌তে যা, যে ছেলর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ হচ্চে, সে তিনটা পাশ কোরেছে!" কেহ বলেন "আমার মেয়ের লেখা পড়ায় মন নাই, ও'কে কোন ভাল ছেলেয় বিয়ে কর্‌বে না" ইত্যাদি। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমাদের ধারণা এই যে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এই

বাক্যের সারত্ব বুঝিয়া যে বাঙ্গালীরা কন্যাকে লেখা পড়া শিখাইতেছেন তাহা নহে; কন্যার ভাবী পতির মনোরঞ্জন করাই অনেক স্থলে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য! তবে গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে ও দেশহিতৈষী মহোদয়দিগের যত্নে যে সহরে ও মফঃস্বলে প্রচুর বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু আর একটী কথা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, এই সকল বিদ্যালয়ে বিশেষতঃ পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিলে অধিকাংশ স্থলে বিশেষ কিছুই ফল পাওয়া যায় না। বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য, চিন্তাশীলতা, সুরুচি ও সভ্যতা শিক্ষা সকলের উপর ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তিগুলি অনুশীলন দ্বারা বিকাশ করা বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য ফল। স্বাস্থ্য রক্ষা বা শরীর পালন বিষয়ে অভিজ্ঞতা; ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন, গৃহচিকিৎসা ও গৃহধর্ম্ম সংরক্ষণ, এ গুলি গৌণ ফল হইলেও স্ত্রীলোকের অবশ্য জ্ঞাতব্য; এই সকল লব্ধজ্ঞান ও কার্য্যই স্ত্রী-জীবনের উপযোগী, কিন্তু এ সকল বিষয়ে বঙ্গীয় বালিকার কতদূর ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, অধিকাংশ বালিকা বোধোদয় ও শিশুবোধ ব্যাকরণ শেষ না হইতেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। যিনি বেশীদিন বিদ্যালয়ে থাকিতে পান, তিনি ভূগোলের সীমা সীমান্ত হইয়া, পাটীগণিতের ভগ্নাংশ লইয়া, সীতা কিম্বা রাম বনবাসের দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস লইয়া বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। যে যে বিষয় তাঁহাদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য, যে যে বিষয়ে লব্ধজ্ঞান তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ-জীবন সংগঠনে সহায়তা করিতে পারে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র শিক্ষা হয় না। যে বয়সে বঙ্গকুমারীগণ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, তাহাতে ঐ সকল গুরুতর বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করাও কঠিন। যাহাহউক বিদ্যাশিক্ষার ফল এই হয় যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, এদিকে গৃহকার্য্য শিক্ষা করা প্রায়ই ঘটে না। তখনকার বার বছরের মেয়েরা ভোজের রান্না রাঁধিতে পারিতেন, ইহা এখন উপকথা বলিয়া বোধ হয়! এইরূপ শিক্ষার প্রভাব!—আবার কোনও কোনও গৃহে "প্রাইজ পাওয়া স্কুলের মেয়ে" মাতা বা পিতামহীর আদেশে গৃহকার্য্য শিখিতে বিরক্ত হইয়া উঠেন! ইহাই যদি সভ্যতা ও সুরুচি হয়, তাহা-হইলে আমাদিগের উন্নতি এখনও বহু-দূরে!—যাহাহউক এইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া বঙ্গ-বালিকাগণের কৌমারাবস্থা অতীত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

বামারচনা।

অভাগিনী। *

১

সাঁঝের বাতাস অই ধীরে বয়ে যায়।
কেরে তুই এলো চুল,
কচি মেয়ে বেল ফুল,
তোর মা, বাঁধেনি খোপা, অমন মাথায় ?
অমন সোণার দেহ,
সে অভাগী ক'রে স্নেহ,
দেয় নি সাজিয়ে আহা, মণি মুকুতায় ?
তার যদি নাই ধন,
দেশে আছে ফুল বন,
মালা, বালা, দুল, ফুলে সব গাঁথা যায় ;
ফুলের ভূষণ দিয়ে,
দিব তোরে সাজাইয়ে,
আয়রে সরলা মেয়ে মোর বাড়ী আয়!
সাজাব ফুলের রাণী ফুলের ছটায়।

২

তোরা কারা ?—কেন হেন র'লি অধোমুখে
কি ক'রি কি করি আর,
বুঝেছি তা এইবার,
সিঁথীতে সিঁদুর নাই—আলো নাই বুকে!
উহুহু। এ কচি মেয়ে,
কে দিয়েছে মাথা খেয়ে,
কেমনে কাটাবে কাল চিতা রাখি বুকে!
জলন্ত আগুণ জ্বালা,
কেমনে সবেরে বালা,
জীবন্তে পুড়িবে বাছা মা' বাপ সম্মুখে!
বোঝে না যে "বিয়ে" হায়।
তার আজি একি দায়,
"বিধবা কহিতে বুক ফেটে যায় দুখে,
জীবন্তে এ পোড়া বিধি কে আনিল মুখে?

৩

জড়ায়ে মায়ের গলে, কয় কানে কানে,
"সাথী সব খেলা ঘরে,
কত কি গহনা পরে,
দেনা মাগো দুটোদুল দিয়ে মোর কানে,"
কভু কয় সেধে সেধে
"দেওনা মা চুল বেঁধে"
কত স'য় অভাগিনী মায়ের পরাণে ?—
হায় রে কপাল পোড়া,
কি আগুণ বুক যোড়া,
সাথীদের বিয়ে হবে যাবে পতি-স্থানে,
অবোধ অভাগী মেয়ে,
বেড়াবে যে মুখ চেয়ে,
ওর যা, হয়েছে ও' তা স্বপনে না জানে!
অফুটন্ত কলিকায়,
রাক্ষসে দলিবে পা'য়!
সাবাসি সাবাসি বটে "হিন্দুর সন্তানে"
গড়া কি তোদেরি বুক নিরেট পাষাণে!

৪

কারে গো সাজা'স ভাই মুক্ত সন্ন্যাসিনী?
না বাঁধিতে হাতে হাত,
আগে "হবিষ্যান্ন" ভাত,
না হ'তে "সম্রাজ্ঞী" আগে পথ-ভিখারিণী
কে তোরা হৃদয়হারা,
কি বলিলি "ধ্রুব তারা"
পাখিরে পড়ালি কেন "হরে কৃষ্ণ" বাণী?
বয়ঃ আট, নয়, দশে,
সিঁথীর সিঁদুর খসে,
বালিকা বধিতে তোর, শাস্ত্র টানাটানি!
বোঝে না যে খাদ্যাখাদ্য,
"ব্রহ্মচার্য্য" তার সাধ্য ?—
"না হ'লে থাকে না মান, লোকে কাণা কাণি"
এই তোর শাস্ত্র তত্ত্ব—হায় অভিমানী!

* একটী বিধবা বালিকা দর্শনে লিখিত।

৫

"বালা-মেধ যজ্ঞে" এরা করিয়াছে মতি,
কচি কচি প্রাণ তায় দিতেছে আহুতি !
অধর্ম্মে ধর্ম্মের নাম,
হতেছে তো অবিরাম,
ভারত ! ভারত ! তোর কি হবে মা গতি ?
এদের নিঠুর প্রাণ,
মুখে করুণার গান,
শুনায় অধ্যাত্ম যোগ তপস্যা মুকতি ;
কিন্তু আঃশিখান যারে,
সে কি তা বুঝিতে পারে,
দশ বছরের মেয়ে—বোঝে কি সে গতি ?
বোঝে কি সে ধর্ম্ম মোক্ষ বোঝে কি সে পতি ?

৬

জানিয়া, চিনিয়া পতি হারা হয় যারা,
স্বর্গীয় পতির তরে,
তারাই জীবন ধরে,
পূজে সে দেবেরে দিয়ে প্রেম-অশ্রুধারা,
জগতের ধন রত্ন,
নাহি লোভ নাহি যত্ন,
স্বরগে সর্ব্বস্ব তাই অবনী সাহারা ;
ভোগ সুখ-সাধ যত,
দয়িতের পদে রত,
আত্ম দান বিধাতায়, নিত্য নির্ব্বিকারা !
তারাই "বিধবা" ঠিক,
"ব্রহ্মচর্য্য বাস্তবিক,
তাদেরি পরম ব্রত "দেবাশীষ" পারা।
একি নিদারুণ এ যে কাঁচা কচি মারা !

৭

আয়রে সোণার বাছা কোলে করি আয় !
দেখাই 'গে' দেশে দেশে,
ভীষণ রাক্ষসী বেশে,
পাষাণ মানুষ তোরে কেমনে সাজায় !
নাই দয়া নাই ধর্ম্ম,
বোঝে না'ক কর্ম্মাকর্ম্ম,
শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বালিকা চিবায় !
কি বাজে গড়া যে বুক,
রক্ত নাই এত টুক,
অনা'সে কলিকা টুকু আগুণে পোড়ায় !
কত তর্ক কত ছল,
কত আসুরিক বল,
রাখিতে আপন কথা কত কি যোগায় ?—
এ রাক্ষস পুরে বাছা, দাঁড়াবি কোথায় ?

৮

হাদে তোর পায়ে পড়ি, বঙ্গবাসী ভাই,
একবার দেখ চেয়ে,
"ননীর পুতলী মেয়ে
জীবন্তে ধরিয়া মোরা আগুণে পোড়াই" !
খেতে খেতে যায় ছুটি,
হেসে হয় কুটি কুটি,
তার তরে একাদশী, কি বলিস ছাই !—
যে জানে না পতি সেবা,
পতিকে বোঝে না যেবা,
তার বিয়ে দিতে বিধি, তোর শাস্ত্রে নাই।
আমি তো বুঝনে মর্ম্ম,
"পূত পূজ্য আর্য্য ধর্ম্ম"
অধর্ম্মে ডুবাবি কেন—কেন এ বড়াই ?—
আয়রে আগুণ জ্বেলে,
দেশাচার দেই ঢেলে,
ভারত কলঙ্ক আজ, সমূলে পোড়াই—
আমরা মানুষ, আয় মানুষি দেখাই !

লেঃ শ্রী ***

ভ্রমসংশোধন।

গতবারের বামাবোধিনীতে "খাসিয়া জাতি" প্রবন্ধে ২য় ছত্রে (৩৬৬ পৃষ্ঠা) "উত্তর পূর্ব্ব দিকে" না হইয়া "দক্ষিণ পশ্চিম কোণে" হইবে। এবং "প্রাণি-তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে (৩৬৯ পৃষ্ঠা) ১ম ছত্রে "বিড়াল" না হইয়া "কুকুর" হইবে।

আর্য্যমহিলা।

গান্ধারী।

(গতবারের শেষ)

কুসংসর্গ ও পাপাচরণে যাহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়াছে, তাহার কি কখনও চেতনা জন্মে? দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন এবং তাহার ভ্রাতৃগণ কপটতা পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও বনবাসী করিয়াও তৃপ্ত হইল না। বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে "সূচ্যগ্র-ভূমি" দিতেও সম্মত হইল না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদির উপদেশ, গান্ধারী দেবীর অনুনয় সবই নিষ্ফল হইল; সবই স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। অবশেষে যুদ্ধই স্থির হইল।

যখন যুদ্ধকাল উপস্থিত হইল, তখন দুর্য্যোধন ভ্রাতাদিগের সহিত জননীর চরণে প্রণাম করিতে গেলেন।—মার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে গেলেন। গান্ধারী দেবী পুত্রস্নেহে, ধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না। রোমীয় জননী, কোরিয়োলেনাসের পরিণাম জানিতেন কি না জানি না, কিন্তু গান্ধারী দেবী পুত্রের শোচনীয় পরিণাম দেখিতে পাইলেন; তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা দৃঢ়তা সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয় হইবে। এমন নিষ্কাম ধর্ম্মচর্য্যা কে কোথায় দেখিয়াছে? সন্তান মার বুকের রক্ত, জীবনের জীবন, হৃদয়ের আনন্দ। কিন্তু ধর্ম্ম তার উপরের জিনিস। ধর্ম্মের অনুরোধে সবই কর্ত্তব্য, ধর্ম্মের নিকট জীবনসর্ব্বস্ব সন্তানও তুচ্ছ। এমন কোনও অনুরোধ নাই, যে তাহার জন্যে ধর্ম্মকে অবমাননা করিবে। তুমি আমি কে? এ বিশাল বিশ্ব জগতের এক এক পরমাণু মাত্র। যাহা নিত্য, যাহা মঙ্গল, তাহাই হউক। তোমার আমার জন্যে, এ অণু কণিকার জন্যে বিশাল বিশ্বকে কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে বলিব? তবে যখন গোপালের সঙ্গে বিনয়ের মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তুমি গোপালের মা, কার মঙ্গল কামনায় ভগবানের চরণে কাঁদিয়াছিলে? "ধার্ম্মিকের জয়" কামনা কর নাই, তাহা হইলে তোমার পুত্রকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়! কিন্তু তুমিই বা কে? আর তোমার স্নেহের গোপালই বা কে? যে তুমি অধর্ম্মাচরণ করিবে—পুত্রস্নেহে অন্ধ হইবে? যদি প্রকৃত দেবীকে দেখিতে চাও, তবে আইস ভারতকন্যা গান্ধারীদেবীকে দেখ, যিনি পুত্রের বিপক্ষদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া তাহাদিগের জয় কামনা করেন, যিনি স্বার্থশূন্য অনুরাগিণী, যিনি পুত্রপৌত্রবতী অন্তঃপুরচারিণী হইয়াও মায়ামুক্তা সন্ন্যাসিনী, এমন দেবীকে—তুমি যে দেশের লোক

হও, যে জাতিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাক, এ অপূর্ব্ব পবিত্র দেবীকে পূজা কর, হৃদয় পবিত্র হইবে।

সময়ে সাধ্বীর মহাবাক্য সফল হইল। কত শত মহারথীর সহিত গান্ধারীর তনয়েরা একে একে রণশয্যায় শয়ন করিলেন। পবিত্র তীর্থ কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে পরিণত হইল। সেই নিদারুণ সময়ে গান্ধারী দেবী, পুত্রবধূ, কন্যা ও আত্মীয়গণের সহিত সেই রণভূমি দর্শনে আগমন করিলেন। কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য!—পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, আত্মীয় প্রভৃতির রক্তাক্ত মৃত দেহ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে, স্নেহের ধন সকল ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আছে! সেই সকল মৃত দেহ দর্শনে ও পতিপুত্রহীনা রমণীদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণে গান্ধারীদেবীর হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। মহাপ্রাণা গান্ধারী দেবী কোমলপ্রাণা বালিকার মত রোদন করিলেন। কিন্তু এই ভগ্নহৃদয়া এই শোকপ্লাবিতা গান্ধারী, ধর্ম্মহারা হইলেন না। পুত্রহন্তা পাণ্ডবদিগকে (শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্ত্তী জানিয়া) কিছুই বলিলেন না। গান্ধারীর বিশ্বাস ছিল, দুর্য্যোধনাদিকে—কৌরবপক্ষীয় শ্রেষ্ঠ বীরদিগকে অন্যায় যুদ্ধে হত করা হইয়াছে; গান্ধারীর বিশ্বাস ছিল, এই অন্যায় যুদ্ধের প্রবর্ত্তক * তাই গান্ধারী দেবী ধৈর্য্যচ্যুতা হইলেন; যিনি ধর্ম্মের চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন, যিনি অধর্ম্মাচরণ বিষবৎ মনে করেন, তিনি শোকে যত কাতর না হইলেন, "অধর্ম্ম-যুদ্ধ" মনে করিয়া তত কাতর হইলেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস, যিনি অধর্ম্ম করিবেন, তিনি প্রতিফল পাইবেনই, তাই গান্ধারীদেবী অবিচলিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—নির্ভীক বীরাঙ্গনা বলিতে লাগিলেন;—

"পাণ্ডবাঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ দগ্ধাঃ কৃষ্ণ! পরস্পরম্।
উপেক্ষিতা বিনশ্যন্তঃ ত্বয়া কস্মাৎ জনার্দ্দন॥
শক্তেন বহুভৃত্যেন বিপুলে তিষ্ঠতা বলে।
উভয়ত্র সমর্থেন শ্রুতবাক্যেন চৈব হি॥
ইচ্ছতোপেক্ষিতো নাশঃ কুরূণাং মধুসূদন!
যস্মাৎ ত্বয়া মহাবাহো! ফলং তস্মাদবাপ্নুহি॥
পতিশুশ্রূষয়া যন্মে তপঃ কিঞ্চিদুপার্জ্জিতং।
তেন ত্বাং দুরবাপেন শপ্স্যে চক্রগদাধর॥
যস্মাৎ পরস্পরং ঘ্নন্তো জ্ঞাতয়ঃ কুরুপাণ্ডবাঃ।
উপেক্ষিতাস্তে গোবিন্দ! তস্মাজ্জ্ঞাতীন্ বধিষ্যসি॥
ত্বমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষট্‌ত্রিংশে মধুসূদন।
হতজ্ঞাতির্হতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ।
কুৎসিতেনাপ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্স্যসি॥
তবাপ্যেবং হতসুতা নিহতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পরিতপিষ্যন্তি যথৈব ভরতস্ত্রিয়ঃ॥"

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে বাস্তবিকই সাধ্বীর শাপ সফল হইয়াছিল। কিন্তু এবিষয় আমরা কাহাকেও "ঐতিহাসিক সত্য" বলিয়া বিশ্বাস করিতে বলি না। আমরা এই টুকু বলি যে, সেই নিদারুণ শোকসময়ে, ভগ্নহৃদয়ে,

* শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, গান্ধারীদেবীর যেমন বিশ্বাস তাহাই বলিতেছি। (প্রঃ লেঃ)

অস্থির চিত্তে যিনি এমন সুযুক্তিপূর্ণ, ন্যায়ানুগত ও গভীরভাবযুক্ত বাক্য বলিতে পারেন, তিনি যে কি অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমরা জানি না। শ্রীকৃষ্ণ "ভগবানের অবতার" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার মুখের উপর, ধীর অথচ গম্ভীর ভাবে তাঁহার দোষ গুলি বলিয়া দেওয়া, "পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী" বলিয়া দেওয়া অসাধারণ তেজস্বিতার কার্য্য। এ তেজস্বিতা কাহার আছে?—যিনি ধর্ম্মে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহারই আছে। গান্ধারী-হৃদয় যদি প্রতিহিংসা প্রভৃতি নীচতায় উত্তেজিত হইত, তাহা হইলে, এমন ধর্ম্ম ও ন্যায়ভাবপূর্ণ কথা বলিতে পারিতেন না, তাহা হইলে "ভীমার্জ্জুন" ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণকে অভিশপ্ত করিতেন না। এবং পুত্রহন্তা পাণ্ডবদিগের গৃহেও বাস করিতে যাইতেন না।

ইহার পরে গান্ধারীদেবী কিছু দিন সংসারাশ্রমে বাস করিয়া, স্বামীর সহিত বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং তপস্যা করিয়া দেহ অবসান করেন। কথিত আছে, তাঁহারা যজ্ঞীয় অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিলন। যেরূপেই হউক, আত্মার যত দূর সদগতি থাকে, তাহা গান্ধারীদেবীর পবিত্রাত্মা সেই "মোক্ষ" পাইয়াছে। আর ইহলোকে তাঁহার অনন্ত কীর্ত্তিরাশি দেদীপ্যমান রহিয়াছে!

"যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" রহিবে!

আহা! আজ এ শ্মশানদেশে অমৃতের কথা তুলিলাম কেন? আজ "সুখের পুতুলী" বঙ্গমহিলার কাছে গান্ধারীদেবীর কথা বলি কেন? অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহাভারতকার যে অপূর্ব্ব ছবি আঁকিয়াছেন, আমার মত নগণ্য মূর্খের, তাহা লইয়া কলম টানা টানি কেন? বড় সাধ হইয়াছে, দেশীয় ভগিনি! আর একবার মার গলে রত্নমালা দেখিব; অভাগিনী মার কোলে "কন্যারত্ন" দেখিব; আর একবার দেখিব, মার মেয়েরা ধর্ম্মের জন্যে, জগতের হিতের জন্যে আপনা ছাড়িয়া দিয়াছে। যে মার কোলে গান্ধারীদেবী শোভা পাইয়াছিলেন, আজি সেই মার কোল শূন্য রহিয়াছে? বলিয়াই ভিক্ষা চাহিতেছি, দেবি গান্ধারি! ভক্তবৎসলে! একবার এই সকল মৃত দেহ, তোমার অমৃতময় অমর প্রাণে অনুপ্রাণিত কর! কথা কহিতে গিয়া কাজের ভুল হইতেছে, পরের শিক্ষা লইতে গিয়া আপনাদের শিক্ষা পড়িয়া থাকিতেছে, এই সকল দুর্ঘটনা নিবারণ কর! ও মা! একবার এই শ্মশানে, এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া সেই ধর্ম্মপ্রাণতা, ন্যায়পরায়ণতা পাতিব্রত্য শিখাইয়া যাও—একবার অভাগিনী ভারতভূমির জন্যে, একবার জাতীয় জীবনের জন্যে, আর একবার সেই অমৃত গাথা, (তোমার মুখে শুনিব,)—গাও মা! গাও—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

লেখিকা শ্রীমাঃ—

সতীধর্ম্ম।

৫ম প্রবন্ধ।

(নানা পুরাণ হইতে)

যা স্ত্রী ভর্ত্তুরসৌভাগ্যা সাঽসৌভাগ্যা চ সর্ব্বতঃ।
শয়নে ভোজনে তস্যা ন সুখং জীবনং বৃথা ॥১॥

স্বামীর সৌভাগ্যে যেই বিরহিত হয়,
সকলি দুর্ভাগ্য তার জানিবে নিশ্চয়,
শয়নে ভোজনে তার কোনো সুখ নাই,
জীবনধারণ তার জানিবে বৃথাই। ১।

যস্যাঃ কান্তে রতির্নাস্তি সর্ব্বপ্রিয়তমে পরে।
সাঽশুচির্ধর্ম্মহীনা চ সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতা ॥২॥

পরম প্রেমের বস্তু পতি অবলার,
ভকতি তাঁহার প্রতি নাহিক যাহার,
সেইত অশুচি নারী পাপের আধার,
কোনো ধর্ম্মকর্ম্মে তার নাহি অধিকার।২।

পতির্বন্ধুর্গুরুর্ভর্ত্তা দৈবতং গতিরেব চ।
সর্ব্বস্মাচ্চ গুরুঃ স্বামী ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ ॥৩॥

পতিই দেবতা ভর্ত্তা গুরু বন্ধুজন,
পতিই নারীর গতি, পতিই জীবন;
যে যেখানে যত গুরু আছে অবলার,
সকল গুরুর গুরু পতিই তাহার। ৩।

পিতা মাতা সুতো ভ্রাতা ক্লিষ্টো দাতুমিদং ধনম্।
সর্ব্বস্বদাতা ভবতি পতিরেব হি যোষিতঃ ॥৪॥

রমণীর পিতা মাতা পুত্র সহোদর,
প্রার্থিত প্রদানে হয় সবাই কাতর;
সর্ব্ব-আচ্ছাদক কিন্তু পতিই তাহার,
সর্ব্বস্ব দিতেও মনে দ্বিধা নাই যার। ৪।

কাচিদেবাভিজানাতি পতিরত্নং মহাসতী।
অতিসদ্বংশজাতা চ সুশীলা কুলপালিকা ॥৫॥

পরম পবিত্র বংশে যাহার জনম,
কুলের পালনকর্ত্রী শীলে অনুপম;
সেই মহাসাধ্বী নারী চিনে পতি ধনে,
সবে কি চিনিতে পারে অমূল্য রতনে? ।৫।

যা স্ত্রী দ্বেষ্টি সর্ব্বপরং পতিং বিষ্ণুসমং গুরুম্।
সা পতেৎ নরকে ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥৬॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুতুল্য গুরু হন পতি,
যে নারী বিদ্বেষভাব করে তাঁর প্রতি;
যতকাল চন্দ্র সূর্য্য হইবে উদয়,
ভীষণ নরকে তার জানিবে আশ্রয়।৬।

ব্রতং চাঽনশনং দানং সত্যং পুণ্যং তপশ্চিরম্।
পতিভক্তিবিহীনায়া ভস্মীভূতং নিরর্থকম্ ॥৭॥

যতই করুক ব্রত দান অনশন,
তপস্যা সুকৃত সত্য করুক সাধন;
পতি প্রতি যদি তার ভকতি না রয়,
সমস্ত সাধনা তার ভস্মসাৎ হয়।৭।

পতিসেবা ব্রতং স্ত্রীণাং পতিসেবা পরং তপঃ।
পতিসেবা পরো ধর্ম্মঃ পতিসেবা সুরার্চ্চনম্।
পতিসেবা পরং সত্যং দানং তীর্থঞ্চ শাশ্বতম্ ॥৮॥

পতিসেবা রমণীর তপস্যার সার,
পতিসেবা একমাত্র ব্রতই তাহার,
সনাতন পুণ্য তীর্থ, দেবতাপূজন,
দান, ধর্ম্ম, সত্য তার পতির সেবন।৮।

সর্ব্বদেবময়ঃ স্বামী সর্ব্বতীর্থময়ঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপুণ্যস্বরূপশ্চ পতিরূপী জনার্দ্দনঃ ॥৯॥

পতিই নারীর পক্ষে সর্ব্বদেবময়,
সর্ব্বতীর্থময় তার পতিই নিশ্চয়;
সকল পুণ্যের মূর্ত্তি রমণীর পতি,
পতিরূপী নারায়ণ একমাত্র গতি।৯।

ভর্ত্তুশ্চিত্তানুগামিন্যা দেবারাধনশীলয়া।
গার্হস্থ্যধর্ম্মরতয়া ভর্ত্তা সেব্যঃ কুলস্ত্রিয়া ॥১০॥

মন প্রাণ সমাধান করি ভগবানে,
পালিবে সংসারধর্ম্ম অতি সাবধানে ;
স্বামীর মনের মত করিবে সকল,
কুলকামিনীর এই ধর্ম্ম নিরমল।১০।

সুব্রতা প্রাতরুত্থায় রাত্রিবাসো বিহায় চ।
লোকেশং প্রণমেৎ কান্তং পুণ্যশ্লোকাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥১১॥

প্রাতে উঠি' রাত্রি-বেশ করি' পরিহার,
ঈশ্বরে ভকতি ভাবে নমি' বার বার ;
প্রণমিবে পরে সতী পতির চরণে,
তার পর প্রণমিবে পুণ্যশ্লোকগণে।১১।(১)

(১) প্রাতে উঠিয়াই এই বলিয়া ঈশ্বরকে নমস্কার করিবে ;—

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব!
শ্রীকান্ত বিষ্ণো! ভবদাজ্ঞয়েব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থম্,
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

শ্রীনাথ! দেবাধিদেব! জগতের পতি!
হে বিষ্ণো! চৈতন্যময়! অখিলের গতি!
প্রভাতে উঠিয়া তব প্রীতি-কামনায়,
করিব সংসারকার্য্য তোমারি আজ্ঞায়।

অনন্তর সেই ব্রহ্মভাবে তন্ময় হইয়া পতিকে এই বলিয়া নমস্কার করিবে ;—

"পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ।
পতিশ্চ নিগুর্ণাধারো ব্রহ্মরূপ নমোঽস্তু তে ॥"

পতি ব্রহ্মা পতি বিষ্ণু পতি মহেশ্বর,
প্রণমি তোমায় ব্রহ্মরূপ পরাৎপর!।

'পুণ্যশ্লোক' যথা ;—
"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ" ॥

গোময়েন চ তোয়েন সংস্কুর্য্যাৎ প্রাঙ্গণং ততঃ।
সুস্নাতা শুদ্ধবেশা চ প্রবিশেৎ সুরমন্দিরম্ ॥১২॥

চৌদিকে গোময় জলে দিয়া ছড়া ঝাঁটি,
সারিবে প্রভাত-কৃত্য করি' পরিপাটি ;
অনন্তর স্নান করি' পরি' শুদ্ধ বেশ,
পূজার মন্দিরে সতী করিবে প্রবেশ।১২।

শ্রীহরিং পূজয়িত্বাথ ভক্ত্যা পত্যুর্হিতার্থিনী।
পাকযজ্ঞং সুনির্বর্ত্ত্য ভোজয়েৎ স্বজনাতিথীন্ ॥১৩॥

পতির কল্যাণ সতী করিয়া কামনা,
একমনে নারায়ণে করিবে অর্চ্চনা ;
অনন্তর পাকযজ্ঞ করি' সমাপন,
অতিথি স্বজনগণে করাবে ভোজন।১৩।

পতিপুত্রাতিথীন্ ভৃত্যানন্যান্ পরিজনাংস্তথা।
তর্পয়িত্বান্নপানীয়ৈঃ স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে সুখং সতী ॥১৪॥

পতি পুত্র অভ্যাগত ভৃত্য পরিজন,
সকলে হইলে তৃপ্ত করিয়া ভোজন ;
পরে সুখে নিজ মুখে দিবে অন্ন জল,
সুশীলা নারীর এই লক্ষণ সকল।১৪।

পদে পদে শুভং তস্য যঃ স্ত্রীমানং চ রক্ষতি।
অবমন্য স্ত্রিয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ।
পদে পদে তদশুভং করোতি জগদম্বিকা ॥১৫॥

রমণীজাতির সদা যে রাখে সম্মান,
পদে পদে সেই জন লভয়ে কল্যাণ ;
যে মূঢ় পামর তার করে অপমান,
জগদম্বা সদা তার অশুভ ঘটান।১৫।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

উদাসীনের চিন্তা।

সরযূবালা কোন এক বাঙ্গালী পরিবারের ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা। কিছু দিন বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া সে এখন গৃহে বসিয়াই অধ্যয়ন করে। সরযূ উপন্যাস, নাটক, গল্প ও কৌতুকের বই ভিন্ন কোন বই বড় ভালবাসিত না। সে কখন কখন সংবাদ পত্র, মাসিক পত্রও পড়িত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সকল বিষয় সজ্জনদিগের অপাঠ্য, সরযূ তাহাই আনন্দের সহিত অধ্যয়ন করিত। যে সকল পত্র পরনিন্দা ও পরকুৎসা কীর্ত্তনে নিযুক্ত, যে সকল পত্র গভীর বিষয়ে বলিতে যাইয়াও ঠাট্টা তামাসার লহরী না তুলিয়া থাকিতে পারে না, সে সকল পত্র সরযূর প্রিয়পাঠ্য ছিল। সরযূর দাদা সুবোধ বাবুর প্রকৃতি কিন্তু অন্য উপাদানে গঠিত। তিনি ধীর, গম্ভীর ও সর্ব্বদা সদালাপ এবং সৎপ্রসঙ্গ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, ও দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন। কখন আমোদ প্রমোদের তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া আত্ম-হারা হইতেন না। সর্ব্বদা সংযমী থাকিয়া মানবের গন্তব্য পথে বিচরণ করিতেন। অবস্থার দাস দাসীদের মত কখনও ঘটনা-প্রবাহ-দ্বারা চালিত হইতেন না। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল, তলতলে কাদার মত যে ছাঁচে ফেল, সেই ছাঁচেই গড়ে উঠ্‌বে, এরূপ ছিল না। ভাই, বোনের প্রকৃতিগত লঘুতা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত ছিলেন। অনেক সময় তিনি সরযূকে কাছে বসাইয়া উপদেশ দিতেন, কিন্তু দাদার কথা সরযূর মনে বড় বসিত না। যাই দাদার কাছ-ছাড়া হইত, অমনি সরযূ আবার লঘুচেতা হইয়া পড়িত। একদিন সরযূ মাঝের ঘরে বসিয়া বটতলার কি একটা ছাই ভস্ম পড়িতেছিল। পড়িতে পড়িতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। দাদা পাশের ঘরে বসিয়া বুদ্ধদেব-চরিত পাঠ করিতেছিলেন। সরযূর অট্টহাসি শুনিয়া তাঁহার প্রাণে বড় লাগিল। তাই বই খানি হাতে করিয়া মাঝের ঘরে প্রবেশ করিলেন। সরযূ দাদাকে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইল এবং বই খানি লুকাইবার চেষ্টা দেখিল।

সুবোধ—সরযূ তোমার হাতে ও কি বই? তাড়া তাড়ি উটী লুকাচ্ছ কেন?

সরযূ—না, কই! এই বলিয়া উঠিতে চেষ্টা দেখিল; তখন সুবোধ বলিল, সরযূ বসো। সরযূ তখন দাদার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সুবোধ তখন সরযূর নিকট আসন লইয়া উপবেশন করিলেন ও বলিতে লাগিলেন—সরযূ! আমি এই মাত্র এই বই খানিতে পড়িতেছিলাম, যোগিশ্রেষ্ঠ

বুদ্ধদেব বলিতেছেন, "যাহাদিগের জীবন বিপদে পরিবেষ্টিত, তাহদের আমোদ প্রমোদের সময় ও সুবিধা কোথায় ?"

সরযু—এত সত্য কথাই। বিপদের সময় কি আমোদের দিকে মন যায় ? বাড়িতে কখন কারও ব্যারাম হয়েছে, কি কোন বিপদ ঘটেছে, তখন কি তুমি আমাকে আমোদ প্রমোদ কর্ত্তে দেখেছ ? তবে তুমি আমাকে নতুন করে এ কথা সুনাচ্চ কেন ?

সুবোধ—না, তা কখন দেখি নাই সত্যি কথা ; কিন্তু বিপদ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান একটু কম,তাই এ-কথা বল্‌ছিলেম।

সরযু—আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, ভাল কোরে বুঝিয়ে বল।

সুবোধ—শরীর ভিন্ন আত্মা বলে আর একটা জিনিশ আছে, তাকি তুমি জান ?

সরযু—জানি বই কি ? তার কি হয়েছে ?

সুবোধ—এই আত্মা চারিদিকে প্রলোভনের পরিবেষ্টিত। হঠাৎ ইহার অধঃপতন হইতে পারে। হঠাৎ প্রলোভনের হাতে পড়ে আত্মার সর্ব্বনাশ হইতে পারে। আর মানবের শ্রেষ্ট সত্ত্বা অমর আত্মারই যদি অধোগতি হয়, তবে কেবল রক্তমাংসপিণ্ডের ভার বহন করে কি লাভ ? এখন বুঝিলে আমরা সর্ব্বদা কিরূপে বিপদজালে পরিবেষ্টিত ?

সরযু—দাদা, এ সকল তোমার কল্পিত ভয়। কই, আমিত একটা প্রলোভনও দেখ্‌তে পাচ্চি না ?

সুবোধ—ভাল সরযু, আমি তোমাকে নাবিকদিগের একটা কথা বলি। কোন কোন সমুদ্রের নিম্নে পাহাড় আছে। যে সকল নাবিক সে সকল স্থান দিয়া অধিক যাতায়াত করিয়াছে, তাহারা ঠেকিয়া ঠেকিয়া কোন স্থানে কোন পাহাড় আছে তাহা জানিয়াছে। অনভিজ্ঞ একজন নাবিক তাহার কিছুই জানে না। তাহার চোখে তরঙ্গায়িত শ্যামল বারিরাশিই খেলা করিয়া থাকে, কিন্তু হায় ! অদূরদর্শী নাবিকেরাই ঐ কল্পিত নিরাপদ স্থানের উপর দিয়া পোত চালাইয়া লয়, আর অমনি সলিলনিমগ্ন শৈল-শৃঙ্গের আঘাতে উহা শতভাগে ভগ্ন হইয়া যায়। তখন আর রক্ষা থাকে না। তোমার দশা কি এই শেষোক্ত অপরিণাম দর্শী নাবিকের মত নয় ? সংসারেরকশাঘাতে তাড়িত,প্রবৃত্তিবাণে ব্যথিত হৃদয়ে বুদ্ধদেব যেখানে বিপদচক্র ঘূর্ণায়মান দেখিতে পান, তোমার মত অদূরদর্শী ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা সেখানে সমুদ্রের কিরণরাশি দেখিবে বিচিত্র কি ? কিন্তু উল্লিখিত অদূরদর্শী নাবিকের মত তুমি তোমার জীবন-তরণী অকূলপাথারে ডুবাইবে বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে। দেখ, আমরা সম্পদদাতা ঈশ্বরকে ভুলিয়া সম্পদ ভোগ করিতেছি, ইহাতে গুরুতর অপরাধ, তার পর অভ্যাস-দোষে তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ অনেক কাজ করিয়া থাকি। অপরাধের গুরুভারে যাহারা এরূপ অবনত তাহারা

লঘুচেতা হইতে পারে না। বিশেষতঃ সর্ব্বদাই আমাদের আত্মোন্নতিবিধায়ক কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত। যাহাতে আমার আত্মাকে একটু নাবাইয়া দেয়, তাহা আমার কর্ত্তব্য নহে। লঘুচিত্ততা আর আত্মার অবনতি একই কথা; সুতরাং নাটক নভেল পড়িয়া কিংবা অলীক আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত হইয়া লঘুচিত্ততা আনয়ন করিলে আত্মার অধোগতি হইয়া থাকে।

সুবোধ— তবে কি তুমি শুষ্ক কাঠ খানি হয়ে বসে থাক্‌তে বল?

সুবোধ—শুক্‌ন কাঠ হওয়া তুমি কাকে বল? আমোদ প্রমোদ, নাটক নবেল ভিন্ন আর কি কোন উপায়ে আত্মার আনন্দ সম্পাদন করা যায় না? ভাল, তুমি কি মনে কর, আমি কেবল কষ্ট যাতনাই ভোগ করি? বাস্তবিক আমি এই সকল বই পড়িয়া যে বিশুদ্ধ আনন্দ ও তৃপ্তি পাই, ইন্দ্রিয়সুখাভিলষী ব্যক্তিগণ তাহার কণামাত্রও ভোগ করিতে পারে না। বিশেষতঃ আমি ও এক সময় তোমার মত নাটক নবেল ভাল বাসিতাম, আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া আত্মহারা হইতাম। এখন আমি এ আনন্দ ভোগ করিতেছি। সুতরাং আমি উভয় প্রকার আনন্দ তুলনা করিয়া কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ বুঝিতে পারি। তোমার ত সে তুলনা করিবার উপায় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে তার কোন মতামত গ্রাহ্য নয়। যে ব্যক্তি কখনও হীরক দেখে নাই, সেত কাঁচকে আদর করিবেই। কিন্তু হীরক অকর্ম্মণ্য এ কথা সে বলিতে পারে না। এবং যে ব্যক্তি হীরক ও কাঁচের মূল্য বুঝিয়া হীরককে আদর করিতেছেন, তিনি শুক্‌ন কাঠ হইয়া গিয়াছেন, একথা বলা সঙ্গত নয়।

দাদার সহিত এই আলাপের পর সরযুর মতের যেন এক যুগ প্রলয় ঘটিল। তদবধি সরযু আস্তে আস্তে নাটক নবেল ছাড়িল এবং তৎপরিবর্ত্তে দাদার নিকট বসিয়া তাঁহার প্রিয়পাঠ্য পুস্তক সকল মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিল। শনিবার অভিনয় দেখিবার জন্য যে সরযুর মন উচাটন হইত, সে সরযু শনিবার দাদার নিকট বসিয়া ধর্ম্মবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিত। এই রূপে ভাই ভগিনী দুইজনেই বিমল স্বর্গীয় আনন্দ ভোগ করিতে লাগিল। পাঠিকা, আপনারা কোন আনন্দের ভিখারিণী? ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়-সুখ, যাহা সময়ের তরঙ্গ মুছিয়া লয়, তাহা কি অমর মানবাত্মার লক্ষ্য হইতে পারে? মানবাত্মা অমর, তাই উহা অক্ষয় আনন্দের জন্য পিপাসিত। কিন্তু হায়! মানুষ তজ্জন্য মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের মত ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের সেবাব্রতে নিযুক্ত হইতেছে। কবে এই মানব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইবে, একমাত্র সর্ব্বদর্শী অন্তর্য্যামী পুরুষই তাহা জানেন।

বিশ্ব-বিদ্যালয়।

(১)

বিশ্ব-বিদ্যালয়, গুরু বিশ্বেশ্বর,
প্রকৃতি পুস্তক তাঁর;
পড় পড় ভাই পড়িবে যতনে,
খুলিবে জ্ঞানের দ্বার।

(২)

ভয় কি!
হেরি ধ্রুবতারা আঁধার সাগরে
চালাও নাবিক তরি;
কি ভয় কি ভয়, প্রবল তুফানে,
জ্ঞান-কর্ণ রাথ ধরি।

(৩)

ফলদাতা-তিনি!
শ্রম সহকারে সুখবীজ ভাই
কররে বপন, দাওরে জল,
অঙ্কুরিয়া তিনি বাড়াবেন তরু,
ফোটাবেন ফুল, দিবেন ফল।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ হাল্‌দার।

শিখদিগের প্রতি মহারাণী ঝিন্দনের উক্তি।

এই সে রমণী রত্ন—
পরমা সুন্দরী
'মহারাণী ঝিন্দন,'
পঞ্জাব-কেশরী
ভুবনবিখ্যাত সেই
'রণজিৎ' জায়া;
শোভিছে পঞ্জাবে যেন
সোণার বিজয়া!
মনের আবেগে আজ
ডাকি শিখ সবে
উন্মত্তা সিংহীর মত
মাতিয়ে গরবে,—
গভীর গর্জ্জন করি
কহিলা তখনঃ—
"নানকের বংশ" তোরা
নহিস্ এখন!
যে বংশেতে জনমিলা
সিংহ-রণজিৎ
শৃগালেরা সে সমাজে
একি বিপরীত!
দুরন্ত দস্যুর করে
কুলের কামিনী
নিপীড়িতা হ'তে দেখি
দিবস যামিনী,
যে জাতির মোহ-নিদ্রা
ভাঙ্গিবার নয়,
সে জাতি কি শিখ নাম
বাচ্য কভু হয়?
নরদেহ ধরী তোরা
নরাধম জীব,
তাই বলি শিখ আজ
অসাড় নির্জীব!

ওহে শিখ—সাবধান!
স্বর্গীয় কুলের
কামিনীর মান রাখি,
'এ অত্যাচারের'
প্রতিশোধ নাহি দিয়া
যেন দেহভার
বহন না কর ভবে
মিনতি আমার।
মরিব দস্যুর হাতে
তাহাতে কি ভয়?
'শিখ নাম' লুপ্ত হবে
নাহি সহ্য হয়!
জীবন সহজ-লব্ধ
সহজেই—যাক
কিছু ক্ষতি নাই তাতে;
কিন্তু 'শিখ জাঁক'
সহজে না যায় যেন,
সহজে সে নাম
আসে নাই—'শিখ জাতি'
লভেছে সুনাম
কত শত যুগ পরে
জাতীয় জীবনে
এমন পবিত্র নাম,
আছে কি ভুবনে?
ডুবাও না সেই নাম
অতল সলিলে,
একতা-বন্ধন—পাশ
বারেক খসিলে,
ছুটিবে কলঙ্ক পাত
পবিত্র সমাজে'
স্বাধীনতা—'কহিনুর'
লুটিবে ইংরাজে!
ছাড়ি যাব মাতৃভুমি
তাহে না ডরাই,
'শিখনাম' যায় পাছে
ভেবে ক্ষুণ্ণ তাই!"
ঝিন্দনের বীর্য্যপূর্ণ
বাক্য শুনি সবে
মাতিয়া উঠিল পুনঃ
জাতীয় গৌরবে!
জড়বৎ শিখ জাতি
ঘুমে অচেতন!
শ্রবণ করিয়ে সেই
সিংহীর গর্জ্জন,—
মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গি আজ
অচেতন প্রাণ
জাগরিল, রক্ষা হেতু
জাতির সম্মান,
কিন্তু সে মুমূর্ষু-কণ্ঠ—
বিনির্গত বানী
বিঁধিল ইংরাজ কর্ণ,
তাই মহারাণী—
ঝিন্দনে আবদ্ধ করি
দিলা নির্ব্বাসন
দেশান্তরে—"শেখপুরে,"
(তাই) শিখের পতন।
বড়ই ব্যথিত প্রাণ
মনোবেদনায়
বন্দিত্ব-বিষম-জ্বালা
কে সহিতে চায়?
এ বিষম নির্ব্বাসন
ইংরাজ-শাসনে

চিরদিন অশ্রুজল ঘুচিবার নয়,
আনিবে নয়নে! ইতিহাসে চিরকাল
ইংরাজের এ কলঙ্ক থাকিবে নিশ্চয়

মুক্তিফৌজের জয়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইংলণ্ডের জনৈক নিরীশ্বরবাদী রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মুক্তিফৌজের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে বলিয়াছেন;—"জ্ঞান ও শিক্ষার পক্ষপাতী হার্বার্ট স্পেনসার, ম্যাথিউ আরনল্ড, ফ্রেডারিক হেরীসনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই বোধ হয়, পথভ্রান্ত হইয়া চলিতেছি; নতুবা জেনারেল বুথ একাকী যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন আমরা সকলে একত্র হইয়াও ত তাহা করিতে পারিলাম না এবং কখনও যে পারিব এরূপ আশাও নাই। তবে কুসংস্কারাপন্ন ধর্ম্মমতের প্রভাবেই জেনারেল বুথ যে এতদূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বলিতেছি না। মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেম উদ্বোধিত করিয়া—বহুসংখ্যক নরনারীর দ্বারা একটী প্রেম-পরিবার গঠন করিয়া—একমাত্র মানব-প্রেমের প্রভাবেই জেনারেল বুথ জগতে এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, মানব-হৃদয়ের উপর বুথের এই অসাধারণ শক্তিই তাঁহার সিদ্ধিলাভের গূঢ় কারণ। বুথের প্রাণ হইতে এই শক্তি কাড়িয়া লও, দেখিতে পাইবে, বুথের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস জগতের কোন কাজেই আসিবে না।" মহামান্য লর্ড উল্‌সিলি (Lord Wolseley) মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, পাঠক একবার স্থির চিত্তে তাহা পাঠ করুন। "একবার ভ্রমণে বহির্গত হইয়া গ্রান্থাম্ নগরের কোন হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহিরে জনতা দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম, যে মুক্তিফৌজ ধর্ম্মপ্রচার করিবেন। আমি বাহির হইয়া ভিড়ের নিকট দাঁড়াইলাম। যাহা দেখিলাম তাহা অতি আশ্চর্য্য। দুইটী যুবতী নারী সঙ্গীত,প্রার্থনাদি দ্বারা প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের মুখে বিশ্বাসের দৃঢ়তা, প্রেমের উজ্জ্বলতা ও উৎসাহের সজীব ভাব প্রতিভাসিত। পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকলের মধ্যে তাঁহারা এক অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত করিলেন! আমি যতবার তাঁহাদের প্রচার দেখিতেছি ততবারই তাঁহাদের এই অদ্ভুত শক্তির

পরিচয় পাইয়াছি। নগরের মাজিষ্ট্রেট, মেস্তর, ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মুখেও শুনিয়াছি যে, আমি যে ১৫ দিন গ্রান্থামনগরে ছিলাম, সে কয়েক দিন মদ্যব্যবসায়ীদের বড় দুরবস্থা গিয়াছে। তাহাদের দোকান পাট প্রায় বন্ধের মধ্যে। এই সকল কথা শুনিয়া ভাবিলাম, আর কিছু না হউক যাঁহারা কেবল আপনাদের জীবনের প্রভাবে গ্রান্থামনগরের ন্যায় একটি নগরে এক পক্ষকাল শুঁড়ীর দোকান বন্ধ রাখিতে পারেন, তাঁহারা কখনও উপহাসের পাত্রী নহেন।" মুক্তিফৌজ পতিত নরনারীগণের জীবনের যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করিতেছেন তাহা দেখিলে প্রত্যেককেই লর্ড উল্সিলির কথায় সায় দিতে হয়। হারবার্ট স্পেন্সারের মতাবলম্বী জনৈক উপন্যাস-লেখক বলেন, "মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে আমার যেমন কুসংস্কার ছিল, এমন আর কাহারও ছিল না। কিন্তু সে দিন মুক্তিফৌজের ভিতরে গিয়া আমার পূর্ব্ব সংস্কার একেবারে দূর হইয়া গেল।

"মুক্তিফৌজ যে কাজ করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আর কেহ সেরূপ কাজ করা দূরে থাকুক, সেরূপ কাজের চেষ্টাও কখনও করেন নাই। মুক্তিফৌজের কাজ দেখা অবধি জেনারেল বুথের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। জেনারেল বুথ যে কোন প্রকার কাজ একবার হাতে লইলে তাহা সম্পন্ন করিতে নিশ্চয়ই পারেন, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস।"

ইংলণ্ডের সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত "পেল্‌মেল গেজেট" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক উদারস্বভাব জনহিতৈষী ষ্টেড্ সাহেব জেনারেল বুথ প্রণীত 'In Darkest England and the Way out' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন ;—"মুক্তিফৌজের সহিত যে দিন আমার প্রথম পরিচয় হয়, আমার জীবনের সে একটী বিশেষ দিন। সে আজ দ্বাদশ বৎসরের কথা। দেখিতে দেখিতে বার বৎসর গত হইল, কিন্তু আমার মনে হয় যেন সে কল্যকার কথা। "১৮৭৯ খ্রীঃ ৬ই জুলাই মুক্তিফৌজের রমণীগণ ডারলিংটন নগরে আগমন করিবেন" নগরের ঘাটে মাঠে এই বিজ্ঞাপন দেখা গেল। ডারলিংটন্‌বাসী ভদ্র লোকদিগের বিরক্তির আর সীমা নাই, রমণীগণ আসিয়া নগর তোলপাড় করিয়া তুলিবে, ইহা ভাবিয়াই তাঁহারা জ্বলিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে ৬ই জুলাই উপস্থিত। খোলা বাজারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মুক্তিসেনাদলভুক্ত দুইটী যুবতী মধুর সংগীত ও হৃদয়গ্রাহী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাদি করিতে লাগিলেন। বহুলোক তাঁহাদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রমে ভিড় বাড়িতে লাগিল। অবশেষে যখন মেয়ে দুইটী ডারলিংটন নগরস্থ "লিভিংষ্টোন হলের" দিকে চলিলেন, তখন

সেই অসংখ্য লোক তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। আজ রবিবার অপরাহ্ণ। সুবিস্তৃত "লিভিংষ্টোন্ হল" লোকে লোকারণ্য। আবার সেই মনোহর সঙ্গীত ও জীবন্ত প্রার্থনা শুনা গেল। প্রচারান্তে যুবতী প্রচারিকাদ্বয় প্রত্যেক লোকের কাছে গিয়া কাহার ধর্ম্মজীবন কিরূপ চলিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই ব্যাপার এক দিনেই শেষ হইল না।

সপ্তাহে সপ্তাহে প্রতিদিন ২০০০ দুই সহস্র হইতে ২৫০০ আড়াই সহস্র লোক 'ডারলিংটন হলে' উপস্থিত হইতে লাগিল। স্থানীয় ভদ্রতাভিমানী লোকেরাও আর দূরে থাকিতে পারিলেন না। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহারাও 'ডারলিংটন হলে' দেখা দিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে নৃত্যগীত আনন্দোল্লাস ও পাগলামী দেখিবেন আশা করিয়া গিয়াছিলেন তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না; বরং নগরের পাপাসক্ত দুরাচারী লোকদের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। "এইরূপে ভদ্র লোক সকল সমভাবে মাতিয়া উঠিলেন। ডারলিংটন নগর ধর্ম্মভাবে টলমল্। যাহারা ডারলিংটন নগরকে এত মাতাইয়া তুলিয়াছেন অবশেষে আমি এক দিন তাঁহাদিগকে দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম দুইটী ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে—একটির বয়স ২২ বৎসর কিন্তু অপরটির বয়স ১৯ বৎসরও নহে। তাহাতে আবার বড় মেয়েটী প্রায় নিরক্ষর। কিন্তু ইঁহাদের কি অসামান্য প্রভাব! অন্যান্য ধর্ম্মসমাজ যাহাদিগকে একেবারে অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, এই দুইটী বালিকা সেই অপদার্থ ব্যক্তিগুলিকে লইয়া একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করিয়াছেন, প্রতিদিন এই অসংখ্য লোকগুলির আধ্যাত্মিক অন্ন পান যোগাইতেছে। ডারলিংটন নগরে উপস্থিত হইবার সময় যাহাদের হাতে একটী পয়সাও ছিল না, নগরে যাহাদের কোন পরিচিত লোক ছিল না, অথবা কাহারো সহিত পরিচিত হইবার সম্ভাবনাও ছিল না, সেই নিঃসহায় বালিকা দুটী নগরের সর্ব্বপ্রধান হল ভাড়া করিয়া তথায় প্রত্যেক রাত্রিতে ও রবিবার সমস্ত দিন উপাসনা করিবার আয়োজন করিয়াছে, গ্যাস ও ট্যাক্স খরচ, ঘর পরিষ্কার করা ও ভগ্ন জানালাদি মেরামত করার খরচ এবং ইহা ছাড়া আপনাদের খাওয়া পরার খরচপত্র ইত্যাদি অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছে। ডারলিংটন নগর লৌহব্যবসায়ের একটী প্রধান স্থান। লৌহের ব্যবসা হইতেই নগরবাসী লোকদিগের বহু অর্থাগম হয়। কিন্তু যে বৎসরের কথা বলা হইতেছে সেই বৎসর লৌহব্যবসায়ের বড় দুরাবস্থা ছিল। নিয়মিত চাঁদা আদায় না হওয়াতে অতি কষ্টে স্থানীয় ধর্ম্মালয় গুলির নিত্যকর্ম্ম চলিতেছিল। কিন্তু এই বালিকা দুটী নিতান্ত

দীনদরিদ্র লোকদের নিকট হইতে দুই এক পয়সা করিয়া কুড়াইয়া লইয়া বৎসরে প্রায় ৪০০০ হাজার টাকার কাজ নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। "দুইটী সামান্য বালিকার এই সকল কাজ নিতান্ত সাংসারিক ভাবে বিচার করিয়া দেখিলেও অদ্ভুত ও অসামান্য বলিয়া মানিতে হয়।" রমণীপ্রাণে যে এমন অসাধারণ শক্তি আছে পূর্ব্বে তাহা কে জানিত? একমাত্র মুক্তি-ফৌজই রমণীচরিত্রের এই অত্যাশ্চর্য্য শক্তি জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

দেশাচার।

(চতুর্থ সংখ্যা।)

চীনদিগের খাদ্য। চীনেরা সর্ব্ব-ভুক্ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কুকুর, বিড়াল, পেঁচা, ঈগল, বাজ, সারস, হংস, ছাগল, মেষ, প্রভৃতি ত ইহাদের সাধারণ খাদ্য। এই সকলের অভাবে নেংটী ইন্দুর, গেছো ইন্দুর, আরসুলা, সর্প ও অন্যান্য কীটের ব্যঞ্জনও ইহাদের নিকট সুখাদ্য। মোটা সোটা কোমল কুকুরের মাংস বড়ই সুখাদ্য, তজ্জন্য বাজারে ইহা মহার্ঘ্য। উত্তম পাচিকা যদি কুকুর ছানার মাংস রন্ধন করে, তবে উহা অমৃত বলিয়া গণ্য হয়। সেখানকার ইংরাজেরাও নাকি বলেন যে যদি চীনদিগের ন্যায় কুকুরশাবক রন্ধন করিতে পারা যায়, তবে বস্তুতই উহা সুখাদ্য হয়। অধিকন্তু অনেক ইংরাজ কুকুর মাংসের বড়ই ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

পার্শিদিগের মধ্যে কুকুরের আদর। বোম্বাইর অগ্নি-উপাসক পার্শিগণ মনে করে যে কুকুরের আত্মা আছে এবং উহা মৃত্যুর পর এক আধ্যাত্মিক লোকে গমন করে। উহার নাম জল্যাবাস। কোন কুকুরের মৃত্যু হইলে দুইটী কুকু-রাত্মা ঐ জল্যাবাসের দ্বারে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যায়। পার্শিরা বিশ্বাস করে যে পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে একটী সেতু আছে। সাধু, ধার্ম্মিক, মানবাত্মাই কেবল উহার পারে উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গে যাইতে সক্ষম হয়। এই সেতু কয়েকটী কুকুরাত্মা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। ইহারা সাধু ও ধার্ম্মিকদিগকে চিনিতে পারে এবং স্বর্গে লইয়া যায়। পাপীদিগকে কদাচ পার হইতে দেয় না। পার্থিব জীবনে যে সকল লোক কুকুরের প্রতি নিষ্ঠুরা-চরণ করে কিম্বা অনাদর দেখায় কুকো-

দিগকে কুকুরেরা ভয়ানক পাপী মনে করিয়া স্বর্গে যাইতে দেয় না। পার্শিদের এই বিশ্বাসের জন্য তাহারা কুকুর দিগকে বড়ই সমাদর করে। ইহাদিগকে হত্যা করা তাহারা বড়ই পাপ মনে করে। কুকুরকে প্রহার করা বা অখাদ্য ভক্ষণ করিতে দেওয়া মহাদোষ ও নিতান্ত অন্যায়। ইহার জন্য তাহাদিগের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে। যদি কুকুর ক্ষিপ্ত হইয়া জলে ডুবিয়া মরে, তবে সেই পল্লীবাসীরা মহা বিপদ মনে করে ও শঙ্কিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য ধার্ম্মিক পার্শিগণ তাহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক গৃহে বাঁধিয়া রাখে ও কদাচ প্রহারাদি করে না। কুকুরকে উত্তম রূপে আহার করান পার্শিদিগের মতে একটী মহৎ ধর্ম্মকার্য্য।

৩

চীনদিগের প্রধান আমোদ। জুয়া খেলা ও ঘুড়ি উড়ান এই দুইটী উহাদের প্রধান আমোদ। চীনেদের প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে সাধারণের জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট জুয়াখেলার স্থান আছে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক পান্থশালাতে জুয়া খেলার জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘর থাকে। অসংখ্য চীনবাসী এই খেলাতে দিন দিন হতশ্রী হইতেছে, তথাচ ইহারা এই আমোদ হইতে বিরত হইতে পারে না। ঘুড়ি উড়ান ইহাদের অপর একটী প্রধান আমোদ। চীন দেশে বালক যুবক বৃদ্ধ সকলেই এই আমোদে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতে ভালবাসে। মৎস্য, পক্ষী, প্রজাপতি ইত্যাদির আকারে ঘুড়ি চীন দেশে খুব প্রচলিত। প্রবাদ আছে যে চীনদেশেই সর্ব্ব প্রথম ঘুড়ির সৃষ্টি হয় এবং অন্যান্য দেশবাসীরা চীন দেশের নিকট ইহা শিক্ষা করে।

জীবনের দায়িত্ব।

বাইবেলের অন্তর্গত মথি-লিখিত ধর্ম্মপুস্তকের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে, যিশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে, ঈশ্বর যে সকল বৃত্তি আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীর জন্য আমরা দায়ী। নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী দ্বারা উক্ত উপদেশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক ব্যক্তি বিদেশে যাইবার সময়, তাঁহার ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিলেন; একজনকে ৫ ট্যালেণ্ট, এক জনকে দুই ট্যালেণ্ট, এবং আর এক জনকে ১ ট্যালেণ্ট * দিলেন। যে ভৃত্য ৫ ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল, সে পাইবা মাত্র সে গুলি লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিল, ও আরও ৫ ট্যালেণ্ট উপার্জ্জন করিল। যে দুই ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল সেও আরো দুই ট্যালেণ্ট উপার্জ্জন করিল। কিন্তু যে এক ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল সে তাহা

* এক ট্যালেণ্ট প্রায় দুই হাজার টাকা।

পাইবা মাত্র মৃত্তিকার ভিতর লুকাইয়া রাখিল। পরে তাহাদের প্রভু আসিয়া হিসাব লইলেন। তখন যে ব্যক্তি ৫ ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল, সে ১০ ট্যালেণ্ট সঙ্গে করিয়া আনিয়া বলিল, "প্রভো তুমি আমাকে ৫ ট্যলেণ্ট দিয়াছিলে, এই দেখ আমি আরও ৫ ট্যালেণ্ট উপার্জ্জন করিয়াছি।" তাহার প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, সাধু এবং বিশ্বস্ত দাস, তুমি বেশ করিয়াছ; তুমি সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হইয়াছ, তুমি তোমার প্রভুর আনন্দের ভাগী হও। পরে যে দুই ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল, সেও বলিল, প্রভো, তুমি আমাকে দুই ট্যালেণ্ট দিয়াছিলে, আমি আরও দুই ট্যালেণ্ট উপার্জ্জন করিয়াছি। তাহাকেও তাহার প্রভু বলিলেন, সাধু এবং বিশ্বস্ত দাস, বেশ করিয়াছ, তুমি সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হইয়াছ, আমি তোমাকে আরও মহৎ কার্য্যের ভার দিব। আর যে এক ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল, সে আসিয়া বলিল, প্রভো! আমি জানি তুমি অতি কঠিন লোক। তুমি যেখানে ছড়াও নাই, সেখানে কুড়াও ও যেখানে বুন নাই, সেখানে কাট। তাই আমি তোমার মুদ্রা মাটীর ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। এই লও, যাহা তোমার, তাহা পাইলে। কিন্তু তাহার প্রভু তাহাতে বলিলেন, রে অলস! তুই নিজে কিছু না করিয়া প্রভুরি উপর রাগ করিতেছিস। তুই এ দানের অযোগ্য। এই বলিয়া তাহার টাকা কাড়িয়া লইয়া বিশ্বস্ত ভৃত্যদ্বয়কে দিলেন।

এই গল্পটী হইতে আমরা এই উপদেশ পাই যে আমাদের প্রভু ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল মূল ধন দিয়াছেন, তাহার অধিক চান। তিনি আমাদিগকে যাহা দিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীর সদ্ব্যবহারের জন্য আমরা দায়ী। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধি, ভক্তি, দয়া, প্রেম, ন্যায়পরতা, অধ্যবসায়, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি বৃত্তি সকল দিয়াছেন? তিনি কি অভিপ্রায়ে আমাদিগকে সে সকল দিয়াছেন? তিনি আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন যে, আমরা সেই বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিব, জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিব এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বারা আমাদের পরিবারের, সমাজের ও দেশের দুঃখ, দুর্গতি, পাপ ও কুসংস্কার সকল দূর করিতে চেষ্টা করিব। আমরা যদি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা না করি, কিম্বা কেবল স্বার্থসিদ্ধি, জঘন্য সুখ-লালসার তৃপ্তি সাধন, অথবা মানবের অনিষ্ট সাধনে বুদ্ধিকে নিয়োজিত করি, তাহা হইলে এই অপব্যবহারের জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী। তিনি আমাদিগকে ভক্তি দিয়াছেন এই জন্য যে, আমরা মহৎ ও পূজনীয় ব্যক্তিকে উহা দান করিব। যাঁহারা বাস্তবিক ভক্তির উপযুক্ত তাঁহাদিগকে ভক্তি

করিলে অনেক সুফল হয়। ভক্তি থাকিলে বড় লোকদের জীবনে অনেক সদ্গুণ দেখিয়া আমাদেরও সেই সকল সদ্গুণ লাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা জন্মে, এবং এই ইচ্ছা থাকিলে ক্রমেই আমাদের জীবন ভাল হইতে থাকে। ভক্তি না থাকিলে মানুষ সদ্গুণের আদর করিতে শিখে না; কেবল বিদ্রূপ ও পরনিন্দা করিতে ভাল বাসে। সুতরাং এপ্রকার মনুষ্য কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। ভক্তি থাকিলে আর একটী উপকার এই হয় যে, আমরা কখনও নিজের সাধুতা কিম্বা জ্ঞানের অহঙ্কারে স্ফীত হই না। এই জন্যই, একজন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন যে জ্ঞান উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকুক, কিন্তু যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধিক হইতে অধিকতর ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব অমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। পরমেশ্বর জ্ঞানময়, প্রেমময়, পবিত্রস্বরূপ। তাঁহাকে ভক্তি না করিলে আমরা কিরূপে প্রকৃত জ্ঞানী, চরিত্রবান, এবং পরোপকারী হইতে পারি? ভক্তির যেমন সুব্যবহার আছে তেমনি অপব্যবহারও আছে। শুধু ভক্তি থাকিলেই হয় না। ইঁদুর, বেঙ, শৃগাল, শকুনি, অসচ্চরিত্র পুরোহিত বংশীয় লোক প্রভৃতি অনেকে অনেক দেশে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি পাইয়াছে, এবং এখনও পাইতেছে। ইহা ভক্তির অপব্যবহার; এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

(ক্রমশঃ)

আখ্যানমালা।

(১৬শ সংখ্যা।)

১। বহু দিবস পূর্ব্বে একদা আমাদের পল্লীগ্রামস্থ বাড়িতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল। আমাদের বাড়ির একটী ঝি পাঠ শুনিয়া গৃহের মধ্যে যাইয়া আপনার দৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কাজ করিতে করিতে সে কান্দিতে লাগিল। আমার পিশিমা ঝির রোদনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ্‌ছ কেন বাছা?"

ঝি,—"আই! বল কি মা! কাঁদ্‌ব না? ছোট বাবু (আমার ছোট জেঠা) কাঁদ্‌চেন, বড় বাবু (আমার বড় জেঠা) কাঁদ্‌চেন; আমি কাঁদিব না?"

অধিক লোকেরই ধর্ম্মামোদ ও ধর্ম্মোৎসাহ এইরূপ ঝির রোদন। আমরা অকারণ পরের মত্ততা দেখিয়া মত্ত হই এবং এই প্রকার মত্ততাকে প্রকৃত মত্ততা বলিয়া ভ্রম করি।

২। আমাদের বাড়ির আর একটী ঝির গল্প শুনিয়াছি। এক দিবস সে অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার

পিশি, ও জেঠাই মাদের নিকট আসিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিল, "বলব কি, মা ঠাকরুণ! আমি দেখে এলাম বড় বাবু (ঐ) 'নিজের' পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!"

এই ঘটনাটি বিস্ময়কর বোধ হইলেও সত্য। ইহা হইতে বাঙ্গালি বাবুদিগের আলস্য ও জড়তার কথা বেশ বুঝা যায়। বাবুরা পরিশ্রমে নিতান্ত নারাজ, এমন কি গের্দ্দা হেলান দিয়া ভুঁড়ি প্রকাশ পূর্ব্বক কালাতিপাত করা তাঁহাদিগের একমাত্র কার্য্য মনে করেন। তবে আজ কাল জীবন-সংগ্রামে নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির টেঁকা দায় বলিয়া ভুঁড়িও যেন কর্ম্মশীল হইতে শিখিতেছে। ইংরাজি কোট্ পেন্টুলেনের টানে দিন দিন ভুঁড়ি সঙ্কোচ হইতেছে।

কি ধর্ম্মে, কি কার্য্যে, কি চিন্তায় আমরা স্বাবলম্বনের ভাব রহিত। সর্ব্ব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিয়া অভ্যাস দোষে আমাদের আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়াছে। এই স্বাবলম্বনের ভাবই উন্নতি ও মহত্ত্ব লাভের একমাত্র সোপান।

৩। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর ইসলেবেন গ্রামে ধর্ম্মবীর লুথারের জন্ম হয়। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোক গমন করেন। এই তেষট্টি বৎসরের মধ্যে নানা শত্রু তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকালে অর্দ্ধ ইউরোপ খণ্ডের অধিপতি ৫ম চার্লস্, রোমীয় পোপ ১০ম লিও প্রভৃতি ইউরোপের অধিপতিগণ লুথারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্রাট্ চার্লস্ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, "ওয়ার্মস্ নগরে ১৫২১ খৃঃ ১৭ই এপ্রেল রাজকীয় ডায়েট্ বা মহাসভা আহূত হইবে। তথায় লুথারকে পোপ ওসম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্য করার জন্য জবাব্দিহি করিতে হইবে।" আগ্নেয় গিরির অভ্যন্তরে যেমন প্রচণ্ড তেজোময় গলিত ধাতুপুঞ্জ নিহিত থাকে, সেইরূপ এই ধর্ম্মবীরের প্রাণে অদম্য ধর্ম্মাগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল। যিনি বিশ্বরাজের অধীন, পার্থিব রাজার নিকট তাঁহার মস্তক অবনত হইবে কেন? তাঁহার বন্ধুগণ বারম্বার তাঁহাকে জীবন নাশের ভয় দেখাইয়া ওয়ার্মসের ডায়েটে যাইতে নিষেধ করিলেন। জার্ম্মণ-কেশরী লুথার বিশ্বাসের অচল শৈলের উপর অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "গৃহসমূহের ছাদে যত টাইল আছে, ওয়ার্মসে যদি ততগুলি সয়তান থাকে, তথাচ আমি যাইব।"

এইরূপ নির্ভীকতার মূলে ধর্ম্মের বল না থাকিলে, উহা টিকিতে পারে না।

"ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং
ধর্ম্মঙ্কর ধর্ম্মাৎ পরংনাস্তি।"

৪। জনৈক বৈষ্ণব একজন বিধর্ম্মীকে বলিলেন "তুমি বৈষ্ণব ধর্ম্ম মান?"

বিধর্ম্মী,—"না।"

বৈষ্ণব—"তুমি যে ধর্ম্মই মান, তুমি আমারই প্রভুর সেবা কর ও তাঁহারই উপাসনা কর। পৃথিবীর সতিনদের বিবাদ বিসম্বাদ হয়, কিন্তু আমার স্বামীকে যাঁহারা প্রকৃতরূপে ভজনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ নাই।"

কেমন উদারতা! প্রকৃত ধর্ম্মের ইহাই লক্ষণ।

এমারসনের "গার্হস্থ্য জীবন" নামক প্রবন্ধ-বিশেষের চূর্ণক।

১। আমি এক বস্তু ও আমার ব্যয় আর এক বস্তু হইতে পারে না। আমার ব্যয়ই আমি। আমাদের খরচপত্র ও আমাদের চরিত্র যে স্বতন্ত্র, ইহা সমাজের রোগ।

২। কেহ যেন কখনও যাহা প্রয়োজন নাই, তাহা ক্রয় না করে, অন্যের প্রেরণায় যেন কখন কোন (হিতকর কার্য্যে) চাঁদা না দেয় এবং অনিচ্ছাপূর্ব্বক যেন কখনও দান না করে।

৩। প্রথমে মিতব্যয়িতা, তৎপরে সুবিধা ও আরাম।

৪। গৃহলক্ষ্মী বলেন, "অর্থ দাও, তবেই তোমার গৃহ তোমার রুচির মত হইবে ও তজ্জন্য তোমার সময় নষ্ট হইবে না।"

"ধন দাও।" সুগৃহিণীর পক্ষে একথা সঙ্গত নহে; অল্প লোকেরই ধন আছে; কিন্তু সকলেরই ঘরকন্না চাই। মানুষ ধনবান হইয়া জন্মে না; ধন উপার্জ্জন করিতে যাইয়া মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত হয়, এবং অনেক সময়েই মনুষ্যত্ব নষ্ট হইলেও ধনাগম হয় না। তদ্ব্যতীত ইহা প্রকৃত উত্তর হইতে পারে না, ধনের সম্বন্ধে আপত্তি আছে।

এই (ধনাকাঙ্ক্ষারূপ) বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিতে হইলে আমাদের লক্ষ্যকে উন্নত করিতে হইবে। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, গৃহের নির্ম্মাণ ও সজ্জা কেবল মানবের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য।

৫। যাহারা দারিদ্র্য অর্থাৎ অধিক অভাব অনুভব করে, তাহারাই দরিদ্র। যাহাদিগকে আমরা ধনী মনে করি এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই দরিদ্র ও কৃপাপাত্র।

৬। মানুষ, তবে বলুক, আমার গৃহ, ইহা এই স্থানের শিক্ষা এবং উন্নতির জন্য; ইহা ভ্রমণকারিগণের আহারস্থান ও শয়নাগার হইবে, কিন্তু তদ্ব্যতীত আরও কিছু হইবে।

৭। যে সকল সাধু বন্ধু গৃহে আগমন করেন, তাঁহারাই গৃহের অলঙ্কার।

৮। হৃদয়ই সৌন্দর্য্যের উৎস। হৃদয়ের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের প্রাচীরকে চিত্রিত কর অর্থাৎ প্রত্যেক ভাবকে সুন্দর কর।

সুখের মৃত্যু।

মাতৃচরণে মুমূর্ষু সন্তানের বিদায়।

কেঁদো না কেঁদো না গো মা! এমন সময়,
হেন শুভ দিনে আজি কাঁদিতে কি হয়?
ভবসিন্ধু-পারে আমি যাব শিবধাম,
দেও মা! পারের কড়ি কর হরিনাম;
প্রেমানন্দে বাহু তুলে কর আশীর্ব্বাদ,
কেন গো জননি! কর হরিষে বিষাদ;
তারকব্রহ্মের নাম সর্ব্বাঙ্গে লিখিয়া,
যাত্রাকালে সন্তানেরে দেও সাজাইয়া;
কুতূহলে কর্ণমূলে কর হরিধ্বনি,
শেষবার তব মুখে হরিনাম শুনি;
'তারা তারা ব্রহ্মময়ী'—বলিতে বলিতে,
যাইব আনন্দধামে নাচিতে নাচিতে;
শিরে দিয়া পদধূলি দেগো মা! বিদায়,
যাইব পিতার কোলে ভাবনা কি তায়?

(১) 'তারা ব্রহ্মময়ী'—নিস্তারকারিণী ব্রহ্মশক্তি।

নবীন সন্ন্যাসী।

নবীন সন্ন্যাসী যায় কে দেখিবি আয়!—
চলে রে! অনন্ত পথে,
সঙ্গী কেহ নাহি সাথে,
সোণার প্রতিমা সে যে করেছে বিদায়; (১)
দেহে নাহি অভিমান,
নাহি মানে মানামান,
প্রাণে তার নাহি টান, চিদানন্দ চায়;
নাহি স্নেহ, নাহি দয়া,
কাটায়েছে সব মায়া,
মায়ের আজ্ঞায় সে যে একা একা যায়;
'বিষ্ণুভক্তি' মা তাহার,
বলেছেন বার বার,—
"একাকী ভাবিয়া ভয় না করিও তায়;
অলক্ষ্যে রাখিব কোলে,
যাও বাছা! যাও চোলে,
কি ভয় অনন্ত পথে মা যার সহায়?"
নবীন সন্ন্যাসী যায় কে দেখিবি আয়।

(১) 'সোণার প্রতিমা'—মায়ার সংসার।

নূতন সংবাদ।

(সংগৃহীত)

১। আমেরিকার যুক্তরাজ্য কুবেরের বাসস্থান। তথাকার ধনকুবেরগণের ধন অগাধ। জে গুল্ডের দৈনিক আয় ১,৫০০ পনের শত পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় ২২,৫০০ টাকা।

২। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই পাপের নূতন পথ খুলিতেছে। সম্প্রতি আয়র্লণ্ড দেশে ঈথার (Ether) পানের ধুম পড়িয়াছে। ঈথার সুরা অপেক্ষা সুলভ। ঈথার-পান সুরাপানাপেক্ষা অধিক দুর্নীতি-জনক। মত্ত ঈথার-পায়ী ইচ্ছা মাত্রেই মত্ততা ত্যাগ করিতে পারেন। মানুষে ঈথারবাষ্প পান করিবে, কেহ কল্পনাও করে নাই।

৩। গত ৩০শে মার্চ্চ রজনীকালে মার্সেলিস্ অব্ সারভেণ্টরিতে ফরাশিস মবেরিক্ষী সাহেব একাদশ শ্রেণীর একটী নূতন তারকা আবিষ্কার করিয়াছেন।

৪। রমাবাইয়ের সারদা-সদন বোম্বাই হইতে পুনানগরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহাতে ২৬টী বিধবা ও ১৩টী কুমারী ও সধবা ছাত্রী আছে। বিধবাগণ কিছু শিক্ষালাভ করিয়া প্রত্যেকেই এক একটী সারদা-সদন স্থাপন করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। উপযুক্ত ভূমিতেই বীজ পড়িয়াছে।

৫। জর্ম্মণ পণ্ডিতদিগের গণনা অনুসারে আজ কাল প্রত্যেক ভারত-বাসীর বস্ত্রের বার্ষিক ব্যয় দেড় টাকা হিসাবে ; অর্থাৎ প্রায় ২৫ কোটী লোকে বৎসরে ৩৭।৩৮ কোটী টাকা ব্যয় করে। বিদেশীয় কাপড়ের প্রাদুর্ভাবে বিদে-শীয়েরা ইহার অধিকাংশ টাকা লুটি তেছে।

৬। "হিব্রু বাইবেল" পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ। উহা রোমের "ভেটিকেন" নামক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অট্টালিকাতে রক্ষিত হইয়াছে। গ্রন্থ ওজনে প্রায় ৩২৫ পাউণ্ড হইবে; দুই জন বলবান লোক না হইলে উহা তুলিতে পারে না। য়িহুদিরা এই গ্রন্থ পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পোপেরা উহা দিতে সম্মত হয় নাই।

৭। অষ্ট্রেলিয়া দেশে ইনক অন্ত-রীপে জঙ্গলের মধ্যে একটী ১৬ বৎসরের যুবক পাওয়া গিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ৪ ইঞ্চ লম্বা লোমে আবৃত,—মাথার চুল ৪ ফুট ও হাত পায় এক একটা নখ ৫ ইঞ্চ লম্বা। এখনও কথা বলিতে পারে না, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই।

৮। গ্লাসগো নগরের এক মহিলা মৃত্যুকালে মুক্তিফৌজের আধিনায়ক জেনারেল বুথ সাহেবকে ৮০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১২॥ লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। বুথ সাহেব সেই অর্থ দ্বারা লণ্ডন নগরে মুক্তি সেনাদের জন্য এক বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

৯। কাশীতে গতপূর্ব্ব বৃহস্পতি-বার আহিরী গোয়ালাদের এক পাত্র বিবাহ করিয়া পাত্রী লইয়া বাড়ী যাইতেছিল। তাহাদের জাতিগত প্রথা-নুসারে নৌকাতে করিয়া পঞ্চগঙ্গা ঘাটে পূজা দিতে গিয়াছিল। নৌকাতে স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা অনেক লোক ছিল,—বাদ্যকরেরা বাদ্য বাজাইয়া আনন্দ কোলাহল তুলিয়াছিল। ঘাট হইতে অল্প দূরে যাইয়াই তলা ফাটিয়া নৌকা ডুবিয়া গেল। পাত্র প্রাণে বাঁচিয়াছে—পাত্রী মারা পড়িয়াছে। একটী যুবতী নৌকা-ডুবির সময় তাহার সন্তানটীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, মৃত অবস্থাতেও মাতা ও সন্তানকে সেই অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে।

১০। মন্দ্রাজে এক সাহেবের মালির স্ত্রী ৩টী সন্তান প্রসব করিয়াছে। প্রসূতি ও সন্তানগণ বেশ সুস্থ অবস্থাতে আছে।

১১। কুমারী মেটিল্‌ডা এস্‌টন নাম্নী এক ১৭ বৎসরের অন্ধ যুবতী অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্‌ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মেলবোর্‌ণের এক মহিলা সভা সেই অন্ধ রমণীর কলেজে পড়িবার ব্যয় বহন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বামারচনা।

আয় ফিরে আয়!

১

ভেঙ্গে গেছে বুক, শোক তাপ দুঃখে,
আগুন রোয়েছে পরাণ ঘিরে,
তাই যেতেছিস্, আঁধারের দেশে?—
যা'স্‌নে, আমার মাথার কিরে।

২

তুই যদি বড়, সুখ শান্তি হারা,
বড় ব্যথা যদি তোরি ও বুকে,
জগত-হৃদয়ে ঢেলে দে' হৃদয়,
বেঁচে থাক্ শুধু জগত-সুখে?

৩

তোর তরে যদি রবি, শশী, তারা,
হাসে না উজল মধুর হাসি,
কেন তায় চোখে শ্রাবণের ধারা?—
জ্বলে কত ঘরে আলোক রাশি!

৪

তোর বাড়ী যদি না যায় শরৎ,
ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত-বায়,
কেন হবি "পর"—ভেঙ্গে ফেলে ঘর,
জগত সংসারে থাটিবি আয়!

৫

"সাধের কানন গেছে শুখাইয়া"
তা বোলে কি শুধু কাঁদিতে হয়?—
না ফুটিলে যুঁই, হাসিবিনে তুই?—
জগত তোমার কেউ কি নয়?

৬

কত ভাই বোন, আপনার জন,
কত কারা হেথা করেছে মেলা,
দেখিলে হৃদয়, কি জানি কি হয়,
আয় এই ঘরে খেলিতে খেলা।

৭

তোর মুখে যদি হাসি নাহি ফোটে,
ওদেরি হাসিতে মাখিবি প্রাণ;
তোর বুকে যদি ঢেউ নাহি উঠে
ওদেরি আনন্দে গাহিবি গান।

৮

অপরের সুখে হাসি মুখে মুখে
যাবে না কি তোর মরম-ব্যথা,
"যে দিন গিয়াছে আসে না কো আর,"
"জগৎ" কি তোর কথার কথা?

৯

মধুমাখা ভাষ স্নেহের সম্ভাষ,
রাত দিন তোর পড়িছে মনে?—
তোর ছিল যা'রা, চলে গেছে তা'রা,
আগুন লেগেছে ফুলের বনে?

১০

"জগৎ" কে তোর—জগৎ তা'রাই,
তো'তে মাখা ছিল তাদেরি প্রাণ,
পরাণের গা'য় জড়াইয়া যায়,
তোদের কাহিনী, পুরাণো গান ?

১১

আজ নয় তুই পথের ভিখারী,
সুখ-সাধ সব হয়েছে ক্ষয়,
তা'বলে চা'বিনে জগতের পানে,
জগত তোমার কেউ কি নয় ?

১২

তুইও একজন জগতের তরে,
এ বিশ্ব জগত তোরও লাগি,
আয় ফিরে আয় জগতের কোলে,
আমি তোর পা'য়ে এ ভিক্ষা মাগি ।

১৩

ভাল তো বাসিস্,— বাসিতে জানিস্,
ভালবাসা তোর হৃদয় মাখা ;
আয় জগতেরে ভাল বাসিবারে,
শোক তাপ সব থা'ক না ঢাকা !

১৪

দেখ অগণন তো'রি ভাই বোন,
চাঁদ মুখে ব'য় বিষাদ-ধারা,
আদরের ভাষে, সোহাগ-সম্ভাষে,
তুলে নে'গো কোলে, হাসুক তা'রা !

১৫

এদের বাগানে উঠিবে ফুটিয়া,
তোরি বেল চাঁপা গোলাপ যুঁই,
এদেরি চাঁদিমা তোরে আলো দিবে,
সবে যে গো, তোর, সবারি তুই !

১৬

তোর্ও এ জগৎ, তোর্ও এ ব্রহ্মাণ্ড,
তোরি হয়ে সবে দাঁড়া'ক ঘিরে,
আয় জগতেরে ভাল বাসিবারে,
ফিরে আয়, মোর মাথার কিরে !

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী ।

হরিষে বিষাদ ।

আনন্দে ভাসিছে আজি সবার হৃদয়,
শরতের শশিসম,
স্নেহের বোনের মম
সুত আগমনে গৃহ পবিত্রতাময় ।
তার সে সৌন্দর্য্য রাশি,
তার সে মধুর হাসি,
আ মরি আ মরি যেন প্রাণ কেড়ে লয়,
অমূল্য রতন সে যে এ মর ধরায় । ১
নেহারি মুখানি তার সব দুঃখ ভার,
ভুলিয়ে মাতা যে তার,
ফেলে আনন্দাশ্রু ধার,
আনন্দে উথলি উঠে হৃদি পারাবার ।
কেন চায় এ নয়ন,
কেন রে অতৃপ্তমন,
চাহিতে তাদের পানে ইচ্ছা বার বার ?
অমূল্য রতন সে যে এমর ধরার । ২
হরিষে বিষাদ আজি হায় হায় হায় !
অই যে মায়ের কোলে,
প্রাণ হীন দেহ দোলে,
অনিত্য পৃথিবী এবে দুদিনে মিশায় ।
আজিরে কাঁদাতে কারে,
কাঁদি যে আদের তরে,
পিতা মাতা পরিজন কাঁদিছে মিছায়,
অমূল্য রতন সে যে এ মর ধরায় । ৩

বোঝেনা বোঝেনা প্রাণ বোঝেনা মাতার,
সেযে গেছে শান্তিধাম,
তবুও মায়ের প্রাণ,
কিছুতে বোঝেনা আহা কাঁদে অনিবার,
মোরা পুন দুই দিনে,
মিলিব তাদের সনে,
কেঁদনা কেঁদনা মাতা কেঁদনাক আর,
অমূল্য রতন সে যে এমর ধরায়। ৪
বিভু হে! তোমার লীলা বোঝে সাধ্য কার?
দেখিতেছি গৃহ আজি আলোকে আঁধার।
তব ইচ্ছা পূর্ণ করি,
তোমারি সান্ত্বনা-বারি,
ঢালি দাও প্রাণে সেই আকুলা মাতার।
হোক্ তোমাময় প্রাণ,
লইয়ে তোমার নাম,
হউক শীতল তাঁর ব্যাকুল হৃদয়;
তোমারি নামের পিতা হোক্ জয় জয়।৫

কুমারী রেবা বাই,
কটক।

সন্ধ্যা।

অবসান প্রায় দিবা,
এ সময়ে শোভা কিবা,
করেছে ধারণ প্রকৃতি সতী,
মন প্রাণ বিমোহন,
করি দৃশ্য দরশন,
আনন্দে মগন হয়েছে মতি।১

প্রকৃতির প্রিয় ছবি,
রক্তিম বরণ রবি,
বসেছে পশ্চিম আকাশ পাটে;
মনে বোধ হয় হেন,
সিন্দূরের ফোঁটা যেন,
শোভিছে প্রকৃতি সতী ললাটে।২

বহিছে শীতল বায়,
জুড়ায় তাপিত কায়,
পাখীগণ করে পুরবী গান;
যেন সবে সমস্বরে,
মঙ্গল আরতি করে,
মঙ্গলময়ের খুলিয়া প্রাণ।৩

শ্যামল শস্যের কোলে,
সুন্দর মঞ্জরী দোলে,
তার সনে খেলে মৃদুল বায়,
পড়িয়াছে তদুপর,
লোহিত ভানুর কর,
ঝিকি ঝিকি মরি কি শোভা পায়!৪

সারি সারি তরুরাজি,
সোণার মুকুটে সাজি,
কি শোভা ধরেছে হেরি নয়নে;
পাতাগুলি নড়ে ধীরে,
যেন তারা নতশিরে,
প্রণিপাত করে বিভু-চরণে।৫

ধন্য সেই চিত্রকর,
হেন মনোমুগ্ধকর,
করি যে রচিল বিশ্ব-ভবন;
প্রণিপাত পদে তাঁর,
করি আমি বার বার,
থাকে যেন তাঁর চরণে মন।৬

শ্রীনীঃ—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৮ সংখ্যা। | আষাঢ় ১২৯৮—জুলাই ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মদিন—গত ২৪এ মে আমাদিগের সাম্রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া ৭২ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৭৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্ব ৫৪ বৎসর হইল। জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করিয়া অগণ্য প্রজার সুখশান্তি বর্দ্ধন করুন।

লেডী ডফারিণ—(১) এই ভারত-হিতৈষিণী মহিলা বিলাতে গিয়াও ভারতকে ভুলেন নাই। ভারতের স্ত্রী চিকিৎসার সাহায্যার্থে সম্প্রতি অক্সফোর্ডে এক সভা হয়, তাহাতে প্রায় ২০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং লেডী ডফারিণ একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। (২) ব্লাকহিথ নামক স্থানে তাঁহার উদ্যোগে কোন হাঁসপাতালের সাহায্যার্থ এক সখের মেলা হয়, তাহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা দোকান খুলিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন।

বিলাতে নিরামিষ রন্ধন—ভারতবর্ষের জনৈক সেনাধ্যক্ষের বিধবা পত্নী বিবী জি জনসন লণ্ডনে এক রন্ধনশালা খুলিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় প্রণালীতে নিরামিষ রন্ধন করিয়া ভোক্তাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন। ইনি এদেশ হইতে পাকবিদ্যা শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন, ৫০ প্রকার চাট্‌নী প্রস্তুত করিতে জানেন। গ্লাসগো প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষীয় লুচির কাট্‌তী যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে বেশ বোধ হয়, ইংরাজ

সমাজে এ দেশের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের যথেষ্ট সমাদর হইবে।

বিবী গ্রিমউডের পুরস্কার—মণিপুরের মৃত রেসিডেণ্ট গ্রিমউডের পত্নী দুর্ভাগ্যের মধ্যে সৌভাগ্যবতী বলিতে হইবে। তিনি "Royal Red cross" রাজকীয় লাল ক্রস চিহ্নিত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছেন। ৮ বৎসর হইল স্ত্রী লোকদিগের সম্মানার্থ এই নূতন সম্ভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধস্থলে আহত সৈনিক বা হাঁসপাতালে পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষার জন্য সুবিখ্যাত কয়েকটী মহিলা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ স্বর্ণমণ্ডিত পাড়ে শোভিত, বাহুতে "বিশ্বাস, আশা ও দয়া" এই তিনটী ধর্ম্মাঙ্গ ইংরাজীতে লিখিত। বিবী গ্রিম উড মণিপুর বিভ্রাটের মধ্যে যেরূপ বীরত্ব ও সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি এই দুর্লভ পুরস্কারের উপযুক্ত।

ঈগল কর্ত্তৃক সন্তান হরণ—জর্ম্মণির হঙ্গেরী নগরে এক ঈগলপক্ষী ৩ বৎসরের একটী বালককে পিতামাতার সম্মুখ হইতে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে !!

মণিপুর সংবাদ—মহারাজা অমাত্য ও কয়েকটী ভ্রাতার সহিত ইতিপূর্ব্বে ধরা পড়িয়াছিলেন। যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ মণিপুর হইতে অল্পদূরে ছদ্মবেশে লুকাইয়া ছিলেন, ২ জন পুলিস কর্ম্মচারী দ্বারা ধৃত হইয়াছেন। একজনের সহিত তাঁহার মল্লযুদ্ধ হইতেছিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া পড়াতে তিনি পরাস্ত হইলেন। মণিপুরে এক সৈনিক কমিসন দ্বারা বিদ্রোহীদিগের বিচার হইতেছে।

বিধবা বিবাহ—পুনার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ভাণ্ডারকারের বিধবা কন্যার বিবাহ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যাটী ১০ বৎসরে প্রথম বিবাহিত হইয়া ১৩ বৎসরে বিধবা হন, এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ২০ বৎসর। ভাণ্ডারকারকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য এক সভা হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহের সপক্ষ সংখ্যা অধিক হওয়াতে বিপক্ষেরা বিফলমনোরথ হইয়াছেন।

মুসলমান স্ত্রী ডাক্তার—ক্রিমিয়ার কোন মুসলমান রমণী ওডেসা নগরে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ডাক্তার হইয়াছেন। মুসলমান সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত এই প্রথম।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরনারী—আমেরিকার কোন পত্র সম্পাদক বর্ত্তমান সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ও রমণীর নাম এইরূপ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং উত্তরদাতাকে পুরস্কার দিয়াছেনঃ—

রাজনীতিজ্ঞ—গ্লাডষ্টোন, সেনাপতি—কাউণ্ট ভন মোলটকী (সম্প্রতি মৃত) উপন্যাসলেখক—রবার্ট ষ্টিভেনসন, কবি—লর্ড টেনিসন, চিত্রকর—মিসনিয়ার, অভিনেতা—মেঃ আরভিং, গায়িকা—এডেলিনা পেটি, আইন ব্যবসায়ী—সার চার্লস রসেল, ইতিহাস লেখক—ই এ ফ্রিম্যান, বৈজ্ঞানিক—টিণ্ডাল, চিকিৎসক—ডাক্তার পাসটিউর, সঙ্গীত রচয়িতা—ভার্ডি, ইঞ্জিনিয়ার এফ ডি লিসেপ্স, আবিষ্কারক—এডিসন।

নারীচরিত।

ম্যাডাম ব্লাভ্যাস্কি।

হেলেনা পেট্রোভ্না ব্লাভ্যাস্কি দক্ষিণ রুশিয়ার একটারিণোসলে নামক স্থানে ১৮৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মেকলেন রবার নামক কোন ভদ্রবংশ রুশিয়ায় আসিয়া বাস করেন। ইহাঁর পিতা কর্ণেল পিটর হান এই বংশোদ্ভব। কিন্তু তাঁহার বাল্যকালের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে আমরা কিছু অবগত নহি। কন্যার যেরূপ অসামান্য মনস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তা, তাহাতে পিতা বাল্যকালে তাহাকে যে কিছুমাত্র শিক্ষা দেন নাই, তাহা বোধ হয় না। হেলেনা পেট্রোভনা হানের বয়ঃক্রম যখন ১৭ বৎসর, তখন কর্ণেল ব্লাভ্যাস্কির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পাত্রের বয়স ৬০ বৎসর। এরূপ অসদৃশ বিবাহ আমাদের দেশে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রায় হয় না। যাহাহউক প্রজাপতি দম্পতিকে সুখী করিলেন না। অচিরে অর্থাৎ মাস কয়েক পরে ইহাঁদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। উভয়েই উভয়ের নিকট জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিবী ব্লাভ্যাস্কি পিতৃগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বিদেশ ভ্রমণেচ্ছা ইহাঁর অন্তরে অত্যন্ত বলবতী ছিল। এই অল্প বয়সেই তুরস্ক, মিশর, গ্রীস এবং য়ুরোপের পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৮৫১ সালে ইনি ক্যানেডায় যাত্রা করেন। ইহার পর ঐন্দ্রজালিক ভুডুদিগের আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবার জন্য যুক্তরাজ্যের নিউ অর্লিন্সে গমন করেন। তদনন্তর টেক্সাস দিয়া মেক্‌সিকোতে যান। মেক্‌সিকো হইতে উত্তমাশার জলপথ দিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। নেপাল দিয়া তিনি তিব্বতে যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন নাই। মান্দ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রধান নগর পরিদর্শন করিয়া যাবা ও সিঙ্গাপুর হইয়া য়ুরোপে প্রত্যাগমন করেন। তথায় দীর্ঘকাল না থাকিয়া দুই বৎসরকাল ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে অবস্থিতি করেন। ১৮৫৫ সালে ভরেতবর্ষে পুনরায় আগমন করেন। চারিজন সঙ্গী সমভিব্যহারে কাশ্মীর সীমান্ত দেশ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে গমন করিবার জন্য পুনরুদ্যম করেন। তিনি ছদ্মবেশে পৌছিলেন, কিন্তু সঙ্গীগণ কেহ পৌছিতে সক্ষম হইল না। তথায় অনেক যোগী ঋষি মহাত্মা সাধু ও সিদ্ধ পুরুষদিগকে দর্শন করিয়া পরম সুখিনী হইলেন এবং যোগাদি বহু দুরূহ আধ্যাত্মিক বিষয়, শিক্ষা করিলেন। শুনা যায় এই স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি বালুকাময় মরুভূমে পথহারা হন, একদল অশ্বারোহী দয়া করিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষের

সীমা পর্য্যন্ত রাখিয়া যান। সিপাহী বিদ্রোহে দেশ ওতপ্রোত হইলে, ম্যাডাম্ ব্লাভ্যাস্কি য়ুরোপে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে ইংলণ্ডে ও জর্ম্মণিতে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া রুষিয়ায় পুনরাগমন করেন। ১৮৫৮ সালে ককেশসের পার্ব্বত্য দেশে অশ্বারোহণে পর্য্যটন করিতে করিতে অকস্মাৎ ভূতলশায়িনী হন। ইহাতে মেরুদণ্ডে বিলক্ষণ আঘাত লাগে। কথিত আছে যে, এই দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। আরোগ্য লাভ করিয়া য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করেন। একদা সমুদ্র পথে ভ্রমণ কালে অর্ণবযানে অগ্নি লাগিয়া সকলে বিনষ্ট হয়, কেবল তিনি আর দুই এক জন লোক রক্ষা পান। অতঃপর প্রেত তত্ত্বানুসন্ধানে সমুৎসুক হইয়া কেরো নগরে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে সে সভার সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। ১৮৭৩ সালে আমেরিকায় পুনরায় গমন করেন। ছয়বৎসর কাল প্রধানতঃ নিউইয়র্ক নগরে বাস করেন এবং অধিকাংশ সময় প্রেততত্ত্ব অনুসন্ধানে ক্ষেপণ করেন। ১৮৭৫ সালে কর্ণেল অলকটের সহিত তাঁহার মিলন হয়। থিয়সফিকেল সোসাইটী সংস্থাপন এই সম্মিলনের ফল। ১৮৭৯ সালে উহাঁরা দুইজনে ভারতবর্ষে আগমন করতঃ মান্দ্রাজে এক সভা সংস্থাপন করিয়া উহাকে প্রধান বলিয়া গণ্য করেন এবং অন্য স্থানের সভাগুলিকে তাহার শাখায় পরিণত করেন এই সভা দ্বারা বিশেষ মঙ্গলকর কার্য্য সকল সাধিত হইতেছে। এই সভার ৩টী প্রধান উদ্দেশ্য :—

(১) পৃথিবীর সকল জাতীর লোককে এক ভ্রাতৃসূত্রে বদ্ধ করা।

(২) হিন্দুশাস্ত্র এবং পূর্ব্ব দেশীয় অন্যান্য শাস্ত্রের প্রচার।

(৩) প্রকৃতির অজ্ঞাত শক্তি সকলের আবিষ্কার ও স্ফুরণ।

যাঁহারা জানেন না বা জানিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা অবশ্য সভাকে ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা জানেন বা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, ইহার উদ্দেশ্য মধ্যে ঘৃণা করিবার কিছুই নাই, প্রত্যুত ভাল বাসিবার অনেক আছে। ইহাতে কোনও রূপ সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। সকল সম্প্রদায়ের ও সর্ব্বপ্রকার মতাবলম্বিগণ এই সভাভুক্ত হইতে পারেন। সে যাহা হউক তদ্বিষয় আমাদিগের আলোচ্য নহে। ১৮৮৭ সাল হইতে ম্যাডাম ব্লাভ্যাস্কি মহানগরী লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন। তথায় থাকিয়া লুসিফার নাম্নী পত্রিকার প্রচারারম্ভ করেন। অতঃপর সুবিখ্যাত নাস্তিকাগ্রগণ্যা বিবি আনি বেসাণ্টকে থিওজফি মতে দীক্ষিত করেন। এই বিদুষী যুবতী উহাঁর সভার সভ্য হইয়া লুসিফার পত্রি-

কার সম্পাদন কর্য্যে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিতে থাকেন। ১৮৭৫ সালে Isis Unveiled'নামক বৃহৎ দুইখণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। ১৮৮৮ সালে "The secret Doctrine, the Synthesis of science, Religion and Philosophy এবং ১৮৮৯ "The Key to Theosophy" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া জগৎকে চৎকৃত করিয়াছে। এ সমস্ত গ্রন্থ যে সে গ্রন্থ নহে। এই সমস্ত পুস্তকে কি আধ্যাত্মিকতা, কি তত্ত্ববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান যাবতীয় দুরূহ বিষয়ের গবেষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। পুস্তকগুলিতে রচয়িত্রীর হৃদয় ও মনের অলৌকিকী শক্তি প্রতিফলিত হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ভিন্ন অপর কেহ ইহাদের কঠিন ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম নহেন।

"থিয়সফিষ্ট" নামে পত্রিকা পাঠে আমরা অবগত ছিলাম যে, ব্লাভাস্কি বহু দিবসাবধি রোগ ভোগ করিতেছিলেন। কখনও ভাল থাকিতেন, কখনও বা আবার অসুস্থ হইতেন। আমেরিকাস্থশাখা সভার উৎসব উপলক্ষে ইনি আহূত হন, কিন্তু পীড়া নিবন্ধন স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে না পারাতে একখানি খেদসূচক পত্র লেখেন এবং তাঁহার শিষ্যা আনিবেজাণ্টকে তথায় পাঠাইয়া দেন। বিলাতে এক্ষণে বিষম শ্লৈষ্মিক পীড়া (সচরাচর যাহাকে ইনফ্লুএঞ্জা বলে) হইতেছে। ইহাঁরও এই পীড়া হয়। গত ৮ই মে তারিখে ১৯ সংখ্যক এভেনিউ রোড, রিজেণ্ট পার্কস্থ সভার কার্য্যালয়ে ইহাঁর মৃত্যু হয়। পৃথিবীর নানা স্থানের সহৃদয় লোকগণ আজ ইহার শোকে বিহ্বল, অনেক সম্বাদ পত্র খেদোক্তিতে পরিপূর্ণ। ইহাঁর ইচ্ছানুসারে মৃতদেহ উকিং সমাধি ক্ষেত্রে দাহ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে তাঁহার অনেক বন্ধু ও মতাবলম্বীগণ এবং কতকগুলি ভারতবাসী তথায় উপস্থিত ছিলেন। সুহৃদ্‌বর্গ তাঁহার দেহের পবিত্র ভস্মাবশেষ স্ব স্ব গৃহে আনয়ন করিয়া সংরক্ষণ করিয়াছেন। ম্যাডাম ব্লাভ্যাস্কির ধর্ম্মমত ও কার্য্য প্রণালী যেরূপ হউক, তিনি একজন ভারতের পরম হিতৈষিণী ও গৌরববর্দ্ধিনী রমণী বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

উড়িষ্যার করণ জাতি।

বাঙ্গালার কায়স্থ এবং উড়িষ্যার করণে অনেক সৌসাদৃশ্য। পুরাণেতে কায়স্থ এবং করণ এক বলিয়াই উক্ত হইয়াছে; তাহা ছাড়া সাধারণতঃ পদমর্য্যাদা এবং জাত্যভিমানের হিসাবেও উভয়ের মধ্যে অনেক মিল। ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বকালে

কাহারও চাকুরী করিতেন না, কায়স্থ এবং করণেরা সমুদায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং বাঙ্গালায় ও উড়িষ্যায় এই উভয় জাতিই মসীজীবী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁরা রাজপ্রসাদে বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়া পদগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের অন্নদাতা এবং আশীর্ব্বাদগৃহীতা হইয়াছেন। কিন্তু এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মোত্তর এবং যজন যাজন কার্য্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া কায়স্থদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া অনেকে যেমন খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, উড়িষ্যায় সেরূপ দৃষ্টান্ত নাই। উড়িষ্যার ব্রাহ্মণদিগের অবস্থার কথা বারান্তরে বলিব। এবারে আনুসঙ্গিক ভাবে এই কথাটি বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাইলাম যে সম্পত্তিশালী বলিয়া ক্ষত্রিয় রাজাদিগের পরে করণ জাতিই উড়িষ্যায় পদস্থ ও গণ্যমান্য।

যাহারা পদস্থ, তাহারা সকলেরই অনুকরণের স্থল; ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতি অজ্ঞাতভাবে তাহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতির বিশেষরূপে অনুকরণ করিয়াছে। সুতরাং করণ জাতির সামাজিক রীতি নীতির পরিচয় দিলে প্রায় সমগ্র উৎকলের সামাজিক অবস্থার ছবি চিত্রিত করা হয়। অতএব আশা করি এ সকল কথা জানিতে বাঙ্গালার পাঠিকাদিগের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে।

প্রথমতঃ করণদিগের বিবাহ প্রথার কথা বলিব। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে স্মৃতির ব্যবস্থা অনুসারে বালবিবাহ অথবা বালিকা কন্যাদান প্রথা প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণে এই প্রথা স্বীয় সমাজ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু উড়িষ্যার করণদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। ক্ষত্রিয়দিগের মত বয়ঃপ্রাপ্তা না হইলে করণকুমারী বিবাহিতা হইতে পারেন না। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের নিম্নে কোন করণ বালিকা বিবাহিতা হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যদিও এদেশের ব্রাহ্মণ এবং অন্য কোন কোন জাতির মধ্যে শিশুবিবাহ প্রচলিত আছে, তথাপি বয়ঃপ্রাপ্তা না হইলে কোন বর্ণের কন্যারাই স্বামিগৃহে যাইতে অথবা স্বামি সন্দর্শন লাভ করিতে পারেন না। এসকল নিয়ম সম্বন্ধে বাঙ্গালার মত উচ্ছৃঙ্খল দেশ আর দেখি নাই।

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীশিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশে যত আপত্তি, উড়িষ্যায় তাহার অর্দ্ধেকও দেখিতে পাই না। শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ দেখিলে প্রতীত হইবে যে লোক সংখ্যার হিসাবে উড়িষ্যায় যত বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, বাঙ্গালায় তাহার অর্দ্ধেকও নহে।

আবার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা করণ-দিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা একটু অধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মার্জ্জিত রুচি নয় বলিয়া করণ বালিকাগণ অতিশয় কদর্য্য অশ্লীল প্রাচীন কবিতা মুখস্থ করিয়া গান করিতে শিক্ষা করে। এই শ্রেণীর গান যে বালিকার যত অভ্যস্ত, সমাজে তাহার তত প্রতিষ্ঠা। এই প্রকার বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত ইহারা অনেকে অবিবাহিতা অবস্থায় চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করিয়া থাকে। এস্থলেও রুচির দোষে ইহাদিগের দ্বারা যে সকল ছবি চিত্রিত হয়, তাহা সময়ে সময়ে অতীব ঘৃণাজনক। অভিভাবকদিগের রুচি মার্জ্জিত হইলে অভ্যস্ত বিদ্যা সুফল-প্রসবিনী হইতে পারে। এতৎপ্রসঙ্গে করণ বালিকাদিগের আর একটি কৌতুকজনক শিক্ষার কথা উল্লেখ করিতেছি। বিবাহের বহুদিন পূর্ব্ব হইতে বালিকাদিগকে কতকগুলি পয়ার মুখস্থ করাণ হয়; এই সকল পয়ারে বালিকা কিরূপে দুঃখ প্রকাশ করিয়া আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া শ্বশুর গৃহে যাই-তেছে, তাহা বর্ণিত থাকে। চোখে জল আসুক আর নাই আসুক, কান্নার সুরে সেই পয়ারগুলি আবৃত্তি করিয়া বালিকাকে স্বামিগৃহে যাইবার পূর্ব্বে স্বগৃহে এবং প্রতিবাসীদিগের গৃহে প্রতি জনের নিকটে বিদায় লইতে হয়। কান্না কখনও এত হাস্যপ্রদ এবং অস্বা-ভাবিক মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয় যে অন্য কোন দেশে সেরূপ দেখা যায় না। কেবল এই কান্নার বিষয়েই নহে; আরও অনেক সামাজিক ব্যবহার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, করণ সমাজ অনেক নিয়মের কারাগারে পড়িয়া বড় অস্বা-ভাবিক ভাব ধারণ করিতেছে।

তৃতীয়তঃ সামাজিক সৌজন্য ও মেলা-মেশা। বাঙ্গালার তুলনায় উড়িষ্যায় সামাজিক সৌজন্য ও মেলামেশা বড় কম। উড়িষ্যায় আসিবার পূর্ব্বে জগ-ন্নাথ যাত্রীদিগের মুখে অবগত হইয়া-ছিলাম যে, অতিথি সৎকার করিবার প্রথা উড়িষ্যায় আদৌ নাই; এমন কি, একজন লোক কাহারও বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলে, বসিবার জন্য একখানা জীর্ণ মাদুরও দেয় না। যখন একথা শুনিয়াছিলাম, তখন কলি-কাতার কেবল উড়িয়া বেহারা দেখিয়া বিশ্বাস ছিল, যে উৎকল বাহকপরিপ্লুত, সুতরাং এরূপ অবস্থা বিস্ময়কর নহে। কিন্তু এখন যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে উৎকলের অবস্থা সেরূপ হীন নহে, তখন জাতীয় সৌজন্য ও সামাজিকতার কিছু অভাব আছে বলিয়াই বোধ হয়। পল্লীগ্রামে যেরূপ প্রণালীতে গৃহস্থেরা গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহাতে কোন অপরিচিত অতিথি যে কাহারও গৃহে আশ্রয় পাইবে সে সুবিধাই থাকে না। উড়িষ্যার উপহার দিবার অর্থ, ব্যবসা করিয়া কিছু লাভ করা। কেহ যদি কাহারও

বাড়ীতে কিছু মিষ্টান্ন, ফলমূল বা অন্য কিছু উপহার পাঠাইল, তবে এই বুঝিতে হইবে যে উক্ত ব্যক্তি তৎবিনিময়ে কিছু অর্থের প্রার্থী। বিক্রয় করিলে যাহা পাওয়া যায়, উপঢৌকন দিলে তদপেক্ষা কিছু বেশী মিলে। কেহ মনে করিবেন না যে এ কথাটা কেবল সাধারণ লোকের পক্ষেই প্রযুজ্য, বড় লোকের মধ্যেও এইরূপ প্রথা। কাহারও বিবাহ উপলক্ষে একজন কাহাকে দশটি টাকা কিম্বা কাপড় পাঠাইলেন। তৎবিনিময়ে তাঁহাকে বিংশ মুদ্রা বা দ্বিগুণ মূল্যের আর একখানি কাপড় ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে। এই ভীষণ বিনিময় সামাজিকতার ভয়ে, মধ্য অবস্থার লোকেরা কোন কর্ম্ম উপলক্ষে বড়লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে না।

বেশভূষা। উড়িষ্যার বিশেষতঃ করণ জাতির বেশভূষার বর্ণনা করিতে গেলে, স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়। বারান্তরে সে বিষয়ের বর্ণনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

উপসংহারে একটি অবান্তর কথা লিখিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিব। সাধারণতঃ বঙ্গদেশে অনেকের সংস্কার আছে যে, উড়িষ্যায় বিধবা ভ্রাতৃবধূর পাণিগ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে। প্রকৃত পক্ষে এ প্রথা অতি নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যেই কখন কখন দৃষ্ট হয় এইমাত্র। যে জাতির মধ্যে এপ্রথা প্রচলিত, তাহারা মূলতঃ অনার্য্য জাতি। ইহাদিগের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। কেবল যে দেবর ভ্রাতৃবধূ বিবাহ করিবেন, এরূপ একটি বিশেষ বাঁধা নিয়ম নাই। তবে উপযুক্ত দেবর থাকিতে বিধবার পক্ষে অন্য বিবাহ অপেক্ষা দেবর বিবাহই প্রশস্ত। কিন্তু পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি আর্য্য উচ্চ শ্রেণীস্থ জাতির মধ্যে এ প্রথার লেশ মাত্রও নাই।

বিমাতা।

আমরা উপন্যাসে, প্রবচনে ও পুরাণে যে সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতার দ্বেষের কথা শুনিয়া থাকি, তাহা সময় সময় আমাদের প্রত্যক্ষও হইয়া থাকে। অতি পুরাকাল হইতে আমাদের দেশে পুরুষদিগের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত, এখনও উহা নিতান্ত দুর্লভ হইয়া পড়ে নাই। পূর্ব্বকালে রাজাদিগের মধ্যে এই বহুবিবাহ খুব গৌরবের বিষয় ছিল। ইহার প্রধান কারণ বহু পুত্র লাভ, দ্বিতীয় কারণ রাজাদিগের বিলাসিতা। যাহা হউক এই বহু বিবাহে বহু সন্তান উৎপত্তি হইলেও পুরুষের পক্ষপাতিত্ব ও স্ত্রৈণতা দোষে সুখের সংসার নরকে পরিণত হয়। কারণ যদি কোন রাজার দশটি মহিষী থাকে, তাহার মধ্যে

এক জনের প্রতি অধিক অনুরাগ সপত্নীদিগের মধ্যে দ্বেষানল উৎপাদন করে, কিম্বা ঐ সপত্নীগণের মধ্যে একজন বন্ধ্যা, অপরা পুত্রবতী হইলে কলহের সূত্রপাত হয়, অথবা রাজা প্রিয়তমা মহিষীর গর্ভজ পুত্রকে রাজ্য দিয়া প্রকৃত রাজ্যাধিকারী জ্যেষ্ঠ রাজ-কুমারকে তাঁহার স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত করিয়া সেই কুমারের ও তাহার মাতার মনে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করেন। এই বিদ্বেষাগুন অল্পে প্রশমিত হয় না, ইহা রাজ্য, সাম্রাজ্য, ধন প্রাণ পর্য্যন্ত ছারখার করে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বিমাতাকে রাক্ষসী অথবা নিষ্ঠুরা বলিতে পারি না। যদি সপত্নী-পুত্রের উপর বিমাতার বিদ্বেষ থাকে, তবে তাহার কারণ ঐ সপত্নী-তনয়ের পিতা ও গর্ভধারিণী মাতা। বাস্তবিক রমণী-হৃদয় শিশু সন্তানের উপর বিরূপ হয় না, ভগবান রামচন্দ্রের অভিষেক সংবাদে কৈকেয়ী আহ্লাদে কণ্ঠহার মন্থরাকে প্রদান করিয়াছিলেন। চণ্ডের বিমাতা চণ্ডকে বিবাসিত করিয়া বিপদের সময় চণ্ডের জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন। কুন্তীদেবী সপত্নী-তনয় সহদেবকে গর্ভজ পুত্রগণ অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন; তদ্ভিন্ন সপত্নীর অবর্ত্তমানে তৎপুত্রকে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ যত্ন করিতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। স্ত্রীলোকের হৃদয় অতীব কোমল, ইহা সামান্য কারণে ঈর্ষ্যানলে প্রজ্বলিত হয়, আবার সামান্য ঘটনায় নবনীতের ন্যায় গলিয়া যায়। যদি কোন শিশু সন্তানের ভার একটী নিঃসম্পর্কীয়া স্ত্রীর হাতেও ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী হৃদয় ভাণ্ডারের সঞ্চিত অপত্য-স্নেহ ঐ শিশুকে না দিয়া থাকিতে পারে না, বিমাতা ত পিতার স্ত্রী। পিতৃমাতৃহীন সপত্নীপুত্রের ম্লান মুখ দেখিলে যাঁহার হৃদয়ে অপত্যস্নেহের সঞ্চার না হয়, আমরা তাঁহাকে রাক্ষসী অপেক্ষাও ঘৃণিত নামে অভিহিতা করিতে কুণ্ঠিত হই না। আমরা আজ একটী বিদ্বেষভাবাপন্না ক্রোধনস্বভাবা বিমাতার অসামান্য স্নেহে বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

হারকুলভূষণ বুধসিংহ সম্রাট্ আরঙ্গ-জীবের সময় বুন্দির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি তৎকালে রাজস্থানের মধ্যে প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ও রণকুশল নৃপতি ছিলেন। ইঁহারই বাহুবলে শা আলম প্রতি-যোগী ভ্রাতৃগণের উপর জয়লাভ করিয়া দিল্লির সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুধসিংহের গুণগ্রামে মোহিত হইয়া অম্বর রাজকুমারী সম্রাটের সিংহাসন তুচ্ছ করিয়া ইহাঁকে পতিত্বে বরণ করেন। বুধ সিংহ তাঁহার অন্যান্য মহিষীগণ অপেক্ষা অম্বর রাজকুমারীকে সমধিক যত্ন ও সম্মাননা করিতেন। এই কুশা-বহ কুমারী বন্ধ্যা, বুধসিংহের অন্য মহিষী বৈশু-রাজকুমারীর গর্ভে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হয়। সপত্নীকে পুত্রবতী দেখিয়া কুশাবহ কুমারী ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে

লাগিলেন। অবশেষে তিনি একটী ঘৃণিত উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এই সময় তাঁহার স্বামী উপস্থিত ছিলেন না। এই ঘৃণিত উপায়—তিনি নিজকে গর্ভবতী বলিয়া প্রকাশ করিলেন, এবং যথাসময়ে একটী পুত্র সন্তান সংগ্রহ করিয়া রাজ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরে বুধসিংহ নিজ সুহৃদ ও বন্ধু জয়সিংহের সহিত মোগল শিবির হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়াই কুশাবহ কুমারীর দুরাচরণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা জয়সিংহকে বলিলেন। জয়সিংহ লজ্জিত হইয়া সহোদরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগিনি! তোমার সম্বন্ধে একি শুনিতে পাইতেছি?" অম্বরাধিপের মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইবামাত্র বুন্দিরাজ মহিষী একেবারে ক্রোধোন্মত্তা হইয়া কপালমালিনী উগ্রচণ্ডার ন্যায় স্বীয় ভ্রাতার কটি হইতে তাড়িত বেগে অসি উন্মোচন পূর্ব্বক "কর্জ্জিকা বাচ্ছা" বলিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। অম্বররাজ যদিও রাজপুত বীর, মোগল সম্রাটের প্রধান সেনাপতি এবং শত শত যুদ্ধে সহস্র সহস্র কামানের বজ্রনাদকে তুচ্ছ করিয়া কত শত বীর-কেশরীর শিরশ্ছেদন করিয়াছেন, কিন্তু নিজ ভগ্নীর সর্ব্বসংহারিকা মূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে জড়ীভূত হইয়া অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। ইহাতেও অম্বর-রাজকুমারীর ক্রোধের শান্তি হইল না, তিনি প্রাণাধিক পরমারাধ্য পতিকে স্বহস্তে বিনাশ করা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া বুধ সিংহকে কিছু না বলিয়া তৎসাক্ষাতে বুন্দি ত্যাগপূর্ব্বক বিনোদীর নগরের এক দেবালয়ে সন্ন্যাসিনী ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইনি ঈর্ষা ও ক্রোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিলেন।

এদিকে অম্বরাধিপ ভগ্নীর নিকট অবমানিত হইয়া নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় বুধসিংহের সর্ব্বনাশের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তিনি বুন্দির প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগকে প্রলোভন দ্বারা বুধসিংহের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে ধর্ম্মের ও বিশ্বাসের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ক্রূরমতি অম্বররাজ বুন্দিরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া স্বভবনে বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং করবার সর্দ্দার দলিলসিংহকে বুন্দির সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। বুধসিংহ বীর, কিন্তু তিনি জয়সিংহের শঠতাজালে আবদ্ধ হইয়া বীরোচিত কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলেন। তিনি কি করিবেন তাঁহার সহিত কতিপয় হারবীর মাত্র, সম্মুখে বিশ্বাসঘাতক সর্দ্দার গণ শত্রুর চক্রে প্রভুর সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজলক্ষ্মীকে হস্তগত করিয়াছে, পশ্চাতে অম্বররাজের বিশাল সেনাব্যূহ তাঁহাকে তাড়না করিতেছে। বাধ্য হইয়া তিনি তাঁহার অজ্ঞাত স

শ্বশুর বৈগুরাজের নিকট পুত্র দুইটাকে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং তথায় দুঃখে অপমানে নিরাশার তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ক্রূরমতি জয়সিংহের ইহাতেও ভগ্নীকৃত অপমানের প্রতিশোধ পিপাসার তৃপ্তিবিধান হইল না। মিবারাধিপ রাণাকে অনুরোধ করিয়া বৈগুজনপদ বুধসিংহের শিশু তনয়দ্বয়ের মাতামহের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। বৈগু তখন মিবারের অধীন, কাজেই বৈগুপতি রাণাকর্তৃক স্বস্থানচ্যুত হইলেন; এদিকে বুধসিংহের জনৈক বিশ্বস্ত সর্দ্দার শিশুতনয় দুটীকে লইয়া পুচাইলের গিরিগুহার বিজন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কালের কি বিচিত্র গতি!! মানব! অনিত্য সংসারে সুখদুঃখ কয় দিনের জন্য! যে বুধসিংহের বাহুবলে একদা ভারত সিংহাসন নিরাপদ হইয়াছিল, যিনি রাজস্থান মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন, তিনিই সময়ে প্রতিকূল স্রোতে ভাসিয়া বিদেশে নিতান্ত দীনের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার বংশধর সুকুমার উমেদ সিংহ ও দীপ সিংহ কোথায় সুখের ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া প্রতিপালিত হইবেন, তাহা না হইয়া আজ তাঁহারা মনুষ্যের আবাস স্থলেও একটু স্থান পাইলেন না—আজ তাঁহারা রাজপুত্র হইয়া সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতির বিচরণ স্থলে আশ্রয় লইয়া বন্য পশুর ন্যায় শত্রুপীড়নে বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। যখন বুধসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র হারকুল গৌরব উমেদ ত্রয়োদশ বর্ষে পদাপণ করিয়াছেন মাত্র, তখন তিনি নির্জ্জন গিরিনিলয়ে থাকিয়া শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার পিতার ভীষণ শত্রু ও তাঁহাদের রাজ্যচ্যুতকারী অম্বরাধিপ জয়সিংহ মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরী সিংহ অম্বরের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছেন, আর তাহার বৈমাত্র ভ্রাতা মধুসিংহ স্বীয় মাতুল মিবারপতি রাণার উত্তেজনায় ও কতিপয় সর্দ্দারের উৎসাহে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কবিতেছেন। জয়সিংহ যদিও সুচতুর ও রাজনীতিজ্ঞ রাজা ছিলেন, তত্রাপি তিনি যে সাপত্ন্য দ্বেষ ছিদ্র পাইয়া বুন্দি রাজ্যের উপযুক্ত রাজা বুধসিংহকে ছারেখারে দিলেন, সেই সাপত্ন্য দ্বেষানল যে তাঁহার নিজ গৃহে প্রজ্বলিত হইবে, তাহা তিনি আদৌ বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু স্বভাবতঃ তাঁহার বুঝিবার কথা, কারণ রাণা প্রতাপ সিংহের পর হইতে শিশোদীয় কুলের কন্যা যখন অন্য রাজপুতের হস্তে অর্পিত হইত, তখন তাহাদের মধ্যে একটী সত্যবন্ধন হইত, তাহা এই —"শিশোদীয় কুলের কন্যার গর্ভে পুত্র সন্তান হইলে সে অন্যান্য মহিষীগর্ভজ পুত্রের কনিষ্ঠ হইলেও রাজ্য প্রাপ্ত হইবে আর কন্যা সন্তান

হইলে তাহাকে কথনই মোগলের করে অর্পণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু এস্থলে মধুসিংহ কনিষ্ঠ হইলেও শিশোদীয় কুলের দৌহিত্র, অপর দিকে ঈশ্বরী সিংহ জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তাহাঁর জ্যেষ্ঠ স্বত্ব। এ অবস্থায় জয়সিংহ যে তাহাঁর রাজ্যের শান্তির উপায় আপনার মৃত্যুর পূর্ব্বে করেন নাই ইহা তাহাঁর ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ রাজার কম ভ্রমের কথা নয়। বীর বালক উমেদ অম্বররাজের এই গৃহছিদ্রের সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না। উমেদের সহায় ও অর্থবল কিছুই ছিল না, বিশেষতঃ তিনি বুন্দি রাজ্যের সমস্ত সর্দ্দার ও সেনাবল সংগ্রহ করিতে পারিলেও অম্বরের বিশাল অনীকিনীর নিকট সামান্য। কিন্তু উমেদ বুধসিংহের উপযুক্ত পুত্র—চৌহান কুলগৌরব পৃথ্বীর উপযুক্ত বংশধর। বীর বালক উমেদ সেই নির্জ্জন গিরি কাননে হারকুলের বিশাল বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া স্বীয় সৈন্য সামন্তদিগকে একত্র করিয়া ক্রমান্বয়ে হ্রদ দুর্গ সকল উদ্ধার করিতে লাগিলেন। বীর বালকের জলন্ত উৎসাহে চারিদিক হইতে বুন্দি সর্দ্দারগণ তাঁহার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল। উমেদের অল্প সংখ্যক সৈন্যগণের নিকট অম্বরের সুশিক্ষিত বিশাল সৈন্যদল কতবার পরাজিত ও নিগৃহীত হইতে লাগিল—এমন কি এই বীর বালকের নিকোষিত অসিবলে কত অনেক সুনামী গোলন্দাজ প্রাণ হারাইতে লাগিলেন—তাঁহার ভীষণ শূলদণ্ডে কত অম্বর সেনানীর মস্তক গুম্ফিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতিশোধ-পিপাসা এত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি ভগবতী আশাপূর্ণার সম্মুখে শপথ করিলেন যে "মাতঃ! তোমার আশীর্ব্বাদে হয় পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিব, নয় স্বশোণিতে তোমার খর্পর পূর্ণ করিব।" কিন্তু তাঁহার সহায় বল অম্বর সৈন্যের তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও হয়—বিশাল অম্বর সৈন্য সমুদ্রের নিকট তাঁহার সৈন্যদল গোষ্পদের ন্যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যতই যুদ্ধজয় করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার সেনাবল ক্ষয় হইতে লাগিল—এমন কি তিনি দলযুদ্ধ ত্যাগ করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও লুণ্ঠন কার্য্যে বাধ্য হইলেন। একদা লুণ্ঠন ব্যাপারে বহির্গত হইয়া উমেদ স্বদলে বিনোদীয় নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। উক্ত নগরে হারকুলের সর্ব্বনাশের মূলীভূতা তাঁহার বিমাতা অম্বররাজকুমারী বাস করিতেছিলেন শুনিয়া তিনি বিমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজ্যচ্যুত সপত্নী তনয়কে দেখিয়া রাজ্ঞীর অনুতাপানল দ্বিগুণবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, একমাত্র তাঁহারই দুরাচরণে যে বীর বালক উমেদ রাজ্যভ্রষ্ট ও নির্ব্বাসিত, এই চিন্তা সহস্র সহস্র বৃশ্চিকের ন্যায় তাঁহার হৃদয় দংশন করিতে লাগিল এবং নিজ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্যায় ব্যবহার স্মরণ করিয়া

তিনি ক্রোধে অধীরা হইয়া উঠিলেন। ইহার প্রতিশোধের বিষয় মুহূর্ত্তে মধ্যে মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন। কচ্ছাবহ কুমারী এখন আর উমেদের ঈর্ষাপরায়ণা বিমাতা রহিলেন না, এখন তিনি উমেদের কুশলাকাঙ্ক্ষিণী স্নেহময়ী জননী, বাঁধ ভাঙ্গিয়া এখন তাঁহার স্নেহস্রোত প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি একেবারে উমেদকে ক্রোড়ে লইয়া সজলনেত্রে বলিলেন "বৎস! এই হতভাগিনীই তোমার সকল কষ্টের কারণ, আমাহইতেই তুমি দীন দশায় পতিত হইয়াছ। বাছা! যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তোমার আর কষ্ট পাইতে হইবেক না, তোমার যে বিমাতা হইতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছ, তাহা হইতেই তুমি পুনঃ বুন্দি সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে। তুমি এখন আর আমার সপত্নীতনয় নও, এখন তুমি আমার হৃদয়ের ধন, স্নেহের ভাণ্ডার, বুন্দিরাজ উমেদ।"

বুন্দিমহিষী আর এখন দেবালয়ের সন্ন্যাসিনী রহিলেন না। তিনি এখন আবার সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পুত্রের রাজ্যোদ্ধারে যত্নবতী হইলেন। এখন তিনি উমেদকে উপস্থিত মত পরামর্শ দিয়া যথাসাধ্য সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিলেন এবং কতিপয় বিশ্বস্ত ও বলিষ্ঠ হারসৈন্য সঙ্গে লইয়া একেবারে দক্ষিণ দেশাভিমুখে গমন করিলেন; স্বল্প দিনে তিনি নর্ম্মদা তীরে উপনীত হইয়া পরপারে যাইতে উদ্যোগী হইলে তাঁহার লোকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি একটি স্মারক স্তম্ভের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "মহিষি! আপনাদের নর্ম্মদা পার হইতে নিষেধ আছে, এই দেখুন এই স্তম্ভ সমস্ত রাজপুতের আটক হইয়া রহিয়াছে।" ইহা শুনিবামাত্র বুধ সিংহের বিধবা মহিষী প্রকৃত রাজপুত-নারীর ন্যায় সেই স্তম্ভস্থ শিলা শাসনখানিকে স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া নর্ম্মদা জলে নিক্ষেপ করিলেন এবং সত্বর নর্ম্মদা পার হইয়া একেবারে ইন্দোর রাজ্যের সীমায় গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। উক্ত রাজ্য তৎকালে বিখ্যাত মার্হাট্টা মূলহর রাউ হলকারের অধীন। হলকার নিকৃষ্ট ছাগপালের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় অতি উচ্চ ছিল এবং তিনি উচ্চ গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন, নতুবা তিনি সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সেরূপ প্রতিষ্ঠা, প্রভুত্ব ও রাজ্যলাভ করিতে পারিবেন কেন? হলকার নিজে বীরকুলের সম্মান করিতে জানিতেন। তিনি যখন জানিলেন যে বীরশ্রেষ্ঠ বুধসিংহের বীরাঙ্গনা পত্নী, বিখ্যাতনামা জয়সিংহের ভগিনী দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার রাজ্যে অভ্যাগতা হইয়াছেন, তখন তিনি অবিলম্বে রাজমহিষীর শিবিরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্র বচনে বলিলেন "আপনি বীরপূজ্য

চৌহানকুলের রাজমহিষী, জগন্মান্য কুশাবহ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আপনি আমাদের পূজনীয়া, আমাকে অন্য জ্ঞান করিবেন না। আজ হইতে আমাকে সহোদর ভ্রাতা বলিয়া জানিবেন। আমাদ্বারা আপনার যদি কোন কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে, তাহা সাহ্লাদে করিব। আপনি আমাকে মার্হাট্টা দস্যু বলিয়া ঘৃণা বা অবিশ্বাস করিবেন না, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমাদ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হইতে পারে, সে উপকার সাধনের জন্য আমি সর্ব্বস্বান্ত হইতে কুণ্ঠিত হইব না।" হলকারের অভাবনীয় আতিথ্যসৎকারে বুন্দিরাজ-মহিষী যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি তখন স্বকার্য্য সাধনের একমাত্র উপায় মূলহররাউকে ধর্ম্মভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং নিজের অভিপ্রায় সমস্ত ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হলকারও একদল গোলন্দাজ সৈন্য এবং দ্বাদশ সহস্র সুশিক্ষিত মার্হাট্টা সৈন্য দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি স্বয়ং তাঁহার সমুদয় সৈন্য লইয়া তাঁহার ধর্ম্মভগিনীর সাহায্য এবং ধর্ম্ম-ভাগিনেয় উমেদকে বুন্দি সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য নর্ম্মদা পার হইবেন।

উমেদ-মাতা হলকারের নিকট এই রণনিপুণ সৈন্যদলের সাহায্য পাইয়া অগৌণে নর্ম্মদা পার হইয়া তাঁহার বিশালবাহিনী একবারে বুন্দি অভিমুখে চালনা করিলেন এবং বুন্দির অদূরে বীরবালক উমেদ তাঁহার রণদুর্ম্মদ হার-সৈন্য লইয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন। মাতা পুত্রের বিষম জিঘাংসার মুখে বিশ্বাসঘাতক দলিল সিংহ ও তাহার রক্ষক অম্বর সৈন্যগণ সদলে পরাজিত ও তাড়িত হইয়া বুন্দি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। উমেদ মাতা একেবারে সদলে বুন্দি প্রবেশপূর্ব্বক প্রিয় পুত্র উমেদকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজ কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

সধবা।

সধবা—সধবার কথা বলিতে গিয়া বিবাহের কথা একটু বলি, কেন না কন্যার বিবাহ বাঙ্গালীর পক্ষে আজ কাল বড় "ভয়ানক ব্যাপার" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের অপরিমিত অর্থলালসা পরিণয়ার্থিনী

বালিকাদিগের দুরদৃষ্টের কারণ হইয়াছে। এখনকার যুবকেরা শ্বশুরের নিকট হইতে অর্থ অপহরণ করিয়া নিজের চিরদিনের সংস্থান করিতে চাহেন। বাঙ্গালার অধিকাংশ ব্যক্তি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র; এই কারণে কন্যার বিবাহ দিতে কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। অর্থাভাবে দরিদ্র ঘরের বালিকারা "রূপে লক্ষ্মী" ও "গুণে সরস্বতী" হইয়াও অপাত্রে ন্যস্ত হইতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হয়। পূর্ব্বে টাকা দিয়া স্ত্রী ক্রয় করিতে হইত, * এখন সভ্যতার ছড়াছড়ির দিনে সর্ব্বস্ব দিয়া—শ্বশুরকে সর্ব্বস্ব দিয়া জামাতা আনিতে হয়! "স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি" এই মহা বাক্য এখন বাঙ্গালায় কথার কথা হইয়া আছে! তবে বিশেষ আশা ও আহ্লাদের বিষয় এই যে কোন কোন স্বদেশ-হিতৈষী মহোদয় এই কদাচার দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন; কেহ কেহ নিজ পুত্র প্রভৃতির বিবাহে স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইতেছেন। এই দুর্ঘটনা নিবারিত না হইলে দেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই বিব্রত হইয়া পড়িবেন ও সংসারাশ্রম অনেকের পক্ষেই দারুণ ক্লেশকর হইবে।

এইখানে বলা আবশ্যক পিতা মাতা ও অভিভাবকগণই বঙ্গীয় বালিকার বিবাহের কর্ত্তা বা কর্ত্রী। তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে বালিকার পরিণয় হইয়া থাকে। অভিভাবকেরা যদি সুবিচারক ও পরিণামদর্শী হন, তাহা হইলে এ প্রথাটী অতি কল্যাণকর সন্দেহ নাই। (১)

বর্ত্তমান সময়ে সচরাচর একাদশ হইতে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বঙ্গীয় বালিকাদিগের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। (২) পূর্ব্বে নিয়ম ছিল বিবাহের একবৎসর পরে ও অযুগ্ম বয়সে নব বধূ শ্বশুরালয়ে গমন করিবেন। এখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। আজি কালি বিবাহের অল্প দিন পরে বালিকারা পতিগৃহে যাইতে বাধ্য হয়; কখনও বা নব-বিবাহিত যুবক শ্বশুরগৃহে আসিয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। ইহার অশুভ ফল অনেকে বুঝিয়াছেন; আর এ সম্বন্ধে আমরা নিজের ভাষায় কিছু বলিতেও অক্ষম, যিনি এ বিষয়ের ফলাফল জানিতে চাহেন, তিনি ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসের "নব্যভারত" পত্রে "বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিবেন। উক্ত প্রবন্ধ-প্রণেতা একজন শারীরবিদ্যাবিৎ, তাঁহার যুক্তিযুক্ত লেখার

---

* কোনও কোনও বংশে এ প্রথা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(১) স্বার্থপর কি নির্ব্বোধ আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক এ কার্য্য সম্পন্ন হইলে অমৃতে গরলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

(২) ইহার অন্যথাও দেখা যায়। কোথাও বালিকারা সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ বয়সে বিবাহিতা হয়।

বাঙ্গালীর শরীর, মন ও সমাজ বহুল পরিমাণে উপকৃত হইতে পারিবে। যাহাহউক শ্বশুরালয়ে গমন করা নব বধূর পক্ষে এক গুরুতর ব্যাপার। বালিকা-জীবনে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রথম শিক্ষা এই। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পিতা কন্যাকে উপদেশ দিয়াছিলেন,

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং
সপত্নীজনে (৩)
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম
প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগে-
ষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেব্যং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ
কুলস্যাধয়ঃ॥"

আজি বাঙ্গালার প্রত্যেক বিবাহিতা রমণী এই উপদেশের পাত্রী। নববধূর জীবন সহিষ্ণুতা, নম্রতা ও লজ্জাশীলতার পূর্ণ আদর্শস্বরূপ। আমাদের বোধ হয় পুরাকালে মনুষ্যত্ব লাভের আশয়ে শিষ্যকে যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া গুরু-গৃহে দাসত্ব করিতে হইত, নব বধূকেও সেইরূপ সুগৃহিণী করণার্থে শ্বশুরালয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করা হয়। বিরক্তি, আলস্য প্রভৃতি মানুষের স্বাভাবিক; ইহার বশীভূতা হইয়া পাছে বালিকা রুক্ষস্বভাবা হয়, সেই আশঙ্কাতেই তাঁহারা অবগুণ্ঠনবতী এবং সেই আশঙ্কাতেই গুরুজনের সহিত বাক্যালাপ-বিবর্জ্জিতা। এই প্রথা প্রবর্ত্তকের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু অনভিজ্ঞ লোকের হাতে সোণা পড়িয়া পিত্তল হইয়া যাইতেছে! তাই শ্বশ্রূ, বধূ কেহই সুখী হইতে পারিতেছেন না।

সাংসারিক নিয়মে নববধূ নিরক্ষরা বা নির্ব্বোধ হইলে শ্বশ্রূ প্রভৃতি তত বিরক্ত হন না। তিনি লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতাপরায়ণা, মৃদুস্বভাবা ও গৃহকর্ম্ম-নিরতা হইলেই পতি-গৃহে "লক্ষ্মী" আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহার অন্যথায় শ্বশ্রূ, বধূকে দেখিতে পারেন না; ননন্দা বচসা করেন, ভ্রাতৃগণ হিংসার চক্ষে দেখেন। বধূরাও গৃহ-পরিচর্য্যারূপ "আপদ বালাই" ছাড়াইয়া স্বামীর সঙ্গে বিদেশবাসিনী হইতে পারিলে রক্ষা পান। কিংবা পরস্পরে বিবাদ কলহ করিয়া, গৃহকে অশান্তি ও অসুখের আগার করিতে থাকেন; এইরূপে স্ত্রীজাতি হইতেও স্ত্রীজাতিকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়।

রুচি সকলের সমান নহে। একথা যে আজি নূতন বলিলাম তাহাও নহে; কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বলিয়াছেন "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।" আমরা এ বিষয় সত্য বলিয়া জানি। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "এই রুচি বৈচিত্র্যই লোক বৈচিত্র্যের কারণ (৩)" আজি কালি নব্য যুবকেরা যে যেরূপ রুচিবিশিষ্ট হইতেছেন, তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীরাও সাধারণতঃ সেই সেই আদর্শে

(৩) বর্ত্তমান সময়ে (বহুবিবাহ নিবারিত হওয়ায়) সপত্নীর পরিবর্ত্তে যাতা, ননন্দাদিগের প্রতি প্রিয়সখী-ব্যবহার কর্ত্তব্য।

গঠিত হইতেছেন; স্বামীর একান্ত অনুগত হওয়া বঙ্গ মহিলার স্বাভাবিক সংস্কার। স্বামী বঙ্গরমণীর প্রতিপালক, শিক্ষক ও জীবন-রক্ষক। রমণীর সুখ, শান্তি, ধন, মান, অধিক কি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত স্বামীর উপর নির্ভর করিতেছে; এরূপ স্থলে স্বামীর বশীভূতা হওয়া রমণীর যে প্রাকৃতিক কার্য্য, এ কথা অনেকে স্বীকার করিবেন। স্বামীই স্ত্রীর নিকট আদর্শ মানব। এই কারণে সংসর্গ গুণে, প্রায়ই দেখা যায়, স্বামীর রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে স্ত্রীর রুচি প্রকৃতি গঠিত হয়। স্বামী সাহেবী ধরণের পক্ষপতী হইলে স্ত্রী মেম, স্বামী কৃপণ হইলে স্ত্রী কৃপণা, স্বামী স্বার্থপর হইলে স্ত্রী স্বার্থপরা, স্বামী সুশীল হইলে স্ত্রীও সুশীলা, সচরাচর এইরূপই হয়। আজি কালি অনেক পুরুষ স্ত্রীর বিলাসিতায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেকে কাঁদিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিবেন। স্বামী উপন্যাস পড়িয়া, স্ত্রীকে উপন্যাসের নায়িকার মত রূপবতী দেখিতে চাহেন; স্ত্রী, বঙ্গ রমণী, হীরা, মুক্তা গাউন, কৃত্রিম লাবণ্যের মাধুরীতে সৌন্দর্য্যপিপাসু পতি-দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহেন। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা বিচার করিয়া বলুন এ টা কি নব্য যুবকের স্বকৃত ব্যাধি নয়? এখন "টাকায় কুলাইতে পারি না" বলিয়া নাকে কান্না ধরিলে কেন? তবে যদি নিতান্ত অক্ষম হইয়া থাক, তাহা হইলে নিজের রুচি মার্জ্জিত কর, স্ত্রীকে ভদ্রতা ও পরিচ্ছন্নতা শিখাও, বাঙ্গালীর মেয়েকে পরী বা অপসরী দেখিতে চাহিও না। স্বামী যে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, রমণী সেই আদর্শে "মানুষ" হইবেন। আবার ইহাও বলি, কোন কোন স্থলে এরূপ কার্য্যের ব্যতিক্রম দেখা যায়; ব্যতিক্রম স্থলেই দম্পতির অমিল হইয়া থাকে। এমনও হইয়া থাকে যে স্বামী কম্‌টের দর্শন, মিলের যুক্তি, কিকিরোর বাগ্মিতা আলোচনা করিতে ব্যস্ত, আর স্ত্রী ভাল জ্যাকেট কিনিতে, "সরস্বতী হার" পড়িতে বা "ব্রেসলেট" (Bracelet) পরিতেই ব্যস্ত; স্বামী কখন দেশের কোন ভাল কাজে লাগিবেন সেই চেষ্টায় রহিয়াছেন, স্ত্রী নিজের ঘর কন্নার কাজ গুলি কিরূপে পরকে ধরিয়া সারিয়া লইবেন, সেই কথাই ভাবিতেছেন; স্বামী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী যুবক, স্ত্রী তিন চারি বছর ধরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে যে "কর্ম্মভোগ" ভুগিয়াছিলেন, তাহাও প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন; এমন অবস্থায় কি কখনও দম্পতির মনে মিল হইতে পারে? আবার এদিকে কত সুশীলা ও গুণবতী ভার্য্যা অপাত্রে পরিণীতা হইয়া মরণাধিক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন। যাহাহউক যাঁহার স্বামী কৃতবিদ্য ও স্ত্রী-শিক্ষানুরাগী, তিনি পতিগৃহে আসিয়া লেখাপড়া বা জ্ঞানালোচনা করিতে সমর্থ হন। বঙ্গদেশে

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত কিছুই নাই। মফঃস্বলের অবস্থা একান্ত শোচনীয়; সহরে খৃষ্টান মহিলারা অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী হইতেছেন। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ পরিবারবর্গের শিক্ষার জন্মে তাঁহাদিগকে শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না, তবে দুই একখানি ইংরাজী পুস্তক পাঠ, হার্‌মোনিয়ম বা পিয়ানোর দুই, চারিটী গৎ বা গান ও কিছু শিল্পকার্য্য শিক্ষা হইয়া থাকে। বঙ্গমহিলার প্রয়োজনীয় শিক্ষা অবশ্য এ সকল নহে। শিল্পকার্য্য অর্থে আজি কালি মহিলাগণ উলের কাজ, ঢাকাই রুমাল, কি বড় জোর শালের কল্কা বুঝেন। শিল্প শিখিতে উহাই শিক্ষা করেন। আধুনিক শারীর-বিদ্যাবিদ্‌ পণ্ডিতেরা উলের টুপী, মোজা, কম্ফর্টার প্রভৃতি আমাদের উষ্ণপ্রধান দেশের অনুপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। ঢাকাই রুমাল ও শালের কল্কা কিছু অবশ্য ব্যবহার্য্য জিনিস নহে, তবে ইহা সৌখীন ব্যক্তিদিগের আদরের সামগ্রী বটে। অতএব এই সকল শিল্প অপেক্ষা জামা, বডী, দোলাই, লেপ, তোষক, মশারি, বালিস প্রভৃতি সেলাই শিখিলে তাহা আমাদের অধিক প্রয়োজনে আইসে। আমাদিগের পুরাতন শিল্প কাঁথা, ক্ষীরের ছাঁচ, সিকা বুনা প্রভৃতিও আমাদের অবহেলনীয় নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই সকল কাজ শিখাইতে আজি কালি লোক জুটে না। এখন অনেক স্থানে স্ত্রী-হিতৈষিণী সভা সমিতি হইয়া অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে সত্য, কিন্তু মহিলারা উপযুক্তরূপ শিক্ষা না পাওয়াতে উত্তরপাড়া হিতকরী, মধ্য বাঙ্গলা সম্মিলনী, যশোহর-খুলনা সম্মিলনী, বিক্রমপুর সম্মিলনী প্রভৃতি সভা গুলির মহদুদ্দেশ্য সকল সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতেছে না। এখনও পল্লীগ্রামে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক জ্ঞানালোচনা করিতে বিতৃষ্ণ; তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন "সংসারের কাজে সময় পাই না" অথচ যে সময় তাঁহারা তাস খেলিয়া, গল্প করিয়া ও ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেন, সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করিলে কত উন্নতি লাভ করিতে পারেন! কিন্তু অধিকাংশের মনের ভাব এইরূপ যে নিজেরা তো উন্নতি ইচ্ছা ছাড়িয়া দিয়াছেন, তারপর স্বজাতীয় কোন ভগ্নীকে জ্ঞানার্জ্জন করিতে দেখিলেও বিরক্ত হইয়া উঠেন। বলা বাহুল্য কেহ কেহ গৃহকর্ম্ম হইতে অবকাশ পাইলেই জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন; এরূপ অবস্থায় যিনি স্বামী বা অন্য কোন আত্মীয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে "সৌভাগ্যবতী" বলিতে পারা যায়।

এইখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক-

দিগের একটী বিশেষ দোষ জন্মিতেছে, সহরেই এ দোষের প্রাবল্য হইয়াছে। এখনকার বধূরা পতিগৃহে গিয়া আর বাটনা বাটা, কুটনা কুটা, দেশীয় ভাত তরকারী রাঁধা প্রভৃতি "নীচ কর্ম্ম" করিতে চাহেন না। আধুনিক সভ্যতা বা রীত্যনুসারে তাঁহারা নানা রকমের সাজগোজ করিয়া একখানা নাটক, নয় কতকটী উল, একান্ত পক্ষে এক যোড়া তাস ও তিনটী সহচরী লইয়া দিন কাটাইতে পারিলেই সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন। স্বহস্তে সাংসারিক কাজ করা অপেক্ষা অনাহার-যন্ত্রণাও তাঁহারা শ্রেয়স্কর মনে করেন। যেদিন "বামুন দিদী" রন্ধনশালায় না আসিবেন, সেদিন আত্মীয় স্বজনকে দোকানের বাসি খাবার খাওয়াইবেন, তবুও কয়লার আঁচে পুড়িয়া "ডাল ভাত" রাঁধিতে পারিবেন না। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই ইহাঁদের স্বামী মহাশয়ও এরূপ কার্য্য অনুমোদন করেন; তাঁহার বিবেচনায় "ওর শরীর খারাপ, আগুণের তাপ লাগাইলে দুদিনেই শয্যাগতা হইতে হইবে।" তিনি নিজের মা'কে, ঠাকুরমা'কে, তিন বেলা আগুণের তাপ লাগাইয়া সুস্থ থাকিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু এখন এই সভ্যতার ছড়াছড়ির দিনে সে পুরাতন কথা ভুলিয়া গিয়াছেন! যাহা হউক স্ত্রীলোকের এরূপ বিলাসিতা ও আলস্যপরতা স্ত্রীমাত্রেরই বড় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। যাঁহাদের অনুকরণ করিতে চাও, তাঁহাদের গুণ গুলি ছাড়িয়া দোষগুলি গ্রহণ কর কেন? দেখ দেখি বিবী কার্লাইল, বিবী গ্লাডষ্টোন, কুমারী সার্লট্ ব্রণ্টি প্রভৃতি মহদাশয়া রমণীরা সাহিত্য-অনুশীলন, রাজনীতি পর্য্যালোচনা প্রভৃতি উচ্চতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও স্বহস্তে কত সামান্য গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম, আর তুমি আমি ঘরের কোণে বসিয়া কে কি দিয়া ভাত খাইতেছে, এই খবরটী সংগ্রহ করিতে গিয়া যদি গৃহকর্ম্মে অক্ষম হই, তবে সে কত লজ্জা ও কত ক্ষোভের বিষয়!

যথাসময়ে বঙ্গাঙ্গনা সন্তান-প্রসূতা হন। এখন ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ বৎসর বয়সের মধ্যেও অনেক রমণী (কি বালিকা) সন্তানের জননী হইতেছেন। এই সকল সন্তান যেরূপ সুস্থ, সবল ও মানসিক ক্ষমতাপন্ন, তাহা মাতার বয়সের হিসাবেই বুঝা যায়। মাতৃকর্ত্তব্য পালন স্ত্রীজাতির এক গুরুতর দায়িত্ব, এই সকল বালিকা-জননীরা অধিকাংশই তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞা। ইহাঁরা যেরূপে সন্তান পালন করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তবে দেশীয় মাতাদিগের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের মাতা, মহাত্মা বিদ্যাসাগরের জননী, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের মাতা, অনারেবল গুরুদাস বাবুর জননী প্রভৃতি মহোদয়াদিগের ন্যায় উন্নতমনা মাতৃগণও আছেন। তাঁহাদিগের প্রসূত

রত্নরাজি দ্বারা এই আঁধার দেশ আলোময় হইতেছে ও হইবে। আবার দুঃশীলা ও অসংযতেন্দ্রিয়া জননীগণ এক একটী মনুষ্যাধম সন্তান প্রস্তুত করিয়া ইহলোকে নিদারুণ মর্ম্মপীড়া ও পরলোকের জন্যে পাপ সঞ্চয় করিতেছেন। * সুসন্তানই "নরাণাম্ পুণ্যলক্ষণং" কুসন্তান মহাপাপের ফল! এখন সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালায় কোন কোনও সদাশয় ব্যক্তি সন্তান পালন নীতি বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। যদি জননীরা ছাই ভস্ম পুস্তকের "পত্র-কীট" না হইয়া বাবু শিবচন্দ্র দেব কৃত শিশুপালন, স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত মাতৃশিক্ষা, বাবু ঈশানচন্দ্র বসু কৃত নারীনীতি, ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত ধাত্রী ও প্রসূতিশিক্ষা, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত মা ও ছেলে, প্রভৃতি সৎগ্রন্থ গুলি পড়িয়া তদনুসারে কাজ করেন, তাহা হইলেও রমণী-জন্ম নিষ্ফল হয় না।

দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তানপ্রসূতা হইয়া অনেক রমণী লেখা পড়ার সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেন। বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শক কত ব্যক্তি কত সময় বলিয়া থাকেন "বালকদিগের অপেক্ষা বালিকাদিগের প্রতিভা অধিকতর তেজস্বিনী; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহাদিগের প্রতিভা যেমন শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে, তেমনি সহসা নিবিয়া যায়। প্রাপ্তবয়সে ইহারা সমস্তই ভুলিয়া যায়।" তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলে হইতে পারেন, আমরা ভুক্তভোগী; আমরা ইহার কারণ এই বুঝিয়াছি যে বৃক্ষের অঙ্কুরটী যেমন যত্ন অভাবে শুকাইয়া যায়, বঙ্গাঙ্গনার প্রতিভাও সেইরূপ অনুশীলন অভাবে বিলুপ্ত হয়। সুকবি বলিয়াছেন "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ" আমাদের দেশেও প্রবাদ আছে "গাইতে গাইতে গাইয়ে হয়" অর্থাৎ অনুশীলনই উন্নতির মূল।" যে বয়সে প্রতিভা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে, যে বয়সে স্বাধীন চিন্তা সকল প্রদীপ্ত হইবে, যে বয়সে স্মৃতি, মেধা, কল্পনা সকল পুষ্টিলাভ করিবে, সেই বয়সে বঙ্গাঙ্গনা সরস্বতী দেবীর সঙ্গে দলাদলি করিয়া বসেন; বাল্যকালে কতকদিন যে মানসিক শ্রম করিয়াছিলেন, এখন চতুর্গুণে তাহার পরিবর্ত্তে আরাম লাভ করিতে থাকেন। এই জন্যই একাদশ বর্ষ বয়সে যে বালিকা বিদ্যালয়ে উত্তমা ছাত্রী ছিল, একবিংশতি বর্ষ বয়সে তাঁহাকে অর্দ্ধ মূর্খ রমণী বলিলে বলা যায়। দশ বৎসরে মধ্যে তিনি এতদূর পিছাইয়া পড়েন! যদি অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দেশীয় সদাশয় ব্যক্তিগণ মনোযোগ করেন, যদি মুখের কথা, কাজের উপরে হইয়া

* মাতৃদোষেই কবিবর বাইরণের মত লোক চরিত্রবান্ হইতে পারেন নাই, অন্যের কথা কি বলিব?

উঠে, তাহা হইলে এরূপ শোচনীয় ঘটনা কখনই হয় না।

যে রমণীর জ্ঞানেচ্ছা প্রবল, তাঁহার আন্তরিক যত্নে তিনি কতক দূর শিক্ষিতা হইতে পারেন। এমনও দেখা যায় স্ত্রী জ্ঞানার্জ্জনে বা গৃহকর্ম্মে অমনোযোগিনী হইয়া কেবল স্বামীর শাসনের ভয়ে ঐ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। আসল কথা, প্রথমে যাহা বলিয়াছি, স্বামীর রুচি অনুসারে স্ত্রীর জীবন গঠিত হইতে থাকে; মৌলিক না হইলেও আংশিকরূপে স্বামীর সহিত স্ত্রীর জীবন অথবা জীবনের সর্ব্বস্ব বিনিময় হয়।

সধবা বঙ্গ মহিলার প্রাপ্তবয়সে গৃহমধ্যে কতক দূর প্রভুত্ব থাকে। যাঁহার স্বামী যত উপার্জ্জনক্ষম ও ক্ষমতাপন্ন পরিবার মধ্যে তাঁহার প্রভুত্ব তত বেশী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা (তারক বাবুর) স্বর্ণলতার প্রমদা সরলার আখ্যায়িকা পাঠ করিতে বলি। যাহা হউক একথা বোধ হয় সকলেই জানেন, রমণীগণ সধবা অবস্থায় অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত, স্বাধীনা ও ক্ষমতাপন্না হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

বেলা প্রায় এগারটা। গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপ। সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত! এমন সময় সরোজিনী তাহার প্রাণসম নয়নের মণি একমাত্র শিশু কুমারকে গৃহের এক প্রান্তে শায়িত করিয়া রাখিয়াছে। সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপফুলের ন্যায় শিশুর মুখকমল প্রফুল্ল। নিদ্রার মোহিনীশক্তি তাহাকে অচেতন করিয়া ফেলিয়াছে। তবুও মধুর হাসি চঞ্চলা সৌদামিনীর ন্যায় মাঝে মাঝে ওষ্ঠাধরের অপরিসীম শোভা সম্পাদন করিতেছে। সরোজিনী নিশ্চিন্তমনে রন্ধনশালায় নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু বিধির কি অচিন্তনীয় বিধান। হঠাৎ সরোজিনীর কর্ণে এক বিকট চীৎকারধ্বনি প্রবেশ করিল। তাড়াতাড়ি কাজ ছাড়িয়া দৌড়িয়া যেখানে নবকুমার নিদ্রাগত ছিল, সেখানে উপস্থিত হইল। দেখিল একখানি ইষ্টক স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাহার প্রাণাধিক সন্তানের মস্তকোপরি পতিত হইয়া শিশুর কোমল মস্তককে নিষ্পেষিত করিয়াছে। দেহ প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। মায়ের প্রাণে শত শেল বিদ্ধ হইল। যাতনায় অস্থির হইয়া ভূতলে পড়িল। আর সংজ্ঞা নাই। কিছুকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সরোজিনী আর্ত্তনাদে গৃহ পরিপূর্ণ করিল। গৃহবাসী ও প্রতিবাসী

অন্যান্য সকল লোক প্রমাদ গণিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং সকলেই শোচনীয় ঘটনাটী প্রত্যক্ষ করিয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিল।

এই নরহন্তা ইষ্টকখণ্ডকে কেহ দোষী করিলেন কি? ঘটনাস্থলে যত লোক উপস্থিত ছিলেন, সকলেই শোকের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু কেহই ইষ্টকখণ্ডকে শাসন করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। যদি এই হত্যাকাণ্ড সংজ্ঞাবিহীন জড় ইষ্টক কর্ত্তৃক না হইয়া একজন মনুষ্য কর্ত্তৃক সংঘটিত হইত, তাহা হইলে দর্শকদিগের কার্য্য কেবল শোকোচ্ছ্বাসে পরিসমাপ্ত হইত না। সকলেই হন্তাকে আক্রমণ করিতেন এবং তাহাকে যথোপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিবার নিমিত্ত বিচারালয়ে উপস্থিত করিতেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই ইষ্টক খানি দোষী নয় কেন? ইষ্টক জড় পদার্থ, জড়শক্তির অধীন। ইষ্টকের এমন কোন শক্তি নাই, যদ্দ্বারা জড় শক্তিকে পরাস্ত করিতে পারে। আমরা যে ইষ্টকখণ্ডের প্রসঙ্গ করিলাম, সেই ইষ্টক খণ্ড যোগাকর্ষণী শক্তি দ্বারা অন্যান্য ইষ্টকের সহিত সংলগ্ন ছিল। এদিকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সর্ব্বদাই তাহাকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিতেছিল। যাই মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সংগ্রামে যোগাকর্ষণী শক্তিকে পরাভূত করিল, অমনি ইষ্টক খণ্ড বিশ্লিষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সরোজিনীর সুকুমার শিশু সেখানে শায়িত থাকিলেও এ ঘটনা ঘটিত, না থাকিলে এ ঘটনা ঘটিত, সুতরাং সরোজিনীর কুমারের হত্যা সম্পূর্ণ আকস্মিক। কিন্তু মানবের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা আছে। মানুষ ইচ্ছা করিলে একজনকে হত্যা করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে তাহার জীবনও রক্ষা করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন ইট যেমন প্রাকৃতিক শক্তির অধীন, মানুষও সেরূপ প্রবৃত্তির অধীন। যখন প্রবৃত্তির উত্তাল তরঙ্গ মানবের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, তখন মানব ইচ্ছা শক্তির সঞ্চালনে আত্মস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন। তখন প্রবৃত্তির স্রোতে কোন অনভীপ্সীত দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। তবে কোথায় মানুষের স্বাধীনতা? আর মানুষের স্বাধীনতা না থাকিলে অর্থাৎ মানব ইষ্টকের মত বলবতী শক্তির অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে তাহাকে অপরাধী কর কেন? নরহন্তাটিকে যদি ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে মানবকে ছাড়িবে না কেন? যাঁহারা এরূপ যুক্তি করেন, তাহাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। স্বীকার করিলাম প্রবৃত্তির হাতে মানুষের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু প্রবৃত্তি কি স্বভাবতঃই মানব মনে উদিত হইয়া থাকে? না প্রবৃত্তির স্বভাব সম্বন্ধে মানবের স্বাধীনতা আছে? যাঁহারা মানবের স্বাধীনতা অস্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া থাকেন, প্রবৃত্তির আবির্ভাব সম্বন্ধেও মানবের স্বাধীনতা নাই। উহা স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন:—মনে কর সরলা সৌদামিনীর অলীক কুৎসা কাহিনী সকলের নিকট কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সৌদামিনী যাই সরলার এ দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনিতে পাইল, অমনি তাহার হৃদয়ে ক্রোধের আবির্ভাব হইল। সৌদামিনীর এ ক্রোধের উত্তেজনা স্বাভাবিক। সৌদামিনী ইচ্ছা করিয়া ইহার বাধা জন্মাইতে পারিত না। ক্রোধ হইলে তদনুরূপ কাজ হইবেই হইবে। সৌদামিনী ক্রোধ বশতঃ সরলাকে বিলক্ষণ প্রহার করিল। এজন্য সৌদামিনীকে দোষী করা অন্যায়। আমরা বলি সৌদামিনীর ক্রোধের উদ্রেক স্বাভাবিক নহে। কারণ যে ঘটনার উপলক্ষ করিয়া সৌদামিনীর ক্রোধের সঞ্চার হইল, সুশীলা সে ঘটনাকে অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া যায়। সুশীলা সর্ব্বদা বলে মনকে এরূপ অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে যে, ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহার মনে ক্রোধ উপস্থিত হয় না। ইহাতে বোধ হইতেছে, ইচ্ছা শক্তির সঞ্চালন দ্বারা প্রকৃতির আবির্ভাবের উপরেও আধিপত্য স্থাপন সম্ভবপর। যখন সুশীলা ইচ্ছা শক্তি দ্বারা ক্রোধের কারণ উপেক্ষা করিতে পারে, তখন সৌদামিনীর যে সে শক্তি আছে মানিয়া লইতে হইবে। সৌদামিনী সে শক্তি ব্যবহার করে নাই বলিয়া ক্রোধের উত্তেজনায় উত্তেজিত। আত্মশক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার করে নাই বলিয়া সৌদামিনী অপরাধী এবং দণ্ডনীয় ও নিন্দনীয়। সুশীলা প্রশংসনীয় ও আদরিণীয়, সুতরাং যাঁহারা বলেন মানুষের স্বাধীনতা নাই, তাঁহারা ভ্রম করিয়া থাকেন।

মানুষ ইচ্ছা করিলে সৎ কিংবা অসৎ হইতে পারে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে একবার কোন কুঅভ্যাস প্রতিষ্ঠিত হইলে সহজে তাহা দূর করা সম্ভবপর নয়। উহার সংশোধন সময়সাপেক্ষ। এখানে কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা খর্ব্ব হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু কালে অধ্যবসায় সহকারে এরূপ অভ্যাসেরও পরিবর্ত্তন সম্ভবপর। যে সকল পুরুষ এবং রমণী শৈশবের কুশিক্ষা এবং কুসংসর্গবশতঃ কু অভ্যাসের কঠিনতর নিগড় পায় পরিয়াছেন, তাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সে শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে উদ্যত হউন। কখনও অদৃষ্টের স্কন্ধদেশে সমস্ত কার্য্যদায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হওয়া বিধেয় নহে। বহু দিনের সঞ্চিত পাপ মুহূর্ত্তে ধ্বংস না হইলেও ভয় নাই। প্রাণগত যত্ন করিলে ইচ্ছা-শক্তির দৌর্ব্বল্য বিদূরিত হইয়া পুনর্ব্বার স্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হইবেই হইবে। এই জন্য শাস্ত্রে বলিয়াছে "আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু।"

"ফুটেছে সুগন্ধি ফুল।"

একটী ঝরিয়া গেলে
আর কি ফোটেনা ফুল ?
ঝরিতে হইবে বলে
তার কি গো ফোটা ভুল ?

দীপটী নিবিয়া গেলে
জ্বালে না কি দীপ আর ?
আবার নিবিবে বলে
রাখে ঘর অন্ধকার ?

একটী ফুরায়ে গেলে
পুনঃ কি করে না আশা ?
বারেক ভাঙ্গিলে গৃহ
ফের কি বাঁধে না বাসা ?

একটী উড়িয়া গেলে
আর কি পোষে না পাখী ?
মনে ভেবে সেও কবে
উড়ে যাবে দিয়ে ফাঁকী ?

আমার উদ্যান আজ
বাসিত সুগন্ধি ফুলে।
ঝরুক সময়ে—কিন্তু
অসময় না কেহ তুলে॥

আবার জ্বেলেছি দীপ
নিবুক তেল ফুরা'লে,
যেন কভু নিবে নাকো
প্রবল বাতে অকালে॥

আবার হয়েছে আশা
নিরাশ এ হৃদয়ের,
আবার নতুন গৃহ
বাঁধিয়াছি আমি ফের॥

স্নেহের পিঞ্জরে মোর
আসিয়াছে পাখী আর,
থাকে যেন দৃঢ় সদা
ভাঙ্গে না শৃঙ্খল তার॥

গিয়াছে একটী ঝরে
ফুটিবে না আর"—ভুল,
আবার বাগানে মোর
ফুটেছে সুগন্ধি ফুল।

সতীধর্ম্ম।

(৬ষ্ঠ প্রবন্ধ, মনুসংহিতা হইতে)

এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি চ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্ যোভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥১॥

'পুরুষ' বলিলে নাহি একটি বুঝায়,
জায়া পতি সন্তানেই পূর্ণতা সে পায় ;
যেই পতি সেই জায়া সেই ত তনয়,
তিনে এক, একে তিন, ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়।১।

যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥২॥

তটিনী সমুদ্র-জলে মিশিলে যেমন,
সমুদ্র-জলের গুণ করয়ে ধারণ ;
যেরূপ গুণের পতি লভে যে রমণী,
সেইরূপ গুণ সেও লভয়ে তেমনি ।২। (১)

কামমা মরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি ।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥৩॥

অতএব কন্যা যদি অনূঢ়া দশায়,
পিতার আলয়ে চিরজীবন কাটায় ;
সেও ভাল, তবু তার আত্মীয় স্বজন,
অপাত্রে বিবাহ নাহি দিবে কদাচন ।৩।

(১) উত্তমের সংসর্গ-গুণে অধমও উত্তম হয়, এবিষয়ে হিতোপদেশে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে, কয়েকটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাদ্ধত্তে মারকতীং দ্যুতিম্ ।
তথা সৎসন্নিধানেন মূর্খো যাতি প্রবীণতাম্ ॥

কাঞ্চনের কাছে কাচ থাকিলে যেমন,
মরকতমণি-শোভা করয়ে ধারণ,
সেইরূপ সাধুসহবাস করি লাভ,
মূর্খও প্রবীণ হয় ছাড়য়ে স্বভাব।

হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্ ॥

হীন-সহবাসে বুদ্ধি হীনতাই পাবে,
সমানের সহবাসে রহে সমভাবে ;
পরম শিষ্টের সঙ্গে হইলে মিলন,
বুদ্ধিও শিষ্টতা অতি করয়ে ধারণ।

যথোদয়গিরৌ দ্রব্যং সন্নিকর্ষেণ দীপ্যতে ।
তথা সৎসন্নিধানেন হীনবর্ণোঽপি দীপ্যতে ॥

উদয়গিরির কাছে যত দ্রব্য রয়,
প্রভাকর-কর-যোগে হয় প্রভাময় ;
হীন জাতি লভি' তথা সাধু-সমাগম,
হীনতা ত্যজিয়া শোভা পায় অনুপম ।

(মৎপ্রকাশিত হিতোপদেশ, কথারম্ভ, ৪১,৪২,৪৬শ্লোক)

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা ।
সারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্ ॥ ৪ ॥

অধম বংশের কন্যা অক্ষমালা নামে,
বশিষ্ঠে লভিয়া পূজ্যা হৈল ধরাধামে ;
সারঙ্গীও হীন বংশে লভিয়া জনম,
মন্দপাল-পতি-গুণে হৈল অনুপম । ৪ ।

এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেঽস্মিন্নপকৃষ্টপ্রসূতয়ঃ ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্ত্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ ।৫

এরূপ দেখিবে কত শত নারীগণ,
জনম অধম বংশে করিয়া গ্রহণ,
সাধু-পতি-সমাগম লভিয়া কেবল,
গুণের আলোকে বিশ্ব করিল উজ্জ্বল ।৫।

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥ ৬ ॥

জীবের জনম-ক্ষেত্র রমণী সকল,
গৃহের আলোক তারা কুলের মঙ্গল ;
রমণী সবার পূজ্য জানিবে সদাই,
লক্ষ্মী আর রমণীতে কোনো ভেদ নাই ।৬।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্ ।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্ ॥৭॥

জীবের জনম কিম্বা জীবের পালন,
রমণী বিহনে নাহি হয় কদাচন ;
এই যে সংসারযাত্রা চলে অনুক্ষণ,
প্রত্যক্ষ দেখিবে তার নারীই কারণ ।৭।

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা ।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনস্তথা ॥ ৮ ॥

বংশরক্ষা আর ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদয়,
আর্ত্তের শুশ্রূষা আর পবিত্র প্রণয়,
আপনার আর পিতৃলোকের নিস্তার,
সুভার্য্যাই একমাত্র নিদান তাহার ।৮।

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥ ৯ ॥

পিতা, ভ্রাতা, পতি, আর দেবর, স্বজনে,
তুষিবে রমণীগণে বসনে ভূষণে ;
যতনে রাখিবে সদা করিবে সম্মান,
নারীর কল্যাণে হয় সবার কল্যাণ।৯।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥১০॥

রামাগণে যে ভবনে লভে সদা মান,
দেবতা-বিহার ক্ষেত্র স্বর্গ সেই স্থান ;
না পায় সম্মান যথা রমণী সকল,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সেই থানে সকলি বিফল।১০।

শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা ॥১১॥

কুলনারী যে ভবনে করে হাহাকার,
জ্বলিয়া পুড়িয়া তাহা হয় ছারখার ;
যে গৃহে রমণীকুল পুলকিতচিত,
সে গৃহে সৌভাগ্যলক্ষ্মী হয় উছলিত।১১।

যাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥ ১২ ॥

রামাগণে অপমানে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
অভিশাপ যে ভবনে করয়ে প্রদান ;
ধন পরিজন আদি সহ সে আলয়,
সমূলে বিনষ্ট হয় জানিবে নিশ্চয়।১২।

তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ ॥ ১৩ ॥

অতএব অশনে বসনে বিভূষণে,
ধনে মানে নারীগণে তুষিবে যতনে ;
বিশেষতঃ ক্রিয়া কর্ম্ম আদি মহোৎসবে,
নারীর সম্মানে যেন দৃষ্টি রাখে সবে।১৩।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥১৪॥

ভার্য্যাগুণে পতি যথা সদানন্দে রয়,
পতি-গুণে ভার্য্যা যথা প্রফুল্লহৃদয় ;
এরূপে দম্পতীপ্রেমে শোভে যেই স্থান,
সর্ব্বমঙ্গলার তথা নিত্য অধিষ্ঠান।১৪।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেযুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ ॥ ১৫ ॥

রক্ষিতে নারীর ধর্ম্ম তারে বন্ধুগণ,
গৃহে রুদ্ধ রাখিলেই না হয় রক্ষণ ;
যে নারী আপন গুণে রক্ষে আপনারে,
যথার্থই সুরক্ষিত জানিবে তাহারে।১৫।

অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাং চ পরিণাহ্যস্য বেক্ষণে ॥ ১৬ ॥

ধন ধান্য প্রভৃতির ব্যয় বা রক্ষণ,
গৃহ গৃহসামগ্রীর নিত্য অবেক্ষণ ;
পাক অন্নদান সর্ব্ব দ্রব্যের শোধন,
ধর্ম্মকর্ম্ম নারী-হস্তে করিবে অর্পণ।১৬।

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীণাং দূষণানি ষট্ ॥ ১৭ ॥

সুরাপান, যথায় তথায় বিচরণ,
পতিসনে দীর্ঘকাল বিরহ ঘটন ;
কুসঙ্গ অকালে নিদ্রা পরগৃহে বাস,
এই ছয় দোষে হয় সতীত্ব বিনাশ।১৭।

বিধায় বৃত্তিং ভার্য্যায়াঃ প্রবসেৎ কার্য্যবান্ নরঃ।
অবৃত্তিকর্ষিতা হি স্ত্রী প্রদুষ্যেৎ স্থিতিমত্যপি ॥ ১৮ ॥

ভার্য্যার ব্যবস্থা অগ্রে না করি' বিশেষ,
ভার্য্যা রাখি' পতি যেন না যান বিদেশ ;
জীবিকা-অভাবে হায়! জঠর-জ্বালায়,
সুশীলাও কত নারী সতীত্ব হারায়।১৮।

বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেন্নিয়মমাস্থিতা।
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ ॥ ১৯ ॥

পত্নীর ব্যবস্থা করি' যাইলে প্রবাসে,
অতি সুনিয়মে পত্নী রবে নিজ বাসে;
নাহি যদি থাকে তার জীবিকা-উপায়,
সাধু শিল্পকর্ম্মে যেন জীবন কাটায়।১৯।

তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ।
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্॥ ২০ ॥

জায়া পতি সদা হেন করিবে যতন,
যাহে দোঁহে নাহি হয় বিরহ ঘটন;
কার্য্যবশে ছাড়াছাড়ি হইলে দোঁহার,
কেহ যেন কভু নাহি করে ব্যভিচার।২০।

এব ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োরপি।
অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ ॥ ২১ ॥

যাবত দোঁহার দেহে রহিবে জীবন,
ব্যভিচার কেহ না করিবে কদাচন;
পবিত্র মনের ভাব পবিত্র আচার,
স্ত্রী পুরুষ উভয়ের এই ধর্ম্ম সার।২১।

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ॥ ২২ ॥

হৃষ্ট হইলেও পতি প্রসন্ন বদনে,
সুচারু সমস্ত কার্য্য করিবে যতনে;
গৃহদ্রব্য সকলি রাখিবে পরিষ্কার,
ব্যয়ের বিষয়ে সদা হবে মিতাচার।২২।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

জীবে দয়া।

দয়া মানব হৃদয়ের একটী শ্রেষ্ঠ ভূষণ। পরের দুঃখকে আপনার দুঃখ করিতে পারা মহত্ত্বের চিহ্ন। এই বৃত্তি অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান। অন্যান্য বৃত্তি সমূহের ন্যায় দয়া বৃত্তিও ব্যবহার দ্বারা উজ্জ্বল ও অব্যবহার দ্বারা মলিন হইয়া পড়ে। দয়ালু ব্যক্তি অন্যের জন্য অনায়াসে ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন। সার ফিলিপ্ সিড্‌নি জাট্‌ফেন যুদ্ধে আহত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় অবস্থান কালে পিপাসাতুর হইয়া এক গ্লাস জল আনিতে অনুরোধ করেন। জল আসিল, সিড্‌নি মুখে গ্লাস তুলিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন নিকটবর্ত্তী একজন সৈন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সকাতরে তাঁহার হস্তস্থিত বারিপূর্ণ পাত্রের দিকে তাকাইতেছে। সিড্‌নি দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন, "উহার প্রয়োজন আমার অপেক্ষা অধিক। উহাকে এই বারি প্রদান কর।" একবিন্দু বারির অভাবে যখন প্রাণ বহির্গত হইতেছে, এমত সময়ে কে এরূপ আত্মোৎসর্গ ও নিঃস্বার্থ-ভাব দেখাইতে পারে? সিড্‌নি জীবনে যত মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন,মৃত্যুকালের এই কার্য্য তৎসমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতে প্রচারিত। যাহার হৃদয়ে এই বৃত্তি সে প্রকার স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই, তাহার

পক্ষে মহাত্মা সিড্নির তুল্য মহাজনগণের পুণ্যকাহিনী উপকথা বলিয়া বোধ হইবে।

দয়া পাপীর উদ্ধারের হেতু ও দুঃখীজনের শান্তির উৎস। বুদ্ধ, ঈশা ও চৈতন্যের প্রাণ যদি দুঃখী পাপীদের জন্য না কাঁদিত, তবে সংসার-যন্ত্রণা আরও যে কত দুঃসহ হইত বলা যায় না।

নানা বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়; কিন্তু দয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ দেখা যায় না। খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রধান গুণত্রয়ের মধ্যে দয়া একটী। মহর্ষি ঈশা শৈলবেদীর উপদেশ কালে বলিয়াছিলেন—"দয়ালু ব্যক্তিগণ ধন্য; কারণ তাহারা (ঈশ্বরের) দয়া লাভ করিবে।" মুসলমান ধর্ম্মে বলে "উপাসনা প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্ম্মাঙ্গ পালন করিয়া মনুষ্য স্বর্গের দ্বারদেশে মাত্র উপস্থিত হইতে পারে,দয়াধর্ম্ম অনুষ্ঠান ভিন্ন তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রেমাবতার গৌরচন্দ্র সনাতন গোস্বামীকে উপদেশকালে বলিয়াছিলেন ;—

"নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন,
এই তিন কর্ম্ম তুমি করো সনাতন।"

বুদ্ধ সিদ্ধার্থ যে অপূর্ব্ব "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। বৌদ্ধ সাধকগণ রজনীযোগে ভ্রমণ করিতেন না, কারণ পাদদলিত হইলে অনেক জীবের প্রাণ সংশয় হইতে পারে। মুখ ও নাসিকার মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করিবে বলিয়া তাঁহারা ঐ দুই ইন্দ্রিয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন এবং দিবাভাগে পথে চলিতে হইলে পথ দেখিতে দেখিতে ও পরিষ্কার করিতে করিতে পদবিক্ষেপ করেন এবং একটী পিপীলিকা পাদদলিত হইলে হৃদয়ে বড় ক্লেশ অনুভব করেন। বৌদ্ধগণের দয়া সাধন এত দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে যে, তাঁহারা খট্টাতে ছারপোকা পালন করেন ও অর্থ পুরস্কার দিয়া দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে সেই খট্টায় শয়ন করাইয়া তাহা দ্বারা নর-শোণিত পান করান।

খৃষ্টানগণের দয়া নানা দেশে নানা কার্য্যে ঈশার প্রচারিত ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। বৈষ্ণবগণের মধ্যেও উহা নানা আকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে নিরামিষ ভোজন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সর্ব্বত্রই দয়াধর্ম্মের সহিত 'নিরামিষ ভোজন' প্রচারিত হইয়াছে। নানা কারণে ইউরোপ খণ্ডে আমিষ-ভোজন বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। অধুনা তথায় নিরামিষ আহার প্রচলিত হইতেছে এবং দিন দিন নিরামিষভোজীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দয়াধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই নানা স্থানে "জীবের প্রতি নির্দ্দয়তা নিবারণী সভা" সংস্থাপিত

হইতেছে। ইউরোপীয়েরা সভা স্থাপন দ্বারা সকল কার্য্য করেন। আমাদের দেশে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া সেই সকল মঙ্গল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান সকলেই আজকাল বুঝিতেছেন যে, মনুষ্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইল না, দয়া অর্থে জীবে দয়া। জীব অর্থে 'কৃষ্ণের জীব', কেবল মানুষ নহে। ইংলণ্ড দেশের পূর্ব্বতন মহৎ ব্যক্তি-দিগের মধ্যে কবি কাউপার ও জন্‌সনের পশুর প্রতি দয়া যথেষ্ট ছিল।

অধুনা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা যেরূপ পশুগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন, শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাঁহাদের এই নৃশংসতা নিবারণার্থে ইংলণ্ডে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহার একজন অধিনায়িকা কুমারী ফ্রান্‌সিস্ পাওয়ার কব্। তিনি একজন ব্রহ্ম-বাদিনী। প্রেমরূপিণী নারীর সুকোমল হৃদয় যে বাক্‌শক্তিহীন পশুগণের জন্য কান্দিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? কুমারী কব্ ও অন্যান্য করুণহৃদয় ব্যক্তিগণের চেষ্টায় মানব সমাজের মন বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠুরতা হইতেও নিবৃত্ত হইতেছে। কালে তাঁহাদের নিঃস্বার্থ ও অবিশ্রান্ত চেষ্টা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে এবং হৃদয়ের নিকট বিজ্ঞান পরাস্ত মানিবে।

যে যত হীন, যত দুর্ব্বল, যত অযোগ্য, তাহার প্রতি ততই অধিক দয়ার ভাব উদিত হয়। বারির ন্যায় দয়া নিম্নগামিনী। মানুষ বাক্য দ্বারা দুঃখ জানাইতে পারে; তাহাদের দুঃখে ত আমাদের দুঃখ হইবেই; কিন্তু যাহারা বাক্যহীন, যাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার কেহ নাই, তাহাদের প্রতি প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তির দয়া ধাবিত হওয়া উচিত। ইংরাজেরা যে দেশকে ভল্লুকের দেশ বলেন, সেই দেশবাসী ভল্লুকগণ পর্য্যন্তও পশুদের প্রতি নির্দ্দয়তা নিবারণের জন্য চেষ্টিত। সম্প্রতি রুসিয়া দেশে ঐ উদ্দেশে সভা সমিতি সংগঠিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

বিড়াল ও ইন্দুর।

আমরা "সান ফ্রানসিস্কো কল" হইতে নিম্নলিখিত অত্যাশ্চর্য্য বিষয়টি সংগ্রহ করিলাম। ইহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ আমরা পূর্ব্ব হইতে জানি যে, স্বভাবতঃ বৈরভাবা-ক্রান্ত প্রাণিদ্বয় একত্রে এক স্বামীর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হইলে এক অদ্ভুত সখ্যভাবাপন্ন হয়।—সুটার ক্রীক নামক স্থানে জনৈক শ্রমজীবী কর্ম্ম করিত। তাহার ঘরে একটি বিড়াল

ছিল। তাহার পাঁচটি শাবক। হঠাৎ একদিন দেখা গেল কোথা হইতে একটী ইন্দুর ক্লান্তভাবে তাহার গৃহে প্রবেশ করিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র, বোধ হয় জলে ডুবিতে ডুবিতে রক্ষা পাইয়াছে। সে বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল। বিড়ালমাতা ৫টী শাবকের সহিত যেখানে লুক্কায়িতভাবে শয়ন করিয়াছিল, ইন্দুর আস্তে আস্তে সেখানে গমন করিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বিড়াল মাতার হৃদয়ে বোধ হয় দয়ার সঞ্চার হইল। সে তাহাকে না মারিয়া শাবকদিগের মধ্যে গ্রহণ করিল এবং আহার দিয়া তাহার কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইন্দুরও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন প্রদর্শনে ত্রুটি করিল না। ভক্ষ্য ভক্ষকের মধ্যে এইরূপ সম্প্রীতি দেখিয়া শ্রমজীবী পরিবার, যারপর নাই আশ্চর্য্য হইল। কিন্তু কেহ ইহাদিগকে বিরক্ত না করে, এইজন্য সতর্কতা অবলম্বন করিল। দিনের পর দিন যায়, ইন্দুর বিড়ালদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিল না। প্রত্যুত ইন্দুর ও বিড়ালদিগের মধ্যে আশ্চর্য্য সখ্যভাব দেখিয়া দর্শকদিগের মন বিমুগ্ধ হইল। ইন্দুর এক্ষণে যথেষ্ট আহার পাইয়া বেশ স্থূলকায় হইয়াছে। সে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়ায়, আবার বিড়াল মাতার নিকট আসিয়া বাস করে!

নূতন সংবাদ।

১। মণিপুরের রাজবিচার শেষ হইয়াছে—বিচারকদিগের মতে মহারাজ কুলচন্দ্র মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করা দোষে দোষী এবং যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ তদুপরি কুইণ্টন প্রভৃতির হত্যার সহায়তা করিয়া আর একটী দোষ করিয়াছেন। উভয়ের প্রতিই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, এখন রাজপ্রতিনিধির কি অনুগ্রহ হয়!

২। জুন মাসের শেষে ময়মনসিংহ নাটোর প্রভৃতি স্থানে বার বার ভূকম্পন হইয়া বিভীষিকা দেখাইয়াছে।

৩। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে নিরামিষ-ভোজীদিগের এক ভজনালয় স্থাপিত হইয়াছে।

৪। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ বিলাতের স্বাস্থ্য মহাসভায় উপস্থিত থাকিবেন।

৫। বেথুন কলেজের কুমারী প্রভাবতী রায়, নগেন্দ্রবালা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেমকুসুম সেন যথাক্রমে ২০৲, ১৫ এবং ১০ টাকার জুনিয়ার ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। উদাসীন পথিকের মনের কথা—কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া মীর মহাতাব আলি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তক খানি নীলকরের অত্যাচার বিষয়ক। গ্রন্থকার এই অত্যাচার কাহিনী অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দুর্দান্ত নীলকরেরা কি প্রকারে কুলি সংগ্রহ করিত, চা বাগানে কি প্রকার কষ্টে তাহাদিগকে দিন কাটাইতে হইত ইত্যাদি বিষয় সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাম্য কন্যা কৃতার্থের সতীত্ব, আদরের ধর্ম্মানুরাগ, কেনীর অর্থ লালসা ইত্যাদির চিত্র, অতিশয় প্রশংসনীয়। ইহার ভাষাও বেশ সরল ও সুন্দর, মুসলমানগণ যে এত সুন্দর বাঙ্গালাভাষায় এরূপ পুস্তক লিখিতে সক্ষম, ইহা বড়ই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

২। হৃদশ্রু—শ্রীকালীহর বসু প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। পুস্তক খানি কাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। গ্রন্থকারের অমিত্রাক্ষর ছন্দে বোধ হয় এই প্রথম লেখা। ইহার ভাব মন্দ না হইলেও ভাষা বড়ই কঠিন। ভাষার দোষে অনেক স্থলে ভাবেরও ব্যত্যয় হইয়াগিয়াছে। স্থানে স্থানে কবিতা মন্দ হয় নাই।

৩। বিকাশ—শ্রীসুরেন্দ্র কৃষ্ণ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৶০ আনা। পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কণ যেমন সুন্দর, কবিতাগুলি সেইরূপ সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখকের বেশ কবিত্ব শক্তি আছে এবং যে বিষয় গুলিতে এই শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে কবিত্বের সার্থকতা হইয়াছে। অনেকগুলি কবিতা পড়িতে পড়িতে গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়।

৪। যোগনাথ—একটী চিত্র, মূল্য ।৶০ আনা। ইহা একটী আদর্শ জীবন সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র গল্প। মধ্যে মধ্যে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মযোগের সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল আলোচিত হইয়াছে। অনন্তের প্রেমে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া জীবন কাটাও, ইহার সার কথা। পুস্তকখানি পাঠে চিন্তাশীলতা ও ধর্ম্মভাবোন্নতির সম্ভাবনা।

৫। ইতিমধ্যে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকখানি নূতন সাময়িক পত্র ও পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি ;—জন্মভূমি, হিতবাদী, নবযুগ, শ্রীহট্ট মিহির, উগ্র ক্ষত্রিয় প্রতিনিধি এবং Indian Homœopathic Review. জন্মভূমি অতি সস্তাদরের সুন্দর মাসিক পত্রিকা। হিতবাদী অনেকগুলি খ্যাতনামা কৃতবিদ্য ব্যক্তিদ্বারা প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র। অন্যান্য পত্রগুলিদ্বারাও বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির সম্ভাবনা।

বামারচনা।

বালিকা আমার।

গাইছে পরাণ শুধু দুঃখময় গান,—
হৃদয় হয়েছে মম শ্মশান সমান।
কতবার ভাবি মনে,
সুখ স্মৃতি আলাপনে,
মুছিব হৃদয় হ'তে শোকের নিশান।
(কিন্তু) বারণ মানে না হৃদি গায় দুঃখ গান।১

কত দিন এই ভাবে রয়েছি বসিয়া,
আমার স্নেহের নিধি গিয়াছে চলিয়া—
হৃদয়ের প্রিয়তর,
সে বালিকা মনোহর,
অকালে যাইল কেন আমারে ত্যজিয়া ?
সেই দিন হ'তে আজো রয়েছি বসিয়া।২

আর কি কখন আমি সে মুখানি হেরিব ?
আর কি আদরে তারে হৃদয়েতে লইব ?
কত আশা ছিল মনে,
লইয়া স্নেহের ধনে,
সস্নেহে তাহার সেই মুখ খানি চুমিব—
যতনে সে বালিকারে হৃদয়েতে রাখিব।৩

হায়! এপোড়া কপালে যদি সেই সুখ থাকিবে—
তা হলে এ হৃদি কেন আঁখি জলে ভাসিবে?
চির অভাগিনী আমি,
সুখ কি? কভু না জানি,
চিরদিন দুঃখ স'য়ে এজীবন কাটিবে।
চিরকাল!পোড়া হৃদি অশ্রুজলে ভাসিবে।৪

স্নেহের সন্তান রত্নে বঞ্চিত হইয়া,
অভাগী জননী কাঁদে বিরলে বসিয়া।
কিবা আর গৃহকাজ,
কি সুখ সংসার মাঝ?
যেথানে সন্তান তার গিয়াছে চলিয়া—
যেতে চায় মন সেথা ধাবিত হইয়া।৫

কোথায় অজানা রাজ্যে গেছে সে রতন
কেমনে পাইব আমি তার দরশন ?
সতত হেরিতে তারে,
পরাণ কেমন ক'রে,
কি ব'লে বুঝাব অন্যে হৃদয় বেদন ?
জানেন বেদনা মোর ভুক্তভোগী জন! ৬

সংসার সুখের সার ভাবি মনেমন।
যে বালিকা সুখে দিন যাপিছে এখন—
জানেনা সে পর পার;
কি যে ঘোর অন্ধকার,
জানে না এ বিশ্ব শুধু মায়ার ছলন—
"সংসার" "সুখের সার" বলে কোন্ জন? ৭

জগদীশ! কৃপা করি হের কৃপা নয়নে!
কত ব্যথা সবে নাথ! অবলার পরাণে?
অধমা তনয়া আমি,
ভক্তি স্তুতি নাহি জানি,
কৃপা কর কৃপাময় এ অধম সন্তানে!
ঘুচাও এ দুঃখরাশি স্নেহবারি প্রদানে!।৮

——শ্রীমতী নি——
পূঁড়া।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৯ সংখ্যা। } শ্রাবণ ১২৯৮—আগষ্ট ১৮৯১। ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বৈদ্যনাথ কুষ্ঠনিবাস—বৈদ্যনাথে দেবতার বরে আরোগ্য হইবার জন্য অনেক দরিদ্র কুষ্ঠ রোগীর সমাগম হয়, কিন্তু বাসস্থান, আহার, পানীয় জল ও বস্ত্রের অভাবে তাহাদের যে দুরবস্থা তাহা অবর্ণনীয়। সুবিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণ বাবু রাজনারায়ণ বসু কয়েকটী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া ইহাদের সাহায্যার্থে চাঁদা তুলিতেছেন, এবিষয়ে দয়াশীল ব্যক্তিদিগের যথাসাধ্য সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গনিবাসীর মোকর্দ্দমা—কয়েক মাস হইল বঙ্গনিবাসী ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম সাধারণের উপর অকথ্য ভাষায় গালি বর্ষণ করেন এবং বিশেষ ভাবে একটী সম্ভ্রান্ত মহিলার চরিত্র আক্রমণ করেন। আদালতের বিচারে পত্রাধ্যক্ষের ১০০৲ টাকা জরিমানা ও ৬ মাস মেয়াদ, প্রকাশকের ৩ মাস মেয়াদ এবং প্রিণ্টারের ৫০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। আমরা এজন্য দুঃখিত, বিশেষতঃ পত্রাধ্যক্ষ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারাদি দ্বারা সমাজের যেরূপ কল্যাণসাধন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার জন্য বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু সংবাদপত্র প্রকাশকগণ আপনাদিগের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া ভদ্রপরিবার ও স্ত্রীলোকদিগেরও মিথ্যাগ্লানি অবাধে প্রচার করিবেন, ইহা কখনও বাঞ্ছনীয় নয়। বঙ্গনিবাসীর বিরুদ্ধে ৩টী অপরাধ সাব্যস্ত হয়, একটীর জন্য এই দণ্ড হইয়াছে, ব্রাহ্মেরা আর ২টীর দণ্ড হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

সমাজ সংস্কার—জয়পুর ও ভাউনগরের রাজারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্মতি আইন স্ব স্ব রাজ্যে প্রচলিত করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকদিগের অধিকার—যুক্তরাজ্যে স্ত্রীলোকদিগের অধিকার বিধিবদ্ধ হইতেছে—কানসাস প্রতিনিধি সভা প্রায় একবাক্যে "স্ত্রীলোকদিগের পূর্ণ অধিকারের" ব্যবস্থা করিয়াছেন। উইসকনসিন প্রতিনিধি সভা অধিকাংশের মতে স্থির করিয়াছেন, বিবাহিতা রমণীগণের মধ্যে যাঁহারা উকীল, তাঁহারা কোর্ট কমিসনর ও আসাইনীর কার্য্য করিতে পারিবেন। অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের ওকালতী করিবার ক্ষমতা ইতিপূর্ব্বেই ছিল। মিসৌরী প্রতিনিধি সভায় বিদ্যালয়ের মনোনয়নে স্ত্রীলোকদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য এক বিল উপস্থিত হইয়াছে।

নবীন সন্ন্যাসিনী—"বাল্‌টিমোর সন" সংবাদপত্র সম্পাদকের কন্যা কুমারী এবেল সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রোমান্ ক্যাথলিক চর্চ্চে উৎসর্গীকৃত হইবে।

মার্কিন দীপমক্ষিকা—ইহা ১ বুরুলের অধিক দীর্ঘ এবং ইহার শরীর দেখিতে জ্বলন্ত মণির ন্যায়। তত্রত্য রমণীরা নৃত্য করিবার সময় অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে এই জোনাকি পোকা দ্বারা কেশ ও বস্ত্র ভূষিত করেন, দেখিতে চমৎকার হয়। মণ্ট্রিয়েলের প্রথম ফরাসী উপনিবেশীরা বেদীর সম্মুখে বর্ত্তিকার পরিবর্ত্তে এই দীপমক্ষিকা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিতেন।

ইউরোপে শবদাহ—ইংলণ্ডে শবের সমাধির পরিবর্ত্তে দাহ হইতেছে, আমরা অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি। ইউরোপের অন্যান্য স্থানেও ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৮৯০ সালে এক পারিস নগরে ৬৩৮৮টী দাহকার্য্য হইয়াছে।

লেডী ইলিয়টের সৌজন্য—কলিকাতার কোন কোন কলেজের ছাত্রগণকে লইয়া ছোট লাট বোটে করিয়া ভ্রমণ ও তাহাদের সহিত বিশেষ আলাপ করেন। ছোট লাটপত্নী এবিষয়ে সহকারিতা করিয়াছেন।

বানরের ভাষা—অধ্যাপক গার্ণার ফনোগ্রাফ দ্বারা বানরের ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। কালে আরও কতই হইবে!

ভারত ভগিনী—লাহোর হইতে হিন্দী ভাষায় এই নামে একখানি সুন্দর পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। বিলাত প্রত্যাগত সুশিক্ষিতা হরদেবী ইহার সম্পাদিকা। ইহাতে সাহিত্য, সমাজসংস্কার, নীতি ও ধর্ম্ম নানা বিষয়ের প্রবন্ধ লিখিত হয়। আমরা ভগিনীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

আর্য্য-মহিলা।

সাবিত্রী।

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।"

আজ ভারতভূমি যাহাই হউক, একদিন অতুল কীর্ত্তিমন্দির ছিল। আজ ভারতকে বিদেশ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, একদিন ভারতই লোক-শিক্ষার অদ্বিতীয় ছিল। এই ভারতে এক-দিন এক দেবাঙ্গনা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একদিন ভারতের নাম চিরস্মরণীয় করিতে এক অপূর্ব্ব দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল, —সে অনেক দিনের কথা, আজ আর সে দেবী ভারতে নাই, ভারতের অণু পরমাণু খুঁজিলেও তাঁহার শেষ চিহ্ন পাইবার সাধ্য নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহার অমৃত কিরণে ভারতবক্ষ অমৃতময় হইয়াছে। তাঁহার পবিত্র নাম, মৃত সঞ্জীবন নাম, ভারতের ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইতেছে; বুঝি ভারতবাসীর মলিন প্রাণ—নির্জ্জীব প্রাণ পবিত্র ও জীবন্ত করিতেছে। সেই সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর নাম সাবিত্রী। "সাবিত্রী সমানা হও" ইহাই ভারত রমণীর শ্রেষ্ঠ-তম আশীর্ব্বাচন। যেমন একাক্ষরের উচ্চারণে পরম ব্রহ্মের অনন্ত নাম বুঝায়, সেইরূপ "সাবিত্রী সমানা হও" বলিলে আশীর্ব্বাদপাত্রীকে "জ্ঞান ধর্ম্মে ভূষিতা হও, ভক্তি প্রীতি রক্ষার্থে সুকুমারী হও, ধর্ম্ম রক্ষার্থে তেজস্বিনী হও, আদর্শ পতিপ্রাণা হও, স্বামীর সর্ব্বার্থ-সাধিকা, সর্ব্বমঙ্গলা, মৃত্যুভয়নাশিনী হও, সুতরাং বৈধব্যাবস্থার অতীত হও" ইত্যাদি শুভময়ী হইতে বলা হয়। আর্য্য জাতির বিশ্বাস, যিনি সাবিত্রী ব্রত করিতে পারেন, সে রমণী কখনই বিধবা হন না। তাই তোমাদিগকে ডাকিতেছি, ভগিনীগণ আইস, সকলে মিলিয়া সেই অমরকীর্ত্তি রমণীর অমৃতময় নাম কীর্ত্তন করিব। আমরা অক্ষম হই, দুর্ব্বল হই, অণু হই আর পরমাণু হই, অমৃতে অরুচি হইবে কেন?

সাবিত্রী অশ্বপতি রাজার একমাত্র কন্যা। অশ্বপতির বিবরণ যতটুকু জানা যায়, তাহাতে তাঁহাকে একজন বহু-গুণান্বিত ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। কন্যার নামকরণেও তাঁহার ধর্ম্মভাব ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সাবিত্রী অর্থে "আর্য্যগণ জনয়িত্রী, সূর্য্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ভবানী, গায়ত্রী" ইত্যাদি সুপবিত্র অর্থগুলি নির্দ্দেশ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কন্যাকে যেরূপে সুশিক্ষিতা করেন, তাহাতে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এ নীতি বাক্যের সার্থকতা দেখা যায়।

শত উপদেশের অপেক্ষা, একমাত্র সাধুদৃষ্টান্তের অধিক কার্য্যকরী শক্তি, এই মনে করিয়াই পিতা সাবিত্রীকে

পবিত্র ও শান্তিময় স্থানে যাইতে আদেশ দিতেন। যেখানে দুর্জ্জনের ভয় আছে, একবিন্দু পাপেরও সংস্রব আছে, সেখানে অবলার পক্ষে অবরোধপ্রথা প্রার্থনীয়। আর যেখানে পুণ্য আছে, পবিত্রতা আছে, দেবতার অভয় আছে, সেখানে রমণী মুক্ত। কিন্তু অভিভাবকেরা এইরূপ ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশে অনেক অভিভাবক ইহা বুঝেন না। "আমোদ" বলিয়া পুরবাসিনীগণকে নরকের চিত্র দেখাইতেও সঙ্কুচিত হন না, আবার 'লোকে কি বলিবে" ভাবিয়া পবিত্র স্থানে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে সাহসী হন না! নানা কারণে আমাদের ঘরগুলি এমন হইয়াছে। তাই, বাঙ্গালির মেয়েগুলির কপাল, এক আগুনে পোড়ে নাই!

যাহা হউক, সাবিত্রীর কথা বলিতেছিলাম—সাবিত্রী অনেক সময়ে তপোবনে যাতায়াত করিতেন। সেখানে বনজাত তরুলতার শ্যামল ছটা দেখিয়া, নব বিকশিত কুসুমকুলের শোভা ও সুগন্ধ পাইয়া, বৃক্ষশাখাসীন বিহগগণের মধুর কাকলী শুনিয়া পরম প্রীত হইতেন। তপস্বীদিগের পালিত মৃগশিশু এবং অন্যান্য নিরীহ পশু যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতেছে; ক্ষীণ তটিনী কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইতেছে; প্রকৃতির সেই রমণীয় উপবনে, প্রকৃতি দেবী সরলা বালিকা হইয়া পবিত্রতা শিক্ষা করিতেছেন! সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রাজ-পুর-বাসিনী সাবিত্রীর হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যাইত। তপোবন পুণ্যময়; তাই তাপস তাপসী দিগের ধর্ম্মপ্রাণতা, সত্যপ্রিয়তা, আত্মত্যাগ, পরহিতৈষণা প্রভৃতি দেখিয়া সাবিত্রী-হৃদয় বিগলিত হইত। সাধুতার প্রতি একান্ত টান হইলে তাহার কিছু না কিছু আয়ত্ত হইয়াই থাকে; বিশেষতঃ সাধুসঙ্গ জীবনের অমৃতস্বরূপ। সাধু সঙ্গের গুণেই রত্নাকর দস্যু বাল্মীকি মুনি; জগাই মাধাই দুর্ব্বৃত্ত, নরদেবতা; শবরী, দেবী। তাই হিন্দু শাস্ত্রে সাধু-সঙ্গ অবলম্বন করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ আছে। তাই আমাদের পবিত্র-হৃদয়া সরলস্বভাবা, সুশিক্ষা-প্রাপ্তা সাবিত্রী তরুণ বয়সে, সাধু দৃষ্টান্ত ও সংসর্গগুণে এক অলৌকিক, দেবী জীবন লাভ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে অবন্তীরাজ দমসেন, অন্ধ ও শত্রুদিগের কৌশলে রাজ্যভ্রষ্ট হন। উপায়ান্তর অভাবে নিজ সহধর্ম্মিণী এবং একমাত্র বালক পুত্র সত্যবানকে লইয়া তপোবনে বাস করেন। দমসেন চক্ষু ও রাজ্য হারাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মঙ্গলময় বিধাতার কার্য্য বুঝিবে কাহার সাধ্য? মানুষে যাহা বিশেষ অকল্যাণকর মনে করে, তাহা হইতেই হয়তো তাহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ কল্যাণ সাধিত হয়। রাজা দমসেন চক্ষু ও রাজ্য হারাইয়া যাহা লাভ করিলেন; তাহা দেবতার লোভনীয়। রাজভব-

নের কূট শিক্ষায়, সম্পদের আসুরী উত্তেজনায় এবং চাটুকারদিগের আপাত-মধুর স্তুতি বাদে, অনেক দেব চরিত্র—তরুণ বয়সে রাক্ষস চরিত্রে পরিণত হইতে পারে। রাজা দমসেনের স্নেহের ধন সত্যবান্, বালক বয়সে পর্ণ কুটীরে থাকিয়া, ব্রহ্মপরায়ণ ও সংযতেন্দ্রিয় তপস্বীদিগের শিক্ষা ও সাহচর্য্য পাইয়া, আজন্মশুদ্ধ এক আদর্শ জীবন প্রাপ্ত হইলেন। রাজা দমসেনের "গরলে অমৃত" হইল।

আগে বলিয়াছি অশ্বপতি-তনয়া সাবিত্রীদেবী তপোবনভ্রমণে যাইতেন। এইখানে সাবিত্রী সত্যবানে শুভ সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে উভয়ের গুণ বুঝিলেন। বুঝিলেন উভয়ে উভয়ের হইতে পারিলেই জীবন সফল হইবে। কিন্তু সে হৃদয় যুগল, দুর্ব্বল হৃদয় নয়; সে হৃদয় যুগল ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গীকৃত, তাই অনুরাগের আকর্ষণ বিশেষ প্রবল হইলেও সে হৃদয়-দ্বয় শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিল না, উভয়ে উভয়কে মনের কথা জানিতে দিল না। সেই বয়সে এমন বিজ্ঞতা, এমন পরিণাম-দর্শিতা, এমন সংযত-চিত্ততা সাধারণ মস্তিষ্কের ও সাধারণ চরিত্রের ক্রিয়া হইতে পারে না।

সত্যবান্ নিজের আকাঙ্ক্ষাকে "দুরাকাঙ্ক্ষা" মনে করিলেন। সত্যবান্ আশ্রয়হীন, রাজকুমারী কি তাঁহার দুর্ভাগ্য-সহচরী হইতে পারেন? সত্যবান্, সে রমণীরত্ন গ্রহণ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইতে পারেন সত্য, কিন্তু সুকুমারী রাজবালাকে বনবাসিনী করিবেন কি করিয়া? তাঁহার মত "অপাত্র"কে সাবিত্রীদেবী পতিত্বে বরণ করিবেনই বা কেন? এই সকল মনে করিয়াই সত্যবান্ মনের কথা প্রকাশ করিলেন না। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত ছিল, মনের কথা প্রকাশ করিলেও সত্যবানকে নিন্দিত বলা যাইত না। এইখানেই আমরা সত্যবানের কর্ত্তব্য বোধ—সত্য-বানের আত্মসংযমের বিশেষ পরিচয় পাইতেছি। এ যদি চোখের ভালবাসা হইত, এ যদি দুষ্মন্ত রাজার অনুরাগের ঝোঁক হইত, তাহা হইলে সত্যবান্ এত ভাবিবার অবকাশ পাইতেন না।

সাবিত্রীর সেরূপ প্রতিবন্ধকতা ঘটিল না। সাবিত্রী বুঝিলেন সত্য-বানের মত নর-দেবতার সহধর্ম্মিণী হইতে পারিলেই সাবিত্রী-জীবন ধন্য হইবে। সত্যবান্ যাহার স্বামী, তাহার বনবাস, স্বর্গবাস। সাবিত্রী জানেন, বিবাহ বাণিজ্য ব্যবসায় নহে। সাবিত্রী জানেন, ধন গৌরব, পদ মর্য্যাদা প্রভৃতি পার্থিব জিনিসের উদ্দেশ্যে যে বিবাহ, সে বিবাহ বিবাহই নহে। সাবিত্রী জানেন, বিবাহের উদ্দেশ্য স্বামী স্ত্রীর উভয় আত্মা একত্রে যোগ করা, সেই মিলিত, সেই দুয়ে এক আত্মা, পরমাত্মায় সমর্পণ করা। এই সকল নিগূঢ় রহস্য জানেন বলিয়াই সাবিত্রী, সত্যবানের

অজ্ঞাতে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন; সাবিত্রীর পবিত্র হৃদয় মন্দিরে, পবিত্র দেবতার প্রতিষ্ঠা হইল। এখন সামাজিক সম্প্রদানের কর্ত্তা পিতা।

মাতা সাবিত্রীর এই "অপরিণামদর্শিতায় দুঃখিত হইলেন।" তাঁহার স্নেহের সাবিত্রী, রাজপুত্রের সহিত বিবাহিতা হইবেন, রাজভবনের ভোগ বিলাসে "পরম সুখী" হইবেন, এখন রাজকুমারী পরে রাজ-বধূ হইবেন, তাহা হইলেই মা'র সকল সাধ পূর্ণ হয়। সাবিত্রী রাজকুমারী; সাবিত্রী তপস্বিনী হইয়া বনে বনে ফিরিবে, যাহার সেবা শুশ্রূষার জন্যে শত শত পরিচারিকা রহিয়াছে, সে আবার অন্যের পরিচর্য্যা করিবে, যাহার জন্য কত রাজভোগ প্রস্তুত হয়, সে আবার বনজাত ফলমূল খাইবে, ইহা স্নেহময়ী মায়ের প্রাণে সহিতেই পারে না। মা সাবিত্রীকে অনেক বুঝাইয়া এ "ভীষণ কামনা" পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু মা'র অনুনয় বিনয়, সবই নিষ্ফল হইল। স্রোতের মুখের তৃণের ন্যায় সবই ভাসিয়া গেল। মাতৃ-ভক্তির অনুরোধে আর সবই পারা যায়, কেবল ধর্ম্মকে অবমাননা করিতে পারা যায় না। তাই সাবিত্রী মায়ের অন্যায় কথা রাখিতে পারিলেন না। আহা, মা! তুমিতো জান না তোমার সাবিত্রী তোমার গর্ভ পবিত্র করিতে আসিয়াছেন। তুমিতো জাননা তোমার সাবিত্রী, ভারতভূমিকে "পুণ্যময়ী" করিতে আসিয়াছেন! আর তুমিতো জাননা তোমার সাবিত্রী বসুমতীকে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছেন! জান না বলিয়াই কাঁদিতেছ, জানিলে কতই হাসিতে!

সাবিত্রীর সঙ্কল্প, তাঁহার পিতার শ্রুতিগোচর হইল। গান্ধারী দেবীর পিতা আপনার স্বার্থের মন্দিরে কন্যা বলি দিয়াছিলেন, সাবিত্রী দেবীর পিতা কোন সময়ে পিতৃ-কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করেন নাই। "অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাত ধর্ম্মশাসনাং" এ নীতি আমরা সাবিত্রীর পিতাকে পালন করিতে দেখিয়াছি। আবার এখন তিনি মনে করিলেন "সাবিত্রী যতই ধর্ম্মশীলা হউন, যতই জ্ঞানবতী হউন, তথাপি বালিকা। * বালিকার অভিপ্রায়ানুসারে অজ্ঞাত কুলশীল, অজানিত চরিত্র সত্যবানকে সহসা কন্যাদান করিতে হইলে হয়তো ভবিষ্যতে অনুতপ্ত হইতে হইবে।" তাই তিনি সত্যবানের পরিচয় পাইতেই বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। আজ কাল দেশের নব্য স্বাধীনতাবাদী যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু সাবিত্রী-জনকের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

এই আন্দোলনের সময়ে দেবর্ষি নারদ, রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা অশ্বপতি তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ

* অবশ্য দশম বর্ষীয় বালিকা নহে।

আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহার স্নেহের সাবিত্রীর অভিলষিত পাত্র সত্যবানের পরিচয় সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবর্ষি সত্যবানের পরিচয় ও সদ্গুণ সকল বর্ণনা করিলেন। রাজা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলেন। রাজা গুণের মর্য্যাদা জানেন। ধনবান্ পাত্র অপেক্ষা গুণবান্ পাত্রে কন্যাদান করাই পিতার গৌরব। কিন্তু দেবর্ষি সত্যবানের কথা শেষ করিয়া সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "বৎসে ! সত্যবান্‌কে ছাড়িয়া অন্য সুপাত্রকে পতিত্বে বরণ কর।"

তাও কি হয়? দেবতাকে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া কি ফিরাইয়া পাওয়া যায়? দেবর্ষি, গার্হস্থ ধর্ম্মহীন ভগবৎ-সাধক, তাই বুঝি জগতের শিক্ষক হইয়াও সাবিত্রী-হৃদয় বুঝিলেন না। সাবিত্রী যে মরজগতে বিশ্ববিধাতার প্রেমপ্রতিমা, তাহা জানিলেন না।

সাবিত্রী কর-যোড়ে উত্তর করিলেন, "দেব, যাঁহাকে একবার পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িলে আমি ধর্ম্মতঃ পতিতা হইব। অতএব আমার প্রতি সেরূপ আদেশ করিবেন না।" সেই বিনীতা অথচ তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখিয়া, দেবর্ষি প্রীতও হইলেন, বিস্মিতও হইলেন। বালিকাতে এতই ধর্ম্মভাব, এতই অনুরাগ! যাহা হউক তথাপি আবার বলিলেন "বৎসে! তুমি সত্যবান্‌কে ছাড়িয়া অপর কোনও সুপাত্রকে পতিত্বে বরণ কর।"

তখন সাবিত্রী দেবী দৃঢ় অথচ কোমল স্বরে উত্তর করিলেন "যাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করা যায়, তিনিই প্রকৃত পতি। আমি জগদীশ্বরের সাক্ষাতে যাঁহাকে বরণ করিয়াছি, তিনি যাহাই হউন, তাঁহার যে কোন অযোগ্যতাই থাকুক, তিনিই আমার স্বামী। তিনি আমার অত্যাজ্য।"

এইখানে পাঠিকা, সাবিত্রীর হৃদয়ের বল দেখ! সত্যবান্ কিসে অবরণীয়, তাহা জানিতে সাবিত্রীর আকাঙ্ক্ষা নাই। যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে, সাবিত্রী স্বামী বলিয়া পূজা করিতে পারেন, সত্যবান্ সেই সকল গুণে ভূষিত। সাবিত্রী সত্যবানকে জানিয়াই পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। যখন পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন সত্যবান্ যাহাই হউন, সাবিত্রী তাঁহারই অনুরক্ত। জগতে এমন ঘটনা কি আছে, যে সতী পতি ত্যাগ করিতে চাহিবে? যদি একদিন পর্ব্বত-শৃঙ্গের পতন সম্ভাবিত হয়, তথাপি সতীর হৃদয় পতিচ্যুত হইবে না। এ কথা কোথায় শিখিলাম? শিখিলাম, সাবিত্রী দেবীর কাছে। দেবর্ষির এত আগ্রহ, তথাপি সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করেন না সত্যবানকে পতি-রূপে গ্রহণ করিতে বাধা কি? সে কথা সাবিত্রীর অনাবশ্যক। সাবিত্রী কেবল সত্যবানেরই! ইহারই নাম পাতিব্রত্য!!

যাহা হউক উভয়ের বাদানুবাদ

শুনিয়া রাজা যেরূপ বিস্মিত হইলেন, সেইরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। সত্যবান্ সুপাত্র, ধনের জন্য দেবর্ষি কখনই আপত্তি করিবেন না। এরূপ স্থলে পুনঃ পুনঃ নিষেধের কারণ জানিবার জন্য রাজা একান্ত অস্থির হইলেন এবং দেবর্ষিকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রীর একাগ্রতা দেখিয়া ও রাজার মিনতি শুনিয়া দেবর্ষি যাহা গোপন করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে বাধ্য হইলেন।—বলিলেন "সত্যবান্, সর্ব্বাংশে সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্র হইলেও অল্পায়ু, অদ্য হইতে একবৎসরের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইবে।"* এই কথা শুনিয়া রাজার হৃদয় বজ্রাহত হইল। তিনি উত্তর করিলেন "তবে সত্যবান্‌কে কন্যা দান করা আমার অকর্ত্তব্য। সাবিত্রী বালিকা, বালিকা-কৃত কার্য্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পারে না।"

যে বালিকার মঙ্গলের জন্য এই সকল কথা হইতেছিল, সে বালিকা কিন্তু এখনও তাহার অটল স্থিরতা হারাইল না! অই নবস্ফুট কুসুমে এতই জীবনী শক্তি যে বজ্রাঘাতেও তাহা শুকাইল না। দীনতাও তুচ্ছ কথা, হীনতাও তুচ্ছ কথা, পবিত্রতার প্রতিমা সাবিত্রীর হৃদয়ে এতই দৃঢ়তা, এতই বীরত্ব যে দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা, অকাল বৈধব্যের ভয়েও সে প্রাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। তখনও সাবিত্রী অবিচলিত ভাবে বলিলেন "জন্ম হইলে মৃত্যু হইবেই। তাই বলিয়াই কি মৃত্যু-ভয়ে অধর্ম্মাচরণ করিব? আমি যাঁহাকে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তিনি যাহাই হউন, তিনি আমার স্বামী!" যেন সাবিত্রী এই কথা বলিতে চান, "বৈধব্যের ভয়ে সত্যবান্‌কে ত্যাগ করিয়া অন্যকে বরণ করিব, সে ও তো মরিতে পারে! মৃত্যু যখন অপরিহার্য্য, তখন অধর্ম্ম করিব কিসের লোভে?"

ধন্য সাবিত্রী! স্বামীর জন্য রমণীকে অনেক করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু বৈধব্যাবস্থা উপেক্ষা করিতে দেখি নাই! যে যাতনা-ভয়ে কত শত রমণী, স্বামীর চিতায় পড়িয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন, সেই অব্যক্ত অসহ্য যাতনা, সাধিয়া লইতে এই প্রথম দেখিলাম, বুঝি এই শেষ দেখিলাম! ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে বলিয়া তরুণ বয়সে "বৈধব্য" চাহিয়া লইতে এই প্রথম দেখিলাম, বুঝি এই শেষ দেখিলাম! এমন ধর্ম্মনিষ্ঠা, এমন অনুরাগ, এমন সাহস আর কোথায় দেখিব? স্বদেশে যাও, বিদেশে যাও-

* শরীরবিজ্ঞানে, ক্ষয়, যক্ষ্মা, হৃদ্রোগ (প্রভৃতি) গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মৃত্যুর নির্দ্দিষ্ট সময় জানা যায়। যাঁহারা জন্মকোষ্ঠী অথবা দেবর্ষির ভবিষ্যৎ জ্ঞান, বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা সত্যবান্‌কে ঐরূপ কোন রোগগ্রস্ত মনে করিলেই করিতে পারেন। এখানে আমাদের মতামত অনাবশ্যক।

হীরা পাইবে, মুক্তা পাইবে, শকুন্তলা ডেস্‌ডিমোনা পাইবে, কিন্তু সাবিত্রী আর পাইবে না! বিধাতার প্রেমপ্রতিমা, নরজগতের "মহাশক্তি," আবার ভারতে দেখিব কি?—কও মা, বিশ্বজননী! আর একবার দেখাইবে কি?

এই বারে দেবর্ষি, সব বুঝিলেন। যিনি স্রষ্টৃ-তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে তাঁর কতটুকু সময় লাগে? দেবর্ষি বুঝিলেন, সাবিত্রী-হৃদয় কিরূপ উপকরণে গঠিত হইয়াছে! দেবর্ষি বুঝিলেন, সাবিত্রী হৃদয়ে কোন্ বৃত্তি গুলি অনুশীলিত হইতেছে! দেবর্ষি বুঝিলেন, সাবিত্রীর প্রাণ কাহার প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছে! দেবর্ষি বুঝিলেন, কেন সাবিত্রী-হৃদয় যুগপৎ—"বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুনি কুসুমাদপি!" বুঝিয়া বলিলেন, মা! তুমি কখনই বিধবা হইবে না। আশীর্ব্বাদ করি এ বিবাহ শুভময় হউক।"

রাজা অশ্বপতি সাবিত্রী সত্যবানে বিবাহিত করিলেন। সাবিত্রী পরমানন্দে পিতৃভবন সুখময় রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া দারিদ্র্যময় স্বামীর পর্ণকুটীরে বাস করিতে গেলেন। সাবিত্রী যেমন সেবা-পরায়ণা, ভক্তিপরায়ণা, সেইরূপ গৃহ কর্ম্মে সুশিক্ষিতা। শ্বশুর শাশুড়ী সাবিত্রীকে পাইয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। প্রতিবাসী তাপস তাপসীরা সাবিত্রীর গুণে মুগ্ধ হইলেন। সাবিত্রীর নৈপুণ্যে সেই পর্ণকুটীরও রাজ-সংসারের ন্যায় "অভাবহীন" হইল। যে মেয়ে গৃহধর্ম্মে অমনোযোগিনী—ছি! তার হাতে সোণার সংসারও "টানাটানি" ভরা।

যে কোন জিনিস—অমূল্যই অতুল্যই হউক, যে কোন জিনিস চিরদিন প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিবার আশা থাকে, তাহার ততটা মর্য্যাদা বোঝা যায় না। গ্রীষ্মকালের দিনে নিত্যই সূর্য্যের আলোক, সূর্য্যালোকের মর্য্যাদা তখন বোঝা যায় না। তারপর বর্ষার সময় যত নিকটে আইসে, সূর্য্য যে কেমন পদার্থ, তাহা ততই হৃদয়ঙ্গম হয়। যখন মা'র কাছে থাকা যায়, তখন মা' যে কেমন জিনিস তাহা বোঝা যায় না, তারপর মা'র কাছছাড়া হইবার দিন যত নিকটস্থ হইতে থাকে, ততই মা'কে ছাড়িয়া একদণ্ড থাকিতে ইচ্ছা করে না। সত্যবানের উপরে সাবিত্রীর ভাল-বাসা এই রকম শক্তিতে বাড়িয়াছিল। সাবিত্রীর এত সাধনার দেবতা, সাবিত্রী দুদিন প্রাণ ভরিয়া পূজা করিতে পারি-বেন না! সত্যবানকে—সেই উপাস্য দেবতাকে, সাবিত্রীর বিদায় দিতে হইবে! আর দিন কতক পরে সত্যবান্ এজগতে থাকিতে পারিবেন না! তাই সাবিত্রী—দিন ফুরাইয়া আসিতেছে বলিয়াই প্রাণ ভরিয়া, স্বামীকে ভাল বাসিয়া লইতেছেন,—নিজে ইচ্ছা করিয়া নয়, ইচ্ছা করিয়া ভালবাসা যায় না—কর্ত্তব্য পালন করা যায়। ভালবাসা, সব বুঝিয়াছে, এই কয়দিনের মধ্যে

তাহার সমস্ত কাজ করা চাই, তাই বুঝি সকল শক্তি একত্র করিয়া তাহার ক্ষমতা দেখাইতেছে। তাই এই কয় দিনেই সাবিত্রী সত্যবান্‌গতপ্রাণ হইয়াছেন। সাবিত্রীর পতিই ধ্যান, পতিই ধারণা, পতিই যোগ, পতিই সাধনা হইয়াছে। ভালবাসার "ক্রমোন্নতি" স্বীকার করি, কিন্তু পথে কোন বাধা দেখিলে ভালবাসা যে অবক্তব্য ক্ষমতা দেখাইয়া থাকে, একথা আরও স্বীকার করি। মা' যে রোগা সন্তানটীকে সকলের অপেক্ষা স্নেহ করেন, তাও এই কারণে। *

এইখানেও সাবিত্রীর অলৌকিক ক্ষমতা দেখা যায়। আমরা জগতে দেখিতে পাই, মনে কোনও দুর্ভাবনা থাকিলে, মনে আত্মীয় স্বজনের অনিষ্টা-শঙ্কা প্রবল হইলে, অনেক সময়ে মানুষ ধৈর্য্যহারা হইয়া যায়। সাবিত্রীদেবী প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যু আশঙ্কা হৃদয়ে রাখিয়াও ধীরতা সহকারে সকল কর্ত্তব্য গুলিই পালন করিতেছেন—সে হৃদয়ে যেন আগুন জ্বলিতেছে না, সে প্রাণ যেন ভস্ম হইতেছে না! যেন কিছুই হইতেছে না! ধর্ম্ম, জ্ঞান, সাহস, সহিষ্ণুতা, পতিপ্রাণতা, গুরুভক্তি,গৃহিনী-পণা, দৃঢ়চিত্ততা—আর আমরা কয়টাই বা জানি—কোন্‌টার কি প্রশংসা করিতে হয়, তাহাও জানি না! তবে সাবিত্রী দেবীর সকল গুলিই সুন্দর, সকল গুলিই মধুর, সকল গুলিই—মনে হয়, এমন আর নাই!—কিন্তু তাই বলিয়া কেহ এমন মনে করিওনা, সাবিত্রী দেবীর কোমলতা কিছু অল্প। কোমলতায় সাবিত্রী-হৃদয় নারীগণ হইতে—আমা-দের বঙ্গবাসিনীগণ হইতে অন্যরূপ নহে। তবে মহাত্মা সক্রেটিশ যেমন স্বাভাবিক ক্রোধন প্রকৃতি হইয়াও অলৌকিক ক্ষমতা বলে ক্রোধকে সংযত করিতেন, আমাদের সাবিত্রী দেবীও সেইরূপ স্বভাবত কোমল-হৃদয়া হইয়াও এক অলৌকিক ক্ষমতা বলে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছেন—রমণীর হৃদয়ে কোমলতা না থাকিলে, সে হৃদয়ের আর গৌরব কি?

(ক্রমশঃ)

* আমাদের দেশের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে বলেন "সত্যবান্ সাবিত্রীতে কয়দিন দেখা শুনা হইয়াছিল যে এত অনুরাগ হইল?" শ্রদ্ধা-স্পদ বাবু পূর্ণচন্দ্র বসুও তাঁহার সমাজ চিন্তায় ঐ কথা প্রকাশ করিয়াছেন—তাই (আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসে) অল্প সময়ের মধ্যে গভীর অনুরাগের কারণ নির্দ্দেশ করিলাম।

প্রঃ লেঃ।

ধর্ম্মকথা।

দুঃখ যন্ত্রণা আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট আনিয়া দেয়। যে সকল দুঃখ যন্ত্রণা আমাদিগেরই কার্য্যের ফল, তাহারই মধ্য দিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে দেখা দেন।

কোন সাধুকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আপনি কোথায় ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "যেখানে আমি আমাকে হারাইয়াছি। আর যেখানে আমি আমাকে দেখিয়াছি, সেইখানে ঈশ্বরকে হারাইয়াছি।"

তোমার ঈশ্বর-ভক্তি কত বৃদ্ধি হইতেছে, ঈশ্বরের জন্য তুমি কত ত্যাগস্বীকার করিতে শিখিতেছ, ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ পাইয়া কত সুখী হইতেছ, বিশেষ কারণ না থাকিলে তাহা লোকসমাজে বলিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের সহিত তোমার প্রেমের কথা, তুমি ও তোমার ঈশ্বর জনিলেই যথেষ্ট।

তুমি যত তোমার নিজের কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে থাকিবে, ততই দেখিবে ঈশ্বর যেন তোমার নিকটতর হইতেছেন।

পবিত্র অন্তঃকরণ ব্যক্তি ঈশ্বরকে দেখিতে পান। পবিত্রতার পূর্ণতা যাঁহাতে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহাকে দেখিতে হইলে পবিত্র হইতে হইবে; অন্য উপায় নাই। পবিত্রতা লাভের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট উপায় দ্বারা যিনি ক্রমে পবিত্র হইতে থাকেন, সেই পূর্ণ পবিত্র স্বরূপের জ্যোতি সেইরূপ ক্রমে তাঁহার মনশ্চক্ষু সম্মুখে প্রকাশিত হইতে থাকে।

ধর্ম্মজ্ঞান আমাদিগের প্রাণে যে সাহস উৎপন্ন করে, সে সাহস আর অন্য কোথা হইতে আসিতে পারে না। ইহা ধর্ম্মকার্য্য, ইহা সংসাধনে ঈশ্বর আমার সহায়, এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও তাহা আমার অমৃত জীবন লাভের সোপান স্বরূপ হইবে, এই জ্ঞান যখন হৃদয়ে জন্মে, তখন মানুষ অতুলনীয় সৎসাহসের পরিচয় দেয়। ধর্ম্মেতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহা সাহসের বীজ নিহিত।

অবরোধ প্রথার উৎপত্তি।

মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদই যে অবরোধ প্রথার প্রবর্ত্তক, অনেক সত্যপ্রিয় ইতিহাসবেত্তা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মহম্মদের সময় আরব দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত ছিল। মহম্মদের সহধর্ম্মিণীগণ একদা

অবাধ্যতা দোষে দোষী হওয়াতে মহম্মদ তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য এই আজ্ঞা দেন যে তাঁহারা বাটীর বাহিরে যাইতে পারিবেন না। মহম্মদ তাঁহার স্ত্রীগণের চরিত্র সম্বন্ধে অতি সন্দিগ্ধমনা ছিলেন। কথিত আছে যে জৈনাব নাম্নী তাঁহার স্ত্রীর চপলতা জন্য তিনি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েন, এবং জৈনাব যাহাতে কোন পরপুরুষের নয়ন-গোচর না হয়েন, তজ্জন্য তাঁহার প্রকোষ্ঠের দ্বার দেশে পর্দ্দা ফেলিয়া দেন। স্বীয় প্রথমা স্ত্রী আয়েসার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিয়া মহম্মদ তাঁহাকেও পর্দ্দার অনুবর্ত্তিনী করেন। মহম্মদ এইরূপ নিয়ম করাতে তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণও পর্দ্দার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। ক্রমে যতই মহম্মদের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই স্ত্রীলোকদিগের পর্দ্দার মধ্যে বাসের প্রথা বিস্তৃত হইতে লাগিল। ক্রমে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই মধ্যে ঐ প্রথা প্রচলিত হইলে —প্রত্যেক মুসলমান রমণী "পর্দ্দানসিনী—" হইলেন। যখন মুসলমানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখন এদেশে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না। মুসলমান প্রথার অনুকরণে এবং যথেচ্ছাচারী মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

অজাগর সর্প।

অজাগর সর্প একটা কাল্পনিক পদার্থ এইরূপ অনেকের বিশ্বাস। গল্পে অজাগর সর্পের যেরূপ বর্ণনা করা হইয়া থাকে,তাহা অসম্ভব বলিয়া বাস্তব অজাগর সর্পের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। অজাগর সর্প দুই জাতীয় ;—(১) বোয়া কনষ্ট্রিক্টর বা পাইথন্, (২) ওফিওফেগস ইলাপ্‌স। বোয়া কনষ্ট্রিক্টর দশ বার হাত লম্বা হইয়া থাকে। ইহারা জড়বৎ পড়িয়া থাকে, নড়িতে চড়িতে বড়ই অনিচ্ছু। খাদ্যাহরণের সময় একটু চলিয়া বেড়ায়। ছাগল ভেড়া ইত্যাদি জন্তু ইহাদের প্রিয় আহার্য্য বস্তু। দক্ষিণ ভারতবর্ষের জঙ্গলে এই জাতীয় সর্প দৃষ্টিগোচর হয়। ওফিয়োফেগস্ ইলাপ্স জাতীয় অজাগর সর্প আমেরিকা খণ্ডে দৃষ্ট হয়,কিন্তু সম্প্রতি গাঞ্জাম প্রদেশের অরণ্যে উহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় সর্প কুড়ি হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। ইহা পাইথনের ন্যায় অলস নহে। ইহা গোক্ষুরার ন্যায় তেজীয়ান ও বিষধর। হরিণ, শৃগাল, ছাগল ইত্যাদি জন্তু দেখিলে ইহা দৌড়িয়া গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। মানুষকেও এই জাতীয় সর্প

আক্রমণ করিয়া থাকে, এবং তাহার শরীর বেষ্টন করিয়া তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই জাতীয় সর্পের বিশষত্ব এই যে অন্যান্য সকল সর্প ইহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। গাঞ্জাম প্রদেশবাসী নীচশ্রেণীর লোকগণ এই সর্পকে পূজা করিয়া থাকে।

উৎকল রমণীর বেশভূষা।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজগণ, বঙ্গদেশ হইতে উৎকলে যাইয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। পুরাতত্ত্ববিৎ মহাশয় বঙ্গের গঙ্গা নদী, এবং গঙ্গাবংশ, এতদুভয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া এই প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উড়িষ্যার সর্ব্বাদিম কেশরী রাজগণ যে বঙ্গদেশস্থ তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হইতে গিয়া উড়িষ্যায় রাজা হয়েন তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু কেশরী রাজগণের পরবর্ত্তী গঙ্গবংশীয়েরা দাক্ষিণাত্য হইতে আগত। গোদাবরীর আর একটী নাম গঙ্গা; অবশ্য এই নাম দাক্ষিণাত্যেই প্রচলিত। গোদাবরী তীরস্থ স্থান বিশেষ হইতে যে গঙ্গবংশীয় (এই বংশের অন্য নাম চোল) প্রথম রাজা চোল বা চোরগঙ্গ উৎকলে আসিয়া শেষ কেশরীরাজকে পরাভূত করিয়া উড়িষ্যায় রাজা হয়েন, একথা এখন বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। হণ্টর প্রভৃতি অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ডাক্তার মিত্রের বিরোধী মতই প্রচার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও উৎকলের-অনেক সামাজিক রীতি নীতি, এবং বিশেষরূপে বেশভূষার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যের প্রাদুর্ভাব পূর্ব্বকালে উড়িষ্যায় অধিক ছিল। গঙ্গবংশীয় রাজগণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদির গঠন প্রণালী দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের অনুরূপ; আর্য্যাবর্ত্তের—সঙ্গীত আদৌ প্রচলিত নাই, উড়িষ্যার সঙ্গীত সম্পূর্ণরূপে তৈলঙ্গী সঙ্গীতের অনুকরণে উৎপন্ন; এখনও "দক্ষিণীগান" উড়িষ্যায় সবিশেষ আদৃত। রাজা প্রতাপচন্দ্র দেব প্রণীত স্মার্তর গ্রন্থ উড়িষ্যায় অপ্রচলিত, কিন্তু তাহা দাক্ষিণাত্যের দায়ভাগ গ্রন্থ মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। উৎকলে গোল গোল করিয়া অক্ষর লিখিবার রীতি তেলেগু লিপির অনুকরণে। ঋ এবং ৯ উড়িষ্যার "রু" এবং "লু" উচ্চারিত হয়; একটি "ল" উড়িষ্যা ভাষায় অধিক আছে, সেটির উচ্চারণ, ল এবং ড় এই দুইটির মধ্যবর্ত্তী বর্ণের এই সমুদায় উচ্চারণ দাক্ষিণাত্যেই আছে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি করণী অক্ষর তেলেগু অক্ষরের অনুরূপ। কেশরী

রাজগণের ভাষা বাঙ্গালা অথবা ঐরূপ একটী ভাষা ছিল ; দাক্ষিণাত্যের ভাষার প্রাদুর্ভাবে তাহাও স্থানে স্থানে (অথবা অল্প পরিমাণে) পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁহারা এসকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা গঙ্গবংশীয় রাজগণকে দাক্ষিণাত্য হইতে আগত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিবেন। রাজাই দেশের প্রধান অনুকরণের স্থল। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তের রীতি নীতি অল্প পরিমাণে দাক্ষিণাত্যের রীতি নীতি দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল প্রতিবেশী বলিয়া কেহ কখনও কাহাকেও অনুকরণ করে না। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষের নিকট স্বীয় প্রাধান্য কেহ বজায় রাখিতে ছাড়ে না। এবিষয়ে যাঁহারা দৃঢ় প্রমাণ চাহেন, তাঁহারা হণ্টর সাহেবের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পারেন।

বেশভূষা সম্বন্ধেও সেই কথা। উড়িষ্যায় দক্ষিণ প্রদেশীয় বেশভূষাই আদর্শস্থানীয়। প্রাচীন কবি উপেন্দ্র ভঞ্জের গ্রন্থে এবং আধুনিক উৎকল রমণীর শরীরে যে সকল অলঙ্কারের নামোল্লেখ ও দর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি আর্য্যাবর্ত্তের কোথাও প্রচলিত নাই। মাথার চাঁদ হইতে পায়ের ঝুণ্টিয়া পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের চক্ষে নূতন। বঙ্গরমণীর মাথার খোঁপা, সহরেই অনেকটা অনুকারিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও সর্ব্বত্রই শিরে "তৈলঙ্গীজোড়া"। জোড়া অর্থ উড়িয়ার খোঁপা। উড়িষ্যার গৌরবস্থল সুকবি বাবু রাধানাথ রায় তাঁহার সুপাঠ্য এবং সুমিষ্ট "চন্দ্রভাগা" গ্রন্থে যেথানেই কোন রমণীর সুন্দর বেশভূষার বর্ণনা করিয়াছেন, সেথানেই দক্ষিণের আদর্শ ধরিয়াছেন। একস্থলে আছে, 'প্রভা মণ্ডলরে (মণ্ডলে) মণ্ডিত তনু কণক গোরা ; তৈলাঙ্গী বশন ভূষণে পুণি (আরও) দিশই (দেখায়) তোরা (উজ্জ্বল)।' অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা বলিয়া রাখি। বাবু রাধানাথ রায় মহাশয় বঙ্গভাষাতেও অনেক সুপদ্য লিখিয়াছেন। ইঁহার উৎকল কবিতা বঙ্গের যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির কবিতার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

অলঙ্কারের সম্বন্ধে একটু বিশেষ বর্ণনা করিতে হইতেছে। প্রথমতঃ শিরোভূষণ। মস্তকের উপর একটা ন্যূনকল্পে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত উচ্চ খোঁপা (জোড়া)। পাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে, এদেশের সকল রমণীরই খুব দীর্ঘ কেশ। মহানদীর জলের সে গুণ থাকিলে কুন্তলবৃষ্যের পরিবর্ত্তে বোতল বোতল ঐ জলই বিক্রীত হইত। যাহার চুল নাই, সেও ফিতা এবং নেকড়া জড়াইয়া কোন মতে একটি উঁচু খোঁপা বাঁধে। খোঁপার উচ্চভাগ জুড়িয়া একখানা গোলাকার সোণার চাকৃতি থাকে। (বলা বাহুল্য আমি ধনীর গৃহের রমণীদিগের কথাই লিখিতেছি)। চাকৃতি খানার পাশ জুড়িয়া আর একখানি

অর্দ্ধচন্দ্র। তদুপরি যদি দু চারিটি কণ্টকের প্রসিদ্ধ "ফুল" গোঁজা যায়, তাহাতেও আপত্তি নাই। এইত গেল মাথার খোঁপা। তার পর আবার চুলগুলি যাহাতে উড়িতে বা ঈষৎ স্থানচ্যুত হইতে না পারে, তাহার জন্য মোম দিয়া চুলগুলি আঁটিয়া রাখা হয় এবং সিঁথির মূলদেশ হইতে প্রায় খোঁপার নিম্নভাগ পর্য্যন্ত সিঁদুর লেপিয়া দেওয়া হয়। সিঁথিতে এবং খোঁপার চতুষ্পার্শ্বে যে সকল অলঙ্কার শোভা পায়, দুই একখানি হইলে তাহার নাম করিয়া শেষ করিতাম। নাসিকা অলঙ্কার ভারে এতদূর পীড়িত, যে সালঙ্কৃতা রমণীর নাক আছে কি না, অনেক কষ্টে বুঝিয়া লইতে হয়। তাটঙ্ক প্রভৃতি কর্ণভূষণ আয়তনে এবং পরিমাণে নাসালঙ্কারের সমতুল্য বা অধিক। মণিবন্ধে এবং প্রকোষ্ঠে অন্যূন দশ রকমের অলঙ্কার; তন্মধ্যে কতুরই প্রভৃতি দুই একখানি অলঙ্কারের বহির্ব্যাস পরিমাণ হস্তের স্থূলতার দ্বিগুণের কম নহে। সেগুলি আবার ধারে এবং ভারে অনায়াসে অনেক সময়ে অস্ত্রের কার্য্য করিতে পারে। যদি কোন সালঙ্কারা রমণী ক্রোধে কাহারও উদ্দেশে বাহু নাড়া দেন, তবে খুব বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে মনে হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি নির্ব্বিরোধী ভারতবাসীর উপর অস্ত্র আইন জারি করিতে পারেন, তবে উৎকলের ভীতপুরুষ অবলার উপর গহনার আইন জারি করিলে কিছু কাপুরুষতা হইবে মনে করি না। বঙ্গরমণীর চরণালঙ্কার শোভার জন্য এবং ঝুম ঝুম করিয়া শব্দ করিবার জন্য। কিন্তু উৎকল রমণী যে প্রকারে মল পরিধান করেন, তাহাতে মনে হয় যে মল কোন প্রকারে খসিয়া না পড়ে অথবা চোরে খুলিয়া না লইতে পারে, এই দিকেই তাঁহারা অধিক সতর্ক। তবে উৎকল-চক্ষে তাহা শোভাশূন্য, এ কথা কোন ক্রমেই বলিতে পারি না। ঝুম ঝুম শব্দ না হউক, ঠুং ঠুং শব্দের ব্যবস্থা আছে; পায়ের আঙ্গুলে যে ঝুণ্টিয়া থাকে, চলিবার সময় সে কখনো নীরব থাকে না। যাহারা নির্ধন, তাহারা এত স্বর্ণালঙ্কার বা রৌপ্যালঙ্কার কোথায় পাইবে? কিন্তু তাহারাও পিত্তল এবং কাঁসার আশীর্ব্বাদে অলঙ্কারের পরিমাণ সমান রাখিতে ক্রটী করে না। আমি কখনো সমগ্র উড়িষ্যা দেশের মধ্যে অলঙ্কারভার-পীড়িতা নহেন, এমন স্ত্রীলোক দেখি নাই। অলঙ্কারের আর অধিক বর্ণনা করিব না। কি জানি, যদি এ মনোহর বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়া কেহ আবার, শ্রীকৃষ্ণ দাসের দোকান ছাড়িয়া উড়িয়া সেকরা, কাঁসারী এবং কামারদিগকে (সকলেই অলঙ্কার গড়ে) অর্ডার পাঠান।

অঙ্গরাগ এবং পরিধেয় বসনের কথা বলিয়া প্রবন্ধের শেষ করিতে চাই। উড়িষ্যা জগন্নাথ ক্ষেত্র; কিন্তু হরিদ্রা ক্ষেত্রও বটে। বিলাত-প্রত্যাগত একজন কৃষি-

বিদ্যা পারদর্শী পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি যে, উড়িষ্যার ভূমি হরিদ্রা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। হরিদ্রাক্ষেত্র উর্ব্বর করিবার জন্য অথবা উড়িষ্যায় রং ফলাইবার জন্য উড়িষ্যার কন্দজাতি নরহত্যা করিয়া জমিতে রক্ত সিঞ্চন করিত, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। রমণীর অঙ্গরাগ সেই হরিদ্রা। স্নানাদি শেষ করিয়া, অথবা অপরাহ্নে বেশ ভূষা করিবার সময় রমণীগণ সর্ব্বাঙ্গে হলুদ্ মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মেথি, আমলকী প্রভৃতির মিশ্রণে এক প্রকার মস্‌লা প্রস্তুত হয়, সেইগুলি জলে গুলিয়া মাথার চুলে দিবারও পদ্ধতি আছে।

উড়িষ্যার স্ত্রীলোকদিগের কাপড় দীর্ঘে ১৫।১৬ হাত; কিন্তু সেই কাপড় এমন জড়াইয়া জড়াইয়া পরিবার রীতি যে অবশেষে গাত্রাবরণের জন্য অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। কাপড় যত বড়ই হউক না কেন, পরিবার সময় এমন গুটাইয়া পরা হয়, যে রাজবধূ হইতে ভিখারিণী পর্য্যন্ত কাহারও কাপড় হাঁটুর নিম্ন পর্য্যন্ত পড়ে না। সহরে যে সকল মেয়েরা বাঙ্গালী মেয়েদিগের সঙ্গে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন, তাঁহারা বাঙ্গালীর মত কাপড় পরিয়া আসিয়া থাকেন; কিন্তু ঘরে গিয়া আবার দেশীয় ধরণে কাপড় পরেন। এদেশের সকল শ্রেণীর এবং সকল জাতির স্ত্রীলোকেরাই এক একখানি কৌপীন পরিধান করিয়া পরে সাড়ী পরিয়া থাকেন। কোথাও কোথাও কাছা আঁটিয়া কাপড় পরিবারও রীতি আছে।

শ্বাসপ্রশ্বাস।

জীবনের এক প্রধান লক্ষণ শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ। কি স্থলচর, কি জলচর সকল জীবের ঐ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বৃক্ষাদিতেও ঐ ক্রিয়ার অভাব নাই অর্থাৎ বৃক্ষেরাও শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে। শ্বাস গ্রহণ না করিলে কোন পদার্থ জীবিত থাকিতে পারে না। শ্বাস ক্রিয়ার অপর নাম "প্রাণন"। যাহারা প্রাণন-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, তাহারা প্রাণী পদবাচ্য। এই লক্ষণানুসারে বৃক্ষাদিও প্রাণী হইতে পারে সত্য; কিন্তু তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস অস্মদাদির দুর্লক্ষ্য; সে কারণে পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থকে প্রাণী সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। ফল, তাহারাও শ্বাস প্রশ্বাস বিশিষ্ট জীবিত পদার্থ।

শ্বাস গ্রহণের উদ্দেশ্য বা প্রধান কার্য্য —তদ্দ্বারা গৃহীত বাহ্য বায়ু দেহস্থ শোণিত পরিশুদ্ধ করিবে। শোণিতের শুদ্ধি কার্য্যের জন্যই ঐ শ্বাস ক্রিয়া বা প্রাণন বিধাতা কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে।

শ্বাস-গৃহীত বাহ্য বায়ুর বলে দেহস্থ মলিন শোণিত শ্বাসযন্ত্রে আনীত হয়, তথায় নিশ্বাসানীত বাহ্যবায়ুর অমৃত ভাগ (অক্‌সিজন্) সেই মলিন শোণিতকে পরিশুদ্ধ করে। এই কার্য্য করিতে সেখানে যে অনিষ্টকর বায়ু উৎপন্ন হয়, সেই অনিষ্টকর বায়ু প্রশ্বাস দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং গৃহীত বায়ুর অগ্রে অমৃত ভাগ (অক্‌সিজন্) পরিশুদ্ধ শোণিতের সহিত দেহের পুষ্ট্যর্থে সর্ব্বাঙ্গে নীত হয়।

যদিচ স্থলচর জলচর, ও উদ্ভিজ্জ এই তিন প্রকার জীবেরই শ্বাসকর্ম্ম নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তথাপি, ঐ প্রাণনকার্য্য সমান দেহে সমানাকারে নিষ্পন্ন হয় না। জীবভেদে ও অবস্থাভেদে উহা বিভিন্নাকার যন্ত্রের দ্বারা পৃথক্ পৃথকরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বৃক্ষের শোণিত নাই, কিন্তু তাহাদের দেহে যে রস আছে, সেই রসের দ্বারা তাহাদের শোণিতের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়; সুতরাং তদ্‌গৃহীত বাহ্যবায়ু ঐ রসকেই পরিশোধিত করে। সেই পরিশুদ্ধ রস বৃক্ষের ত্বক্ দ্বারা পত্রাদি মধ্যে নীত হয় এবং পত্রের পৃষ্ঠদেশে বাহ্যবায়ু সংযুক্ত হইয়া তাহার শোধন কার্য্য সম্পন্ন করে। বৃক্ষের নিশ্বাসযন্ত্র পত্র, তাহারই দ্বারা উহাদের প্রাণনক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। পত্রে ও ত্বকে শিরাসদৃশ সৌত্রিক সংস্থান আছে, তদ্দ্বারা বৃক্ষের সর্ব্ব গাত্রে রসাদি সঞ্চারিত হইয়া বৃক্ষদেহ পরিপুষ্ট করে।

লতা ও পতঙ্গাদি ক্ষুদ্র জীবের দেহ পার্শ্বে এক সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, বায়ু সেই ছিদ্রের দ্বারা তাহাদের দেহমধ্যে নীত হয়, হইয়া তত্রস্থ সূক্ষ্ম নাড়ীর মধ্যে চালিত হইবার সময় ঐ সকল জীবের দেহস্থ রস পরিশোধিত করে। ঐ ছিদ্রগুলিকে শ্বাসছিদ্র, এবং নাড়ীগুলিকে শ্বাসনাড়ী বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি জীবের বুকের মধ্যে স্পঞ্জ নামক বিখ্যাত পদার্থের আকার বহু-ছিদ্র-বিশিষ্ট এক প্রকার মাংসল পদার্থ আছে, তাহাই তাহাদের শ্বাসযন্ত্র। মুখ নাসিকার দ্বারা সেই মাংসল পদার্থে বাহ্যবায়ু নীত হইয়া কথিত প্রকারে প্রাণনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।

কুম্ভীর, গোধা, সর্প, ইত্যাদি উভচর জন্তুদিগকে কখন জলে কখন বা স্থলে অবস্থান করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের শ্বাসযন্ত্র অবিকল স্থলচর জীবের শ্বাসযন্ত্রের সমান হইলে চলে না। কারণ, তাহারা যে সময়ে জলমধ্যে থাকিবে, সেই সময়ে তাহাদের শ্বাসাভাবে রক্তের পরিশোধন কার্য্য বন্ধ থাকিবে, তাহাতে তাহাদের দেহে মলিন শোণিতে ব্যাপ্ত হইয়া অচিরে দেহকে পাতিত করিবে। অপিচ, যদি অবিকল জলচর জীবের ন্যায় তাহাদের নিশ্বাসযন্ত্র নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলেও তাহাদের স্থলবাস

কালে ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত। করুণাময় বিধাতা উক্ত উভয় দোষ নিবারণার্থ উহাদের শরীর মধ্যে একপ্রকার আধার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহা থাকাতে তাহাদের কোনও দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে না। ঐ সকল জীব যে সময়ে জলমধ্যে থাকে, সে সময়ে তাহাদের মলিন শোণিত সেই আধার মধ্যে ন্যস্ত থাকে; পরে যোগ্য সময়ে তাহারা যখন ভাসিয়া উঠে, তখন তাহাদের নিশ্বাসকার্য্য যথা-নিয়মে সম্পন্ন হয়, হইয়া সেই মলিন রক্তের শোধন করে। ঐ কারণে সর্প, গোধা ও কুম্ভীর প্রভৃতি কিছুকাল জল-মধ্যে নিমগ্ন থাকিতে পারে এবং থাকার উপযুক্ত কাল শেষ হইলেই তাহাদের জলোপরি ভাসমান হইতে হয়। কোন কোন উভচর জীবের ধড়ে এক এক বায়ুকোষ থাকে, তাহাতে তাহারা কিয়ৎক্ষণ ব্যবহারোপযোগী বায়ু লইয়া জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিতে সমর্থ হয়।

মৎস্যেরা নিয়ত জলমধ্যে বাস করে। সুতরাং তাহাদের প্রয়োজনীয় বায়ু সেই জল হইতেই সংগৃহীত হয়। মৎস্যের নিশ্বাসযন্ত্র কর্ণকুপ অর্থাৎ কান্‌কো। কানুকুয়ার শলাকা সমূহের উপর বহু সূক্ষ্ম শিরা আছে এবং সে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ত্বক্ দ্বারা আবৃত। জলে স্বভাবতঃই শুদ্ধ বায়ু মিশ্রিত থাকে, মৎস্যেরা সেই বায়ুবিশিষ্ট জল মুখের দ্বারা গ্রহণ করিয়া তাহা কর্ণ-কূপের (কানকুয়ার) উপর সঞ্চালিত করে। সেই সংস্পর্শে উহাদের কান্-কুয়াস্থ শোণিত শোধিত হইয়া যায়। অতএব, এই কান্‌কুয়াই মৎস্যজীবের শ্বাসযন্ত্র এবং ইহারই দ্বারা তাহাদিগের প্রাণনকার্য্য সম্পাদিত হয়।

কোন কোন ক্ষুদ্র জলজ কীটের শ্বাসকর্ম্ম তাহাদের শুঁড় দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সেই শুঁড় অতি সূক্ষ্ম ত্বকে আবৃত। তাহাতে তাহাদের দেহের মলিন শোণিত বা রস শুণ্ডে আনীত হইলেই তাহারা শুণ্ড সঞ্চালন করে। সেই সঞ্চালনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জলের গতি হয়, সেই গতিতে পুনঃ পুনঃ বায়ুপূর্ণ জলের সংস্পর্শে শুণ্ডস্থ রস পরিষ্কৃত হয়।

মলিন শোণিতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অঙ্গার পদার্থ থাকে। ঐ অঙ্গার পদার্থ দূরীকরণার্থেই নিশ্বাসকর্ম্মের সৃষ্টি। বায়ুস্থ অম্বরামৃত (অক্‌সিজন্) অংশ নিশ্বাস যন্ত্রে গিয়া শোণিতের সেই আঙ্গারিক পদার্থ দগ্ধ করিয়া দেয় এবং তাহাতেই শোণিত পরিষ্কৃত হইয়া মলিন নীল বর্ণের পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল রক্ত-বর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই কার্য্য করিতে উক্ত যন্ত্রে যে পৈত্তিকাম্ল বায়ু (কার্ব্ব-নিক আসিড্) উৎপন্ন হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রশ্বাস দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়; দেহে অবস্থান করিতে পারে না। এই বায়ু অর্থাৎ এবম্ভূত নিশ্বাসবায়ু বিশেষ অনিষ্টকর। এই বায়ু গরম ও শরীরনাশক পদার্থে পরি-

ব্যাপ্ত। অধিকক্ষণ ইহার ঘ্রাণ লইলে মস্তিষ্ক শুষ্ক ও বিকল হইয়া আইসে। ক্ষুদ্র গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে অধিক লোক শয়ন করিলে গৃহমধ্য ভাগ নিঃশ্বসিত বায়ুতে পরিপূর্ণ হয়, সুতরাং সেই নিঃশ্বসিত বায়ু শ্বাসপথে তত্রত্য মানবের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের পীড়া উৎপাদন করে। কলিকাতার পুরাতন দুর্গে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা এক সময়ে ১৪৬ জন ইংরাজ কয়েদ রাখিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে ১২৩ জন ইংরাজ উক্ত কারণে এক রাত্রের মধ্যে মরিয়া গিয়াছিল।

ইহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে যে, যদি অনেক মলিন রক্ত শীঘ্র শীঘ্র নিশ্বাস যন্ত্রে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে সকলের পরিশোধনের নিমিত্ত অধিক পরিমাণ পরিষ্কার বায়ুর ও শ্বাসকর্ম্মের শীঘ্রতার প্রয়োজন হয়। শ্বাসকর্ম্ম মৃদুভাবে হইলে অধিক শোণিত শীঘ্র পরিস্কৃত হইতে পারে না, সুতরাং রক্ত সঞ্চলন ও শ্বাসক্রিয়া উভয়েরই মৃদুতা ঘটনা হয়। এই জন্যই শ্রমের বিধান ও আবশ্যকতা আছে জানিবে। শ্রম করিলে রক্তের ও নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়, শ্বাসযন্ত্রও দ্রুত বেগে চলিতে থাকে, সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র প্রভূত রক্ত পরিস্কৃত হইয়া শরীরের বল বীর্য্য ও স্বাস্থ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে। নিদ্রাকালে পরিশ্রম নাই। তখন সমুদায় ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ থাকে। সেই কারণে সেই সময়ে নাড়ীর ও রক্তের গতি মৃদু হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসও মন্দভাব ধারণ করে। দীর্ঘকাল নিদ্রাভিভূত থাকিলেও ঐ কারণে শরীর অলস ও স্বাস্থ্যবিহীন হইয়া পড়ে। এ সকল বাক্য মনোনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, জীবের বেগ ও বীর্য্য, বল ও উৎসাহ, নিশ্বাস কর্ম্মের উপর অনেকটা নির্ভর করে এবং নিশ্বাসের ব্যাঘাত হইলে নিশ্চিত বেগের ও বীর্য্যের, বলের ও কার্য্যোদ্যমতার হানি হইয়া থাকে।

দেহস্থ শোণিতের সংশোধন করাই প্রণয়-ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য সত্য; পরন্তু উহার দ্বারা আমাদের আরও অনেক উপকার হইয়া থাকে। উহা দৈহিক উষ্ণতার প্রধান কারণ বায়ুর অক্‌সিজন্ (অম্বরামৃত) ও শোণিতস্থ মলিন আঙ্গারিক পদার্থ সংযুক্ত বা মিলিত হইবার সময় যে উত্তাপ নির্গত হয়, সেই উত্তাপ দ্বারা দৈহিক উষ্ণতা সংরক্ষিত হইয়া থাকে। শ্বাসের বৃদ্ধিতে উত্তাপের বৃদ্ধি, শ্বাসের অল্পতায় উত্তাপের হ্রাস হইয়া থাকে। পক্ষিনাড়ী মনুষ্য নাড়ী অপেক্ষা দ্রুতগতিবিশিষ্ট, সেই কারণে তাহাদের শ্বাস ও দৈহিক উষ্ণতা মনুষ্য অপেক্ষা অধিক। পক্ষীর স্বাভাবিক দৈহিক তাপ তাপমান যন্ত্রের ১০৮ অংশ; কিন্তু মনুষ্যের দৈহিক উষ্ণতা ৯৮ অংশ। ঠিক্ এ পরিমাণ থাকে না, কারণ বশতঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়াও থাকে। (জ্বরাদি

হইলে ১০৫।৬ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়)। কোন কোন জীবের দৈহিক তাপ ৯৫ হইতে ১০৫ পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে।

মনুষ্য-দেহের বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য অনুসারে দৈহিক তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যৌবন অতীত হইলে তাপভাগ অনেক কমিয়া আইসে। সম্প্রতি এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কোন্ মনুষ্য কত বয়স্ক তাহা জানা যায়।

যে সকল জীবের শ্বাসকর্ম্ম অত্যন্ত মৃদুভাবে নিষ্পন্ন হয়, সে সকল জীবের শরীরের উষ্ণতা প্রখররূপে উপলব্ধ হয় না। মৎস্যাদি এই শ্রেণীর জীব। বায়ুর উষ্ণতা যদ্রূপ, ইহাদের দেহের উষ্ণতাও তদ্রূপ। এতদনুসারে তাদৃশ জীবকে শীতল শোণিত আখ্যায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। যাহাদের দেহ সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে, তাহাদিগকে উষ্ণ-শোণিত কহে। মনুষ্য ও পশু এই শ্রেণীর জীব। উষ্ণশোণিত জীবদিগের মধ্যে কোন কোন জীব শীতকালে ক্রমাগত ৩।৪ মাস নিদ্রিত থাকে, তখন তাহাদের শ্বাস-ক্রিয়াও দীর্ঘকাল ব্যবধানে মৃদুভাবে নির্ব্বাহিত হয়। এই কারণে তখন সেই সকল জীবের দেহে উষ্ণতার লেশও থাকে না। ইহা কি কারণে ও ঈশ্বরের কোন্ অভিপ্রায়ে নিষ্পন্ন হয় তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

শ্বাসকর্ম্মের দ্বারা জীব-দেহের অপর এক উপকার হইয়া থাকে। শরীর মধ্যে বায়ু না থাকিলে বহির্বায়ুতে শরীরকে একবারে চাপিয়া চ্যাপ্টা করিয়া ফেলিত। নিশ্বাস যন্ত্রে সর্ব্বদা বায়ু থাকে, তাহারই বলে বাহ্য বায়ুর দাহন অবরোধ করতঃ এই দেহ সংরক্ষিত রাখে। খেচর সকল ইহারই সাহায্যে অনায়াসে আকাশ পথে উড্ডয়ন করে। মৎস্য সকল ঐ উপায়ে ইচ্ছানুসারে জলমধ্যে বিনা ক্লেশে পরি-ভ্রমণ করে, এবং জীবমাত্রেই স্বেচ্ছাক্রমে আপন আপন দৈহিক ভার হ্রাস বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। অধিকন্তু ইহার দ্বারা দেহের পুষ্টিও সাধিত হইতেছে। স্বচ্ছন্দ শরীরে মধ্যম পরিমাণ পুরুষ প্রত্যহ ৭০০ চতুরস্র ফিট বায়ু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করে পরন্তু তাহার ১৫০ ফিট শরীরের পোষণার্থ ব্যয়িত হয়। ঐ ১৫০ ফিটের পরিমাণ অন্যূন ৩৭ ভরি। এখন ভাবিয়া দেখ, আমরা প্রত্যহই ৩৭।৩৮ ভরি অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ সের পরিমিত পদার্থ নিশ্বাসযন্ত্রের দ্বারা গ্রহণ করিতেছি অথচ তাহা লক্ষ্য হইতেছে না।

উদাসীনের চিন্তা।

ঘোষালদের বাড়ীর বড় বৌয়ের নাম কুমুদিনী। কুমুদিনী বিবাহের পূর্ব্বে গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে কিছু দিন পড়িয়াছিল। তৎপর স্বামি-গৃহে আসিয়াও লেখা পড়ার একটু একটু চর্চ্চা রাখিয়াছিল। কুমুদিনীর প্রথম সন্তান শিশিরকুমার। পিতা সুশীলচন্দ্র শিশিরকুমারের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় একদিন শুভলগ্নে পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকাইয়া আনিয়া শিশিরের বিদ্যারম্ভ করাইলেন। সুশীলচন্দ্র নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাই বিদ্যারম্ভের পর হইতেই পুত্রের শিক্ষার ভারটা কুমুদিনীর হাতে প্রদান করিলেন। পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন শিশিরকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইল না কেন? সুশীলচন্দ্র, অল্পবয়স্ক ছেলেরা বিদ্যালয়ে যায়, এরূপ প্রথার বড় বিরোধী ছিলেন। তাহার একটু কারণও ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতিবেশী শরৎ বাবুর রত্নের মত দুটী ছেলে বিদ্যালয়ের দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া বদ হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিজের জীবনেও একটু পরিচয় পাইয়াছিলেন। দুই চারি খানি ইংরেজী গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহার এ মত আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। তিনি পড়িয়াছিলেন "শিশুগণ শৈশব কালে জননীকে খুব ভালবাসে; সুতরাং মা যেমন শিশুর কোমল মনকে গড়িয়া তুলিতে পারেন এমন আর কেহই পারে না। শিশু মায়ের শিক্ষাধীনে থাকিলে যত শীঘ্র শিক্ষা লাভ করিতে পারে, বিদ্যালয়ে পুরুষশিক্ষকের অধীনে তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না।" তাই শিশিরকুমার গৃহে মায়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। একদিন কুমুদিনী একখানি তাসের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড তালব্য "শ" এর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন—বল দেখি বাবা শিশির এটা কি?

শিশির—"ছ"

কুমুদিনী—না বাছা এটা তালব্য'শ' আবার বল দেখি।

শিশির—তালব্য"ছ"।

কুমুদিনী—(ঈষৎ বিরক্ত হইয়া) না এটা তালব্য 'ছ' নয়, তালব্য "শ"; জিভটাকে একটু সরল করে বল।

শিশির—তালব্য "ছ"।

কুমুদিনী—তখন খুব বিরক্ত হইয়া "হতভাগ্য ছেলে বার বার বল্‌ছি তালব্য "শ" আর তুই বলবি তালব্য 'ছ'। আবার বল, এবার না বল্‌তে পাল্লে তোকে আচ্ছা শাস্তি দিব।"

তখন শিশির ছল ছল চোখে—তালব্য 'ছ'। এখন আর কুমুদিনী ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, অমনি শিশিরের

গালে এক চপেটাঘাত করিল। শিশির মুখ ব্যাদন করিয়া পঞ্চম স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কুমুদিনী 'চুপ কর' 'চুপ কর' বলিয়া শাসন করিতে আরম্ভ করিল। সুশীলচন্দ্র স্থানান্তরে একটা অফিষের কাগজ লইয়া মাথা ঘুরাইতে ছিলেন। ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য শিশিরের পাঠের ঘরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ছেলে চোখ রগড়াইতেছে, শিক্ষয়িত্রী ক্রোধ-বিস্ফারিত লোচনে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সুশীলচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া "ভাল ব্যাপার টা কি ?" কুমুদিনী স্বামীকে দেখিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন "ন্যাও তোমার ছেলের শিক্ষা তুমিই দাও, আমার দ্বারা হবে না, হতভাগা ছেলেকে বার বার বল্লেম বল তালব্য 'শ'। পোড়ার মুখো কেবল বল্‌বে তালব্য "ছ"।

সুশীলচন্দ্র ছেলের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—'বলত, বাবা তালব্য "শ"।

শিশির—তালব্য "ছ"।

তখন সুশীলচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন শিশিরের কোন দোষ নাই। তাহার জিভ একটু আড়ষ্ট, তাই তালব্য 'শ' উচ্চারণ করিতে পারে না। ইহা বুঝিতে পারিয়া শিশিরকে ছাড়িয়া কুমুদিনীর দিকে ফিরিলেন;—ভাল, তুমি যে শিশিরকে মারিলে, শিশিরের কি কোনও অপরাধ আছে ?

কুমুদিনী—অপরাধ আছে বই কি ? ওকে বার বার তালব্য "ছ" বলিতে নিষেধ ক'রেছি। ও শুন্‌লে না কেন ? এমন অবাধ্য ছেলে অপরাধ করে নাই কি ?

সুশীলচন্দ্র—ভাল কুমুদ! একটু বুঝ্‌তে চেষ্টা কর মানুষকে অপরাধী বলি কখন ? যখন কোন মানুষ একটা কাজ অন্যায় বলিয়া জানে এবং সেই অন্যায় কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবার তাহার শক্তি থাকে, তখন যদি সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সে কাজ করে তাহা হইলে তাহাকে অপরাধী বলা যাইতে পারে। এখন দেখ শিশির অপরাধের কাজ করেছে কিনা ? সত্য বটে শিশির জানে যে মায়ের অবাধ্য হওয়া অন্যায়, কিন্তু যে শক্তি থাকিলে মায়ের বাধ্য হইতে পারা যায়, শিশিরের সে শক্তির অভাব। জিভের দোষ স্বাভাবিক, জিভের শক্তি না থাকিলে শিশিরের দোষ হইতে পারে না।

কুমুদিনী—ন্যাও, তোমার ন্যায় এখন রেখে দাও। সকল ছেলের জিভ একরূপ আর তোমার ছেলে স্বর্গের চাঁদ কিনা তাই তার জিভ আর একরূপ হইয়াছে।

সুশীলচন্দ্র—দেখ কুমুদ আমরা মানুষ, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি আছে। জ্ঞানবুদ্ধিকে অতিক্রম করে চলা অমানুষের কাজ। যুক্তিতর্কটা যেন কোন কাজেরই জিনিষ নয়, এরূপ ক'রে যদি

ইহাকে উড়াইয়ে দিতে চাও, তাহা হইলে কোন কালেও সত্যে পঁহুছিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদিগকে সত্য দর্শন জন্য এক দিব্য চোখ প্রদান করিয়াছেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা বুজিয়া রাখা ঠিক নয়।

কুমুদিনী একটু ক্রুদ্ধ হইয়া—তোমরা পুরুষ মানুষ যুক্তিতর্ক লইয়া তোমরা থাক। আমাদের উহা সাজে না। এই বলিয়া উঠিতে উদ্যতা হইলেন। সুশীলচন্দ্রের অনুরোধে আবার বসিলেন।

সুশীলচন্দ্র—ভাল কুমুদ! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের খোঁড়া ছেলেটি যে সোজা হইয়া চলিতে পারে না, তার জন্য কি তার কোন দোষ হয়েছে?

কুমুদ—পা নাই তার, সোজা হয়ে চলবে কি করে?

সুশীল—তবে কেন একথা বলনা যে সকলের ছেলের পা একরূপ, আর ভট্টাচার্য্যের ছেলে স্বর্গের চাঁদ কিনা যে তার পা অন্যরূপ হবে?

কুমুদিনী—ভট্টাচার্য্যের ছেলের খোঁড়া পা সবাই দেখতে পারে। কোথায় শিশিরের জিভের ত এরূপ কিছু দোষ দেখি না; দিব্যি খায়, কথা বলে, চীৎকার করে, কেবল বুঝি তালব্য "শ"র বেলায়ই তালব্য "ছ"।

সুশীল—দেখ আর নাই দেখ নিশ্চয়ই সুশীলের জিভের কোন স্বাভাবিক দোষ আছে, কোন কোন ছেলের শৈশবকালে এরূপ দোষ থাকে, পরে অভ্যাস কর্ত্তে কর্ত্তে দোষ সেরে যায়।

কুমুদিনী এখন নিজের দোষ বুঝিতে পারিল, সে অন্যান্য মেয়েদের মত দোষ বুঝিতে পারিলেও বৃথা তর্ক করিত না। নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইল। তখন সুশীলচন্দ্র সময় পাইয়া শাস্তিসম্বন্ধে দুই চার কথা বলিতে লাগিলেন।

সুশীলচন্দ্র—কুমুদ! তুমি তোমার দোষ বুঝিতে পারিয়া যে ঈষৎ লজ্জিত হইয়াছ, তজ্জন্য আমি খুব আনন্দিত হইলাম। এখন শাস্তিসম্বন্ধে দুই চারটী কথা বলিব।

শাস্তি প্রদানের দুইটী উদ্দেশ্য। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ন্যায়ের পক্ষপাতী ব্যক্তিরাই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। শাস্তি প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য অপরাধীকে সংশোধন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অন্যান্য অপরাধ করণোদ্যত ব্যক্তিদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া। যদি নিরপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায় তাহা হইলে, শাস্তিদাতার প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মিয়া থাকে এবং সে শাস্তিদাতাকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী ন্যায়ের শাসন বিবর্জ্জিত বলিয়া মনে করে। সে নিতান্ত অজ্ঞ লোক হইলে, এই প্রবৃত্তির অনুকরণও করিতে পারে। সুতরাং নিরপরাধী শাস্তি না পায় সর্ব্বদা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের

দেশে বিচারকগণ এবিষয়ে বিশেষ সাবধান। তাঁহাদের মতে দশজন অপরাধী মুক্তি পায় তাহাও ভাল, তবুও যেন এক জন নিরপরাধী শাস্তি না পায়। এজন্য বিচার কালে কোনও ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে আসামীকে সেই সন্দেহের ফল ভোগ করিতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সন্দেহের উপর কোনও আসামীর শাস্তি দেওয়া বিধেয় নহে। কিন্তু শিশির সম্বন্ধে তুমি বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছ। তুমি নিরপরাধী শিশিরকে অনর্থক তিরস্কার এবং প্রহার করিয়াছ; সন্তানদিগকে শাসন করিবার সময় এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। অন্যথা ন্যায়ের প্রতি তাহাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মিবে না। দ্বিতীয় কথা, নিরপরাধীকে যেমন শাস্তি দেওয়া অন্যায়, গুরুপাপে লঘুদণ্ড ও লঘু পাপে গুরুদণ্ড প্রদানও তদ্রূপ অন্যায়। কিন্তু জননীগণ অধিকাংশ স্থলেই এ নীতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন না ইহার কারণ এই যে তাঁহারা অপরাধীর সংশোধনের জন্য শাস্তি দেন না। অপরাধীর প্রতি বিরক্ত হইয়া মনের ঝাল মিটাইয়া থাকেন। এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কুমুদিনী স্বামীর এ মহামূল্য উপদেশ স্মৃতিপটে অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিল। যদিও অভ্যাস দোষে কখন কখনও এ নীতি অতিক্রম করিয়াছিল, তথাপি অবশেষে আত্মদোষ স্খালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জননীর সদুপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্তে পুত্র কন্যাগুলিও ন্যায়তৎপর হইয়া উঠিল। আশা করি যদি ভারতের জননীগণ এই সুনীতির অনুসরণ করিয়া চলেন, তাহা হইলে ভারত সন্তানের কোমল অন্তঃকরণে শৈশব কাল হইতে ন্যায়পরতার বীজ উপ্ত হইয়া কালে সুফল প্রসব করিবে।

বৌদ্ধ ইংরাজ রমণী।

কর্ণেল্ অলকট্ অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়াছিলেন। তথায় তিনি কুমারী কেট্ পিফেটকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ব্লাভাস্কির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কর্ণেল যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, কুমারী অষ্ট্রেলিয়া হইতে তাঁহার সহিত সিংহলে আগমন করেন। ইনি এখানে আসিয়া সঙ্ঘমিতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ইনি উক্ত পদে দীর্ঘকাল থাকিয়া সিংহলবাসীগণের হিত সাধন করিতে পারিলেন না। ইনি নিশা রোগগ্রস্ত ছিলেন, সম্প্রতি জলমগ্না হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এ সাধু সংক্ষিপ্ত জীবনের বিষয় কিছু বলিবার নাই। তবে এই মাত্র আমরা অবগত আছি

যে ইহাঁর মৃতদেহের সমাধি হয় নাই, হিন্দুদিগের মত দাহকার্য্য সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই দাহ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—দেহ প্রথমতঃ প্রাচীন মিশরীয়দিগের মত সংরক্ষিত হয়, তৎপরে শবাধারে সংনিবিষ্ট হয়। মুখখানি দেখা যাইতে লাগিল, কারণ আধারের ঐ স্থানে কাচের ঢাক্‌নী ছিল। শ্মশানে ৬।৭ শত বৌদ্ধ মতাবলম্বী শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সমবেত হন। প্রথমে বাদ্যকরগণ বাদ্য ধ্বনি করিতে করিতে গমন করে, তার পর বৌদ্ধ ও থিয়সফিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, তার পর শুভ্র সোনালী ও রূপালী বর্ণের কাগজমণ্ডিত শব-শকট অশ্ব-যুগল দ্বারা পরিচালিত। সর্ব্ব শেষে শোকার্ত্ত ব্যক্তিগণ। নারী-শিক্ষা-সমিতির সভাপতি বিদুষী উইরিকুন, ডাক্তার ড্যালি প্রভৃতি থিয়সফিকেল সোসাইটীর সভ্যগণ শোকসূচক বক্তৃতা করেন। তৎপরে সিংহল-মহিলা উইরিকুন মৃত নারীর আত্মীয় স্থানীয় হইয়া মুখাগ্নি করেন। ইহাঁর বিষয় পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে 'সিংহলে স্ত্রীশিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। মডেল ফারমে এই শোকাবহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেক য়ুরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। রাজকীয় কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক জেঃ ডবলিউ অলপোর সাহেব দৃশ্যের ফটোগ্রাফ তুলিয়া লন। শুনা যায় মৃতা নারীর বৌদ্ধমতাবলম্বিনী মাতার নিকট ইহার দেহের ভস্মাবশেষ প্রেরিত হইবে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় আজ কাল অনেক শবদাহ হইতেছে।

প্রাণিরহস্য।

(১৫শ সংখ্যক।)

১। পরলোকগত কবিবর ব্রাউনিং প্রেমের সূত্রে একটী ভেকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ভেক বন্ধুর গর্ত্তের নিকট যাইয়া, তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ ধূলি বর্ষণ করিলেই সুহৃদ্বর প্রিয়তমের আগমন-সঙ্কেত লাভ করিয়া বহির্গমন করিতেন। কবি ভেকের মস্তকদেশে মৃদু শুড়শুড়ি প্রদান করিলে, ভেক প্রিয়তমের প্রতি স্নেহদৃষ্টি পাত করিতেন এবং বারম্বার ঊর্দ্ধদৃষ্টি পূর্ব্বক হৃদয়ের আনন্দ ও প্রসন্নতা প্রকাশ করিতেন। ব্রাউনিং বন্ধুকে গৃহে আহ্বান করিলেই তিনি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থুপ্ থুপ্ শব্দে গৃহে প্রবেশ করিতেন। বহুকাল তাঁহারা সুখে একত্র বাস করিয়া অবশেষে নিষ্ঠুর যমরাজ কর্ত্তৃক পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন।

২। নিম্ন শ্রেণীর জীবগণ মানবের ভাষা বুঝিতে না পারিলেও, তাহারা

যে ভাব গ্রহণ করিতে কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদেরও ভাষা আছে। মার্কিন দেশে অধ্যাপক গার্ণার বানর-গণের সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য বহুকাল ব্যাপিয়া চেষ্টা করিয়া কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গত জুন মাসের 'নিউ রিভিউ' পত্রিকাতে গার্ণার সাহেব এক অতীব বিস্ময়কর ঘটনা-পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধের নাম 'বানরের ভাষা'। ইহাতে প্রকাশ যে, তিনি 'ফনোগ্রাফ্' * যন্ত্রসহকারে বান-রীয় ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছেন।

তিনি মার্কিন দেশীয় "জাতীয় পশু-শালা" হইতে এক দম্পতি বানরকে লইয়া পৃথক্ ২ স্থানে রাখিয়া দিলেন এবং বান-রীর সম্মুখে ফনোগ্রাফ্-যন্ত্র ধরিয়া তাহার শব্দকয়েকটী যন্ত্রস্থ করিলেন। উহা বান-রের সম্মুখে আনিয়া খুলিয়া দেওয়াতে ঠিক্ পূর্ব্ব শব্দ বাহির হইল ও বানর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যন্ত্রমুখে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া দিল, কিন্তু কোথাও প্রেয়সীর নিদর্শন না পাইয়া বারম্বার ঔৎসুক্যের সহিত তন্মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। এক এক বার দূরে যাইতে লাগিল, আবার আসিয়া যন্ত্রটী পরীক্ষা করিতে লাগিল ক্রমাগত পরীক্ষা দ্বারা গার্ণার সাহেব বানরীয় ভাষায় দুগ্ধের প্রতিশব্দ মুখস্থ করিয়া একটী বানরের নিকট উহা উচ্চারণ করিলেন। তদ্দণ্ডেই বানর দুগ্ধপাত্র লইয়া পিঞ্জরের পার্শ্বে আসিল ও ঠিক্ সেই শব্দ উচ্চারণ করিল। তৎপরে গার্ণার মহোদয় দুগ্ধ আনাইয়া বানরভ্রাতাকে পান করাইলেন। পানান্তে বানর উল্লাসের সহিত ৩।৪ বার সেই শব্দ উচ্চারণ করিল। গার্ণার দেখিলেন পিপাসা হইলেই বানর ঐ শব্দ উচ্চারণ করে; অতএব সেই শব্দ পানীয় তরল পদার্থবাচক বা পিপাসা-বাচক সন্দেহ নাই।

ঐরূপ পরীক্ষা দ্বারা গার্ণার স্থির করিয়াছেন যে ক্ষুধাপ্রকাশক বা ভক্ষ্য বা কঠিন আহারবাচক একটী স্বতন্ত্র শব্দ আছে। এইরূপে গার্ণার হর্ষ বিষাদ, ভয় ও বিপদবাচক শব্দ শিক্ষা করিয়াছেন। ভয়বাচক শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র শাখামৃগকুল অত্যুচ্চ স্থানে আরোহণ করে ও তিন চারি বার শব্দ শুনিলে ভয়ে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে।

গার্ণার ৮।৯টী শব্দ শিক্ষা করিয়া-ছেন। উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে ঐ ৮।৯টী হইতে উহার চতুর্গুণ শব্দ লাভ করা যায়। গার্ণার বলেন ভিন্ন ভিন্ন বানরজাতির মধ্যে কিঞ্চিৎ ভাষা-ভেদ আছে। এমনও হইতে পারে যে, তিনি যে ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, ঐ সকল ভিন্ন ভাষা তাহারই উপভাষা মাত্র।

* অর্থাৎ শব্দ মুদ্রাঙ্কণ যন্ত্র, যাহার মধ্যে শব্দ ভরিয়া রাখা যায় এবং ঠিক্ সেই স্বর ইচ্ছা মাত্র বাহির করা যায়।

৩। জন্তুদিগের মধ্যে উষ্ট্রেরা সাঁতার দিতে অক্ষম। তাহারা জলমধ্যে পড়িলেই উল্টাইয়া যায় এবং সন্তরণ দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া জলমগ্ন হয়।

৪। কোন কোন জীব শরীরের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক আহার করে। মাকড়্সা প্রত্যহ আপনার শরীরের ছাব্বিশ গুণ আহার উদরস্থ করে। শরীর সম্বন্ধে আহারের তুলনা করিলে মাকড়্সার মত 'ঔদরিক' জগতে বোধ হয় আর নাই।

মুক্তিফৌজের জয়।

(৩১৬ সংখ্যা ২৯ পৃষ্ঠার পর)

পরিবারই নারীগণের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র, পারিবারিক কর্ত্তব্য ব্যতীত জগতের সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপারে রমণীর হস্তক্ষেপ করা কখনও উচিত নহে, শিক্ষিত সমাজেও অনেকের এইরূপ মত। চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ক্যানন লিড্ন (Canon Liddon) এই মতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং মুক্তিফৌজের প্রতি তিনি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। জনহিতৈষী ষ্টেড সাহেবের সহিত মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথা বার্ত্তা হইত। তাহাতে মুক্তিফৌজের প্রচার দেখিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মে। তিনি ষ্টেড সাহেবের সঙ্গে ১৮৮১ সালের শেষভাগে কোন এক শুক্রবার রাত্রিতে মুক্তিফৌজের একটী প্রার্থনা-সভায় গমন করেন। পাছে লোকে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলে, এজন্য গাড়ী চড়িয়াই ক্যানন লিড্ন ধর্ম্মযাজকের চিহ্নস্বরূপ তাঁহার গলার সাদা কলারটী খুলিয়া রাখিলেন। ষ্টেড জিজ্ঞাসা করিলেন, এসকল খুলিয়া রাখিতেছেন যে?"

ক্যানন লিড্ন উত্তর করিলেন, "দুর্ব্বলতা বশতঃ এইরূপ করিতেছি ভাবিবেন না; আমি মুক্তিফৌজের প্রার্থনা-সভায় আসিয়াছি শুনিলে কত লোকের কত প্রশ্ন ও প্রতিবাদ আসিয়া আমার কাছে উপস্থিত হইবে। কিন্তু লোকের নিকট কৈফিয়ত দেওয়া বড় ক্লেশকর।" ক্যানন লিড্ন ষ্টেড সাহেবের সহিত যথা সময়ে গন্তব্য স্থানে পৌছিলেন। তাঁহারা গিয়া গ্যালারীর এক কোণে বসিলেন। অমনি চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের অপর এক ধর্ম্মযাজক ক্যানন লিড্নকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার জন্য সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; ক্যানন লিডনের লুকাইয়া মুক্তিফৌজের কার্য্য দেখার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। যথা সময়ে সঙ্গীত, প্রার্থনা ও পরিত্রাণের সাক্ষ্যদান প্রভৃতি আরম্ভ হইল। একটী মনোরমা

বালিকার সঙ্গে সঙ্গে একটা কদাকার পুরুষও সাক্ষ্যদান করিতে দণ্ডায়মান হইল। সমস্ত দিন লণ্ডনের কোন ষ্টীমারে কয়লা উস্‌কাইয়া কয়লার রঙে সে অত্যন্ত বিকটাকৃতি হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ক্যানন লিড্‌ন তাঁহার বন্ধু ষ্টেড সাহেবকে বলিলেন, "এইরূপ লোককে ত আমরা কখনও সেণ্ট পল গির্জার উপাসনায় দেখিতে পাই না!" ক্যানন লিড্‌ন মুক্তিফৌজের কার্য্য আদ্যোপান্ত মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলেন। বাড়ী যাইবার সময়ে গাড়ীতে চাপিয়া কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে বন্ধু ষ্টেডকে বলিতে লাগিলেন;—

"আজ লজ্জায় আমার মুখ অবনত হইতেছে আজ আর আপনাকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। এই ত কতকগুলি অজ্ঞ দরিদ্র লোক, ইহাদের সঙ্গে তুলনায় আমরা কি করিতেছি? আমাদের শিক্ষায় ধিক্, আমাদের উচ্চপদে ধিক্, আমাদের দ্বারা কিছুই হইতেছে না"!

মহাত্মা ষ্টেড আর এক স্থলে বলিয়াছেন:—

"বিংশ বৎসর যাবৎ সংবাদপত্রের সম্পাদকের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বর্ত্তমান সময়ের সুবিজ্ঞতম ও শ্রেষ্ঠতম নরনারীগণের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় হইয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইউরোপের রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, জ্ঞানী ও কর্ম্মী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নরনারীগণের সম্বন্ধে আমার অল্পাধিক পরিমাণে কিছু কিছু জানা আছে। কিন্তু মানসিক শক্তি, কার্য্যদক্ষতা, উৎসাহ ও কোন কিছু গড়িয়া পিটিয়া তুলিবার ক্ষমতাতে জেনারল বুথ, তাঁহার পত্নী ও তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় আমার সমস্ত পরিচিত লোকের মধ্যে ৫ জন লোকও দেখিতে পাই নাই।"

পৃথিবীতে এমন অনেক মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা আপনাদের অসাধারণ প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতা বলে অনেক মহৎ অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহৎব্রত পালনের জন্য একটী পরিবার গঠন করার দৃষ্টান্ত একমাত্র জেনারেল বুথই দেখাইয়াছেন। তিনি জীবনের কার্য্য বলিয়া যে মহৎ ব্যাপারে হাত দিয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধ করিবার জন্য এমন আশ্চর্য্য একটী পরিবার গঠন করিয়াছেন, দেখিলেই তাহাতে বুথের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

যুগ-যুগান্তর তপস্যার ফলে
পেয়েছিলে যেই অমূল্য রতন,
সে ধনে বঞ্চিতা হইলে জননী!
কে আছে দুখিনী তোমার মতন? ১

চন্দ্রহীন আজ ভারত আকাশ,
দুঃখ অমানিশা দিগন্ত প্রসার!
শোকেতে মগন সমগ্র ভারত—
হিমালয় হ'তে কুমারিকা পার। ২

'রত্নগর্ভা' নাম পেয়েছ জননী
যে রতন গর্ভে করিয়ে ধারণ,—
সে অমূল্য নিধি কেড়েনিছে কাল,
শূন্য করি বুক না মানি বারণ। ৩

কাঁদিতে এসেছ—কাঁদ চিরকাল
সোণার চাঁদেরা—র'লনা কেউ!
একে একে তাঁরা ছাড়ি গেলা মায়,
গণিছ কেবলি দুঃখের ঢেউ। ৪

উপাধি তোমার—'বিদ্যার সাগর'
দয়ার সাগর বাস্তবিক তুমি!
জীবনের ব্রত—পর উপকার;—
ভুলিবেনা কভু ভারত ভূমি। ৫

বাল-বিধবার বাপের অধিক—
গরীব দুঃখীর সহায় সম্বল,
স্বদেশের হিতে সদা প্রাণপণ,
কামনা কেবলি দেশের মঙ্গল। ৬

সাহিত্য-সমাজে অগ্রণী সবার!
মৃত বঙ্গভাষা—দিলে তারে প্রাণ,
সকলের নেতা সমাজ সংস্কারে,
তব ঋণে ঋণী ভারত সন্তান। ৭

আড়ম্বর-হীন অশনে বসনে,
আচরণে যেন শুদ্ধ ব্রহ্মচারী,
আলাপনে তাঁর কিবা শিষ্টাচার,
মধুর ব্যাভার যাই বলিহারি। ৮

দেশের দুর্গতি করিয়ে স্মরণ
কতই যাতনা পেয়েছেন মনে,
নীরবে নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন
করেছেন কত দেশের কারণে। ৯

নির্গুণে কিগুণ বলিবে তাঁহার?
একাধারে কার থাকে এত গুণ?
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান দয়া মায়া স্নেহ
ফুটেছিল তাতে সমস্ত প্রসূন। ১০

যাও স্বর্গধামে—গুণের সাগর।
ওই দেখ মায়—অমৃত ভবনে
নিয়ে যাবে তাই বাহু প্রসারণ
করেছেন আজ তোমারি কারণে। ১১

রতন-খচিত স্বর্ণ সিংহাসন
শূন্য রহিয়াছে দেবতা সমাজে,
পূরণ করগে ওহে সুভাজন—
হেন সিংহাসন আর কারে সাজে? ১২

কাঁদিওনা আর—ভারত জননী,
সুরপুরে দেখ আনন্দ অপার!
দেবতারা মিলে করিছে উৎসব,
তুমি কেন তবে ফেল অশ্রুধার? ১৩

স্বর্গে গেছে সুত সাধি দেশহিত!
এ হ'তে কি সুখ আছে জননীর!
বীর-মাতা বলি দেও পরিচয়,
ধন্যা হও গর্ব্বে ধরি হেন বীর। ১৪ চ.

নূতন সংবাদ।

১। পুটিয়ার রাণী হেমন্তকুমারী রাজসাহী জেলার দরিদ্র লোকদিগের জলপ্রাপ্তির সুবিধার জন্য কূপখননার্থ ৪৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

২। কলিকাতা নগরে ব্রাহ্মগণ স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি জন্য ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ও ছাত্রীনিবাস নামে যে দুইটী অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন, অল্পদিন

মধ্যে সেই দুইটীরই শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৮০ এবং ছাত্রী-নিবাসে প্রায় ২৫ হইয়াছে। উভয়েরই কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে।

৩। বঙ্গমাতা দুইটী অমূল্য রত্ন এককালে হারাইয়া অতল শোক সাগরে নিমগ্ন!! গত ২৬এ জুলাই রবিবার রাত্রি ৯টার সময় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি ভারতবাসীদিগের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় বিদ্বান্, এবং সাহিত্য সংসারে অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ইহাঁর নিকট বিশেষ ঋণী।

পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৮এ জুলাই মঙ্গলবার দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অশেষ গুণান্বিত, দয়ার অবতার ও প্রকৃত মনুষ্যত্বপূর্ণ আদর্শ বঙ্গসন্তান ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় স্ত্রীজাতির পিতৃস্থানীয় হইয়া আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার শূন্য স্থান কি আর পূর্ণ হইবে?

৪। বোম্বাই হইতে ৩২টী ভারত মহিলা অহিফেন ব্যবসা নির্ম্মূল করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় খৃষ্টান রমণীদিগের নিকট অনুরোধপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। বঙ্গমহিলারাও এ শুভানুষ্ঠানে যোগদান করুন্।

বামারচনা।

শোকাতুরা মা।

(বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত।)

১

উহুহু রে বাপধন!
ভেঙে চুরে গেল মন,
আজ অভাগীর মাথা, কেন হেন খেলি,
তুই আঁচলের হীরা,
মাথা খোঁড়া—বুক চিরা,
কাঙালিনী মা'রে ফেলে কার কাছে গেলি?

২

ভিক্ষা মেগে দুটো খাই,
তা'য় কোন দুঃখ নাই,
ভুলে আছি সব ব্যথা তোরি মুখ চেয়ে;
তোর "মা" বলিয়া হায়,
আজো লোকে ফিরে চায়,
সকলে আমারে বলে 'ভাগ্যবতী মেয়ে'!!

৩

জানেন অন্তরযামী,
বড় অভাগিনী আমি,
অমূল রতন তুই বুক পূরাবার;
অভাগী মায়ের তরে,
চাঁদ মুখে কথা ক'রে,
"মা"বলিয়া ডাক্ বাছা, আর একবার।

৪

তুই যে "করুণাসিন্ধু"
"দীন কাঙ্গালের বন্ধু"
কেমনে ছাড়িয়া যা'স কাঙ্গালিনী মা'রে,
বোঝ না কি হায় তুমি,
আমি দীনা—বঙ্গভূমি,
তোমা বিনা বাপ ধন, বুকে নেব কারে?

৫

থেটে থেটে রাত দিন
শরীর হয়েছে ক্ষীণ,
তাই কি রয়েছ শুয়ে অলস হইয়া ?—
অভাগী মায়ের লাগি,
সারা রাতি জাগি জাগি,
আজি কি এমন তর পড়েছ ঘুমিয়া ?

৬

ওঠ যাদু, কথা কও,
তুমি তো "অবাধ্য" নও,
জগতে তোমার নাম "মাতৃভক্ত ছেলে";
মায়ে তোর বড় টান,
মায়ে মাথা তোরি প্রাণ,
চাও না স্বরগ তুমি মা'র কোল পেলে !

৭

নাই সুযশের লোভ,
নাই বিলাসের ক্ষোভ,
তোমার কাহিনী তুমি কিছুই জান না,
শুধুই আমারি তরে,
খাটিছ সহস্র করে,
শুধু ভাই ভগিনীর মঙ্গল কামনা।

৮

দুরন্ত বালক গুলো,
চোখে দিয়ে আছে ধূলো,
তুই যে কি ধন মোর কি বুঝিবে তারা ?
কেউ দেয় গালাগালি,
কেউ দেয় করতালি,
কোন আহম্মক হায় হেসে হয় সারা !

৯

দেখে সেই নিঠুরতা
পরাণে লেগেছে ব্যথা,
তাই কি আমার প'রে রাগ করে যাও ?—
কভু তো শোন না তুমি,
পাগলের পাগলামি,
এস কোলে যাদুমণি, মা'র মাথা খাও।

১০

তোমারে হইলে হীন,
মরিবে কাঙ্গাল দীন,
মরম-বেদনা তারা কার কাছে ক'বে,
কেবা সে আপনা দিয়ে,
দিবে অশ্রু মুছাইয়ে,
কেই বা তাদের ব্যথা নিজ বুকে ব'বে !

১১

মেয়ে গুলো অবিরত,
আজিও কাঁদিছে কত,
আজো সেই অত্যাচার, সেই পায়ে ঠেলা,
আজো, "সতীনের ঘর"
"কচি মেয়ে বুড় বর"
এই কি তোমার যাদু, ঘুমা'বার বেলা ?

১২

তোমারে রয়েছে চেয়ে,
বালিকা বিধবা মেয়ে—
আপন কর্ত্তব্যে তুমি কবে কর হেলা—
তাদের যে কেউ নাই,
তুমি বাপ তুমি ভাই,
এই কি তোমার যাদু, ঘুমা'বার বেলা ?

১৩

আজিও সে "রুচিদোষ"
আজো কত "আপ্‌শোষ"
আজিও শ্মশানে ভূত পিশাচের মেলা ;
কও তাই চাঁদ মুখে,
ঘুমায়ে র'লে কি সুখে,
এই কি তোমার যাদু, ঘুমা'বার বেলা ?

১৪

তুমি না থাকিলে বুকে,
অভাগী কি পোড়ামুখে,
জগতের কাছে মুখ দেখাইবে ফিরে ?—
পোড়া বুক ফেটে যায়,
আয় যাদু কোলে আয়!
লুকায়ে রাখিগে' তোরে শত বুক চিরে!

১৫

মরি! মরি! বাপধন!
ছিঁড়ে টুটে গেল মন,
তো'হেন পুত্রের শোক কার কবে স'য়?
তোমারে হইয়ে হারা,
কাঁদে রবি শশী তারা,
কাঁদিছে জগত সারা, আমি একা নয়!

১৬

নিঠুর শ্রাবণ মাস!
কি করিলি সর্ব্বনাশ,
আঁধারে ডুবালি মোর সরবস্ব ধন,
হৃদি-পিণ্ড করে চুর,
কেড়ে নিলি কোহিনুর,
পোড়ালি আগুন দিয়ে বুকের বাধন!

১৭

ওকি ও জাহ্নবী বক্ষে!—
উহু, কি দেখিনু চক্ষে,
চন্দনের কাঠে কা'রা চিতা সাজাইলি ?—
হোক্ ধরা ছাই ভস্ম,
——কাঙ্গালের সরবস্ব,
জ্বলন্ত অনল মাঝে কোন্ প্রাণে দিলি?

১৮

ও দেহ—সোণার দেহ,
দি'স্‌নে চিতায় কেহ,
অভাগীর সুখ সাধে দি'স্‌নে আগুন;
অন্ধের হাতের নড়ি,
নি'স্‌নে মিনতি করি,
কি দোষে এ ভিখারীরে করিবিরে খুন!!

১৯

সহস্র মরণে ছায়,
ভাঙিব পায়ের ঘা'য়,
সহস্র গঙ্গার জলে নিভাইব চিতে;
আনিয়া অমৃত-বায়ু,
দিব কোটী পরমায়ু,
আমার সোণার চাঁদে, কে আসিবি নিতে!!

২০

অযুত তরঙ্গ-সঙ্গে,
উথলি উঠেছ গঙ্গে!
তুমি কি পবিত্র হবে "ঈশ্বরে" পরশি,
স্বরগে দেবতা তা'য়,
ডাকিছে কি "আয় আয়!"
পাতিয়া রতনাসন তা'রা আছে বসি?

২১

যেথানে নারদ, ব্যাস,
জনকাদি করে বাস,
আমার বাছারে কি গো সেথা নিয়ে যাবি?
ঈশ্বরে "ঈশ্বর" দিয়া,
দিবি নাকি মিশাইয়া,
মরণেরে একবার অমর করাবি?

২২

তবে বাবা দেব-বেশে,
যাও চলি দেব-দেশে—
মরণের পরপার—অনন্ত যথায়!
আজ দশ দিক্ ভরি,
বল্ তোরা হরি হরি,
আমার ঈশ্বরচন্দ্র স্বর্গপুরে যায়!!

* * *

কবি যে আপনা হারা,
চোখে বয় শত ধারা,
কলিজা, পরাণ, সব হয়ে গেল জল,
বিদ্যাসাগরেরে মাগো! কেন দিলি বল্?

শ্রীমা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২০ সংখ্যা।	ভাদ্র ১২৯৮—সেপ্টেম্বর ১৮৯১।	৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

বামাবোধিনীর অষ্টাবিংশ সাংবৎসরিক জন্মোৎসব।

কালচক্র ঘুরে অবিরত,
সুখ দুঃখ চলে সাথে সাথ ;
জীবনের ভোগ সেইমত,
কভু হাসি, কভু অশ্রুপাত।

আজিকার জনম উৎসবে,
স্তরে স্তরে পুড়িছে হৃদয় ;
পূর্ণদিক্ হাহাকার রবে,
বলি তবু জগদীশ জয় !

তব ইচ্ছা হউক পূরণ,
সুখ দুঃখ যা কর বিধান ;
তব কার্য্য করিব সাধন,
সঁপি তব পদে মনঃপ্রাণ।

মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় আজি বামাবোধিনী ২৮ বৎসর অতিক্রম করিয়া ২৯ বর্ষে পদার্পণ করিল। আজি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ভক্তিভরে সেই দেবতার চরণে প্রণত হইয়া এবং ইহার আত্মীয় পরিজন স্বদেশীয় বিদেশীয় হিতৈষী ভাই ভগিনী সকলের শুভাশীষ যাচ্ঞা করিয়া ইহা নববর্ষের কার্য্যে প্রবেশ করিতেছে।

বামাবোধিনী এবার শ্রাবণের ধারার সহিত অশ্রুধারা মিশাইয়া পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়াছে। এমত দুর্ব্বৎসর এতৎ-কালে ইহার হয় নাই। বঙ্গের পরমবন্ধু দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের বিয়োগে বাঙ্গালীজাতি বন্ধুহীন হইয়া হাহাকার করিতেছে, কিন্তু বঙ্গনারীগণ পিতৃহীন

হইয়াছে বলিয়া বামাবোধিনী তাহাদের সহিত অপার শোকসাগরে ভাসিতেছে! বামাবোধিনীর পরম হিতৈষী কোন্নগর নিবাসী সাধু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পরলোকগমনে বামাবোধিনী যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বামাবোধিনী আরও দুইটী দারুণ শোকশেলে বিদ্ধ হইয়াছেন! খাঁটুরা নিবাসী বাবু বসন্তকুমার দত্ত বামাবোধিনীর অসহায় বাল্যজীবনে ইহার প্রতিপালকের স্থান গ্রহণ করিয়া বহু পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক ইহার জীবন রক্ষণ ও উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন,বামাবোধিনী তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। গতবর্ষে সেই বন্ধুবরকে হারাইয়া বামাবোধিনী গভীর শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর একটী ভক্তিভাজন প্রাচীনবন্ধু যিনি বামাবোধিনীকে বড় ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার বহু অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের ফল পৃথিবীর নানাস্থানের নানাজাতীয় মনুষ্যের বৃত্তান্ত লিখিয়া বামাবোধিনীর স্তম্ভসকলকে সুশোভিত করিয়াছিলেন, আজি কয়েক দিন হইল তিনিও ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন—তিনি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কুলোদ্ভব দেবর্ষি স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ মিত্র। এই সকল অন্তরঙ্গ আত্মীয় জনের বিয়োগে বামাবোধিনী শোকে জর জর হইয়াছেন, এ শোক বর্ণনীয় নয়। বামাবোধিনী যোড় করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি দুঃখিনী বঙ্গনারীগণের পরম বন্ধু এই মহাত্মাদিগের আত্মার চিরশান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন। বামাবোধিনী যেন তাঁহাদের উপকার ঋণ শ্রদ্ধার সহিত চিরদিন স্মরণ করিয়া রাখিতে পারেন এবং তাঁহাদের ন্যায় বামাকুল হিতৈষী সকলের উদয়ে বঙ্গমাতার শূন্য বক্ষ যেন আবার পূর্ণ দেখিতে পান।

বামাবোধিনী আজি তাহার জন্মোৎসবের দিনে শোক বিহ্বল হইয়া আত্মকথা আর কি নিবেদন করিবে? বামাবোধিনী ইহার পাঠক পাঠিকা ও দেশহিতৈষী মহোদয়গণের নিকট কাতর প্রাণে সহৃদয়তা ভিক্ষা করিতেছে। ভারতবাসিনী দুর্ভাগিনী রমণীগণের প্রতি মুখ তুলিয়া চায়, এমত লোক অতি অল্প। ইহাদিগের হইয়া দুকথা যাহারা বলিতে যায়, তাহারাও লোকের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়। বামাবোধিনী অবলাগণের দুঃখে দুঃখিনী ও দূষিত দেশাচারের পরিবর্ত্তে সমাজ মধ্যে সদাচার প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতিনী এই জন্য কয়েকটী গ্রাহক ইহার সহিত সম্বন্ধপরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বামাবোধিনীকে ইংরাজী সভ্যতার পক্ষপাতী ও দেশীয় রীতিপদ্ধতির উপেক্ষাকারী বলিয়া ইহার প্রতি তীব্রগালি বর্ষণ করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। বামাবোধিনীর প্রকৃত ভাব ও উদ্দেশ্য কি? যাঁহারা ইহার সহিত বহুদিন হইতে পরিচিত, তাঁহারা

বিলক্ষণ জানেন; সে বিষয়ের উল্লেখ করা বাহুল্য বলিয়া আমরা অধিক কিছু বলিব না। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য, বামাবোধিনী এ দেশের নারীজাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁর জ্ঞান শক্তি অনুসারে সেই ব্রতপালনে নিযুক্ত আছেন ও থাকিবেন। ঈশ্বর করুন্ অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থার মধ্যে নিন্দা প্রশংসা লাভালাভ সমদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া বামাবোধিনী যেন অবিচলিত ভাবে তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। আজি বামাবোধিনীর বন্ধুগণ সকলে ইহাঁকে সেই শুভ আশীর্ব্বাদ করুন্।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গের মহাশোক—বঙ্গের মহোজ্জ্বল রত্ন কয়েকটী গত শ্রাবণের জলস্রোতে কাল-সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের বিয়োগে বঙ্গমাতা যে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছেন তাহা পূরণ হইবার নয়। পণ্ডিত-প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বাবু কালী কৃষ্ণ মিত্রের শোকে দেশময় হাহাকার পড়িয়াছে। ইহাদিগের স্মরণার্থে সংবাদ পত্রে বিলাপ প্রকাশ এবং নানা স্থানে সভা সমিতি হইতেছে। কালী কৃষ্ণ বাবু অতি নির্জনপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু এ দেশে স্ত্রী শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, সুরাপান নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি অনেক শুভানুষ্ঠান ও সমাজ সংস্কারের মূলে তিনি ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য এমন স্থান নাই, যেথানে তাঁহার স্মরণ সভা হইয়া স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ না হইতেছে। রাজা রাজেন্দ্র লালেরও স্মৃতিচিহ্ন প্রস্তুত হইতেছে। কবে আমরা ইহাদিগের ন্যায় অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে আবার পাইব?

চিনে শিশু হত্যা—চিন মহারাজ্যের মধ্যে বৎসরে ২ লক্ষ ফা[illegible] সদ্যোজা[illegible] কন্যা হত হইয়া থা[illegible] সংবাদে কাহার না হৃৎকম্প [illegible] নানা স্থানে ১০ হইতে ৩০ হা[illegible] উচ্চ এক একটী গৃহ নির্ম্মিত আছে, তাহার কেবল একটী দ্বার। সেই দ্বার দিয়া সন্তান গৃহ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কলিচূণ ঢালিয়া ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণ বিনাশ করা হইয়া থাকে। মফস্বল প্রদেশের গরিব দুঃখী লোকেরা কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য অধিক পরিমাণে এই নৃশংস কাণ্ড করিয়া থাকে। হাঙ্কো নগরে এক রোমান-কাথলিক শিশু-আশ্রম হইয়াছে, মাদার পলা বিসমারা তাহার তত্ত্বাবধারিকা। নদীর ধার ও অন্যান্য স্থান হইতে কুড়াইয়া ইঁহারা প্রায় ৪০ হাজার শিশুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। দেশের আইন ও মাতা পিতার হস্ত

যেখানে কন্যা বধের সহায়তা করে, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ভিন্ন সেখানে শিশুদিগের প্রাণ কে রক্ষা করিবে ?

বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম—সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আপনার স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ২০০০ টাকা ব্যয়ে বৈদ্যনাথে একটী বাটী নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কুষ্ঠ রোগীদিগের নিরাশ্রয় অবস্থার কথা শুনিয়া তিনি সেই টাকা কুষ্ঠাশ্রম নির্ম্মাণার্থ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সম্প্রতি সেবাগুণে তাঁহাকে উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার নামে এই কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ডাক্তার মহাশয়ের ইচ্ছা।

মণিপুর কাণ্ডের পরিণাম—যুবরাজ টেকেন্দ্রজিৎ ও সেনাধ্যক্ষ টাঙ্গাল জেনারেলের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। কুলচন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সম্ভাবনা। মণিপুর ইংরাজাশ্রিত একটী রাজ্য হইবে এবং রাজবংশের কোন ব্যক্তি রাজা মনোনীত হইবে।

স্মরণার্থ দান—জয়দেবপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ ঢাকা কলেজে ৩০০০৲ টাকা দিয়াছেন, তাহার সুদে একটী ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা হইবে।

স্ত্রী-বারিষ্টার—রাউমেনিয়ার প্রথম স্ত্রী বারিষ্টার শর্ম্মিসা বিলসেস্কো বুচারেষ্ট নগরে ব্যবসায় খুলিতে যাইতেছেন। তিনি গত শীতকালে পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনেক বাদানুবাদের পর রাউমেনীয় রাজসভা স্ত্রীলোককে বারিষ্টারী করিবার অধিকার দিয়াছেন।

সিজারউইচের স্বদেশ প্রত্যাগমন—গত ১৬ই আগষ্ট রুসীয় যুবরাজ মস্কো নগরে নিরাপদে প্রত্যাগমন করাতে নগরবাসীরা মহানন্দ প্রকাশ ও গিরজায় গিরজায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বিশেষ উপাসনা করিয়াছে।

ছোটলাটের সহৃদয়তা— গত ১১ই আগষ্ট সার চার্লস ইলিয়ট ময়মনসিংহের জলের কল এবং ১৫ই আগষ্ট বরিশাল বালিকা বিদ্যালয় গৃহের ভিত্তি স্থাপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বরিশালস্থ মহিলাগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং বালিকাবিদ্যালয়টীকে সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্টের অধীন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

যুবরাজপত্নীর শিল্পদক্ষতা—ভিয়েনাতে যে অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হইবে, আমাদিগের বড় রাজবধূ তাহাতে স্বহস্ত প্রস্তুত অনেকগুলি ফটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভগবতী দেবী। তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ লাইব্রেরি ভবনে গত ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় ২॥টার সময় কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। এক পুত্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। উপরে যে ছবি দেওয়া হইল ইহা তাঁহার যুবা বয়সের ছবি।

আমাদিগের কোন সহৃদয়া লেখিকা ১৪ই শ্রাবণ বুধবার প্রাতে গঙ্গাস্নানে গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র দেহের দাহকার্য্য স্বচক্ষে, দর্শন করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

আজি বেলা ৭টার সময়ে নিমতলার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া যে হৃদয়—বিদারক দৃশ্য দেখিলাম, তাহা ভাষায় বলিতে পারি না। দেখিলাম মানব-জগতের এক প্রদীপ্ত সূর্য্য খসিয়া পড়িয়াছে, ভারতবাসীর প্রধান অহঙ্কার শেষ হইয়াছে, বঙ্গভূমির উচ্চ গৌরব ফুরাইয়াছে! দেখিলাম সেই অগতির গতি, অসহায়ের সহায়, অনাথের বন্ধু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এজননের মত আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছেন। আজি আর কাঙ্গালের দাঁড়াইবার আশ্রয় নাই,

হতভাগ্যের অশ্রু মুছিবার স্থান নাই, দগ্ধ-হৃদয় জুড়াইবার উপায় নাই! আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন! আজি বাঙ্গালার সাধ বাসনা ফুরাইল, বাঙ্গালির জাতি-গৌরব ফুরাইল, বুঝি ব্রাহ্মণ বংশের সৌভাগ্য-গর্ব্বও ফুরাইয়া আসিল —আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এসকল পরিত্যাগ করিয়াছেন! আজি বঙ্গজননী নয়নের মণি, আঁচলের নিধি হারাইয়া ফেলিয়াছেন! আজি আমরা সকলেই পিতৃহীন হইয়াছি! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সন্তান সন্ততিগণের সহিত আজি আমরা সমগ্র বঙ্গবাসী পিতৃহীন হইয়াছি! বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহারও নিজের সম্পত্তি নহে; জল, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্যের মত আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সকলের জিনিস। যে মূর্খ, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে দরিদ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে রমণী সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে বালিকা বৈধব্য-আগুনে পুড়িতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা অন্নবস্ত্রের জন্যে লালায়িতা, শিশু সন্তান পালনে অক্ষমা, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; এক কথায় বলিতে গেলে যাহার হৃদয়ে একটুকু ব্যথা আছে, যাহার একটুকু অভাব আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; এই হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়কে "আমার" "আমার" বলিতে পারি। তাই, সকলের জিনিস বলিয়া—সকলের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া আমরা সকলেই আজি পিতৃহীন, বন্ধুহীন ও আরামের স্থান হীন হইয়াছি! আজি পৃথিবী! শোন, আকাশ শোন, মানুষ শোন, দেবতা শোন, সকলেই আজি এই শোকসন্তপ্ত প্রাণের কাতরোচ্ছ্বাস শোন, সকলেই আজি আমাদের সর্ব্বনাশের কথা শোন, আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে এ জনমের মত ফাঁকি দিয়াছেন!! এই কয়টী কথার মধ্যে আমাদের কি দারুণ সর্ব্বনাশ ভরা রহিয়াছে, কি অসহ শোক তাপ ঢালা রহিয়াছে, যাহার হৃদয় আছে তিনি তাহা হৃদয়ে অনুভব করুন্। এ নিদারুণ কথা, এ হৃদয়ময় বেদনা কহিতে পারি এমন ভাষা আজিও হয় নাই।—যদি হইয়া থাকে আমরা শিখিতে পারি নাই।

ওই জাহ্নবী বক্ষে ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে! ওই আগুনে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইতেছে, বাঙ্গালির "পিরামিড" ভস্মসাৎ হইতেছে! ওই ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, অই আগুনে বাঙ্গালার সম্মান গৌরব পুড়িয়া ছাই হইতেছে! ওই জ্বলন্ত আগুনে বাঙ্গালির প্রধান অহঙ্কার প্রধান গর্ব্ব পুড়িয়া যাইতেছে! ওই চিতার আগুনে আজি কত কি ফুরাইল! সহস্র সহস্র বক্ষ শ্মশান হইল! কত কাঙ্গাল গরিব একত্রে মাতা পিতা হারা হইল! কত

হৃদয় আজি আশা ভরসা হারা হইল! শ্রাবণের মেঘ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে, আজি চিহ্ন ফুরাইয়া আসিতেছে, ইহার মত সর্ব্বনাশের কথা আর কি আছে, তাহা আমরা জানি না! যে দেহ পরের জন্যে, জগতের জন্যে, ধর্ম্মের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, অবিশ্রান্ত ভাবে অবিচলিত উৎসাহে এই প্রাচীন বয়সে যুবকের খাটুনি খাটিয়াছে, আজি সেই দেহ— আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, পুণ্যময় দেব-দেহ চিতার ভস্ম হইতেছে! এই ভস্ম হৃদয়ে লইয়া মা' জাহ্নবীও অধিকতর পবিত্রতা লাভ করিতেছেন! আর আত্মা? সে অক্ষয় অমরাত্মা স্বর্গে গিয়াছে। যেখানে মহর্ষি ব্যাস, পরাশর, রাজর্ষি জনক প্রভৃতি দেবতাগণ বিরাজিত আছেন, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইখানে গিয়াছেন। বিশ্বজননীর স্নেহময় কোলে আমাদের সেই পরিশ্রান্ত দেবতা ঘুমাইতে গিয়াছেন। আজি ঈশ্বরে "ঈশ্বর" বিলীন হইয়াছে! একবার প্রাণ ভরিয়া সকলে হরি হরি বল! নরনারী, ইংরাজ বাঙ্গালি, বড় ছোট, চেতন অচেতন, জগৎ স্বর্গ, সকলে একত্রে প্রাণ খুলিয়া, গলায় গলা মিশাইয়া হরি হরি বল। আমাদের পিতা, শিক্ষক, বন্ধু, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আজি অনন্ত সাগরে মিলিত হইতেছেন, আজ একবার মনের মত করিয়া হরি হরি বলি! আমরা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে সহস্র ঋণী—যে বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগখানিও পড়িতেছে, সেও বিদ্যাসাগরের নিকটে বিক্রীত—তাঁহারই হাতে গড়া পুতুল, এস সকলে একবার হরি হরি বলি!!

এ চিতার আগুন নিভিবে ও দেহের শেষ চিহ্ন ফুরাইবে; কিন্তু বিধবা রমণীর বুকের আগুনের মত ভারতের বুকের স্তরে স্তরে এই শোকের আগুন জ্বলিতে থাকিবে। আজি যে ময়ূরাসন, যে রাজাসন শূন্য হইল, সেখানে বসিবার রাজা—মহারাজা—সম্রাট্ বুঝি আর মিলিবে না! এ অমূল্য রত্ন এ দেবদুর্লভ রত্ন হারাইয়া ভারতের—জগতের বলিলেও ক্ষতি হয় না,—যে নিদারুণ অভাব হইল, বুঝি সহস্র বৎসরেও সে অভাব পূর্ণ হইবে না! বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতবাসী বলিয়া ভারতবর্ষ ধন্য, বাঙ্গালি বলিয়া বাঙ্গালি জাতি ধন্য, ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব বলিয়া ব্রাহ্মণ কুল ধন্য, "আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়" বলিয়া মানবসমাজে দাঁড়াইতে পারি, এজন্য আমাদের এ অপদার্থ জীবনও বুঝি ধন্য—সেই ব্যাস, নারদ, মনু, অত্রি ব্যতীত আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আসনে বসিবার মত দেবতা কোথায়?

তবে যাও, বঙ্গবাসী, হরি হরি বলিতে বলিতে ঘরে ফিরিয়া যাও। বাঙ্গালা দেশের, ভারতবর্ষের, জগৎ

সংসারের উজ্জ্বলতম রত্ন কলিকাতার নিমতলার ঘাটে বিসর্জ্জন দিয়া হরি হরি বলিয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা কর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অমর কীর্ত্তি মা'র বুকে অঙ্কিত কর। সকলের উপরে—যার ক্ষমতা থাকে, হরি হরি বলিয়া আত্মগঠন কর, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শূন্য স্থান পূর্ণ কর! মানবজীবন সফল কর। মানবত্ব, দেবত্বে মিশ্রিত কর!

তা এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় কি মরিবার ছেলে? যিনি কোটী কোটী মৃত্যু পদ-দলিত করিয়া চলেন, তাঁহার কি মৃত্যু হইতে পারে? না, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় মরিতে জানেন না। অনেক রকম জানেন—মানুষ কেমন করিয়া দেবতা হয় তাহা জানেন, স্বাবলম্বনের বলে গরিবের ছেলে কেমন করিয়া রাজাধিরাজ হইতে পারে তাহা জানেন, মরজগৎকে কেমন করিয়া স্বর্গ করিতে হয় তাহা জানেন, জগতের প্রত্যেক নরনারীকে কেমন করিয়া "আপনার জন" করিতে হয় তাহা জানেন, পরের ভিতরে নিজের অস্তিত্ব কেমন করিয়া মিশাইতে হয় তাহা জানেন, এই বিশ্ব জগৎ কি করিয়া এক বাঁধনে বাঁধিতে হয় তাহা জানেন,—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত দেবতা হইতে হইলে যাহা কিছু জানিতে হয় সবই জানেন.. [illegible] মরিতে জানেন না. দেবতার মৃত্যু নাই, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত্যুঞ্জয়।

কে বলিল আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জগতে নাই! পৃথিবী চূর্ণ হইয়া যায় যাউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় না থাকিলে আমাদের আর থাকিল কি? আজিতো কলিকাতা সহরের সকল স্থানেই বিদ্যাসাগর মহাশয় রহিয়াছেন। আজি তো কলিকাতার প্রতি শিরা ধমনীতে, প্রতি অণু পরমাণুতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্রোত ছুটিতেছে। আজি তো কলিকাতা মহানগরী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহা প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! লোকে যত বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জগতে নাই, তিনি ততই যেন অসংখ্য মূর্ত্তি ধরিয়া ভয়ার্ত্তকে অভয় দিতেছেন, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতেছেন, সকল ব্যথিতের ব্যথা হাত দিয়া—সেই স্নেহমাখা হাত দিয়া মুছিয়া দিতেছেন! তাই বলিতেছি, রামা মরিতে জানে, শঙ্করা মরিতে জানে, তাহাদের মত শত সহস্র প্রাণী নিত্যই মরিয়া থাকে, বুঝি কত বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাবাগীশেরাও মরিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনও দিন মরিতে জানেন না। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়—আমাদের গরিবের দাঁড়াইবার অবলম্বন, দীনহীনের প্রতিপালক, অনাথের ভরসা, সত্য ন্যায়ের অবতার. করুণার পূর্ণ আদর্শ. জগতের

দেবদুর্ল্লভ রত্ন, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়, যিনি চিরদিন সমভাবে আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্যই খাটিয়াছেন, যিনি মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তেও আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছেন, যিনি অসহনীয় অকৃতজ্ঞতা, পৈশাচিক কৃতঘ্নতা, অনায়াসে পদ-দলিত করিয়াছেন, আমাদের সেই বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া কখনও যাইতে পারেন না!! আজি মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া অমর হইয়াছে। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত্যুঞ্জয় হইয়া আমাদের নিকটে বিরাজ করিতেছেন। তবে আর কি, "চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি।"

শ্রীমা।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ মহিলা সভা।

গত ৮ই আগষ্ট শনিবার বেলা ২॥০ ঘটিকার সময় বেথুন কলেজ গৃহে পরলোকগত পূজ্যপাদ মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থে মহিলাগণের একটি সমিতি আহূত হয়। উহাতে প্রায় তিন শত রমণী সমবেত হইয়াছিলেন। যদিও এই সভাটি ব্রাহ্ম-মহিলাদিগের উদ্যোগ ও যত্নে সংঘটিত হইয়াছিল, তথাপি বহুসংখ্যক হিন্দু-মহিলা আগ্রহ সহকারে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং কতিপয় খৃষ্টীয় মহিলাও উপস্থিত ছিলেন।

কুমারী চন্দ্রমুখী বসুর প্রস্তাবে এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে কুমারী কামিনী সেন সভাপতি মনোনীত হন এবং তিনি এই কয়েকটি কথা বলিয়া সভার কার্য্য করেন :—

আমাদের দেশের গৌরব, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগে আমাদের দেশে যে স্থান শূন্য হইয়াছে তাহা কখনও পূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার গুণের কথা আমাদের দেশে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন, উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে অনেকে হয় ত সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ঋষিতুল্য চরিত্র, অলোকসামান্য মনীষা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব পরদুঃখকাতরতা, তাঁহার আশ্চর্য্য দানশীলতা, তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞা এবং তাঁহার নির্ভীকতা—আর কত গুণের কথা বলিব? একাধারে এত গুণের সমবায় বর্ত্তমান সময়ে আর দেখা যায় না। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গসমাজ—সমগ্র ভারতবর্ষ এক প্রকারে নয়—বহু প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত। সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট ঋণী, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারে সাহায্য করিয়া, বালবিধবাদিগের পুনঃসংস্কার বিধি প্রণয়ন করিয়া, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কদা-

চারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিয়া তিনি ভারত রমণীকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সর্ব্ব-প্রধান হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকারী হৃদয়বান্ সুহৃদের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। চিরদিন অন্তরে বাহিরে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আজি কিয়ৎ পরিমাণে সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। অতঃপর তিনি কুমারী কুমুদিনী কাস্তগিরকে সভাস্থ প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বলিলে কুমারী কুমুদিনী কাস্তগির বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠানন্তর এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন ঃ—

১ম প্রস্তাব। অদ্যকার সভাতে সমাগত মহিলাগণ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছেন যে, পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোক গমনে আমরা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় বঙ্গবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু অচিরে আর মিলিবে না। তিনি এদেশের নারীগণের দুর্দ্দশা বিমোচনার্থ শরীর মনের শক্তি; অর্থ ও সময় কিছুই ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সেই উদার প্রীতি ও অকৃত্রিম নারীহিতৈষিতা স্মরণ করিয়া সকলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

শ্রী অবলা বসু এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। শ্রীমতী কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু প্রস্তাব করেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যাদিগের গভীর পিতৃশোকের সহিত এই সভাতে সমবেত মহিলাদিগের সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা বসু এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

৩য় প্রস্তাব। শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দে প্রস্তাব করেন যে, বেথুন কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হউক এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ, শ্রীমতী বরদা সুন্দরী ঘোষ, শ্রীমতী কুমারী চন্দ্রমুখী বসু, শ্রীমতী কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু এবং শ্রীমতী কুমারী কামিনী সেন ইঁহাদের কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া ইঁহাদের প্রতি চাঁদা আদায়ের ভার অর্পিত হউক। শ্রীমতী বরদাসুন্দরী ঘোষকে সম্পাদিকা এবং শ্রীযুক্তা কুচবিহারের মহারাণীকে সভাপতি করা হউক।

শ্রীমতী সরস্বতী সেন এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বেথুন কলেজেই যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের সর্ব্বো-

পযুক্ত স্থান, সে সম্বন্ধে বিশদরূপে আপনার সম্মতি প্রকাশ করেন।) তিনি বলিলেন বঙ্গরমণীগণ কোথা-য়ও যদি তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপ-নের বাসনা করেন, তবে সে এই স্থান। যে বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি জীবনের বিংশতি বর্ষ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যিনি এই বিদ্যা-লয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা বেথুনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া তাঁহার সকল কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, আমার একান্ত ইচ্ছা যে বেথুনের এই সুন্দর চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে পরলোকগত মহাত্মার এক খানি ছবি সন্নিবেশিত হউক। অথবা মহাত্মা বেথুনের প্রস্তর মূর্ত্তির পার্শ্বে তাঁহার আর একটি প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হউক। যে প্রকার স্মৃতি-চিহ্নই হউক না কেন, আমার একান্ত ইচ্ছা তাহা এই বেথুন কলেজেই যেন সংস্থাপিত হয়।

অতঃপর কেহ কেহ বলেন যে চিত্র অথবা প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইতে পারে এত অর্থ আমাদের মধ্যে সংগৃহীত হইবে না, অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে এই স্কুলে একটি বৃত্তি স্থাপিত হউক।

(তৎপরে শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রেরিত প্রস্তাবটি পঠিত হয়— প্রস্তাবটি এই—

"তাঁহার নামে অসহায়, অক্ষম, অবলাদিগের জন্য একটি আবাস স্থান স্থাপিত হউক।"

এই প্রস্তাবে কোন কোন হিন্দুরমণী অসম্মতি প্রকাশ করেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র প্রস্তাব করেন যে প্রতি বৎসরে তাঁহার মৃত্যু দিবসে তাঁহার স্মরণার্থে সভা আহুত হউক, তাঁহার সুন্দর কার্য্যাবলী তথায় আলোচিত হইবে। শ্রীমতী অচলবালা বসু এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর দুই চারি জন মহিলা সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে সংক্ষেপে বিদ্যাসাগর মহা-শয়ের মৃত্যুতে তাঁহাদের গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থে হিন্দু অন্তঃপুরে চাঁদা সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সভাস্থলে কতক চাঁদা সংগৃহীত এবং শতাধিক মুদ্রা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

তৎপরে শ্রীমতী কুমারী কামিনী সেন এই বলিয়া উপসংহার করিলেন:—

আপনারা অনেকেই বিদ্যাসাগর মহা-শয়ের জীবনের অনেক কথা জানেন। এখানে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীও পঠিত হইল। এই মহাত্মার সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই।) তবে জ্ঞাত এবং পঠিত বিষয়ের মধ্যে দুই একটির প্রতি আমি বিশেষ ভাবে আপনাদের মনো-যোগ আকর্ষণ করিতে চাই।

আজ কাল এদেশে অনেক সংস্কারক

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যখন সংস্কার কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন, তখন তাঁহার সহযোগী কেহ ছিল না, এখন যে সকল কার্য্য সহজসাধ্য মনে হয়, তখন তাহা নিতান্ত কঠিন ছিল। যে ব্যক্তি প্রথম কোন দেশপ্রচলিত প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন, তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা, অনেক অপমান, অনেক অত্যাচার ও অনেক মিথ্যা অপবাদ সহ্য করিতে হয়।

শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন সংস্কার কার্য্য সহজ হইয়া উঠিতেছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা, বিশেষতঃ স্ত্রী সমাজের অবস্থা যাহা ছিল, তাহা শুনিলে আমরা আশ্চর্য্য না হইয়া পারি না। সেই প্রতিকূল অবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সত্যের এবং ন্যায়ের অনুরোধে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।

বালবিধবার কষ্ট অনেকে অনেক কাল হইতে দেখিয়া আসিতেছিলেন; সংসারে যত বালবিধবা ছিল, সকলেরই পিতামাতা অথবা আত্মীয় স্বজন ছিল—সেই আত্মীয়েরা তাঁহাদের দুঃখে অশ্রুপাত করেন নাই, এমনও নয়; কিন্তু সে করুণা কাজে প্রকাশ করিবার জন্য যে বল চাই, তাহা কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই ছিল।

রামমোহন রায় সতীদাহরূপ রাক্ষসোচিত নৃশংস প্রথা উঠাইয়া দিয়া যেমন সভ্যজগতের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় বালবিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে কত চিন্তা, কত পরিশ্রম ও কত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু এ সকল ব্যতীতও এই সংস্কার কার্য্যের মধ্যে তাঁহার আর একটি গূঢ় মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। যত দিন মুখে মুখে চলে, তত দিন অনেকে সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন। অনেকে কিন্তু যাহা বাহিরে প্রচার করিয়া বেড়ান, তাহা নিজের বাড়ীতে কার্য্যে পরিণত করিতে তত চেষ্টা করেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় মুখে বলিয়া, শাস্ত্র দেখাইয়া, তর্ক করিয়া কেবল বিধবা বিবাহ প্রচার করেন নাই—তিনি নিজের ঘরে নিজের একমাত্র পুত্রের সহিত একটি বালবিধবার বিবাহ দিয়াছেন। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে তিনি যাহা অন্যায় মনে করিতেন, তাহা দেখিয়া কেবল বিলাপ, অশ্রুপাত করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, সে অন্যায় দূর করিবার জন্য প্রাণপণ খাটিতেন—যাহা পরের পক্ষে ভাল মনে করিতেন, করিতে উপদেশ দিতেন, নিজের ঘরে, নিজের পরিবারে তাহা করিয়া দেখাইতেন।

তাহার পর, তিনি মান, সম্ভ্রম ও নামডাকের জন্য কখনও কিছু করেন নাই, যাহা ভাল বুঝিয়াছেন তাহাই

করিয়াছেন—লোকের নিন্দা প্রশংসা তাঁহাকে কোন অধ্যবসায় হইতে কখন বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার বীরত্বের মূলে দয়াধর্ম্ম বিরাজ করিত। তিনি স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন—যাহা করিয়াছেন বিবেকবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া করিয়াছেন। রাজা বাদসাহ, কাহাকেও তাঁহার ভয় ছিল না; তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর সহিত সামান্য মতান্তরের জন্য একাধিকবার পদত্যাগ করিয়াছেন।

যদি শুদ্ধ ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে সহস্র প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকাতে বীরত্ব থাকে, যদি স্বীয় ব্রত প্রতিপালনের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে উন্মুখ থাকাতে বীরত্ব থাকে—তবে তিনি প্রকৃত অর্থে বীর ছিলেন। তাঁহার অভাব আজ ভাষাতে প্রকাশ করা অসাধ্য।

সত্য বটে তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, কর্ম্মবৃদ্ধ হইয়া জীবনের কার্য্য সাঙ্গ করিয়া জরা মরণের অতীতস্থানে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। কিন্তু যদি সংসারে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য রাখা সম্ভব হইত—আমরা বোধ হয় কেহই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতাম না। তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে, কিন্তু আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া চিরদিন পূজা করিব।

উপস্থিত মহিলাদিগের প্রতি অনুরোধ, যেন তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদ্‌গুণাবলী সর্ব্বদা সন্তানদিগের নিকট মুখে মুখে বিবৃত করেন এবং সন্তানদিগের চরিত্র তাঁহার চরিত্রের অনুরূপ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন; তাহা হইলে রত্নগর্ভা বিদ্যাসাগরের মাতার ন্যায় আপনারাও ধন্য হইবেন, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোকগত হইয়াও স্বদেশীয়দিগের চরিত্রের মধ্যে জীবিত থাকিয়া চিরদিন ভারতের কল্যাণসাধন করিবেন। তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশের শ্রেষ্ঠতর উপায় আর কিছুই হইতে পারে না।

অতঃপর শ্রীমতী কুমারী কামিনী সেন বিরচিত একটী কবিতা শ্রীমতী কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য্য পাঠ করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুদিন পূর্ব্বে বিরচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

যাওরে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাশরি,
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি;
জরা নাহি,মরণ নাহি,শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দস্রোতঃ চলিছে প্রবাহি।
যাওরে অনন্তধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে;
দেব-ঋষি, রাজ-ঋষি, ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে
ধ্যান ভরে গান করে একতানে।
যাওরে অনন্তধামে জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে
শুভ্র সেই চিরবিমল পুণ্য কিরণে,
যায় যথা দান-ব্রত সত্য-ব্রত পুণ্যবান্
যাও, তাত, যাও সেই দেব সদনে।

আর্য্য মহিলা।

সাবিত্রী।

(৩১৯ সংখ্যা, ১০৬ পৃষ্ঠার পর)

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে সত্যবানের সেই "কাল বৎসর" পূর্ণ হইল। সাবিত্রী দেবী একথা দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছেন—তাই দুই দিন পূর্ব্বেই পানাহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রাণ ভরিয়া কেবল জগদীশ্বরের অভয় চরণ স্মরণ করিতেছেন, সেই চরণ স্মরণ করিয়া এখনও সাবিত্রীর দেহে জীবন রহিয়াছে! বিধবা হইয়া রমণীকে বাঁচিয়া থাকিতে দেখিয়াছি, কিন্তু বৈধব্যাশঙ্কা "জীবন্মৃত" হইতেও ভয়ানক, একথা আর বিশেষ করিয়া কি বুঝাইব?

দিবাবসান সময়ে সত্যবান্ প্রতিদিনের ন্যায় কাষ্ঠচ্ছেদন ও ফল মূল আহরণ করিতে গভীর বনে যাইতে উদ্যত হইলেন। সাবিত্রী গৃহকার্য্যেই নিযুক্তা থাকুন বা যে কার্য্যেই ব্যস্ত থাকুন, তাঁহার কেবল সত্যবানই চিন্তা। যে রকম সাধারণতঃ রমণীর হইয়া থাকে, তাহাহইতে আজি সাবিত্রীর বিশেষ চিন্তা—ভয়ানক চিন্তা, না জানি কখন সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়! যিনি—যে হতভাগিনী মুমূর্ষু স্বামীর অন্তিমাবস্থা প্রতীক্ষা করিয়াছেন, তিনিই আজি সাবিত্রীহৃদয় বুঝিতে পারিবেন! সে হৃদয়ে কত জ্বালা, কত ব্যথা—নৈরাশ্য আসিয়া করাল করে প্রাণের গ্রন্থি কি করিয়া খুলিতেছে, জানিতে পারিবেন! যাহাহউক পতিকে একাকী যাইতে দিতে, সাবিত্রীর প্রাণ সরিল না। সাবিত্রী পতির বনপথের অথবা মৃত্যুপথের সঙ্গিনী হইলেন।

গৃহস্থ সকলে জানিতেন, সাবিত্রী কি এক "ব্রত" করিয়াছেন। তাই সত্যবান্ অনাহারক্লিষ্টা ভার্য্যাকে নিজের অনুগামিনী হইতে বিশেষ নিষেধ করিলেন। সাবিত্রীর শ্বাশুড়ীও অনেক নিবারণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সাবিত্রীতে কি আর সাবিত্রী আছেন, যে সে সকল কথা রাখিতে পারিবেন? রমণী কি একাকী স্বামীকে মৃত্যু-মুখে পাঠাইতে পারে? তাই তিনি অনেক অনুনয় করিয়া সত্যবানের অনুগামিনী হইলেন।

দুজনে গহনবনে প্রবেশ করিলেন। সত্যবান্ কাষ্ঠ ছেদন করিতে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়াছেন, সাবিত্রী বৃক্ষ-তলে দাঁড়াইয়া আছেন। সহসা সত্যবানের শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। তিনি সাবিত্রীকে নিজের অবস্থা বলিতে না বলিতে বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িতেছিলেন, কিন্তু পতিপ্রাণা সাধ্বী স্বামীকে নিজের অঙ্কে ধারণ করিয়া প্রাণপণে

শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন—আজ নিজের সকল শক্তি একত্র করিয়া পতিপ্রাণা সাধ্বী, স্বামীর জন্যে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন! আজ রমণীর বলে মৃত্যু অগ্রসর হইয়াও, ভয়ে ভয়ে পশ্চাদ্গামী হইতেছে! আজি সাবিত্রী পতির প্রাণরক্ষার্থে নিজের প্রাণপণ করিয়াছেন! এই বীরঙ্গনা মূর্ত্তি, এই মৃত্যুনাশিনী মূর্ত্তি যে একবার দেখিতে পায়, সেও বুঝি কোনও দিন মরে না!

এখন কাজে কাজে, আগে পৌরাণিক ঘটনা বলিতে হইতেছে। পুরাণ বলেন, সাবিত্রীর সর্ব্বস্ব ধন, সত্যবানকে গ্রহণ করিতে প্রথমতঃ যমদূতেরা আগমন করে, তাহারা সেই রণ-চণ্ডী সাবিত্রীকে দেখিয়া ভয়ে "পলাতক" হয়। শেষে যমরাজ নিজেই সত্যবানকে লইতে আইসেন! তিনি সাবিত্রীর ধর্ম্মভাব ও পতিপ্রাণতা দেখিয়া এত মুগ্ধ হন যে, সাবিত্রীকে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বর দান করিয়া ফেলেন। চতুরা সাবিত্রী যমের নিকট হইতে, শ্বশুরের দৃষ্টিশক্তি, পিতার বহু পুত্র, শ্বশুরের রাজ্য, অবশেষে সাবিত্রী মাতা ও সত্যবান্ পিতা হন, এইরূপ শতপুত্র চাহিয়া বসেন! যম মহাশয়, আত্মবিস্মৃত হইয়া সমস্তই স্বীকার করেন। অবশেষে সতীর কৌশলে (হাবা গঙ্গারাম বা বোকা রাম মোহনের মত) অপ্রতিভ হইয়া সত্যবানকে ছাড়িয়া যান। যমের বরে সাবিত্রী চিরদিনই সুখ শান্তি ভোগ করেন (১)। যাঁহারা পুরাণের সকল কথাই "সত্য" বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক, এইখানে এ প্রবন্ধ শেষ করিতে পারেন।

পুরাণ হইতে কল্পনাগুলি সরাইতে পারিলেই, পুরাণ প্রকৃত ইতিহাস হয়। "সাবিত্রী" যে কল্পিত, একথা আমরা কখনই সহিতে পারিব না—এ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহা ঐতিহাসিক সত্যই। তবে শেষ ভাগটী অর্থাৎ সত্যবানের মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কল্পিত বটে!—যদি মনুষ্য জীবনের অতিক্রান্ত কোনও ঘটনা হয়, তাহা "সরল বিশ্বাসী" বিশ্বাস করুন, কিন্তু মানুষে তাহা হইতে কোনও শিক্ষা পাইতে পারে না—ধারণা করিতেও পারে না। আজি কালি অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করেন যে, সত্যবান্ কোনও দারুণ রোগাক্রান্ত হন, সাবিত্রী প্রাণপণে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করেন। সম্ভবতঃ দ্যমসেন, সাবিত্রীর শুশ্রূষায় দৃষ্টি, ও বুদ্ধি-কৌশলে রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। তাই "সাবিত্রী সমানা" হও বলিলেই সাবিত্রীর মত "স্বামীর আয়ু, যশ, ধন ও সৌভাগ্যের মূল হও" বলা হয়।

এই আধুনিক ব্যাখ্যাতেও আমার

(১) মহাভারতে এ বিষয় বিশেষরূপ বিবৃত আছে। আমরা সংক্ষেপে লিখিলাম, কারণ এ অংশটুকু বর্ণনা করিতে আমরা তত রাজি নহি।

মনে একটু গোলমাল থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ ইহাতে বোধ হয়, সাবিত্রী দেবী পতির একান্ত শুশ্রূষা করিয়াই, তাঁহাকে আরোগ্য করেন, অতএব প্রধানতঃ শুশ্রূষা-পরায়ণা হইতে পারিলেই রমণী পূর্ণ জীবন লাভ করিতে পারেন। শুশ্রূষা-পরায়ণা রমণী যে রোগযাতনা-নাশিনী একথা আমরা সহস্রবার স্বীকার করি, এবং বিজ্ঞ চিকিৎসক, যাহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন রোগীও শুশ্রূষা গুণে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে; ভগিনী ডোরা, শুশ্রূষা গুণে চিকিৎসককেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণপণ শুশ্রূষা করিলেও অনেক লোককে বাঁচাইতে পারা যায় না—তদ্ভিন্ন আত্মীয় স্বজনের বিশেষতঃ স্বামীর রোগ সময়ে কোন্ রমণী শুশ্রূষায় বিমুখ হয়? স্বামীর সহিত স্ত্রীর যে সম্বন্ধ, তাহাতে যিনি "রমণী রত্ন", তিনিও পতির রোগে আত্মবিস্মৃতা; যে রমণীকুলে "নগণ্য" সেও (সেইরূপ না হউক) অতিশয় চিন্তিতা। তবে প্রথমোক্ত "রমণী-জীবনের সর্ব্বস্ব" জানিয়াই পতি সেবা করেন, শেষোক্ত অন্ততঃ "অন্ন-বস্ত্রের যোগানদার" মনে করিয়াও পতিকে যত্ন করে। তাই বলিতেছি, "শুশ্রূষা"ই যদি আদর্শ জীবনের প্রধান উপকরণ হয়, তাহা হইলে এখনও বঙ্গগৃহে তাহার বড় অভাব হয় নাই—যে সাবিত্রী-ইতিহাস না বোঝে, সে [illegible]তির শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ "সাবিত্রী ব্রত করিলে বৈধব্য অতিক্রম করা যায়।" কেন? শুশ্রূষা করিয়া?—অমন কথা বলিও না, তাহা হইলে বঙ্গমাতা "কত শত রত্ন" হারাইতেন না!!

যদি সাবিত্রী-কীর্ত্তির আসল কথাটা বাকি না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কমলাকান্তের পথানুসরণ করিতাম না। (২) সাবিত্রীর সর্ব্বোচ্চ গৌরব, স্বামীকে "যমদণ্ড" হইতে রক্ষা করা, বা বৈধব্যাবস্থার অতীত হওয়া। এই আশয়ে মেয়েরা সাবিত্রী ব্রত করে, যে তাহারা কখনই বিধবা হইবে না; তাহারাও সাবিত্রীর মত "জন্মএয়োস্ত্রী" হইয়া থাকিবে! আজিকার দিনে—দর্শন বিজ্ঞান আলোচনার দিনে, এই রকম কথায় কয়জনের বিশ্বাস হইবে জানি না—"জন্মান্তর" বিশ্বাস করিতে না পারিলে এ সকল কথা কেহই বুঝিবে না!—সেই "জন্মান্তর" বিশ্বাস করিতেই বা কয় জনের প্রবৃত্তি হইবে? অথচ যে আর্য্যগণ, প্রতি ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অমানুষিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন,

---

(২) পণ্ডিত কমলাকান্ত ঠাকুর তাঁহার দপ্তররূপ শাস্ত্রে ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন "যখন হারিয়া যাইবে, তখন গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিবে।" আমরাও সাবিত্রী দেবীর শেষভাগের সত্য উদ্ধার করিতে পারিতেছি না—অবশ্য হারিয়া যাইতেছি, এখন আমাদের কমলাকান্তের ব্যবস্থা মত কাজ করাই ভাল! "মহাজন যে পথে যান, সেই পথই পথ"।

তাঁহারাই যে এত বড় কথাটা একটা কথার কথা—একটা "ছেলে ভুলানো" কথা বলিবেন, ইহাও অসম্ভব।

তবে সাবিত্রী-ব্রত জিনিসটা কি? সাবিত্রী ব্রতের অর্থ যে কেবল জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে ফুল চন্দন দিয়া স্বামীরচরণ পূজা করা, ইহা কখনও বিশ্বাস্য নহে। (তবে সে কার্য্যেরও মহদুদ্দেশ্য আছে বটে।) আমাদের বিশ্বাস, সাবিত্রী ব্রতের প্রকৃত অর্থ, সাবিত্রীর ন্যায় আত্ম-গঠন করা। সাবিত্রীর মত ধর্ম্মানুরাগ, পতিপ্রাণতা, ত্যাগস্বীকার, দৃঢ়তা ও দেবীত্ব শিক্ষা করা। সাবিত্রী দেবীর মত পতিদেবতায় আত্মোৎসর্গ কর; সাবিত্রীর মত স্বামীর ধন চাহিও না, মান চাহিও না, কিছুই চাহিও না, কেবল তাঁহাকে ভালবাসিয়াই চতুর্বর্গ লাভ কর। সাবিত্রী দেবীর মত, স্বামীর দুঃখের অংশ সাধিয়া গ্রহণ কর, রাজার মেয়ে হইলেও হাসিয়া হাসিয়া বন-বাস ক্লেশ ভোগ কর, যথা নিয়মে ভার্য্যাধর্ম্ম পালন কর। সাবিত্রী দেবীর মত, স্বামীকে ভালবাসিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাও, স্বামীর মঙ্গলের জন্যে আপনার সুখ, বলিদান দাও, স্বামীর ভিতর আপনাকে হারাইয়া ফেল, এক দিন, দুই দিন, বহু দিন,—সাবিত্রী-ব্রত করিতে চৌদ্দ বর্ষ ব্যবস্থা—তুমি এই ব্রত চিরদিনই কর। তুমি যে কেন হও না, সাবিত্রী মাহাত্ম্যে তুমি কোনও দিন পতি হারাইবে না।

বিবি সেল্‌ডনের সাধু সংকল্প।

বিবি মে সেল্‌ডন (Mrs. May Sheldon) নাম্নী মার্কিনদেশীয় এক মহিলা আফ্রিকা দেশে যাত্রা করিয়া তথাকার অজ্ঞাত অপরিচিত প্রদেশ সমূহে ভ্রমণ পূর্ব্বক তত্তৎ দেশবাসিনী কৃষ্ণকায়া স্ত্রীলোকদিগের সমুদায় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন! এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অনেক সাহসী ইয়োরোপীয় পুরুষ আফ্রিকায় ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহ বা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে, কেহ বা ঐ মহাদেশের কোথায় কোন্ নদী, কোন্ পর্ব্বত, কোন্ মরুভূমি বা অরণ্য আছে তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য, কেহ বা কাফ্রিদিগের আচার ব্যবহার অবগত হইবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই আফ্রিকার স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে চান নাই। বিবি সেল্‌ডনই এই কার্য্যে প্রথম উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে অসভ্য কাফ্রি মহিলাগণের বুদ্ধি কিরূপ, ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ, তাহাদের হৃদয়ের গুণ নিচয় কতদূর উন্নত তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ঐ দেশের স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি

সাধন জন্য একটী মহা চেষ্টার আয়োজন করেন। বিবি সেল্‌ডনের অদম্য অসাধারণ সাহস ও সুমহৎ উদ্দেশ্যের আমরা যথোচিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। ঈশ্বর তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হউন্, ইহা আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বিবি সেল্‌ডনের বাসস্থান সুপ্রসিদ্ধ চিকাগো নগরে। তিনি একজন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণা স্ত্রী-চিকিৎসক। চিকাগো নগর পরিত্যাগ করিয়া তিনি কিছুকাল পারিস নগরে অবস্থিতি করেন, এবং সেখানে সংগীত বিদ্যা ও স্থাপত্য কার্য্য শিক্ষা করেন। আফ্রিকার পরি-ব্রাজকগণের মধ্যে অনেকেরই সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আছে। তাহারাই তাঁহাকে তাঁহার সংকল্প সাধনে উৎসাহ দিয়াছেন। বিবি সেল্‌ডন আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন এবং একটী আরব দেশীয় ভৃত্য সঙ্গে লইয়া আফ্রিকা যাত্রা করিবেন।

ছাতা।

আসিয়া খণ্ডে ছাতা অতি পুরাতন দ্রব্য। কিন্তু ইয়োরোপে উহা অপেক্ষা-কৃত নূতন জিনিষ। ভারতবর্ষ, শ্যাম, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশ সমূহে রাজা ও সম্রাটগণ অতি পুরাকালে ছত্রের ব্যবহার করিতে একমাত্র অধিকারী বিবেচিত হইতেন! সংস্কৃত ভাষায় ছত্র শব্দের একটী অর্থ নৃপ। আর ছত্র-ভঙ্গ বলিলে নৃপনাশ বুঝায়। অদ্যাবধি ব্রহ্মদেশে ছত্রধারণ করা রাজার বিশেষ অধিকার বিবেচিত হয়। পারস্য, চীন, শ্যাম, এসকল দেশেও রাজার রাজকীয় সাজ সজ্জার মধ্যে অদ্যাপি ছাতাকে একটী প্রধান দ্রব্য মনে করা হয়। মরক্কো প্রদেশেও রাজা ও তাঁহার পরিবারস্থ লোক ব্যতীত রাজ্যের অন্য কেহ ছাতা ব্যবহার করিতে পারেন না। ইয়োরোপীয় তুরস্ক দেশে ছাতার প্রচলন অধিক হয় নাই এবং সুলতানের প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া ছাতা খুলিয়া গমন করা দণ্ডনীয় বিবেচিত হইয়া থাকে। গ্রীক ও রোমানদিগের মধ্যে পুরাকালে ছাতার ব্যবহার ছিল। রোমান্ পুরুষগণ ছাতা ব্যবহার করা পুরুষোচিত মনে করিতেন না, সুতরাং কেবল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই ছাতার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু রোম-সাম্রাজ্যের পতনের কিছুকাল পূর্ব্বে রোম সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ছাতা ব্যবহার করিত। দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে সপ্ত-দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপে, ছাতার প্রচলন ছিল না। ১৭৩০ খৃঃ অব্দে পুনরায় উহা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। ইয়োরোপীয়গণ ভারতবর্ষে

ব্যবহৃত ছাতা দেখিয়াই উহা প্রস্তুত করেন। প্রথমে যে ছাতা প্রস্তুত করা হয়, তাহার আকার বর্ত্তমানে ব্যবহৃত ছাতা অপেক্ষা অনেকাংশে ভিন্ন। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে ছাতা সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে যে ইংরাজ ছাতা ব্যবহার করেন, তাঁহার নাম জোনাক্ হেনওয়ে। ইংরাজদিগের মধ্যে দুই প্রকার ছাতা প্রচলিত আছে, একটীর নাম 'পারাসল্'; অর্থাৎ 'সূর্য্য প্রতিরোধক", বৃষ্টির সময় ইহা ব্যবহার করা হয় না। 'পারাসল্' পুরুষেরা ব্যবহার করেন না, উহা কেবল ইংরাজ স্ত্রীলোকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহাকে ইংরাজীতে 'Umbrella' বলা হয়, তাহা বৃষ্টির সময়েই ব্যবহার করা হয়, এবং তাহা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের ব্যবহার্য্য। ইয়োরোপীয়গণ ছাতার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করা অবধি উহা ক্রমেই সংস্কৃত ও সুলভ করা হইতেছে। এক্ষণে ইয়োরোপের নানা স্থানে যে ছাতা প্রস্তুত হয়, এসিয়া খণ্ডের লোকেরাই তাহা ব্যবহার করে। এই ভারতবর্ষে কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বহুল সংখ্যায় দেশীয় ছাতা প্রস্তুত ও বিক্রীত হইত, কিন্তু এক্ষণে দেশীয় ছাতা বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে।

ভীমরুলের চাক।

ভীমরুল চাক বোলতা চাকের ন্যায় তত সুন্দর না হইলেও দেখিতে মন্দ নয়। ইহা বিচিত্র রঙ্গে রঞ্জিত বোধ হয়। এই চক্র কি উপকরণে নির্ম্মিত হয়, অনুসন্ধান দ্বারা যতটুকু জানিয়াছি, তাহা বর্ণন করিব। ইহারা প্রথমে যখন চক্র নির্ম্মাণ আরম্ভ করে, তখন কোন একটী স্থান মনোনীত করিয়া তাহার কতক অংশ নির্ম্মাণ দ্রব্য দিয়া লিপ্ত করিয়া লয়। পরে সেইটুকু গোলাকার কুটারির মত যতটী কুটারী ঐ লিপ্ত স্থানে ধরে, ততটী গাঁথিয়া তোলে। পরে আবার তাহার পার্শ্বস্থিত কতকটা স্থান উক্তরূপে লিপ্ত করিয়া গাঁথিয়া তোলে, কিন্তু পূর্ব্ব কুটারী গুলির সহিত এই নূতন কুটারী গুলি সংযুক্ত থাকে। এইরূপে ইহারা চক্র বড় করিতে থাকে। বাহিরের কিম্বা বাগানের চক্রে নির্ম্মাণ আমি দেখি নাই; আমাদের গোয়াল ঘরের বারাণ্ডার চালে একটা মস্ত চাক নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছি। চক্র নির্ম্মাণ কালে ইহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করে। আমি যেমন দেখিয়াছি তাহাই লিখিলাম, অবশ্যই ইহাতে ভুল থাকা অসম্ভব নহে, কেননা এই চক্র নির্ম্মাণ আমি একটা বই দেখি নাই। এই চক্রের কিয়দংশ নির্ম্মিত হইলে আমি ইহার নিকট

অবসর মত দাঁড়াইতাম এবং ভীমরুলদের কার্য্য দেখিতাম। এইরূপে ক্রমে খুব বড় চক্র হইলে পরে ইহা নষ্ট করা হয়। ইহারা যে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করে, তাহার এক শ্রেণী নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দেয়। অনুসন্ধান দ্বারা যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাতে ঐ নির্ম্মাণ দ্রব্য আর কিছুই নহে, উহা কেবল শুষ্ক বাঁশ কিম্বা কোন কোঁদা কাষ্ঠের অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ভীমরুলগণের লালায় মিশ্রিত হইয়া কর্দ্দমবৎ হয়। উহারা যে স্থান হইতে লালামিশ্রিত ঐ সূক্ষ্ম পদার্থ লইয়া আইসে, সে স্থানে কিছু ক্ষত দেখায় না। যাহাহউক ঐ দ্রব্য আনিয়া ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীদের মুখে দিয়াই পুনর্ব্বার ঐ দ্রব্য সংগ্রহে বহির্গত হয় এবং উহাদের তীক্ষ্ণ ও অতি সূক্ষ্ম দংষ্ট্র দ্বারা ঐ বংশ বা কাষ্ঠ হইতে কুরিয়া কুরিয়া গুঁড়া কাষ্ঠ বাহির করিতে থাকে। তাহা উহাদের লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া তরল হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী এই সংগ্রহকারীদের নিকট হইতে ঐ দ্রব্য লইয়া কার্য্য আরম্ভ করে। ইহারা ঐ দ্রব্য অল্প অল্প করিয়া মণ্ডলাকারে কক্ষমুখে বসাইয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর ভীমরুলগণ উহা অতি সাবধানে নিজেদের ঠোঁট দ্বারা মসৃণ ও বিস্তৃত করে, ক্রমে উহারা ঐ কক্ষের মুখ সকল অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ করিয়া আনে, পরে মুখটার যে ফাঁক থাকে, তাহা আঁটিয়া দেয়। এই সকল কক্ষের পরদা গুলি এত পাতলা হয় যে তাম্রপাত তাহার নিকট হার মানে। এই সকল কক্ষের ভিতর ভীমরুল স্ত্রীগণ ডিম্ব প্রসব করে, এবং বোধ হয় বড় ভীমরুলগণও রাত্রে ইহার মধ্যে বাস করে। এই ভীমরুল নগরী বোধ হয় ১০।১২ মহল হইবে। কিন্তু বাহিরের দরজা একটী কিম্বা বড় জোর দুইটী; কারণ যখন চক্র ছোট রকম ছিল,তখন একটী মাত্র বহির্দ্বার দেখিয়াছি, কিন্তু খুব বড় হইলে দুইটী দ্বার দেখিয়াছি। ভীমরুলের ডিম্ব দেখিতে কড়া পোকার ন্যায়। চতুর্থ শ্রেণীর ভীমরুলগণ কেবল ভিতর বাহির পর্য্যবেক্ষণ করে। চক্রের কোন স্থান যদি ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তাহা তারে সংবাদের ন্যায় ভীমরুল নগরের সকলেই জানিতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান মেরামত করে কিম্বা মেরামতের বন্দোবস্ত করিয়া রাখে। একদিন দেখিলাম যে প্রকাণ্ড চক্র যাহা গোয়ালের বারাণ্ডার চালের অর্দ্ধেক স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেই চক্রের উপর একটী মাত্র ভীমরুল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। আমি ফিরিয়া আসিয়া একখানি চেয়ার ও ছোট একখানি কাঁচি লইয়া অতি সাবধানে চুপে চুপে সেখানে চেয়ার পাতিয়া তাহার উপর দাঁড়াইলাম, পরে যখন দেখিলাম যে ভীমরুল প্রহরী এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়াছে; তখন আমি কম্পিতহস্তে ঐ চক্রের একটী

কক্ষের মুখটা ছাঁটিয়া দিলাম, অমনি দেখিলাম একটী ডিম্ব তথায় অবস্থিত। পরক্ষণেই দেখি ভীমরুল প্রহরী সেই ভগ্ন কক্ষের নিকট হাজির, এবং ভগ্ন কক্ষ দেখিবা মাত্র চক্রদ্বার দিয়া চক্রের মধ্যে গেল। তার পর ১। ২ করিয়া ১০। ২০টী কিম্বা তদধিক ভীমরুল বহির্গত হইল। আমি পলাইবার চেষ্টা পাইতেছিলাম, কিন্তু তাহাদের কার্য্য যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার ভয়ের কোন কারণ ছিল না, কারণ ঐ ভীমরুলগণ সকলেই মনোযোগসহ ভগ্ন স্থান দেখিতে ছিল। তৎপরে মেরামত করিবার দ্রব্য সংগ্রহ জন্য কয়েকটী ভীমরুল ছুটিল। কেহ ভিতর বাহির দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল, সকলেই মহাব্যস্ত, ভীমরুলনগরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত ভাবে ভগ্ন স্থান মেরামত করা আরম্ভ হইল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে সেই ভগ্ন স্থান সম্পূর্ণ মেরামত হইয়া গেল, আমি সে দিনের জন্য সেখান হইতে বিদায় লইলাম। পরদিন বিকালে অবকাশমত চেয়ার ও কাঁচি লইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম, কিন্তু অদ্য দেখিলাম যে তিনটী প্রহরী চক্রের উপর ভ্রমণ করিতেছে। বোধ হইল আমার কল্যকার ব্যবহারে অধিক সতর্ক হইবার জন্য যেন ৩টীকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছে। আমিও অধিক সতর্কতার সহিত সুবিধার প্রতীক্ষায় রহিলাম। যাই দেখিলাম উহারা আমার লক্ষ্যস্থল পরিত্যাগ করিয়া চক্রের অন্য প্রান্তে গেল, অমনি আমি ৫।৬টী কক্ষ কাঁচি দিয়া কাটিলাম। ইহাতে একটী আমাকে তাড়া করিয়া আসিল, বোধ হয় সে আমার কার্য্য জানিতে পারিয়াছিল। আমি বাধ্য হইয়া কিছুক্ষণের জন্য সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার তথায় আসিলাম। এবারও সেখানে অনেক ভীমরুল জমা হইয়াছে, কিন্তু বেলা নাই, কার্য্য অধিক করিতে হইবে দেখিয়া তাহারা চক্র মেরামত না করিয়া চক্রের ভিতর গেল। পরদিন বিকালে আসিয়া দেখিলাম যে চক্রের ঐ ভগ্নস্থান সম্পূর্ণ মেরামত হইয়া গিয়াছে, তাহায় কোন চিহ্ন মাত্রও নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পরদিন আমাদের রাখাল ঐ চাকের নীচে আগুন দিয়া ধূঁয়া করিল, তাহাতে ভীমরুলগণ কতক বাহির হইয়া গেল, অবশিষ্টগুলিকে ঐ রাখাল চটে দাঁ বাঁধিয়া দূর হইতে চক্র কাটিয়া আগুনে নিক্ষেপ করিয়া সডিম্ব পোড়াইয়া মারিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে দিন ঐ রূপে ভীমরুলদের সর্ব্বনাশ করা হইতেছিল, সে দিন আমি ও আমাদের বাড়ীর অনেকগুলি বালক বালিকা এবং আরও অনেকে সেখানে ছিলাম, কিন্তু ধূমাকুল ভীমরুলগণ বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় ক্ষেপিয়া কোনটী আমাদের কাহাকেও না কামড়াইয়া সহিষ্ণু, ধার্ম্মিক ও ক্ষমাশীলের ন্যায় চলিয়া গেল—মনুষ্য

জাতি নৃসংশ এই সিদ্ধান্ত করিয়াই যেন চলিয়া গেল। সে দিন আমার মনটাও কেমন খারাপ হইয়াছিল, বোধ হয় ভীমরুলদের দুর্দ্দশাই আমার মন খারাপ হইবার কারণ হইবে।

মৃতের সৎকার।*

তিব্বতবাসিগণ মৃত শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন পূর্ব্বক হ্রদে নিক্ষেপ করে এবং মৎস্যগণকে আহ্বান করিয়া তাহা ভক্ষণ করিতে দেয়। পুরাকালীন বেক্‌ট্রিয়ান জাতি মৃতশরীর কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইত। মৃত শরীর ভক্ষণ করাইবার জন্য কতকগুলি কুক্কুর সাধারণের ব্যয়ে প্রতিপালিত হইত। পুরাকালে নরওয়েবাসীগণ মৃত শরীর একটী নৌকার উপর স্থাপন করিয়া তাহাতে মৃত ব্যক্তির ব্যবহার্য্য বস্তু সকল একত্রিত করিত, এবং ঐ নৌকায় অগ্নি সংযোগ করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিত। ইথিয়োপিয়ান্ জাতি মৃত্তিকার বা কোন ধাতুনির্ম্মিত আধারে চির-কালের জন্য মৃত শরীর রক্ষা করিত। বেবিলোনিয়ান জাতি মৃত শরীর মধুতে রক্ষা করিত। ফ্রান্স ও বেলজিয়ম বাসীগণ পূর্ব্বে পর্ব্বত কন্দরে মৃত শরীর প্রোথিত করিত। সিকিম রাজ্যে মৃত দেহ দাহ করিয়া চারিকোণে ভস্ম বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার রীতি প্রচলিত আছে। আফ্রিকার কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে প্রথা আছে তাহারা মৃত শরীর পর্ব্বত শিখরস্থ গহ্বরে নিক্ষেপ করে এবং পথিকগণ উক্ত গহ্বর অনাবৃত দেখিলে তদুপরি এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া যায়। ব্রহ্ম-দেশের ভদ্র লোকগণের মৃত দেহ একটী কাষ্ঠাবরণের মধ্যে রক্ষিত করিয়া তাহা অগ্নি রাশি মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়; কাষ্ঠাবরণটী দগ্ধ হইয়া গেলে মৃত দেহটী উঠাইয়া লইয়া তাহা দাহ করা হইয়া থাকে।

বেয়েনী নামক আমেরিকার অসভ্য জাতি অরণ্য মধ্যে বৃক্ষোপরি মৃত শরীর লম্বমান করিয়া রাখে, মাংসাশী পক্ষিগণ তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। চীনেরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুন্দর স্থানে মৃত শরীর কবর দিয়া থাকে। চীনদিগের বিশ্বাস যে তাহারা যেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হউক না কেন, চীন দেশে তাহাদিগের শরীর সমাহিত না হইলে পরকালে তাহাদিগের সদ্গতি হইবে না। এই বিশ্বাস থাকাতে অনেক চীন বিদেশে কার্য্য করিতে যাইবার সময় নিয়োগকারীর নিকট হইতে এই

* বামাবোধিনী ৩৬৩ সংখ্যা ৩১২ পৃষ্ঠায় দেখ।

বন্দোবস্ত করিয়া লয় যে মৃত্যুর পর তাহার শরীর স্বদেশে সমাহিত করিবার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। গ্রীক জাতির মধ্যে মৃত দেহ দাহ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। রোমানদিগের মধ্যে কিয়ৎকাল দাহ রীতি প্রচলিত থাকে এবং তৎপরে সমাধি প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

১। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কান্সাস্ নামক একটী রাজ্য আছে। ঐ রাজ্যে স্ত্রীলোকদিগকে প্রায় সকল বিষয়ে পুরুষগণের ন্যায় সমান অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। কান্সাসে নিয়ম আছে কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ না করিয়া জমী কিম্বা অন্য কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে না।

২। ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে দরিদ্রদিগের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিবার জন্য যে আইন আছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে এক একটী সভা আছে, তাহাকে "পুয়র্-ল-বোর্ড" বা "দরিদ্রদিগের আইন নির্ব্বাহক সমিতি" বলা হইয়া থাকে। এই সকল সমিতির সভ্যগণের মধ্যে কয়েক জন করিয়া স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এক্ষণে ইংলণ্ডের উক্ত সমিতি সমূহে চল্লিশজন স্ত্রীলোক সভ্যরূপে নিযুক্ত আছেন।

৩। সেন্ ডোমিঙ্গো দ্বীপে একটী লবণের পর্ব্বত আছে। ইহা দুই ক্রোশ লম্বা এবং ৫০।৬০ হাত উচ্চ। এই পর্ব্বত একটী প্রকাণ্ড লবণের চাঁই। এই লবণ প্রায় কাচের ন্যায় স্বচ্ছ; এক ইঞ্চি পুরু একখণ্ড লবণ কোন একখানি ছাপার কাগজের উপর রাখিয়া অনায়াসে তাহা পাঠ করা যায়। এই পর্ব্বতস্থ লবণ উক্ত দ্বীপবাসীগণ ব্যবহার করিয়া থাকে বলিয়া ক্রমে ইহার আকৃতি হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে।

৪। বাদুড়েরা দৃষ্টিশক্তির পরিচালনা অতি অল্পই করিয়া থাকে, এই জন্য তাহাদিগের চক্ষু নষ্ট হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। স্পালান্জানি নামক ইতালীর প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বাদুড়ের শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্পর্শ শক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ যে একটী বাদুড়ের চক্ষু নষ্ট করিয়া যদি তাহাকে একটী ঘরে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে উড়িবার সময় সম্মুখস্থ সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থের ব্যবধান পর্য্যন্ত স্পর্শ শক্তি দ্বারা বোধ করিয়া থাকে।

৫। মস্কট নগরে এরূপ গ্রীষ্মাতিশয্য হইয়া থাকে যে তথায় অনেকে দিবা-ভাগে ও রাত্রিকালে মাটীর উপর শয়না-বস্থায় থাকিয়া ভৃত্যদিগকে অনবরত তাহাদিগের শরীরে বারিবর্ষণ করিতে আদেশ দেন। সারি সারি আট দশজন

লোক শয়ন করিয়া রহিয়াছে, এবং মালী যেমন গাছে জল সিঞ্চন করে, সেইরূপ এক জন ভৃত্য তাহাদিগের গাত্রে জল ছড়াইয়া দিতেছে, এই দৃশ্য মস্কট নগরে গৃহে গৃহে দেখা যায়।

৬। স্পেন্‌দেশে ত্রিশ প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত আছে। তথায় প্রত্যেক রাজা বা রাণী নূতন মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বা রাণীগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করেন না। এইরূপে ক্রমেই মুদ্রার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে।

৭। যে সকল মৎস্য সমুদ্রের দুই হাজার ফিট নিম্নে জল মধ্যে সর্ব্বদা বাস করে, তাহারা মাংসাশী। অতদূর নীচে সূর্য্যালোক সম্যকরূপে প্রবেশ করে না বলিয়া সেখানে কোন প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ জন্মে না, সুতরাং তথাকার মৎস্য-গণ জলমধ্যস্থ কীটাদি আহার করিয়াই জীবন ধারণ করে।

"যেমন দেবা তেমনি দেবী।"

ভাষায় বলে "যেমন দেবা তেমনি দেবী।" এই উক্তির কি কিছু সার্থকতা আছে? যদি থাকে তো তদ্বিষয় কিছু অনুশীলন করা যাউক। সকলেই জানেন যে, এখানে "দেবা" অর্থে স্বামী আর "দেবী" অর্থে স্ত্রী, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী অর্থাৎ স্বামী যে প্রকার লোক হইবে স্ত্রী নিশ্চয় অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে তদনুরূপ প্রকৃতি পাইবে। স্থূল কথা, স্বামী স্ত্রীর আদর্শ, স্বামীকে দেখিয়া স্ত্রীর জীবন গঠিত হয়। স্বামী ভাল হইলে, স্ত্রী ভাল হইবেই হইবে। যেমন অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ধাতু সংশুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়, সেই-রূপ স্বামীর সারবত্তারূপ অনলে স্ত্রীর অসারবত্তাটুকু ভস্মীভূত হইয়া বিশুদ্ধ সারবান পদার্থে পরিণত হয়। প্রত্যুত, স্বামী অসার চরিত্রহীন পুরুষ হইলে স্ত্রী চরিত্রবতী গুণশীলা হইয়াও অনেক স্থানে দোষসঙ্কুলা হইয়া পড়েন। যেমন আলোক হইতে লোক অন্ধকারে আগমন করিলে সকলি অন্ধকারময় দর্শন করে, পূর্ব্বের আলোক তাহাকে কিছু-মাত্র সহায়তা করে না—সে চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়ে; নির্গুণ স্বামীর হস্তে গুণবতী নারীরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হয়। এই উক্তির যাথার্থ্য সমস্ত সভ্য জগতে স্বীকৃত। ইংলণ্ডীয় মহিলাগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া চরিত্রবতী হইয়া পরিণীতা হন; তথাপি তাঁহাদিগের ভাবী জীবন স্বামীর উচ্চ বা নীচ আদর্শে পুনর্গঠিত হয়। আমাদিগের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এ অবস্থায় বঙ্গমহিলার স্বামী শুধু

স্বামী নহে, শিক্ষকও। বঙ্গীয় যুবকদিগের এই দায়িত্বের ভিত্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। চরিত্রবান, সুশিক্ষিত ও ধার্ম্মিক হওয়া যে তাঁহার বিশেষ আবশ্যক, বোধ হয় তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

এক্ষণে দেখা যাউক এখন কিরূপ দেবী বঙ্গদেশে জন্মিতেছেন। শিক্ষার প্রথম ও প্রধান আগার গৃহ। গৃহে জনয়িত্রী প্রধানা শিক্ষায়িত্রী। বঙ্গীয় গৃহস্থগৃহে জননী নিজে লেখা পড়া জানেন না, অন্যকে শিখাইবেন কি? সুতরাং মূর্খা মাতা দ্বারা সন্তান কিরূপ শিক্ষিত হইতে পারে, তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে না। এই কথার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে, লেখা পড়া না জানিলে কি নারী গুণসম্পন্না হয় না? আমরা বলি হয়, কিন্তু বিদ্যা গুণের নায়িকা, বিদ্যা গুণের শিরোভূষণ, বিদ্যাই গুণ বর্দ্ধনকারিণী। গুণ সুবর্ণ, বিদ্যা সোহাগা। বিদ্যাহীন গুণী লোক অন্ধগুণকলাপ দ্বারা পরিচালিত হয়।

পারিবারিক চক্রের মধ্যে দ্বিতীয় শিক্ষক পিতা। এখনকার পিতৃগণের মধ্যে অনেকে নীতি বিষয়ে উদাসীন। ইহারা অনেক সময়ে মিথ্যা কথা বলা যে একটি মহা পাপ, তাহা নিজে স্মরণ রাখিয়া কণ্টকাকীর্ণ সংসারমার্গে পদবিক্ষেপ করেন না। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। কোনও ভদ্রলোক কোনও ভদ্রসন্তানের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, পিতার যদি দেখা করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে সন্তানকে দিয়া বলিয়া পাঠান "বলগে যা বাবা বাড়ী নেই।" এদিকে মুখে শিক্ষা দিতেছেন "বাবা মিথ্যা কথা বলিও না," "মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ," ওদিকে স্পষ্ট মিথ্যা বলিতে আদেশ দিতেছেন। ইহাতে কি হয়? সন্তান অনতিবিলম্বে জানিয়া লয় যে, বাবা নিজেই মিথ্যা বলিতে সময় সময় আজ্ঞা করেন। অতএব মিথ্যা বলা দেখিতেছি তত পাপ নয়। সেও ঐরূপ বলিতে চায়, শেখে, শিখিয়া কালক্রমে ভয়ানক মিথ্যাবাদী হইয়া উঠে।

তৃতীয় শিক্ষক গুরুমহাশয়। এস্থলে আমরা গুরুমহাশয়ের অর্থে পাঠশালার শিক্ষক ও স্কুলের মাষ্টার পণ্ডিত সকলকে এক শ্রেণীভুক্ত করিলাম, আর বিদ্যালয় অর্থে স্কুল পাঠশালা সকলি অভিহিত হইল। বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয় বলিলেন "ওরে পরের জিনিষ লওয়া দোষ, ও কাজ করিসনে।" তার পর ছাত্র দেখিল (অবশ্য বিদ্যালয়ের বর্হিদেশে) শিক্ষক মহাশয় নিজে তাহা করিতেছেন। ইহাতে কি সে অন্ততঃ কলমটা বা কাগজটা তৎ তৎ অধিকারীর অজ্ঞাতসারে লওয়া চুরী বলিয়া মনে করিবে? এই দৃষ্টান্তটা সহজে মনে পড়িল, তাই উল্লেখ করিলাম। ইহা অপেক্ষা গুরুতর পাপ তিনি নিজে করিয়া যে শিক্ষা

দিতেছেন ও প্রকারান্তরে আপনার নীতি শিক্ষার অসারত্ব প্রমাণ করিতেছেন, সে সর্ব্বনাশ নিবারণের কি কিছু উপায় হইতেছে? ঘরে বাহিরে মিথ্যা কথা চুরী প্রভৃতি শিক্ষা হইতেছে। ধর্ম্মের আলোচনা, নীতির আলোচনা প্রকৃতপক্ষে আদৌ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নাই। ধর্ম্মবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই যুক্তি ভাল সন্দেহ নাই; কিন্তু যে সকল সত্যে সকল ধর্ম্মের ঐক্য আছে এরূপ বিষয় বিদ্যালয়ে কেন না অধীত হয়? এই মহানগরীস্থ কোন এক গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে কোন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মার প্রদত্ত সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম বিষয়ক "উপদেশ" তত্রত্য প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগের মধ্যে বিতরিত হইতে দেন নাই। দেওয়াতে উপকার ব্যতীত অপকার নাই, ইহা তিনি বুঝেন নাই। এরূপ লোকের হস্তে দুরূহ অধ্যাপনা কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে মহাপণ্ডিত চাণক্যের শ্লোক গুলি পঠিত হইত, এমন কি ছাত্রগণকে তাহা মুখস্থ করিয়া গুরুমহাশয়কে শুনাইতে হইত। এখনকার ছেলেরা কি চাণক্যের নাম শুনিতে পায়? পূর্ব্বে ঐ শ্লোকগুলি আবার বাটীতে ও "পঞ্চ পিতা, সপ্তমাতা" প্রভৃতি সার নীতি বিষয় গুলি পিতা প্রভৃতি গুরুজন সমক্ষে সন্তানগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইত। এখন কি তাহা হয়? এখনকার ছেলেরা স্বর্গীয় পিতার নামের অগ্রে শ্রী দিয়া বসে; পিতামহের মাতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিলে চক্ষু স্থির। আপনার পিতামাতা শিক্ষকেরই অবমাননা করে, "অন্যে পরে কা কথা"। এই সকল কুশিক্ষায় যে কিরূপ "দেবা" হইবে, তাহার আভাস মাত্র বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দিতে প্রয়াস পাইলাম।

আখ্যায়িকা।

অতি প্রাচীনকালে দুইজন খ্রীষ্টান সাধু এক পর্ব্বত গুহায় থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেন। বাল্যকাল হইতেই মানবসমাজের সর্ব্ব প্রকার হিংসা দ্বেষাদি মলিন ভাব হইতে বহু দূরে থাকাতে তাহারা সংকীর্ণতা ও কুটিলতা কি জিনিস তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে একজন অপর ব্যক্তি অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন, কিন্তু বহুকাল হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মবন্ধুত্বে পরস্পর সম্বদ্ধ হওয়াতে একের সহিত অপরের কোন পার্থক্য ছিল না।

এক দিন ছোট সাধু বড় সাধুকে বলিলেন, "শুনিয়াছি লোকালয়ে কত ঝগড়া বিবাদ হয়, এস আমরা দুজনে মিলিয়া খানিকক্ষণ ঝগড়া করি।" বড়

সাধু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন "তুমি কি ঝগড়া করিতে পারিবে ?" ছোট বলিলেন "কেন পারিব না ?" তুমি আমাকে একবার শিখাইয়া দিলেই আমি বেশ ঝগড়া করিতে পারিব। তখন বড় সাধু ছোটকে এক খণ্ড প্রস্তর দেখাইয়া বলিলেন, "মনে কর এই প্রস্তর খণ্ড লইয়া আমাদের ঝগড়া হইবে। তুমি বলিবে যে এ প্রস্তরখণ্ড আমার, আবার আমি বলিব যে ইহা আমার ; এই ভাবে এই সামান্য শিলাখণ্ড লইয়া আমাদের মধ্যে খুব বিবাদ বাধিবে।" বড় সাধুর নিকট এইরূপে ঝগড়া করিতে শিখিয়া ছোট সাধু বলিয়া উঠিলেন, "এ প্রস্তর-খণ্ড আমার," বড় সাধু অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমার নয়, আমার।" ছোট সাধু বলিলেন, "বেশ তোমার হয় ত তুমিই লও।" দুঃখের বিষয় ঝগড়া এই-খানেই শেষ হইয়া গেল।

যীশুর প্রিয়তম শিষ্য সাধু জন (John) একটী যুবাপুরুষকে বড়ই প্রেম করিতেন। জনের সহবাসে থাকিয়া এই যুবকের হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যুবকের প্রাণে ধর্ম্মভাব মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই কার্য্যোপলক্ষে জনকে স্থানান্তরে গমন করিতে হইল। যুবক কুসংসর্গে পড়িয়া বিপথগামী হইল। যুবক একজন শক্তি-শালী লোক ছিল। সুতরাং কুপথে গিয়াও কুলোকের নেতৃত্ব পদ লাভ করিল। সে একদল দস্যুর দলপতি হইয়া অশ্বারোহণে রাজপথে দস্যুবৃত্তি করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে জন ফিরিয়া আসিলেন। তিনি প্রত্যাগমন করিয়াই প্রিয় শিষ্যের পতনের কথা শুনিলেন। তাঁহার প্রাণে শেল বাজিল। তিনি অবিলম্বে প্রিয় শিষ্যের অন্বেষণ না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্যাকুল প্রাণে অন্বেষণ করিতে করিতে একদিন অকস্মাৎ দেখিতে পাই-লেন প্রাণসম যুবা শিষ্য অশ্বারোহণে যাইতেছে। সাধু পাগলের ন্যায় "প্রিয় বৎস," "প্রিয় সন্তান," বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেই দস্যুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। যুবা সাধুকে চিনিয়াও চিনিল না, দেখিয়াও দেখিল না। সে অধিক-তর জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া গন্তব্য স্থানে চলিতে লাগিল। প্রেমস্বভাব জন প্রেম বলে বলীয়ান হইয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। পার্ব্বতীয় পথে অশ্ববেগে দৌড়িতে দৌড়িতে তাঁহার চরণ ক্ষত বিক্ষত হইল, শরীরের স্থানে স্থানে আঘাত লাগিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। কিন্তু সে দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি প্রাণের টানে সন্তানতুল্য শিষ্যকে ধরিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়াছেন। অবশেষে অশ্বারোহী ও সাধু উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অশ্বারোহী যুবক অশ্ব থামাইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। সাধু হারাধন পাইলাম বলিয়া প্রবল বেগে ছুটিয়া গিয়া যুবকের গলা জড়াইয়া ধরিলেন এবং

চক্ষের জলে ভাসিয়া "আমার সন্তান," "প্রিয় পুত্র" ইত্যাদি সুমধুর সম্বোধনে দস্যুকে ডাকিতে লাগিলেন। যুবকের পাপাসক্ত পাষাণ প্রাণ গলিয়া গেল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সেও জনের চরণ ধরিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। প্রেম যুগে যুগে দেশে দেশে নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়া কত জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার করিয়াছে কে তাহার গণনা করিবে?

নূতন সংবাদ।

১। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান দেশ ব্যাপিয়া হইতেছে, তাঁহার পুত্রও এতদুপলক্ষে উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন। প্রায় ২০,০০০ কাঙ্গালীকে ।০ চারি আনা করিয়া দিয়া বিদায় করিয়াছেন।

২। আগামী নবেম্বর মাসে যুবরাজ প্রিন্স জর্জ ভারত ভ্রমণে আসিবেন।

৩। এ বৎসর বিলাতের সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় দুইজন বাঙ্গালী যথাক্রমে ২৮ ও ৩১ স্থানীয় হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম এস পালিত ও বি সি, সেন।

৪। বঙ্গবাসী পত্র রাজদ্রোহী বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। পুলিস কোর্ট হইতে বিচার হাইকোর্টের দায়রা সোপরদ্দ হয়। আপাততঃ আসামী ৪ জন জামিন দিয়া খালাস হইয়াছেন, ২ মাস পরে তাহাদের পুনর্বিচার হইবে।

বামারচনা।

মাতৃ ও শ্বাশুড়ী ভক্তি।

(পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।)

গুরুজনের প্রতি ভক্তি মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক, তবে কোথায় কোথায় ইহার ন্যূনাধিক্য দেখা যায় বটে। যাহা আমাদের প্রকৃতিতে স্বাভাবিক, আমরা যে তাহা সর্ব্বদাই করিতে পারি, এমত নহে। শিক্ষাদ্বারা আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলিকেই বিকশিত করা চাই এবং কোন্ অবস্থায় কাহার প্রতি আমাদের কি প্রকার কর্ত্তব্য, তাহাও অনেক দূর পর্য্যন্ত যথাসাধ্য স্থির করিয়া রাখা উচিত। এবিষয়ে এইরূপ চিন্তা ও শিক্ষার অভাবে আমাদের অনেক সময়েই অনেক ক্রটী পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রথমতঃ মাতৃভক্তির বিষয় উল্লেখ করা যাউক।

এজগতে মাতৃস্নেহের তুলনা কোথায়? মাতার স্নেহ যে জগতে অতুলনীয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিপদের সময়, পীড়ার সময় আমরা একবার 'মা' নাম মুখে করিলেও কত আনন্দ লাভ করি, সন্তানের প্রতি মা যেমন স্নেহ করেন, তেমন আর কেহই করে না, কেহই পারে না। স্নেহ অনেকেই করেন বটে, কিন্তু মায়ের স্নেহের সহিত তাহার তুলনা হয় না। আমি যদি মূর্খ কিম্বা পাপী হই, তবে আমি সকলের অপ্রিয় হইব বটে, কিন্তু কখনও মাতার বিরাগভাজন হইব না। যাহাকে পাপী বলিয়া সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই হতভাগ্যের জন্য মাতা ভিন্ন কে আর নীরবে অশ্রুপাত করে? মাতাকে সন্তান সম্বন্ধে যে যাহা বলুক না কেন, মাতা সন্তানের শুভ কামনা ভিন্ন অন্য ভাব মনে স্থান দিতে পারেন না। তাই লোকে বলে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" ইহার অর্থ এই যে জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এমন যে মাতা, আমরা তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া কি থাকিতে পারি? সন্তান যদি দুদিনের জন্যও বিদেশে যায়, তবে মার নিকটে সেই দুইদিন দুই বৎসরের মত বোধ হয়। সর্ব্বদা সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন। আর আমাদের একটু অসুখ হইলে মা অস্থির হইয়া পড়েন, এবং আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল সন্তানের শুশ্রূষা করিতে থাকেন। আমরা যখন মাতার অবাধ্য হই, তখন ভাবি না যে মাতা আমাদের প্রতি কত স্নেহবতী। দেখিতে পাই যে তিনি আমাদের অবাধ্যতায় কষ্ট পাইলেও আমাদের সেই দুষ্ট ব্যবহার শীঘ্রই ভুলিয়া যান। আমাদিগের সর্ব্বদাই চেষ্টা করা উচিত কিরূপে তাঁহাকে সুখী করিতে পারি। তাঁহার পীড়ার সময় তাঁহার সেবা করিব, মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহার কষ্ট দূর করিব এবং আরও নানারূপে তাঁহার বিনোদনে সযত্ন হইব। যাহার এ সংসারে মা নাই, তাহার কোথাও আদর নাই; সে হয়ত কোথায় দাঁড়াইয়া খাবার চাহিতেছে, সে কথাও কেহ শুনে না, সে কাঁদিয়া অস্থির হইলে কে তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া দেয়? অন্য লোক থাকিতেও সে এ সংসারে মা বিনা অনাথা। এমন যে স্নেহময়ী মাতা আমরা তাঁহাকে প্রাণপণে সুখী করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাতার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিব। মা যখন যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব যেন সর্ব্বদা মাতার আজ্ঞাবহ হইতে পারি, এবং তাঁহার হৃদয়ে ক্লেশ উৎপাদন না করি।

শাশুড়ী ভক্তি।

শাশুড়ী মার অনুরূপা সত্য বটে,

কিন্তু মাতাকে জন্মাবধি দেখিতেছি, জন্মাবধি তাঁহার স্নেহ অনুভব করিতেছি, সুতরাং মাতার প্রতি ভক্তি যেরূপ স্বতঃ উৎপন্ন হয়, শাশুড়ীর প্রতি সেরূপ না হইতে পারে। তবে শাশুড়ী যে আমাদের মাতৃস্থানীয়া এবং মাতার স্বরূপ, তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত ইহাতে আর সন্দেহ নাই। রমণী, প্রণয়ে স্বামীর সহিত যুক্ত হয়েন। যদি স্বামী তাহার মাতার প্রতি ভক্তিমান থাকেন, তাহা হইলে সেই রমণীর পক্ষেও শাশুড়ী-ভক্তি অতিশয় স্বাভাবিক, এবং সহজ হইতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক ও সহজ হউক আর নাই হউক, সর্ব্বপ্রযত্নে শাশুড়ীর প্রতি মাতার মত ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। অনেক বধূর ভাগ্যে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে যাহাকে সে কখনও দেখে নাই, যাঁহার স্নেহ কখনও অনুভব করে নাই, তাঁহারই বধূ হইতে হইল। সে জানে না শাশুড়ী কাহাকে কেমন স্নেহ করেন, এরূপ স্থলেও সহজে ভক্তির উদয় হয় না। আমাদের ভক্তি প্রভৃতি অন্যের ভাবসাপেক্ষ। সচরাচর দেখা যায় যে, যিনি যাহাকে যে পরিমাণে স্নেহ করেন, তিনি সেই পরিমাণে স্নেহ পাইয়া থাকেন। সেই প্রকার শাশুড়ী বধূকে স্নেহ করিলেই, বধূ তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিবে না। কোন কোন স্থানে শাশুড়ীর দোষে, কোন স্থানেই বা বধূর নিজের দোষে শাশুড়ীর প্রতি ভক্তির ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। এখন কাহার প্রথমে ভক্তি এবং স্নেহ করা উচিত? বধূ কন্যাস্থানীয়া, এবং শাশুড়ী মাতৃস্থানীয়া। এরূপ স্থলে বোধ হয় প্রথমে শাশুড়ীর বধূকে স্নেহ করা উচিত। কারণ বালিকা সহজেই ভ্রম করিতে পারে এবং তাহা কতকটা মার্জ্জনীয় বটে। সে নূতন স্থানে আসিয়াছে, কিরূপে চলিতে হইবে, কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা সে জানে না। প্রথম সে যখন আসে, তখন তাহাকে পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, তখন তাহার নূতন স্থান তাহার ভাল লাগে না। যে প্রকার অরণ্য হইতে একটী পক্ষী ধরিয়া পিঞ্জরে রাখিলে তাহার নিকট সে পিঞ্জর সুবর্ণময় হইলেও তাহার নির্ম্মিত বাসা অপেক্ষা কখন ভাল লাগে না; সেই প্রকার বধূ যখন নূতন বাড়ী আসে, তখন তাহার কিছুই ভাল বোধ হয় না। পাখী যেরূপ উত্তম খাদ্য না পাইলে পোষ মানে না, সেইরূপ বধূ কিরূপে তাহার সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া শাশুড়ীকে মাতার ন্যায় দেখিতে পারে? এই জন্য শাশুড়ীর উচিত যে প্রথম সেই বালিকাকে কন্যা নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন। একমাত্র স্নেহই তাহাকে ভুলাইয়া রাখে এবং কেবল স্নেহের দ্বারাই বধূগণ বশীভূত হইয়া শাশুড়ীর প্রতি ভক্তিমতী হয়েন। স্বভাবতঃ সকল বধূ শাশুড়ীকে ভয় করেন। শাশুড়ীর পক্ষে বধূর প্রতি যেরূপ স্নেহ করা উচিত, বধূরও সেইরূপ শাশুড়ীর প্রতি ভক্তি করা উচিত। যদি শাশুড়ী কখন কোন বিষয়ে বিরক্ত হন, তবে বধূর উচিত যে সহিষ্ণুতা গুণে তাহা সহ্য করেন। আর কখনও তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা বধূর কখনও উচিত নয়। কিন্তু আজ কাল অনেক বধূই যাঁহারা একটু লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা শাশুড়ীকে দুই একটী কথা বলিতে ত্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু বধূদের পক্ষে মাতার অনুরূপ সেই শাশুড়ীর প্রতি এমন ব্যবহার করিয়া শিক্ষার কুফল প্রদর্শন করা উচিত নহে। শাশুড়ী যত দুষ্ট হউন না কেন,

বধূর তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া অন্য রূপ ব্যবহার করা উচিত নহে। যখন শাশুড়ীর কন্যারা নিজ নিজ শ্বশুর বাড়ী থাকেন, আর শাশুড়ী কন্যাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ক্লেশে বাস করিতে থাকেন, সেই দুঃখের সময় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বুঝান কর্ত্তব্য যে, বধূরাই তাঁহার কন্যাস্থানীয়া। পীড়ার সময় ঠিক্ মায়ের তুল্য সেবা করিতে হইবে। এক কথায় কন্যার যত কার্য্য সকলি বধূকে করিতে হইবে।

উল্লিখিত শাশুড়ী-ভক্তি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে প্রথমে শাশুড়ী বধূকে স্নেহ না করিলে বধূরা শাশুড়ীকে স্নেহ্ করেন না (অনেক স্থলেই এরূপ ঘটিয়া থাকে।) তবে কি সে শাশুড়ীর প্রতি স্নেহ করা উচিত নয়? শাশুড়ী স্নেহ না করিলে বধূর শাশুড়ীর প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, তাহাই এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বধূ বালিকা, তাহার ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু বধূ আর চিরদিন বালিকা থাকেন না, ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত হইয়া উঠেন; তখন আর সে বালিকা ভ্রম থাকে না। অনেক শাশুড়ী আছেন, তাঁহারা বধূকে স্নেহ করেন না, আর অনেক বধূ আছেন যাহারা শাশুড়ীর এই প্রকার ব্যবহারের সমুচিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। শাশুড়ীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করা কদাচ উচিত নয়। শিক্ষিতা হইয়াছেন, বয়স বৃদ্ধি হইয়াছে, এখন একবার বধূর শাশুড়ীর প্রতি পূর্ব্বোলিখিত প্রকারে ভক্তি করিয়া দেখা আবশ্যক। তিনি শাশুড়ীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবেন যে শাশুড়ী পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বধূকে স্নেহ করিতে পারেন। বোধ হয় বধূর এইরূপ কোমল ব্যবহারে শাশুড়ী বধূকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তাহা হইলে বধূরা যখন পীড়ায় অস্থির হইয়া মাগো, বাবাগো বলিয়া ডাকিবেন, তখন কি শাশুড়ী তাহাদের প্রতি মাতৃস্নেহ বিস্তার না করিয়া থাকিতে পারিবেন? উচ্চ পদ বা উচ্চ মান সম্ভ্রমের ভ্রমে পড়িয়া যদি শাশুড়ীর কিম্বা মাতার প্রতি রূঢ় ব্যবহার বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে চরিত্রের অত্যন্ত গুরুতর দোষই প্রকাশিত হয়। দিনে দিনে যেরূপ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে সুশিক্ষিতা রমণীগণ গুরুজনের প্রতি অসামান্য ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আপনাদের সুশিক্ষার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিবেন।

শ্রীমতী রেবা রায়, কটক।

বিসর্জ্জন।

আর কেন দিবাকর, পূরব গগনে
দিলে দরশন?—
থাক্ বঙ্গ কালি-মাখা,
থাক্ কুহেলিকা-ঢাকা,
আজি তার বুকে নাই "প্রাণাধিক ধন!'

২

তুমি কি দেখিছ মুখ লুকাইয়া হেন,
শ্রাবণের ধারা!
যত পার ঢা'ল তুমি,
ডুবে যা'ক্ বঙ্গ ভূমি,
স্নেহের "ঈশ্বর" তার হয়েছে সে হারা!

৩

থা'ম্ রে বিহগ, তোরা গা'স্‌নেকো আর
ও প্রভাতি গান!
ভুলে গিয়ে "কুহু কুহু"
ডাক্ পাখি "উহু উহু"
[তা]'র বুকে নাই আজি প্রাণের সন্তান!

আর তুমি দিগঙ্গনে, কি দেখিতে এলে
গগন-প্রাঙ্গণে ?
চাইনে, মৃদুল বায়,
আতর ফুলের গা'য়,
আমরা এসেছি আজি দেব-বিসর্জ্জনে !

৫

মায়ের কপালে কালি দিয়েছে আগুন
নিশীথ অষ্টমী—
মুখে তা কহিতে হায়
বুক যে ফাটিয়া যায় !—
হয়েছে বঙ্গের আজি "বিজয়া দশমী !"

৬

আঁধারি অযোধ্যাপুরী বঙ্গ অভাগীর
রাম গেছে ছেড়ে !—
কি কহিব হরি হরি,
কহিব কেমন করি,
বিদ্যাসাগরেরে আজি নিয়ে গেছে কেড়ে

৭

কেন রে অশনি, আজি পড়িলে না আসি
বঙ্গ মা'র শিরে—
তা হলে তো আজি মাতা
সহিত না হেন ব্যথা,
জীবনের সরবস্ব ফেলি গঙ্গাতীরে ! !

৮

কেন রে সাগর, তুমি না করিলে গ্রাস
বঙ্গ-অভাগিনী—
তা হলে তো এতক্ষণ
দিত না সে বিসর্জ্জন,
দুখিনীর কোটী সোণা নয়নের মণি !

৯

আজ আর দীন হীন কার কাছে ক'বে
পরাণের জ্বালা ?—
কোথা সে "অনাথবন্ধু"
কোথা সে "করুণাসিন্ধু"
কোথা সে অমর আভা দেব-দেহে ঢালা !

১০

কার আশা করে আর পতি সুতহীনা
অনাথা দুঃখিনী ?—
অবলা বালার তরে,
কে খাটিবে শত করে,
কার মুখ চাবি তোরা, ও বঙ্গ-বাসিনি !

১১

বঙ্গের উজ্জল রবি আজি রে ডুবিল
কাল সিন্ধু-নীরে—
জননীর হৃদাকাশে,
কত তারা যায় আসে,
এমন তপন আর উজলিবে কিরে ? ?

১২

পেয়েছিলি অভাগিনি, শত জনমের—
তপস্যার ধন—
আজি এ কনক খাটে
এই নিমতলা ঘাটে,
সে দেব-দুর্ল্লভ নিধি দেরে বিসর্জ্জন ! !

১৩

কাঁদিছে পঞ্জাব বম্বে কাঁদিছে মান্দ্রাজ-
হয়ে পাগলিনী !
কাঁদিছে বৃটনবাসী—
যায় বিশ্ব শোকে ভাসি !
দিগন্তে, অনন্তে, অই হয় প্রতিধ্বনি ।

১৪

আয় মোরা, বঙ্গবাসী ! স্নেহময় দেবে—
"বিসর্জ্জন" করি !—
পাষাণে বাঁধিয়া মন,
মিলে মিশে ভাই বোন,
দিগন্ত কাঁপায়ে আজি বলি "হরি ! হরি !"

১৫

তুমি তো দেবতা-পিতঃ ! দেবতার দেশে
চলি গেলে সুখে,
আমরা কিসের আশে
র'ব এ আঁধার বাসে,
জগতে দেখাব মুখ কোন্ পোড়া মুখে ?

১৬

দিনে দিনে যাবে দিন, দেবের আশীষে-
যাবে হাহাকার !—
যাবে না ও কীর্ত্তি-গাথা,
যাবে না দীনের ব্যথা,
যাবে না এ অশ্রুজল বঙ্গ অবলার—
তাদেরি "ঈশ্বরচন্দ্র" আসিবে না আর ! !

প্রণয় প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২১ সংখ্যা। | আশ্বিন ১২৯৮—অক্টোবর ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রমাবাই ও তাঁহার বিধবা পরিজন—এই শীর্ষক একখানি সুন্দর ছবি ৫ই সেপ্টেম্বরের বোম্বাই গার্ডিয়ানে দেখিয়া আমরা পরম প্রীত হইলাম। ৩ বৎসর হইল তাঁহার "সারদাসদন" বোম্বাই নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১ বৎসর হইল ইহা পুনার রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট এক বৃহৎ বাঙ্গালায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। এক একটী করিয়া ৩০টী হিন্দুবিধবা এখানে আশ্রয় লইয়াছেন। পুনা ও বরাহনগর এই দুই স্থানের বিধবাশ্রম দ্বারা অনেক উপকার হইতেছে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাদের স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

বিবী বেসাণ্ট—এই সুপ্রসিদ্ধ বিদুষী ইংরাজ রমণী ঘোর নাস্তিক ছিলেন, পরে মাডাম ব্লাভাস্কির একজন প্রধান শিষ্যা হন। ইনি থিয়সফী প্রচারার্থ আমেরিকায় গিয়াছিলেন, আগামী ডিসেম্বরে ভারতবর্ষে আসিবেন।

টাউন হল স্মরণ সভা—গত ১১ই ভাদ্র কলিকাতার টাউন হলে ভারতগৌরব বিদ্যাসাগর ও রাজা রাজেন্দ্রলালের স্মরণার্থ মহা সভা হয়। বড় বড় গণ্যমান্য লোক ও সাধারণ ব্যক্তিগণ হলটীকে পরিপূর্ণ করেন এবং স্বয়ং বঙ্গেশ্বর সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। দুই মহাত্মার স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থ ২টী পৃথক্ কমিটী গঠিত হইয়াছে।

বেদাধ্যাপনার সাহায্য—বাবু দ্বারকানাথ পাল গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৫০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন, ইহার সুদের টাকায় বেদাধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বেদ শিক্ষা দেন, ইহাই দাতার উদ্দেশ্য।

যুবকদিগের উচ্চতর শিক্ষা-সমিতি—বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের যত্নে এবং ছোটলাট ও শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের উৎসাহে এই সভা ১৫ই ভাদ্র টাউন হলে বিধিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ৩টী বিভাগ হইয়াছে। শারীরিক শিক্ষা বিভাগের সভাপতি কলিকাতার মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান লি সাহেব, সাহিত্য বিভাগের বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নৈতিক বিভাগের বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। বিচারপতি ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ইহার একজন প্রধান উৎসাহদাতা। তিনি ২০এ ভাদ্র তাঁহার বাটীতে এই সভার সভ্য ও অনেক বিদ্যোৎসাহী লোকদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বেদ ব্যাখ্যা ও ধ্রুব চরিত্রের কথকতা প্রভৃতি দ্বারা সকলের চিত্ত বিনোদন করেন।

আনা বাই (বিবী লিটেলডেল।)

বড় দুর্ব্বৎসর, কি কুক্ষণে জুলাই মাস আসিয়াছিল। আমরা এই মাসে ভারতের অনেকগুলি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হারাইলাম। বঙ্গে, দেশহিতৈষী দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর, বুধ অগ্রগণ্য ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় ও আমাদিগের বনপ্রসূন বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়কে আমরা হারাইয়াছি, বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক আত্মারাম পাণ্ডুরাংয়ের বিদুষী কন্যা গত ৫ই জুলাই তারিখে এডিনবরা নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন—আর একটি নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। এই বিদ্যাবতী ও সদ্‌গুণসম্পন্না রমণীর জীবনবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সুতরাং আমরা সংক্ষেপে ইহা বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে সকল ভারত মহিলা পাশ্চাত্য শিক্ষায় সর্ব্বপ্রথমে সুশিক্ষিতা হন, আনাবাই তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। তাঁহার পিতা সদালাপী, উন্নতমনা, মার্জ্জিতবুদ্ধি, জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক। ইনি বালিকা কন্যাকে অধ্যয়নার্থে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ইহাতে ইনি সমাজের বিরাগভাজন হন। কিন্তু কিছুতেই ভয় পান নাই; জাতিভেদের বন্ধন উল্লঙ্ঘন করিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। বুদ্ধিমতী আনা অলৌকিকী শক্তির পরিচায়িকা। ষোড়শ বৎসরে তিনি যেরূপ গুণবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ডাক্তার আনন্দীবাই যে অসামান্য মনস্বিতার পরিচয় দেন স্ত্রী কবি বঙ্গ যুবতী কুমারী তরুদত্ত যে কবিত্বের লালিত্যে অখিল সভ্য জগৎকে বিমুগ্ধ করেন, ইঁহারও সেই শক্তি ছিল, বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ

হয় নাই। কলিকা প্রস্ফুটিত না হইতে হইতে কালের কঠিন করাঘাতে বিদলিত হইল! গীতবাদ্যে তিনি সুনিপুণা ছিলেন। মাতৃভাষা মহারাষ্ট্রীয় ব্যতীত তিনি ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মণ, ও পর্ত্তুগীজ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সকল ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন। তিনি সংস্কৃতও কিছু কিছু জানিতেন। তাঁহার রীতি নীতি চাল চলন এত ভাল ছিল, তিনি এরূপ সদালাপিনী ছিলেন, যে একবার যিনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার হৃদয়গ্রাহিতার প্রশংসাবাদ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ডবলিন নগরে বব্দা কলেজের অধ্যাপক লিটেলডেলের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎই প্রণয়ের মূল। এই প্রণয়ই পরিণামে পরিণয়ে পরিণত হয়। এই বিবাহে ভারতবাসীদিগের ও ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যায়।

আনাবাই "নলিনী" স্বাক্ষরিত বিবিধ প্রবন্ধ, ছোট ছোট গদ্য ও পদ্য দেশীয় ও বিলাতী সম্বাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে লিখিতেন। চিকালগোদা নামক স্থানে মনের মত একটী বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি তাহাতে বাস করিতেন।

ভুবন বিখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী হইতে প্রত্যাগমনকালে শকট হইতে পতনে উদরে বেদনা লাগে। এই বেদনাই তাঁহার সাংঘাতিক রোগের মুখ্য কারণ, আনাবাইয়েরও তদ্রূপ। একদা সেকন্দারেবাদে একটী শকট দুর্ঘটনা হওয়াতে ইনি বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন, ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। এই বিষম দুর্ঘটনা দুই বৎসর পূর্ব্বে ঘটে, কিন্তু তদবধি ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। পীড়া নিবন্ধন ইনি গত এপ্রেলমাসে ইয়ুরোপ যাত্রা করেন; এবং সেখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

আমরা পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে, আনাবাই যে শ্রেণীর মহিলা, স্বর্গীয়া ডাক্তার আনন্দীবাই বা স্বর্গীয়া স্ত্রীকবি তরুদত্ত সেই শ্রেণীর। ভারতবর্ষে এই সুশিক্ষিত শ্রেণীর অভ্যুদয় এক্ষণে দিন দিন উপলব্ধি হইতেছে। ইহঁাদিগের জীবন সমগ্র ভারতমহিলার পক্ষে আদর্শ জীবন না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহাদিগের জীবন যাহাদিগের অনুকরণীয়, তাহাঁরা যে ক্রমে ক্রমে জনসমাজে সম্মানিতা ও উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইতেছেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা।

তৃতীয় প্রস্তাব।

বিধবা।

আমাদের দেশের কোনও হৃদয়বান্ বক্তি বলিয়াছেন,—

"অভাগা দেখিলে যদি দয়া হয় মনে,
বিধবার সম আর নাহি ত্রিভুবনে।"

এই কবিতার অক্ষরে অক্ষরে যে সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে তাহা আর বলিতে হইবে না। বিধবা বঙ্গমহিলার ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব বোধ হয় কোথাও নাই। যাঁহার উপর রমণী-জীবনের সমস্ত নির্ভর রহিয়াছে, যিনি রমণী-জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ, যিনি রমণীর ভক্তি, ভালবাসা ও বন্ধুত্বের আস্পদ, যাঁহার ন্যায় শুভানুধ্যায়ী এ জগতে আর নাই, যিনি রমণীর শিক্ষক, প্রতিপালক ও জীবন-রক্ষক স্বরূপ, যিনি রমণীর নিকটে মানুষ হইয়াও দেবতা, দেবতা হইয়াও বন্ধু, যাঁহার প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোক সহস্র ক্লেশ দুঃখও অম্লানমুখে সহিত পারে, যিনি ইহ জগতের অবলম্বন, পর জগতের আলোক, সেই সর্ব্বস্ব রত্ন স্বামী এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গেলে সে শোক সে দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? সাগরে চালিত তরণী কর্ণধার-বিহীন হইলে যেমন অতলে নিমগ্ন হয়, রমণী জীবনও সেইরূপ জীবন-দেবতা স্বামীকে হারাইয়া অকূল দুঃখার্ণবে ডুবিয়া যায়! যাহাহউক বিধবার হৃদয়ের ক্লেশ বর্ণন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগকে দেখাইতে হইবে, বিধবার সাংসারিক জীবন। সংসারে অথবা পরিবার মধ্যে বিধবা মহিলাগণ ক্ষমতাহীনা, পরমুখাপেক্ষিণী ও অনাদৃতা। কোনও রাজা রাজ্যচ্যুত হইলে যেমন তাঁহার পূর্ব্ব সময়ের ভৃত্য বা প্রজাবর্গ তাঁহাকে পূর্ব্বের মত ভক্তি ও সম্মান দিতে চাহে না, রমণী বিধবা হইলে তাঁহার স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণও তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ মমতা ও সম্মাননা প্রদর্শনে প্রস্তুত নহেন। সধবার যে ক্রটী গৃহের লোকেরা হাসিয়া উড়াইয়া দেন, বিধবা কর্ত্তৃক সেই ক্রটী সাধারণের কর্ণে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়। আহা! বঙ্গবাসী! আপনারা যথার্থ হৃদয়বান্ হইবেন কবে?

বিধবাদিগের মধ্যে প্রাচীনা, যুবতী ও বালিকা এই তিন শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছেন। প্রাচীনা রমণীরা যদি ধন ও পুত্রবতী হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সাংসারিক ক্লেশ অপেক্ষাকৃত সামান্য বলা যায়। ধনবতী প্রাচীনা বিধবাগণ ধর্ম্মাচরণেই কাল-যাপন করেন। যাঁহাদিগের সন্তান হয় নাই, তাঁহারা প্রায়ই সংসার হইতে নির্লিপ্তা থাকেন। এখানে ধর্ম্মাচারণ

অর্থে আমরা সন্ধ্যা আহ্নিক, দেবতা পূজা, দেবতা প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, ব্রাহ্মণ ভোজন, ব্রত উপবাস, ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালীদিগকে দান প্রভৃতি হিন্দু-নৈতিক কার্য্যই বলিতেছি; এই সকল কার্য্যেই ধনবতী প্রাচীনা বিধবাদিগের সময় অতীত হয়।* নির্ধন ও নিঃসন্তানা বিধবাগণ পরের গলগ্রহ স্বরূপ। ইহারা আশ্রয় বা অন্নদাতার গৃহ কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, এই জন্যে সর্ব্বদা সঙ্কুচিতা ও অবহেলনীয়া হইয়া থাকেন। নিতান্ত অনাদৃতা অবস্থায় ইহাদিগর জীবন শেষ হয়।

প্রাচীন পুত্রবতী বিধবাগণ পূর্ব্বোক্ত রূপে ধর্ম্মাচরণ করিলেও সংসারের প্রতি বিশেষ আসক্ত। হিন্দু শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরে বনে গমন করিবে। ইহার ভাবার্থ এই যে ঐ সময়ে সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিবে। এখন যাঁহাদিগের কথা বলিতেছি, তাঁহারা বনে গমন করিবেন কি? আজি কালি যে সকল "লক্ষ্মীরূপা বধূমাতারা" গৃহে আসিতেছেন, তাহাতেই শ্বশ্রূকে অশ্রুজলে ভাসিতে ও সংসারজালে চতুর্গুণে জড়িত হইতে হইতেছে। আধুনিক প্রথানুসারে বধূমাতাদিগের "শরীর অসুস্থ," তাঁহারা "ছেলেমানুষ" কিংবা "তাঁদের কোলে কচি ছেলে," সুতরাং শাশুড়াকেই গৃহ কার্য্য স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতে হয়। বৌমা সংসারের যত্ন বোঝেন না, তাই ছুঁচটী হারাইয়া গেলে, লুণটুকু পড়িয়া গেলে, কি হাঁড়িটী ভাঙ্গিয়া গেলে শাশুড়ীর সহ্য হয় না, তিনি প্রাণপণে সেই সকল গুছাইতে গুছাইতে নিজের ধর্ম্মাচরণের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। যাঁহার (প্রাপ্ত বয়স্ক) পুত্রের "মেজাজ" সর্ব্বদা গরম, যে পুত্র বিশেষ রূপে "স্ত্রীভক্ত" হয়, যে পুত্রের বিবেচনায় মাতা "বাবার পরিবার," সে হতভাগিনী মাতা বিনা চক্ষের জলে এক দিনও কাটাইতে পারেন না। আমরা এইরূপ মাতা পুত্র দেখিয়াছি, যে দিন শাশুড়ী পুত্রবধূর মন যোগাইতে পারেন, যে দিন বৌমা শাশুড়ীর প্রতি প্রসন্ন থাকেন, সেই দিন "বৌমা"র গুণবান্ স্বামী তাঁহার "বাবার পরিবার"কে "মা" বলিয়া ডাকেন ও "মা"র আহারাদির ভাল বন্দোবস্ত করেন। আর যে দিন "পোড়া বুড়ী" বৌমাকে বাক্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করে, সংসারের কার্য্য নিজে না করিয়া সেই "কোমলাঙ্গী দেবী"র ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়, সে দিন সে হৃদয়বান্ পুরুষ "আবাগের বেটীর" উপরে যথার্থ বীরত্ব দেখাইতে ত্রুটী করেন না!! যে হতভাগিনী দশমাস গর্ভে ধরিয়াছে, ও নিজের রক্ত

---

* ত্রিবিধ বিধবারাই অনেক স্থলে কঠোরতার বাড়াবাড়ি করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন। মস্তক মুণ্ডন, গৈরিক বস্ত্র পরিধান, নির্জ্জলা উপবাস প্রভৃতি করিতে অনেকে অক্ষম হইয়াও সামাজিক শাসনে করিতে বাধ্য হন। স্থল বিশেষে এই সকল কঠোরতার "গুরু লঘু" ভেদও আছে।

মাংস দিয়া পালন করিয়াছে, এখনও যে পুত্রগতপ্রাণা; তাহার প্রতি এই উপযুক্ত ব্যবহারই বটে !! † এইরূপ মাতার মত হতভাগিনী মাতা কোথাও নাই। হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে "যং মাতা পিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্। ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যাঃ কর্তুং বর্ষ শতৈরপি॥" অতএব যে গৃহে মাতার, সন্তানের দুর্ব্ব্যবহারজনিত অশ্রু পতন হয়, সে গৃহকে নরককুণ্ড এবং যে সন্তান স্বার্থপরতা ও ভোগসুখে বিহ্বল হইয়া মাতৃদেবীর অবমাননা করে, সে সন্তানকে নরক কীট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে সৌভাগ্য এই যে দেশে আজিও মাতৃভক্ত ব্যক্তি সকল বাস করিতেছেন, নিজেরা বিপুল অর্থ ও যশ উপার্জ্জন করিয়াও সেবকানুসেবকের মত মায়ের চরণে নতশির রহিয়াছেন, এ দৃশ্য স্বর্গীয় !

যুবতী বিধবাদিগের মধ্যে কাহারও সন্তান বর্ত্তমান, কেহ বা নিঃসন্তানা। ইহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ধনবতী বা স্বামিধনের উত্তরাধিকারিণী, তাঁহারা সন্তানাদি সত্ত্বেও সচ্ছলাবস্থায় দিনাতিপাত করিতে পারেন; অন্ততঃ তাহাদিগকে পরের পদানতা হইতে হয় না। আর যাহারা হীনজাতীয়া, তাহারাও কতকদূর সচ্ছলাবস্থায়, কায়িক পরিশ্রম ফলে, জীবন কাটাইতে পারে। সে কথা পরে বলিতেছি। বিধবাদিগের মধ্যে যাঁহারা নিজে নির্ধন ও সদ্বংশজাতা, যাহারা সাধারণের নিকটে সম্মানিতা অথচ যাহাদের নিজের কোন সংস্থানই নাই, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা দুরবস্থাপন্না। ইহারা সকলেই প্রায় আত্মীয় স্বজনের আশ্রিতা, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে জীবনাতিপাত করাও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইহাদিগের আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়দাত্রীদিগের একজনের এইরূপ ক্রূর স্বভাব, যে, সে প্রকার লোকের নিকটে অনুগৃহীতা হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুও শতবার প্রার্থনীয়, মনে হয়। কিন্তু মনে হইলে কি হয়, অনন্যোপায় বলিয়া বঙ্গ বিধবাগণ স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, কৃতঘ্ন ও নিষ্ঠুর আত্মীয়ের পদসেবা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। সেবা-পরায়ণতা রমণীর প্রধান ধর্ম্ম, পরসেবাতেই রমণীর সুখ, সে কোন্ সময়ে? যখন রমণী বিবেক বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনায় ঐ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। অনিচ্ছায়, পরবল পীড়ায়, গ্রাসাচ্ছাদনের দায়ে, হীনচেতা মনুষ্যের পদলুণ্ঠন, রমণী-ধর্ম্ম নহে; বরং অধর্ম্ম বলিলে বলা যায়, ইহা সামান্য দুঃখও নহে। অনেক বিধবার এমন দুরবস্থা যে পিত্রালয়ে (শ্বশুরালয়ে বা ঐরূপ কোন আত্মীয়ের ভবনেও) বাস করেন, তাঁহাদিগের সংসা-

† এ সকল কথা কেহ অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। অনেকে এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ

সে সংসারের কেহই নহেন। সকলেরই অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্রী। দাসদাসীরাও কত সময়ে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করে। বিধবা যদি পিত্রালয়ে বাস করেন, তাহা হইলে যে ভ্রাতৃবধূর (আবশ্যক মত) তিনি পাচিকা ও দাসীত্ব কার্য্যে নিযুক্তা, সেই ভ্রাতৃবধু তাঁহার কোন ক্রটী পাইলেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। তিনি যে কত অনুগ্রহ করিয়া বিধবা ননদিনীর জাতি, কুল, মান ও প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং এই অপরিসীম অনুগ্রহ না পাইলে ননদিনীর ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট কিরূপ বিভীষিকাময় হইত, তাহার যথাযথ হিসাব দিতে বসেন। তাহার উপরে ননদিনীর দোষের মাত্রা যদি বেশী পরিমাণে দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহাকে অম্লান মুখে গৃহত্যাগ করিতেও ব্যবস্থা দেন। বিধবার সহোদর প্রায়ই স্ত্রীর অনুকূল স্বামী, সুতরাং তাঁহার চক্ষে ভগ্নী নিতান্ত প্রগল্‌ভা, অসহিষ্ণু ও কৃতঘ্না। তিনি স্ত্রীর পক্ষ সমর্থন করিতে সভ্য ভাষায় ভগ্নীকে দশ কথা শুনাইয়া দেন, কখনও বা তদধিক শাস্তি দিতে বাধ্য হন। এই উনবিংশ শতাব্দির উজ্জ্বল সভ্যতার দিনে যখন পুত্রের গৃহে মাতার স্থান নাই, তখন ভ্রাতার গৃহে ভগিনীর স্থান কোথায়? তাই নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত হইয়া বঙ্গবিধবাগণ সময়ে সময়ে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত ঘটাইয়া থাকেন। যাবৎ দেশীয় ভগিনীদিগের মন অপেক্ষাকৃত উন্নত না হইবে, যাবৎ পরের দুঃখে হৃদয় পূর্ণ সহানুভূতি দিতে না পারিবে এবং যাবৎ দয়ার প্রধান অন্তরায় স্বার্থপরতা হইতে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে না পারিবেন, তাবৎ এ নিদারুণ ঘটনা সকল তিরোহিত হইবে না।

আমরা ভ্রাতৃ-গৃহ-স্থিতা বিধবা বঙ্গাঙ্গনার বিষয়ে যেরূপ বিবৃত করিলাম, ভাশুর দেবর প্রভৃতির গৃহাশ্রিতা রমণীগণেরও ঐরূপ হইয়া থাকে। তবে আশ্রয়-দাতা বা প্রতিপালক যদি হৃদয়বান্ ও সদাশয় ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের আশ্রিতা বিধবাগণ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ ভাবে জীবন কাটাইতে পারেন।

তারপর বালিকা বিধবাদিগের কথা। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে বালিকা বিধবাদিগের সাংসারিক জীবন ততটা অসুখজনক বোধ হয় না। ইহাদিগের মধ্যে যাহার পিতা মাতা প্রভৃতি বর্ত্তমান, তাহাদের আদর ও যত্নও থাকে। ইহারা অনেকেই নিজের অবস্থা বোঝে না। এখন যে সময়, তাহাতে নিজের অবস্থা অনভিজ্ঞতায় অনেকটা শান্তি আছে। কিন্তু ইহাদিগের পরিণাম নিতান্ত শোচনীয় ও বিভীষিকাপূর্ণ; আত্মীয়গণ তাহা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে থাকেন, আর জীবন্তে আগুনে পুড়িতে থাকেন।

সদ্বংশজাতা বিধবাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন সদুপায় প্রচলিত না থাকা, স্ত্রীজাতির মন অনুদার থাকা

এবং স্ত্রীজাতির সকল বিষয়ে অক্ষমতা ও পরমুখাপেক্ষাই বিধবা বঙ্গাঙ্গনার সাংসারিক জীবন এত দুঃখময় করিয়াছে। ইহার অবসান কবে হইবে, ভবিষ্যৎই তাহা বলিতে পারে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করিয়াছি, সে সমস্তই উচ্চবংশীয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযোজ্য। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা বাল্যকাল হইতেই শারীরিক শ্রম করিতে নিপুণা। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে জাতীয় ব্যবসায়েও পারদর্শিনী। গোয়ালা, তাঁতি, কুমার, নাপিত প্রভৃতি জাতির স্ত্রীগণ স্ব স্ব ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। কৃষি ব্যবসায়ী পুরুষেরাও স্ব স্ব আত্মীয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়া থাকে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ রমণীরা অধিকাংশই মানসিক শিক্ষা কিছুমাত্র পায় না, সকলেই প্রায় নিরক্ষরা। বৈধব্যাবস্থায় ইহারা প্রায়ই এক একটী উপজীবিকা অবলম্বন করে, তদ্দ্বারা উচ্চ বংশীয়া বিধবাদিগের হইতে সচ্ছন্দে অথবা নিরুদ্বেগে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কার্য্যতঃ ইহারা কতক দূর স্বাধীনা; যদি জীবিকা নির্ব্বাহে অসুবিধা হয়, তাহা হইলে ধনবান্ ব্যক্তিদিগের গৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে, তথাপি আত্মীয় স্বজনের নিকট অবৈতনিক ও "প্রাইভেট" দাসীত্ব করিতে রাজি হয় না। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীস্থ যাহারা ধনিবংশসম্ভূতা, তাহারা উচ্চ শ্রেণীর বিধবাদিগের ন্যায় অবস্থাপন্না। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান পারিবারিক অবস্থা এইরূপ—সাধারণতঃ এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

বিনোদপুরে হরি বাবুর বাড়ী। হরি বাবুর দুটী ছেলে, একটী মেয়ে। ভাই ভগ্নীদের বয়সের বড় একটা পার্থক্য নাই।—হরি বাবুর বড় পুত্র সুরেশচন্দ্র। একদিন সুরেশ কতগুলি বালীশ স্তূপীকৃত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিয়াছে। হাতে এক গাছি বেত। এক একবার সজোরে বালীশ গুলিকে কশাঘাত করিতেছে আর বলিতেছে "চল্ চল্"। কখন বা পদ দ্বারা কৃত্রিম অশ্বকে অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। নির্জ্জীব স্তূপীকৃত বালীশ গুলি, সুরেশের তাড়নায় বিন্দু মাত্র বিচলিত হইতেছে না। আবার সজোরে কশাঘাত। দুই একটী বালীশ প্রহারের চোটে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তবুও আরোহী ছাড়িবে না। তক্তপোষের নিম্নদেশে, দ্বিতীয় পুত্র সুবিমলচন্দ্র একখানি ছোট থালা হাতে করিয়া তাহাকে বাদ্যযন্ত্রে পরিণত করিয়াছে।

এক খণ্ড কাঠ দ্বারা সজোরে আঘাত করিতেছে। থালা "ঢং ঢং" শব্দে বাজিয়া উঠিতেছে। সুবিমল বেতালে পা ফেলিয়া ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছে, আর এক একবার চিৎকার করিয়া বলিতেছে "দাদা ঘোঁড়াটাকে খুব মার।" কখন বা আপনার মনে আপনিই খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। সুরেশের "চল চল" শব্দ, সুবিমলের থালার বাদ্য, মাঝে মাঝে অট্টহাসিতে বাড়ী তোলপাড়। ভগিনী কমলকামিনী শিষ্ট শান্ত, ঘরের এক কোণে বসিয়া কচু, কুমড়া, আলুপটল কুটিয়া স্তূপ করিতেছে। হরিবাবু ঘরের এক পাশে একখানি চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে ডার্ব্বিণের "মানব জাতি" বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। হরি বাবু অধ্যয়নপ্রিয় লোক, বিজ্ঞান দর্শনের প্রতি বড়ই অনুরাগ—প্রায়ই গ্রন্থ লইয়া বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন, আত্মহারা হইয়া চিন্তা-সাগরে ডুবিয়া যান। এদিনও সেরূপ ডুবিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রদ্বয় এদিন মাত্রাতীত গোল করিতেছিল। তাই একবার গ্রন্থ হইতে চোক তুলিয়া সুরেশ ও সুবিমলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন "বাবা গোল করিও না।" এই বলিয়া আবার অবনত মস্তকে গ্রন্থাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতার নিষেধ বিধি হাওয়াতে মিশিয়া গেল। পুত্রদ্বয় এবার মাত্রাটা একটু চড়াইয়া ধরিল। নির্ব্বাত প্রশান্ত সাগরবৎ স্থিরমতি হরিবাবু এবার একটু অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যবাসিনীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওগো! দেখ তোমার ছেলেরা বড় গোল কচ্চে। এদের নে যাও" এই বলিয়া আবার গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলেন। হরিবাবুর সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যবাসিনী শিক্ষিতা রমণী বলিয়া পরিচিতা। তিনি দুই একটা ছাত্রীবৃত্তিও পাইয়াছিলেন। তিনি পাশের ঘরে বসিয়া ছেলেদের কাপড় সেলাই করিতেছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর আদেশ শুনিয়া বলিলেন "ওরা আমারই ছেলে, তোমার আর যেন কেউ নয়। কেন তুমি ওদের বারণ কচ্চ না?" একথা স্বামীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। অন্য দিকের ঘরে হরি বাবুর বৃদ্ধা জননী রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যা-শায়িত ছিলেন। পৌত্রাদিগের গোলমালে তাঁহার রোগজনিত অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। যদিও তিনি পৌত্রদিগের সীমাতীত আবদার রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে দুর্দ্দম করিয়া তুলিয়াছিলেন, যদিও তিনি সুস্থ অবস্থায় তাহাদিগের মুষ্ট্যাঘাত চপেটাঘাত অম্লানচিত্তে সহ্য করিতেন, তথাপি রোগ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অতি কষ্টে বলিলেন "ও বৌ, তোমার ছেলেদের নে যাও।" হরিবাবু মাতৃভক্ত

ছিলেন। তাই যদিও অধ্যয়ন কালে অনেক সময় ঢাক ঢোলের শব্দ তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না, তবুও মায়ের অভিযোগ ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, তখন ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ওগো তোমায় আমি একবার বল্লেম, তুমি শুন্‌তে পেলেনা, আবার ওঘরে মা চেঁচাচ্ছেন। তোমার হাতে এমন কি কাজ যে তুমি হতভাগাদের শাসন কর্‌তে পাল্লে না?" এখন বিন্ধ্যবাসিনীর অভিমান একটু উথলিয়া উঠিল। এ অভিমান স্বামীর তিরস্কারের জন্য নহে। শ্বশ্রূদেবীর অভিযোগের জন্য। তখন বলিয়া উঠিলেন "উনিইত ওদের মাটি করেছেন" এই বলিয়া ক্রোধভরে ছাতের জামা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সন্তানগণ কি অনিষ্ট করিয়াছে দেখিতে পাইলেন। সুরেশ বালিশ ছিঁড়িয়াছে, সুবিমল থালা ফাঠাইয়াছে, কমলকামিনী তরকারী গুলি নষ্ট করিয়াছে। ইহা দেখিয়া ক্রোধের তরঙ্গ আরও উথলিয়া উঠিল। তখন পুত্র কন্যার পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত পড়িতে লাগিল। সকলে মুখব্যাদান করিয়া পঞ্চমে চিৎকার ধরিয়া দিল। ক্রন্দন ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। পিতামহীর হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল—চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "ওরে ও হরি! দেখ্ হতভাগিনী পোড়ারমুখী বুঝি আমার সোনার চাঁদদের খুন কল্লে! আবার বৌয়ের প্রতি "ও পোড়ারমুখী খুন কল্লি নাকি? আজ ভাল থাকলে তামাসা দেখ্‌তে পেতে।" তখন বিন্ধ্যবাসিনী "খুন করেছি না? আমি ডাকাত কি না? আমি মা হয়ে হলেম ডাকাত আর উনি হলেন ওদের পরম বন্ধু! এমনি কোরেইত ওদের মাথা খেয়েছেন, এমন সময় বাহিরের ঘরে "ওহে হরি বাবু, ঘরে আছ?"

হরি বাবু—ওকে রাম বাবু নাকি? এস ভাই। তখন বিন্ধ্যবাসিনী কি করেন? রাম বাবু বিন্ধ্যবাসিনীকে সুধীর শান্ত অতি শিক্ষিতা বলিয়া জানেন। এখন রাম বাবুর নিকট সকল গুণ গরিমা প্রকাশ হইয়া পড়িবে ভাবিয়া অস্থির হইলেন। তখন শাশুড়ীকে ছাড়িয়া সন্তানদিগকে লইয়া বিব্রত হইলেন; "চুপ কর, চুপ কর" শব্দে তাহাদিগকে তাড়াইতে লাগিলেন। তাহারা রাগিণী আরও চড়াইয়া ধরিল, বিন্ধ্যবাসিনী নিরুপায়, ভাবিয়া অবস্থার হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন। রাম বাবু প্রথম ঘরে প্রবেশ করিয়া শয্যাশায়িতা হরিবাবুর মাকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার প্রতি—"পিশীমায়ের কোন অসুখ নাকি?

হরিবাবুর মা—হাঁ বাছা, কদিন জ্বরে ভুগছি।

রামবাবু—পিশীমা, ও ঘরে এত কান্না কেন?

হরিবাবুর মা—বাছা সে কথা আর কি বলিব—এক হতভাগিনীকে ঘরে এনেছি, পোড়ারমুখী জ্বালাতন করে মাল্লে। এঃ এঃ এঃ।”

রামবাবু—তোমার বড় কষ্ট হচ্চে নাকি? এমন সময় হরিবাবু আসিয়া “হাঁ কষ্ট হচ্চে বই কি? উনিত আর ডাক্তারের ঔষধ খাবেন না, ও ফিরিঙ্গীর জল বলিয়া উনি ঘৃণা করেন, তাই কদিন ভুগছেন।”

রামবাবু—পিশীমা “ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ” শাস্ত্রের বিধি। তবে তুমি ডাক্তারি ঔষধ খেতে ইতস্ততঃ কচ্চ কেন?

হরিবাবুর মা—যাও বাছা, আমরা আরত ম্যাম নই, আমরা সেকেলে মেয়ে, আমাদের ভিতর বাহির এক। আমরা লোকের নিকট শিষ্ট সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাই না।

হরিবাবু বুঝিতে পারিলেন কথাটা বিন্ধ্যবাসিনীর উপর গড়াইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন “মা আপনি একটু চুপ করুন। তা না হলে কষ্ট আরও বাড়িবে।” এই বলিয়া বন্ধুকে লইয়া যেখানে বসিয়া বই পড়িতে ছিলেন, সেখানে যাইয়া বসিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী রামবাবুকে দেখিয়া করযুগে প্রণাম করিলেন। অবশেষে তিন জন তিন আসন গ্রহণ করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে সুরেশ, সুবিমল ও কমল কামিনীর ক্রন্দন ধ্বনি ক্রমশঃ দীর্ঘ নিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। বন্ধুদ্বয়ের বাক্যালাপ সর্ব্ব প্রথমে বিষণ্ণ-বদন, ছল ছল চক্ষু, নিঃশব্দোপবিষ্ট বালক বালিকাদিগের সম্বন্ধেই হইতে লাগিল। হরিবাবু ঘটনাগুলি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতেছিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া অধোবদনে ধরণী পানে চাহিয়া ছিলেন।

রামবাবু—কেন আমি সে দিনত তোমার ছেলে মেয়েদের এরূপ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলাম “বাবা সুরেশ, যে জিনিসের যে ব্যবহার সে জিনিস দ্বারা সে ব্যবহার করিবে।” তবে আজ আবার বালিসকে ঘোড়া, থালাকে বাদ্যযন্ত্র করিল কেন? ওদের এখানে ডাক দেখি।

হরিবাবু—ছেলেদের প্রতি—বাবা এখানে এস দেখি। তখন সন্তানগণ ক্রৌঞ্চগমনে পিতৃ সন্নিধানে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল। রামবাবু তাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন “বাবা ওদিন তোমাদের বুঝিয়ে দিলুম যে যে জিনিশ যে জন্য তৈয়ারি করা হয়েছে, সে জিনিশ দিয়ে তাই কর্ত্তে হয়। শোবার সময় মাথা রাখিবার জন্য বালিস, তবে তাদের ঘোড়া কল্লে কেন? ভাত খাবার জন্য থালা, তাকে বাজালে কেন? তোমাদের কি একটুও বুদ্ধি নাই?”

তাহারা চুপ করিয়া রহিল। তখন রামবাবু বিন্ধ্যবাসিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন “দেখুন বৌ দিদি, ছেলেদের

ধারণা শক্তি বড় কম। বার বার সাবধান করিয়া না দিলে তাহারা মনে রাখিতে পারে না। আমি ওদিন যাহা বলিয়াছিলাম তাহা ইহাদের মনে নাই। তাই আবার এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। হরিবাবু! আপনারও বিশেষরূপে আবার আজ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। এরূপ বার বার বুঝাইয়া দিলে আর কখনও ইহারা এইরূপ ব্যবহার্য্য জিনিশের অপব্যবহার করিয়া ক্ষতি করিবে না। পণ্ডিতদিগের কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে ক্ষীণস্মৃতিশক্তি বালক বালিকাদিগের কোনও বিষয়ে স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য সামান্য—এমন কি কখন কখন গুরুতর শাস্তি দিলেও ক্ষতি নাই। মানুষ অনেক সময়ে বিস্মৃতি জন্যই অসৎ কাজ করিয়া থাকে। এই স্মৃতি সতেজ রাখিবার জন্যই শাস্তির ব্যবস্থা, কিন্তু আপনি আজ যে ইহাদের প্রহার করিয়াছেন তাহা মঙ্গলপ্রসূ শাস্তি নহে। উহাকে চলিত কথায় "মনের ঝাল মিটান" বলে।

বিন্ধ্যবাসিনী একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি নানা কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকি। উনি আর কি ওকাজটা করিতে পারেন না? ওঁর ত কেবল বই পড়াই কাজ। ওঁর ত গৃহের কাজ, সেলাইয়ের কাজ প্রভৃতি কিছুই ক'র্ত্তে হয় না, উনি কি আর ছেলে মেয়েদের কোথায় কোন্ দোষটা গজাইতেছে দেখিয়া তুলিয়া ফেল্‌তে পারেন না? আপনারা পুরুষ জাতি কেবল সকল বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাইতে চান।"

রামবাবু—"এত বুঝলেম। এখন ছেলে মেয়েগুলি যদি ব'য়ে যায়, তা'হলে আপনার কি কষ্ট হবে না? আমিত হরি বাবুকে আর নিষ্কৃতি দেই নাই। সন্তানের চরিত্র গঠনের জন্য পিতা মাতা সমান দায়ী। সুতরাং যখন যিনি দোষ দেখিবেন, তখন তিনি তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবেন। মনে করুন হরিবাবু বাহিরে গিয়াছেন, এমন সময় ছেলে একটা কুকাজ করিল, তখন কি আপনার উহা শোধন করা উচিত নয়? মনে করুন সুরেশের অসুখ হইল, হরিবাবু বিদেশে, তখন কি আপনি হরিবাবুর আশায় বসিয়া থাকিবেন? চিকিৎসক আনয়ন করিয়া চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিবেন না?"

বিন্ধ্য—ছেলে যে তা না হ'লে মারা যাবে।

রামবাবু—শরীরের মৃত্যু হইতে কি আত্মা ও বিবেকের মৃত্যু ভয়ঙ্কর নয়? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে সন্তানদিগের আধ্যাত্মিক ও চরিত্রগত রোগ দেখিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? হরিবাবু কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া সন্তানদিগের প্রতি উদাসীন হইলে কি আপনিও কর্ত্তব্যে অবহেলা করিবেন? হরিবাবু কর্ত্তব্য প্রতিপালন না করিলে তজ্জন্য ঈশ্বর সমীপে দায়ী। আপনি আপনার কর্ত্তব্য সাধন না করিলেও

কি ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন না? মনে করুন আপনার স্বামী বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া পান ভোজন পরিত্যাগ করিলেন, এ কর্ত্তব্য পালনে নিবৃত্ত হইলেন, আপনিও কি তাহাই করিবেন? তবে কেন সন্তানদিগের দোষ প্রক্ষালন সম্বন্ধে এই অসার কথা তুলিতেছেন?

বিন্ধ্যবাসিনীর তখন চৈতন্য সঞ্চার হইল। তখন তিনি মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন, যখনই সন্তানদিগের কোন দোষ দেখিবেন, তখন তাহা উৎপাটন করিতে চেষ্টা করিবেন।

এদিকে রামবাবু হরিবাবুর প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, ভাই, তুমি গ্রন্থকীট হইয়া পড়িয়াছ, অধ্যয়নের প্রতি অপরিমিত অনুরাগ বশতঃ তুমি অন্যান্য কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িয়াছ। ঈশ্বর সন্তানদিগকে আমাদিগের হস্তে প্রদান করিয়া এই আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাদিগের সমস্ত ভার তোমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হইল। যতদিন ইহারা স্বাধীনভাবে আত্ম সংরক্ষণ ও আত্ম শক্তি বিকাশ করিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন তোমরা ইহাদিগের সমস্ত মঙ্গল সাধন জন্য দায়ী। যদি আমরা পরম পিতার এই ধ্রুব আদেশ অবহেলা করিয়া আত্মসুখে উন্মত্ত হই, নিশ্চয়ই এজন্য ফলভোগ করিতে হইবে। চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি কত কুপুত্র পিতা মাতার ঔদাসীন্য জন্য পাপকূপে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাদিগকে শোক প্রবাহে ভাসাইয়া দিতেছে, কত কুপুত্র কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া পিতা মাতার অমল নামে কলঙ্ক লেপন করিতেছে। ইহা দেখিয়া শুনিয়াও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের পাপের ভোগ ভুগিতে হইবে। এই বলিয়া রামবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন। হরিবাবু ও বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহার উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মেয়েদের নীতিশিক্ষা।

ছেলেদের নীতিশিক্ষা সম্বন্ধেই সচরাচর কথাবার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়; মেয়েরা যেন তার বড় একটা ধার ধারে না। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের নীতিশিক্ষা কোন অংশে কম আবশ্যক নয়, বরং বেশী, ইহা অনেকেই ভুলিয়া আছেন, অনেককেই এ বিষয়ে বড়ই উদাসীন দেখিতে পাই। নীতির কঠিন শৃঙ্খল পাছে মেয়েদের কোমল চরণে ব্যথা দেয়! এ যে মুক্তা-হার বুঝিলেন না।

দেশশুদ্ধ এই যে কথা উঠিয়াছে আজ কালের মেয়েরা সে কালের মেয়েদের মত সতী, সাধ্বী, লক্ষ্মী হয় না—এদের নীতিনিষ্ঠা আর তেমন নাই, এটা কি মিথ্যা? আগে লেখা পড়ার তত

আলোচনা ছিল না বটে, চারুবিদ্যার চর্চ্চা কি ছিল না? তবু নীতির দিকেই মন প্রাণ ঝুঁকিয়া পড়িত। নারী-নীতির প্রতি প্রায় সকলেরই বিশেষ লক্ষ্য ছিল, নীতি অতীব গৌরবের ধন ছিল। জ্ঞান বিদ্যার আলোক ফুটিয়াছে, নীতির শুভ্র জ্যোৎস্না ডুবিয়া গিয়াছে। এখন মেয়েরা লেখা পড়া, উল বুনা, গান বাজনা ইত্যাদি বেশ শিখে, কিন্তু যে জ্ঞান সমস্ত গুণকে উজ্জ্বল করে, সেই নীতি-জ্ঞানে হতাদর। তাই তাদের গুণগুলি ডোরা-ডুরি পটের মত ঠেকে, আকাশের রাম-ধনু খানির মত শোভা পায় না। একটা কেরোসিন কেনেষ্টার, একখানা কাঁসি, একটা ঘণ্টা বাজাইলে শুনতে যেমন, তাদের কাজগুলি তেমনি; বীণার সপ্ত সুরের মত মধুর বাজে না। একটি গুণ আর একটির সহচর হয় না, বিরুদ্ধ-ভাব ধারণ করিয়া সকল গুলিকেই কেমন একটা কদাকার করিয়া তুলে। মিলন-সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে, হইবে না কেন? মিলন-সূত্র কি? নীতি।

ঠাকুর মা পেটের চামড়া ঢাকের মত টন্ টনে হওয়া পর্য্যন্ত নাতিনীর উদরে অন্নাদিতে পুরিয়া দিলেন, ঠাকুর দাদা বাজার হইতে নানা রঙ্গের কাপড় কিনিয়া আনিয়াছেন। নাতিনী পরিয়া বেড়াতে বাহির হইল। মাঠ, ঘাট, বাগান, যার-তার বাড়ী কিছুই বাকী রাখিল না। সে যে কোথায় কোথায় গেল, সেদিকে কেহ কিন্তু দৃষ্টিও করিল না। অতি সোহাগে সর্ব্বনাশ হইল। নাতিনীর মন আর ঘরে টেঁকে না, পাখা বাহির করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে চায়। মা মেয়েকে স্কুলে পাঠাইলেন, মেয়ে সেখানে গিয়া কুচরিত্র সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলিয়া হয়ত স্লেটে কুকথা লেখালেখি করিল, কদালাপ মন্দাচার শিখিল, বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পথে হয়ত বদলোকদের বা খারাপ ছোড়াদের হাসি তামাসা ও কুকথা শুনিল। এইরূপ কত বড় ছোট কুনীতি আত্মীয়েরা দেখিয়াও দেখেন না, দেখিলেও সংশোধন করেন না তাহা বলা দুষ্কর। যে মেয়ে দুদিন পরে শ্বশুর বাড়ী যাবে, বা দুদিনের তরে বাপের বাড়ী এসেছে, তা'কে কি কিছু বলা যায় না? কাহারও মনে মেয়েদের নীতি-শিক্ষার কথা আদৌ আসেই না, কেহ বা মনে করেন যতটুকু দরকার তাহা দেখিয়া শুনিয়া আপনা আপনিই হইবে, তার জন্যে শাসন, শিক্ষা, যত্নের আবশ্যক নাই। এর কুফল পূর্ণমাত্রায় ফলে কোথায়? শ্বশুরবাড়ী। স্বামীকে ভালবাসা দেখাইতে গেলে গৃহকর্ম্মে ত্রুটি হয়, সরলতা প্রকাশ করিতে বেহায়া হইতে হয়, লেখা পড়ায় অনুরাগ দেখাইতে শাশুড়ির গঞ্জনা সহিতে হয় ইত্যাদি কত রকমেই পদে পদে লাঞ্ছনা! পিত্রালয়ে অভিভাবকগণ লেখা পড়া শিখাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, গৃহকার্য্য শিখাইতে অমনোযোগী ছিলেন, কিন্তু সকল গুণের সার যে নীতি-জ্ঞান

তাহাতে শিক্ষা নাই। নীতি কি? মিথ্যা না কহা, চুরি না করা কেবল এই? নীতি ক্ষুদ্র নয়, অতি ব্যাপক বিষয়। নীতি-জ্ঞান জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য দেখাইয়া দেয়, কর্ত্তব্য সাধন করিতে আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করে, কার্য্যে সুশৃঙ্খলা আনয়ন করে, যাহা অনুচিত বলিয়া বোধ হয় তাহা করিতে বাধা দেয়, মানুষকে ঈশ্বরের দিকে টানিয়া লয়। সংক্ষেপতঃ যাহা হইলে নারী দেবী তুল্য হইতে পারে, জীবন সুখের শান্তির হয়, নীতি-জ্ঞান জীবন্ত থাকিলে তৎসমুদায় লাভ করা যায়। নীতিকে সকল গুণের ভিত্তি করিলে, সকলের অভ্যন্তরে কার্য্য করিতে দিলে সকল গুণ প্রস্ফুটিত হয় অথচ তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ-ভাব থাকে না; জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ সহজ হইয়া আসে। কে না শিষ্টা সচ্চরিত্রা কুললক্ষ্মীকে ধন্যবাদ করে?

এই নীতি শিক্ষা কি অল্প সময়ের কাজ? শৈশবাবস্থা হইতেই শিক্ষা-দান আরম্ভ করিতে হয়, নতুবা একবার চরিত্র দূষিত হইয়া গেলে আবার ভেঙ্গে চুরে গড়া বড় কঠিন কর্ম্ম। এ বিষয়ে কেহ যেন উপেক্ষা না করেন। মেয়ের চলাফেরা, আচার ব্যবহার, মনের ভাব গতি সর্ব্বদা লক্ষ্য করিবেন, অসঙ্গত দেখিলে বিহিত ব্যবস্থা না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। মেয়েরা যখন মা হয়, সন্তানের চরিত্রে মায়ের চরিত্রের ছায়া পড়িবেই পড়িবে, সুতরাং চরিত্রের উপর সমাজের শুভাশুভ নির্ভর করে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেকে অনেক বই লিখিয়াছেন; কিন্তু অনেকেরই স্ত্রীচরিত্রের সকল দিক্, সকল ছবি চোখে পড়ে নাই। যেমন চাই, তেমন বই অতি বিরল। স্ত্রী শিক্ষা চারিভাগে বিভক্ত করা উচিত, ১ম নীতিশিক্ষা, ২য় গৃহ কার্য্য শিক্ষা, ৩য় লেখা পড়া শিক্ষা, ৪র্থ সঙ্গীতাদি শিল্প বিদ্যা শিক্ষা। ইহার মধ্যে নীতিশিক্ষাই সর্ব্ব প্রথম। নীতিবিহীন গুণ অনেক সময়ে দোষের কারণ হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত দেখিয়া যেমন শিক্ষা হয় এমন আর কিছুতেই নয়, পরিবার মধ্যে সদ্দৃষ্টান্তের অভাব যেন না হয়।

এই প্রবন্ধ বিশেষতঃ মেয়েদের অভিভাবকদিগের জন্য। সুবুদ্ধি পাঠিকা ইহার সুবিধা লইতে ছাড়িবে না। সতী, সাধ্বী হও, জ্ঞানে গুণে কুলোজ্জ্বল কর, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা। স

দেবর্ষি নারদ ও দেবী সাবিত্রীর কথোপকথন।

সাবিত্রীর পানে　　চাহিয়া দেবর্ষি
　　কহিলেন অতঃপর :—

ছাড়ি সত্যবানে　　পতিত্বে বরণ
　　কর বাছা অন্য বর।

সে কেমনে হয় ? ওহে ঋষিবর
হৃদয় সঁপেছি যাঁরে,
সে দেবতা বিনে হেন সুভাজন
কে আছে বরিব তাঁরে ?
জগতের গুরু যে নারদ মুনি
মতিভ্রম হ'ল তাঁর !
সাবিত্রী-চরিত না জানিয়ে তায়
কহিলেন আর বার ঃ—
সত্যবান আশ কর পরিহার
ধর মম উপদেশ,
নহিলে অশেষ অকল্যাণ হবে
পাইবে যাতনা ক্লেশ।
এ মর জগতে বিশ্ব বিধাতার
প্রেমের প্রতিমা খানি,
অবনত শিরে কহিলা নারদে
যোড় করি যুগ-পাণি।
পতিত্বে বরণ করেছি যাঁহারে
মনে মনে—একবার,
ছাড়িলে তাঁহায় ধর্ম্মেতে পতিতা
হব—সন্দ * নাহি তার।
অতএব বলি ওহে ঋষিবর
নাকর আদেশ হেন,
প্রসন্ন হইয়ে দেও এই বর
"সিদ্ধকাম হই যেন।"
বিনীতা অথচ— তেজস্বিনী মূর্ত্তি !
—দেখিয়ে দেবর্ষি প্রীত,
এত ধর্ম্মভাব এত অনুরাগ
বালিকার কি বীরত্ব !!
হ'কনা সে দীন নির্গুণ অক্ষম
কহিলা সাবিত্রী পুনঃ,
ফুটেছে যে ফুল হৃদয় কাননে
ছিঁড়িব কি সে প্রসূন ?
আরাধ্য দেবতা হৃদয়ের স্বামী
আদরের ধন পতি,
সে ধনে বঞ্চিতা হইলে নারীর
নিশ্চয় নরকে গতি
দেখ দেখ চেয়ে হে ভগিনীগণ !
সাবিত্রী-হৃদয় বল,
সংকল্প হইতে কে ফিরাবে তায় ?
যেন দৃঢ় হিমাচল !
পতিব্রতা সতী শুনিতে না চায়
ওজর—আপত্তি যত,
দীন দুঃখী জেনে বরেছে 'তাঁহায়'
ধন্য ধন্য পতিব্রত !
কথোপকথন শুনি অশ্বপতি
বিস্মিত হইয়ে অতি,—
জিজ্ঞাসিলা 'তাঁরে' কহ ঋষিবর
করি ওপদে মিনতি ;
কি হেতু বারণ করিছ কন্যারে
বরিতে সে সত্যবানে ?
হেন সুভাজন কোথা পাব আর
কি আপত্তি কন্যাদানে ?
কি করেন মুনি একাগ্রতা হেরি
কহিলা রাজারে চেয়ে,
'বছর না যেতে মরিবে জামাই,
বিধবা হইবে মেয়ে।'
শুনি অশ্বপতি স্তম্ভিত অবাক্ !
তবে নাহি দিব মত,
বালিকার মতে কিবা আসে যায়
সে কি বুঝে সদসৎ ?

কিন্তু সে বালিকা টলিবার নয়
কিবা দৃঢ় পণ তার।
সে দারুণ বাণী করিয়ে শ্রবণ
চাহিল না প্রতিকার।
অই নবস্ফুট কুসুমে এতই
জীবনী শকতি হায়!
অশনি প্রপাতে বিকচ কমল
শুকায়ে না গেল তায়!
দীনতা হীনতা সেত তুচ্ছ কথা
দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা,—
অকাল বৈধব্য— ভয়ে না ডরায়,
ধন্য ধন্য ধর্ম্ম নিষ্ঠা!!
কহিলা সাবিত্রী 'জনম হইলে
অবশ্য মরিতে হয়,
মৃত্যু ভয়ে কেন অধর্ম্মে ডুবিয়ে
জীবন করিব ক্ষয়?
ঈশ্বর গোচর যেজনে করেছি
পতিত্বে বরণ আমি,
সেই সত্যবান (যাহাই হউন)
তিনিই আমার স্বামী।
কে আছে এমন মৃত্যুর অধীন
নহে সে,—অমর ভবে,
সত্যবান ছাড়ি পরপুরুষেরে
কি হেতু বরিব তবে?'
ধন্য হে সাবিত্রি! ভারত-ললনা
সাধে করি গুণগান,
যে যাতনা ভার শত শত নারী
সহিতে না পারি—প্রাণ—
সঁপি চিতানলে সে বৈধব্য-জ্বালা
ঘুচাল সহ-মরণে;
তুমি কি না তারে আলিঙ্গন করি
সাধিয়া নিলে আপনে।

রমণী সমাজে বীরাঙ্গনা তুমি
তোমার তুলনা নাই,
অপূর্ব্ব কাহিনী— 'সাবিত্রী-চরিত'
তাই শত কণ্ঠে গাই।
তরুণ বয়সে বৈধব্য যাচিয়ে—
লইতে দেখিনু এই,
আর দেখিব কি? বুঝি শেষ দেখা
—দেখা'ল সাবিত্রী সেই।
হেন ধর্ম্মনিষ্ঠা হেন অনুরাগ
এমন সাহস কার?
দেশে ও বিদেশে এহেন রতন
কোথাও না পাবে আর।
স্বরগের ছবি এ মর জগতে
ক'ও না—বিশ্বজননী,
আর একবার দেখাবে কি তাঁরে?
ধন্যা হবে এ ধরণী!
দেবর্ষি নারদ বুঝিলেন সব
সাবিত্রী মনের ভাব,
কি উপকরণে গঠিত হৃদয়
কি মধুর সে স্বভাব?
যে চরিত্র বলে রমণী সমাজে
অগ্রগণ্যা 'তিনি' আজ,
বুঝিয়ে এখন দেবর্ষি নারদ
পাইলেন মহা লাজ!
হ'ক পরিণয় করি আশীর্ব্বাদ
'বিধবা না হবে তুমি,'
তোমার সুযশে ছাইবে জগত
(হবে) ধন্যা এ ভারত ভূমি!
তোমার সুব্রত পালিয়ে সকলে
হইবে সফল-কাম,
ঘরে ঘরে নারী পূজিবে তোমারে
স্মরিয়ে তোমার নাম!!

শ্রীচঃ।

মুক্তি ফৌজের জয়

(৩১৯ সংখ্যা ১২৮ পৃষ্ঠার পর)

জন্মলব্ধ শক্তিতে মুক্তিফৌজের যেরূপ বিশ্বাস, শিক্ষার শক্তিতেও সেইরূপ প্রবল বিশ্বাস। বুথ-পরিবারে এই দুই প্রকার শক্তিরই কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বুথের কার্য্যকে তাঁহার পত্নী আপনার জীবনের কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং আপনাদের বালক বালিকাগণকেও অতি শৈশবকাল হইতে এমন ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন যে তাহারাও বড় হইয়া মুক্তিফৌজের জন্যই বাঁচিতে চায়, মুক্তিফৌজের জন্যই আত্মবলিদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, সংসারে যাঁহারা মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন—নরনারীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। আর যাঁহারা বিবাহিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া পারিবারিক জীবনের সকল দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া জগতের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু জেনারেল বুথ যে কেবল সপরিবারে মহৎ ব্রত সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এমন নয়, তাঁহার মতে সকলেরই পরিবারবদ্ধ হইয়া জগতের সেবা করা একান্ত আবশ্যক। বাস্তবিক দুর্ব্বলের পক্ষে পরিণয় পাশস্বরূপ, সবলের পক্ষে মুক্তির সোপান; যে পরিবারে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মের নিয়মেই যে পরিবার চলে, স্ত্রীপুরুষ যেখানে সমভাবে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া জ্ঞানের আলোক জগতে বিকীর্ণ করিতেছে, প্রেমসাধন করিয়া নিষ্কামচিত্তে জগতের সেবা করিতেছে; সেই পরিবারই প্রকৃত স্বর্গ, সে পরিবার অমৃতময় মধুময়। আত্মসুখসর্ব্বস্ব নরনারী সেখানে গিয়া আপনাদের ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া যায়, নীচতা পরিত্যাগ করিয়া সেই উদার আদর্শ জীবনে পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। কিন্তু কর্ত্তা কর্ত্রীর উপরেই পরিবারের উন্নতি অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সুযোগ্য রাজার অভাবে যেমন রাজ্যের অশেষ দুর্গতি, সেইরূপ কর্ত্তা কর্ত্রীর জীবনে জীবন্ত ধর্ম্মভাব ও নিষ্কাম সেবার ভাব না থাকিলে সেই পরিবারের পুত্রকন্যা জামাতা ও পুত্রবধূদিগকে লইয়া কখনও জগতের হিতসাধক মণ্ডলী গঠিত হইতে পারে না। দক্ষিণ ওয়েলসবাসী কোন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের কন্যা জেনারেল বুথের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিবাহ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পতিতা রমণী-

গণের জন্য মুক্তিফৌজের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ভার সম্পন্ন করিতেছেন। মধ্যম পুত্র এক ইংরেজ ধর্ম্মযাজকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াযুক্ত রাজ্যের সাধারণ বিভাগের কার্য্যে সস্ত্রীক নিযুক্ত রহিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র ডেনমার্ক দেশীয় জনৈক সুযোগ্যা শক্তিশালিনী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন। কন্যাগণের মধ্যে কেবল দুইটীর বিবাহ হইয়াছে মাত্র। জ্যেষ্ঠাকন্যা আয়র্লণ্ড দেশবাসী কোয়েকার (quaker) সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক যুবাপুরুষকে বিবাহ করিয়া স্বামী স্ত্রী মিলিয়া ফরাশী ও সুইজারলণ্ড দেশে মুক্তিফৌজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়া কন্যা "ইমা" সুপ্রসিদ্ধ কমিসনার টকারকে বিবাহ করিয়া ভারতবর্ষে মুক্তিসেনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মুক্তিফৌজ পৃথিবীর আর দশটী দলের ন্যায় একটী দল নয়। সাম্প্রদায়িক ভাব লইয়া ইহার জন্ম হয় নাই। ইহার প্রবর্ত্তক বলেন, "মুক্তিফৌজের প্রাণস্বরূপ ধর্ম্মভাব ও জনহিতব্রত যখন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, মুক্তিফৌজও তৎসঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে। সাম্প্রদায়িক লোকেরা প্রাণহীন ধর্ম্মসম্প্রদায় গুলির সুধু কঙ্কাল রক্ষা করিবার জন্যই যেমন সর্ব্বদা তৎপর, প্রাণহীন হইলে মুক্তিফৌজের কঙ্কাল, আমি সেইরূপ রক্ষা করিতে চাই না।" মুক্তিফৌজ আজ প্রায় জগতের সর্ব্বত্রই আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতেছেন। অর্থ পরমার্থ সকল বিষয়েই মুক্তিফৌজ আজ ধনী। গ্রেটব্রিটেনে ৩৭, ৭৫,০০০ টাকা, ক্যানাডায় ৯৮৭, ২৮০ টাকা, অষ্ট্রেলিয়ায় ৮৬২৫১০, নিউজিল্যাণ্ডে ১৪৭,৯৮০ টাকা, সুইডেন দেশে ১৩৫,৯৮০৲ টাকা, নরওয়ে দেশে ১১৬৭৬০৲ টাকা, দক্ষিণ আফ্রিকায় ১০৪০১০৲ টাকা, হলণ্ডে ৭১৮৮০৲, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৬৬০১০৲,ভারতবর্ষে ৫৫৩৭০৲, ডেনমার্ক দেশে ২৩৪০০৲ টাকা, ফরাশী এবং সুইজারলণ্ড দেশে ১০০০০০৲ লক্ষ টাকা, এই বিপুল অর্থ রাশি আজ মুক্তিফৌজের সম্পত্তি। মুক্তিফৌজ যে দেশে যাইতেছেন, সেই দেশেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্র সকল প্রকাশ করিয়া জীবন্ত ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন! মুক্তিফৌজের বাহিরের দিকে তাকাইলে যেমন স্তম্ভিত হইতে হয়, ভিতরের ভাব দেখিলেও তেমনি মুগ্ধ হইতে হয়। ইহাঁরা যে যে দেশে যাইতেছেন, সেই সেই দেশীয় লোকের প্রকৃতি, রুচি ও সংস্কারের সম্মান করিবার জন্য আপনাদের অনেক সুখ সুবিধা বিসর্জ্জন করিতেছেন। ইহাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াও দেশ বিদেশের নরনারীগণের নিকট দাসখত লিখিয়া দিতেছেন, মানব হইয়া দেবতার ন্যায় পরের সুখ দুঃখের জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

বাঙ্গালীর ছেলে দুই চারি বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়াই সাহেবী চাল চলনে অভ্যস্ত হইয়া স্বদেশবাসীদিগকে অবজ্ঞা করিতে শিখেন, দেশী লোকের সন্তোষ অসন্তোষ সুখ দুঃখ কিছুরই প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; আর সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে ইংরেজের ছেলে মেয়েরা আসিয়া বাঙ্গালীদের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মিশিবার জন্য গৈরিক বসন পরিধান করিয়া খালি পায় বেড়াইতেছেন! ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্ম প্রচারকেরা গিয়া ইংলণ্ডের নরনারী-গণের শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিতেছেন, আর দেবস্বভাব মুক্তিসেনা কলিকাতা মহানগরীর বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সুসভ্য "আর্য্য সন্তানের" প্রহারে রক্তাক্ত কলেবর হইয়া প্রহারককে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—প্রেমালিঙ্গন দিতেছেন! মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়া আসিল, মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে যাহা বলা উচিত ছিল, তাহার কিছুই বলা হয় নাই। মুক্তিফৌজ যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাহার তালিকা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মুক্তি ফৌজের জন্ম ও ক্রম বিকাশের বিবরণ প্রকাশ করাও আমাদের অভিপ্রায় নয়। মুক্তিফৌজ আমাদের সম্মুখে যে উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন—স্বামী স্ত্রী পুত্রকন্যা প্রভৃতি সমস্ত পরিবার জগতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার যে স্বর্গীয় ছবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন—অতি সামান্য শিক্ষালাভ করিয়াও সুধু হৃদয়-বলে জগৎ পরাজয় করা যায়, এই যে মহাসত্য আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, কেবল এই সকল দিকে পাঠক পাঠিকাগণের চিত্ত আকর্ষণ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রাদ্ধোৎসব।

"বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ!" কেন দিস্ গালি?
আমার মাথার কিরে,
ও কথা কস্‌নে ফিরে,
ছয় কোটী বুক যে গো হয়ে যায় খালি!
"সাত শ' রাক্ষসী-প্রাণ"
তাঁর নাকি "পিণ্ডদান!"—
ছয় কোটী হৃদি-পিণ্ড আগে দিব ডালি,
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ, বড় গালাগালি!

বল্—বঙ্গভূমি-শ্রাদ্ধ—শ্রাদ্ধ ভারতের;
এ যে শ্রাদ্ধ মাতৃ-ভাষা,
এ শ্রাদ্ধ উন্নতি-আশা,
এ শ্রাদ্ধ এ পিণ্ডদান, দীন কাঙ্গালের!
সাঁওতাল দেশময়,
হৃদয়ের শ্রাদ্ধ হয়!
সতিনী জ্বালায় হাড় জ্বলিছে যাদের—
বিদ্যাসাগরের কেন?—শ্রাদ্ধ তাহাদের!

কার শ্রাদ্ধ ?—শ্রাদ্ধ আজি বেদ সংহিতার-
কার নামে তিলাঞ্জলি ?—
ন্যায়, সত্য, প্রেম, বলি !
আদ্যকৃত্য বাঙ্গালীর আশা ভরসার !
যাদের জনম-শোধ
মমতার পথ-রোধ,
"সপিণ্ড করণ" সেই বাল-বিধবার !
কার শ্রাদ্ধ ?—শ্রাদ্ধ আজি বঙ্গ-অনাথার !

৪

"বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ" বালাই ! বালাই !
হৃদয় চমকি ওঠে,
শোণিতে আগুন ছোটে,
ছয় কোটী প্রাণ পুড়ে হয়ে যায় ছাই !—
এ দীন পতিত দেশে,
পতিতপাবন বেশে,
দয়ার দেবতা আহা আজ আর নাই !—
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে, বুক ফাটে তাই।

৫

আজ যদি "পিতৃশ্রাদ্ধ" সারা বঙ্গময়—
"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম"
দেখিব তাহারি কর্ম্ম,
হৃদি পিণ্ডে পিণ্ডদান ক'র সমুদয়।
পদ ধূলি রাখি শিরে,
চল যাই গঙ্গা-তীরে,
ঘরে ঘরে হবে সেই দেব-অভ্যুদয়—
এ যে গো প্রতিষ্ঠা—এতো বিসর্জ্জন নয় !

৬

বিষাদের দিনে এই নব মহোৎসব,
ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, সবে,
"ষোড়শ" সাজাতে হবে !
কোটী ভাই বোন কেউ থেকনা নীরব।
কি করিবে "বৃষোৎসর্গ"
এ বিধি যে আত্মোৎসর্গ !
ফিরে যাহে প্রাণ পাবে কুড়ি কোটী শব !
খুলিয়া বুকের পাতা,
দেখ সঞ্জীবনী গাথা,
পড় সে 'বিরাট পুথি' বীরত্বের স্তব !
আজি পিতৃ-প্রীতি লাগি,
হও সবে স্বার্থত্যাগী,
উঠুক দিগন্ত ভেদি কোটী কণ্ঠ রব,
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ—নব মহোৎসব !

৭

বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে আত্ম দাও ডালি—
কাঙ্গালী 'বিদায়' যাচে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে—
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে ভারত কাঙ্গালী !
টাকা পয়সার তরে
আসে নি মা শোকভরে,
কাঁদিছে সে, কোল তার হয়েগেছে খালি,
দাও মারে দাও ভিক্ষা,
মহামন্ত্রে হও দীক্ষা,
'ঈশ্বরের' 'ভাই' হও ছ'কোটী বাঙ্গালি !
জননী হয়েছে আজি 'ঈশ্বর কাঙ্গালী !'

৮

'বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ' ; বড় গালাগালি—
ক'স্নে ও কথা ফিরে,
কোটী বুক যায় চিরে,
ছয় কোটী প্রাণ পুড়ে হয়ে যায় কালি !
এ জাতীয় পিতৃকৃত্য
তবেই হইবে 'নিত্য"
হীনতা নীচতা দাও গঙ্গা-জলে ঢালি !
শেখ সে উদ্যম-আশা,
বুকভরা ভালবাসা,

পুরাও পরাণ পণে, মার কোল খালি!
মহাশ্রাদ্ধ হোক্ শেষ,
'ঈশ্বরে' ভরুক দেশ,
পুজিব সে পিতৃ-মূর্ত্তি হৃদয়ে উজালি,
নিতি দিব—প্রাণগলা আঁখিজল ঢালি!

শ্রী মা।

ইতর প্রাণীর বন্ধু-শোক।

খিদিরপুরে এক ভদ্র পরিবার তিনটি পাতিহংসী পুষিয়াছিলেন। এরূপ জীব পোষাতে পরিবারের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। উহারা কত ডিম্ব যোগায় অথচ যা তা—এমন কি বাটীর আবর্জনা খাইয়া প্রাণধারণ করে। যাহাহউক একদিন নিশাকালে হংসীদের মধ্যে একটী হঠাৎ চিৎকার করিতে লাগিল। চিৎকারে বাটীর লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; কিন্তু কেহ বুঝিতে পারিল না, কিজন্য উহা চিৎকার করিতেছে। কেহ কেহ মনে করিল যে উহা পীড়াজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কেহ কেহ অনুমান করিল উহাকে সর্পদংশন করিয়াছে। পূর্ব্বে পীড়ার কোন লক্ষণ লক্ষিত না হওয়াতে সর্পদংশনই সম্ভব বোধ হয়। যাহা হউক পরদিন প্রাতঃকালে উহাকে মৃত দেখা গেল, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মৃত্যু অবশ্যই সংঘটিত হইয়াছিল। সঙ্গিনী সহচরী হংসীদ্বয় বন্ধুবিরহে কাতরা হইয়া বিস্তর চিৎকার করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য ইহা শোকের ক্রন্দন। তাহারা চতুর্দ্দিকে উহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল, কোথায় পাইবে? পাওয়া কি যায়? কালের যা যে খাইয়াছে তাহাকে কি আর পাওয়া যায়? জ্ঞানবান্ মনুষ্যই এ কথা বুঝিয়া বুঝেন না, তা ক্ষুদ্রপ্রাণী কি বুঝিবে? বলিতে কি, তাহারা আহার একপ্রকার ত্যাগ করিল, চরিয়া বেড়ান হইতে বিরত হইল, প্রাতঃকালে আগার হইতে বহির্গত হয় নাই। তথায় ম্রিয়মাণা হইয়া থাকিত, যদি কেহ দয়া করিয়া কিছু ভক্ষ্য দ্রব্য আনিয়া দিত তো আহার করিত, নচেৎ নহে। মানব-হৃদয়ে স্নেহ মমতা ও ভালবাসা স্বভাবতঃ বলবতী, স্বভাবের বিকৃত অবস্থায় এই ঐশ্বরিক পরম রত্নের খর্ব্ব দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট প্রাণিসকলে মনুষ্য-সুলভ স্নেহ ও ভালবাসা না থাকুক, উহা যে আছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার বিকাশ হইতে পারে। আমাদিগের যেটি দৃষ্টিগোচর হইল, সেইটি দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, কিন্তু উত্তমরূপে যত্নের সহিত দেখিলে নিশ্চয়ই জানা যায় যে, উহারা প্রাত্যহিক জীবনে কত শত বার এইরূপ স্নেহ ও পরস্পরের প্রতি ভালবাসার পরিচয় দিয়া থাকে! প্রাণিগণকে গৃহে রক্ষা কর, লালন পালন কর, উহাদিগের প্রতি সদয়

ব্যবহার কর, নিষ্ঠুরাচরণ করিও না, দয়াধর্ম্ম নীতি অজ্ঞাতসারে শিক্ষা পাইবে। চৈতন্যদেব বলিয়াছেন 'জীবে দয়া, নামে ভক্তি' ধর্ম্মসাধনের প্রধান উপায়। তবে দেখ নিকৃষ্ট গৃহপালিত প্রাণিগণকে ভালবাসা পবিত্র জীবনের অন্যতম অঙ্গ। ইহার অনুষ্ঠানে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি ও আনন্দ হয়। আমরা যেন এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করি।

গৃহ চিকিৎসা।

(মুষ্টি-যোগ)

সাময়িক প্লাবনে আমাদের যে সকল রত্ন ভাসিয়া গিয়াছে, গৃহ চিকিৎসাও তাহার একটী। গৃহচিকিৎসা কিরূপ উপকারী, ইহার অভাবে বঙ্গমহিলাদিগকে অনেক সময় কিরূপ বিপদে পড়িতে হয়, বামাবোধিনীতে এ কথা অনেক বার আলোচিত হইয়াছে। আবশ্যক বিবেচনায় এখানে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া অদ্য আমাদের পরীক্ষিত কতিপয় সুলভ ঔষধ দেশীয় ভগিনীদিগের জন্য লিখিতেছি। আজিকার এই ডাক্তার কবিরাজ ছড়াছড়ির দিনে, পেটেণ্ট ঔষধের জাঁকাল বিজ্ঞাপনের দিনে এবং ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথি বাক্স রাখার দিনে, যদি কোনও ভগিনী আমাদের লিখিত "গাছ গাছড়া" প্রভৃতি হইতে উপকৃতা হন, তাহা হইলেই শ্রম সফল মনে করিব। তবে গুরুতর রোগে বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগকে উপেক্ষা করিয়া গৃহ-চিকিৎসায় নির্ভর করা সকলেরই অকর্ত্তব্য।

শিশুদিগের উদরাময়ের ঔষধ—দাস্তের রঙ্ যদি হল্‌দে থাকে, তাহা হইলে বিশেষ ব্যস্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। যদি সাদা বা সবুজ রঙের দাস্ত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অপাঙ্গ চিড়চিড়ে * গাছের কতক গুলি শিকড়, একটী গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া, লোহার পাত্রে রাখিয়া গরম করিয়া খাওয়াইতে হয়। এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুর পক্ষে ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক ব্যবস্থা। সাত আট বৎসরের বালকদিগকেও এ ঔষধ দেওয়া যায়। বয়স বুঝিয়া মরিচের মাত্রা (পূর্ণ মাত্রা ৩টী) ও ঔষধের মাত্রা অধিক পরিমাণে দিতে হয়।

২।৩ বৎসরের শিশুদিগের উদরাময়ে

* অপাঙ্গ চিড়্‌চিড়েকে কোন কোন স্থানে শিস্‌অপাঙ্গও বলিয়া থাকে। গার্হস্থ্য চিকিৎসার এক প্রধান অসুবিধা এই যে একই গাছ গাছড়ার নাম, কলিকাতা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ভিন্ন রূপে আখ্যাত। এক জেলার কথা অন্য জেলার লোকের বুঝিতে কষ্ট হয়।

এক ছটাক শীতল জলে একটী পাতি বা কাগজি লেবুর রস দিয়া প্রত্যহ দুই বার সেবন করাইলে আরাম হয়। এই ঔষধ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগকেও দেওয়া যায়।

সকল প্রকার উদরাময়েই দুগ্ধ পথ্য অনুপকারী। (চুণের জল দিয়া) বার্লিই সুপথ্য। অভাবে সাগু ও এরারুট দেওয়া যাইতে পারে। মিছিরির জল দেওয়া ব্যবস্থা হইলে, খুব পাতলা দেওয়া উচিত। মিছিরির জল ঘন হইলে উদরাময়ের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব।

শিশুদিগের কাশির ঔষধ—ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম করিয়া মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়াইলে কাশি আরাম হয়। যদি সর্দ্দি বসিয়া গিয়া কাশি হয় এবং হাঁপানির ন্যায় কষ্টকর হয়, তাহা হইলে আকন্দের পাতায় সরিষার তৈল গরম করিয়া গলায় সেঁক দিলে হয়। একটা মাটীর গামলায় আগুন রাখিয়া তাহাতে আকন্দের পাতা তৈল দিয়া রাখিলেই গরম হয়। ঐ তৈল গরম থাকিতে থাকিতে গলায় ধরিতে হয়। এইরূপে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সেঁক দিলে হাঁপানির ন্যায় কষ্ট দূর হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগের কষ্টকর হাঁপানিতে এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

পেট ফাঁপার ঔষধ—পেটে টার্পিণ তৈল মালিস করিয়া গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া সেঁক দিলে, প্রায়ই এক ঘণ্টার মধ্যে আরাম হয়। কতক গুলি মৌরি একখানি ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া জলে রাখিতে হয়। সেই জল ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে, ইক্ষুচিনি দিয়া, রোগীকে দুই ঘণ্টা অন্তর এক ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে পেট ফাঁপা আরোগ্য হয়।

আমাশয়ের ঔষধ—রাখাল ছিট্‌কী গাছের পাতা ৫।৬টী গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া, লৌহ পাত্রে গরম করিয়া খাইলে আমাশয়ের পীড়া আরাম হয়। দিনে তিন বার সেবন করিতে হয়। শিশু হইলে মরিচের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাশয়ের রোগীর যদি জ্বর না হয়, তাহাহইলে অন্ন পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন চাউলের অন্ন চাই। সেই সঙ্গে ডালিমের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া আমাশয়ের রোগীকে দেওয়া উচিত। জ্বর থাকিলে বেল শুঁট দিয়া সাগু, বার্লি প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থা।

বেল পোড়া আমাশয়ের রোগীর পক্ষে কিরূপ মহৌষধ, তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। বেল কয়লা অপেক্ষা কাঠের আগুনে পোড়ানই ভাল। বেল পোড়া ইক্ষুচিনি দিয়া খাইতে হয়।

পানে চুণ বেশী হইলেই তো গাল পুড়িয়া যায়। সেই চুণ গালের যেখানে লাগে, সেখানে এক রকম ঘা হইয়া থাকে। উহা এরূপ যন্ত্রণাদায়ক যে উহার জন্য অনেক সময়ে আহারাদি করিতে বা কথা কহিতে বড় ক্লেশ হয়। এরূপ হইলে, বাজারে বেণের দোকানে "রসমাণিক্য" বলিয়া একরূপ পদার্থ

পাওয়া যায়, (তাহার আকার বায়লেট কালির ডেলার মত), তাহা মধু দিয়া পাথরে ঘসিতে হয়, তাহা হইতে হলুদের রঙের মত যে দ্রব বাহির হয় তাহা ঐ চূণে পোড়া ঘায়ের উপরে দিলে শীঘ্র আরাম হইয়া যায়। সামান্য রকম চূণে পুড়িলে একটু সরিষার তৈল আঙ্গুলে লইয়া ঐ চূণে পোড়া স্থানে মালিস করিলে আরাম হয়।

দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া নিবারক—খয়ের চিবাইয়া দাঁতের গোড়ায় দিলে আরাম হয়। যদি বেশী পরিমাণে রক্ত পড়ে, তাহা হইলে আমরুল পাতা চিবাইয়া দিলে বন্ধ হয়।

গর্ভিণীদিগের প্রসব বেদনার দ্বিতীয় অবস্থায় (অর্থাৎ ধড়্ফড়ে ব্যথার সময়ে) যদি ব্যথা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে এক গ্লাস খুব শীতল জল অথবা শীতল দুগ্ধ পান করাও, শীঘ্রই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে।

আমেরিকার প্রাচীন তত্ত্ব।

আমেরিকার আবিষ্কার অবধি ইহার প্রত্নতত্ত্ব জানিবার জন্য প্রভূত যত্ন ও অর্থ ব্যয় হইতেছে। বর্ত্তমান আদিমবাসীরা যে ইহার প্রথম আদিমবাসী নহে, তাহা বহুকাল প্রমাণিত হইয়াছে। সমস্ত আমেরিকাময় যে সকল ভগ্নাবশেষ ও প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে স্বতঃই এই সিদ্ধান্ত মনে উদিত হয় যে ইহা এককালে কোন মহা জাতির বাসস্থল ছিল। শিল্প ও সভ্যতায় তাহারা বর্ত্তমান সভ্যজাতিদিগের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না, বরঞ্চ কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগের প্রাধান্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

পেরু, মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোর স্থানে স্থানে প্রভূত পরিমাণে মৃণ্ময় ফলক সকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (Earthen tablets engraved on plastic clay) ফলক সকল সুপরিস্কৃত কোমল মৃত্তিকায় নির্ম্মিত, তদুপরি ফিনিসীয় ভাষায় লিখিত। কাঁচা মৃত্তিকায় লিখিয়া ছাঁচের ন্যায় পোড়ান হইয়াছে, এক্ষণে তাহা কঠিন প্রস্তরের আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল ফলকে খৃষ্টীয় শকের দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সকল লিপি দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। "তলতেক জাতি, (ইহাদের পুরাবৃত্ত উক্ত পদক সকলে লিপিবদ্ধ আছে) বহু দূর দেশ হইতে আসিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা অত্যন্ত সভ্য ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাকেই সকলের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলিয়া জানিতেন। জুম (Tzuma) নামে এক ব্যক্তি মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্য-

বর্ত্তী আছেন। তিনি অবতার হইয়া তাঁহাদিগকে সত্য শিক্ষা ও পরিত্রাণ দিবেন, ইহা তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গ। তাঁহাদিগের রাজারা কেবল দণ্ড-নীতির নহে, ধর্ম্মনীতিরও পরিচালক। সমস্ত জাতি দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। শ্রমজীবী এবং চিন্তাশীল। যাজক (পুরোহিত), রাজা, ভাস্কর, শিল্পী, স্থপতি এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকল এই শেষ শ্রেণীভুক্ত। "অল্পতেক" বা শ্রমজীবী ব্যক্তিরা শূদ্রের ন্যায় অবস্থান করিত, রাজ্য শাসন বা সাধারণ কার্য্যে তাহাদের হস্তক্ষেপ করিবার যো ছিল না। এই জাতি অল্পকালের মধ্যেই মহা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং খৃষ্টীয় শকের ৪ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকায় পরিব্যাপ্ত হইয়া মেক্সিকো পর্য্যন্ত অধিকারভুক্ত করিয়াছিল। তৎকালে মেক্সিকো প্রদেশে এক বর্ব্বর জাতি বাস করিত, তাহারা স্রোতস্বতীর উত্তর তীরে বসবাস করিত; দেশের স্বভাবজাত ফল মূল, নদীর বা সমুদ্রের মৎস্য এবং বনের পত্রই তাহাদের খাদ্য ছিল। এইরূপে তলতেক জাতি সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল আমেরিকায় অবস্থান করিয়াছিল। খৃষ্টীয় শক আরম্ভের শত বৎসর পূর্ব্বে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতি পূর্ব্বদেশ হইতে বহুসংখ্যক রণতরী সহ আমেজন নদ দিয়া দেশ মধ্যে প্রবেশ করে ও দেশবাসীদিগকে আক্রমণ করে; তাহারা জাতি বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। ইহারা তলতেকদিগকে পরাজয় করিয়া দেশ মধ্যে স্বাধিকার বিস্তার করে এবং দুই তিন শত বৎসর মধ্যে প্রবল প্রতাপে সমস্ত দেশ আয়ত্তাধীন করে। আজতেক জাতিও সাত শত বৎসর ধরিয়া দেশে একাধিপত্য করিয়াছিল, ক্রমে বিলাসপরায়ণ হওয়াতে তাহাদের বাণিজ্য ও শ্রমজাত দ্রব্য সকল হ্রাস হইতে লাগিল, সুতরাং অচিরে সমস্ত জাতির অধঃপতন হইল। খৃষ্টাব্দ আট শতাব্দীতে উত্তর এবং পশ্চিম হইতে চিসিমেক নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত বর্ব্বর জাতি আগমন করিয়া আজতেক জাতির অধঃপতন সম্পন্ন করে; শিল্প, সভ্যতা, সমৃদ্ধি সমস্তই বহুকালব্যাপী বর্ব্বর যুদ্ধে পর্য্যুদস্ত হয়—এমন কি সভ্যতাব্যঞ্জক চিহ্ন সকলও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। অবশিষ্ট ক্ষীণবল পীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোক সকল পলাইয়া পর্ব্বতাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্ত্তমান "গুহাবাসী" ও পার্ব্বতীয় (আমেরিকার) লোক সকল তাহাদিগেরই বংশসম্ভূত। কতক গুলি হীনবীর্য্য ভীরু, কাপুরুষ আজতেক আততায়ী চিসিমেকদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল।"

দগ্ধ মৃণ্ময় পদক সকল হইতে উল্লিখিত প্রাচীন বিবরণ সকল সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই যে সমস্ত মৌলিক ইতিবৃত্ত তাহা নির্ণয় হওয়া সুকঠিন।

সেমেটিক জাতিরা আসিয়া এখানে আধিপত্য স্থাপন করেন। শেষ চীন-তাতারস্থ ভয়ঙ্কর তুরাণি জাতিরা আসিয়া ইহাদের ধ্বংস সাধন করে। অদ্যাপি সেমেটিকদিগের সভ্যতা-ব্যঞ্জক ভগ্নাবশেষ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৺কালীকৃষ্ণ মিত্রের জননী।

এই রত্নপ্রসূ রমণী শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজী ১৭৯৬ সালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় জনৈক গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর তৃতীয় পুত্র কালীকৃষ্ণ বাবু তাঁহাদের পৈতৃক বাটী (কলিকাতাস্থ সিমুলিয়া মিত্রদের বাটীতে) আনুমানিক ১৮২২ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আর দুইটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। প্রথম কৃষ্ণধন, যাঁহার বিষয় সঞ্জীবনীতে উল্লিখিত হইয়াছে, দ্বিতীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্র। আর একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম রাজকৃষ্ণ।

কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতা ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সে বিধবা হন। এতদিন কলিকাতায় ছিলেন—প্রথমে পিতৃভবনে, পরে শ্বশুরালয়ে। স্বামীর মৃত্যুর পর তাদৃশ সঙ্গতি না থাকায় তিনি ১৮৩২ কিম্বা ১৮৩৩ সালে ৪টী পুত্রকে লইয়া বারাসত গ্রামে তাঁহার ভ্রাতার আলয়ে আসিয়া আশ্রয় লন। ভ্রাতা কলিকাতা সহরের বণিকদের নিকট সামান্য কাজ করিতেন, আয় অল্পই ছিল। তথাপিও সমস্ত অসহায় আত্মীয়দিগকে আশ্রয়দানে বিমুখ ছিলেন না। কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতামহী ও মাসী প্রভৃতিও ঐ পরিবারের মধ্যে বাস করিতেন।

একশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ গৃহে কিরূপ রীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা হইত জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় আমাদের সমাজে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই! কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতামহ রামমোহন রায়ের স্থাপিত "সমাজে" যাইতেন এবং ধর্ম্মালোচনায় যোগ দিতেন। সম্ভবতঃ এই সূত্রে তাঁহার স্ত্রী (কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতামহী) একেশ্বরবাদিনী ছিলেন এবং 'পৌত্তলিক উপাসনা অলীক' একথা স্পষ্টই বলিতেন। তাঁহাদের কন্যা কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতা, অল্প বয়স হইতেই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার পরিচয় দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে। শ্বশুর বাটীতে তাঁহাকে মাছ কুটিতে হইত—জীবন্ত কই কুটা কি নিষ্ঠুরতা তাহা আর পাঠিকাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। ইহা অল্প ক্ষোভের বিষয় নহে যে নিত্যকৃত্য এই নিষ্ঠুরতার প্রতি অনেক দয়াশীলা হিন্দু রমণীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। যাঁহার কথা হইতেছে

এই রমণী স্বীয় বাটী হইতে এই নিষ্ঠুরতা একেবারে নিবারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয়ক গল্পটী এইঃ—একটী বিড়াল তাঁহাদিগকে বড় বিরক্ত করিত। একদিবস কোন কার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবার জন্য কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতা বিড়ালটীকে ধরিয়া জানালা হইতে গলাইয়া নীচে ফেলিয়া দেন। তিনি দেখিলেন যে একটি কুকুর দৌড়িয়া আসিল এবং তাঁহার বোধ হইল যেন কুকুরটী আসিয়া বিড়ালটীকে মুখে করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। এই ঘটনাতে ধর্ম্মভীরু নারী ৬ মাস কাল শোকসন্তপ্তা হইয়া আহার নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন তাঁহার এই পাপক্ষালন জন্য তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঈশ্বরের নিকট প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা করিতেন এবং তাঁহার এ পাপের মার্জ্জনা হইবে না এই চিন্তাতে নিরতিশয় অসুখী ছিলেন। ৩।৪ বৎসরের পর একদিন প্রার্থনার পরেই অতি উজ্জ্বল সুস্পষ্ট ভাবে তাঁহার প্রতীতি হইল যে অদ্য তাঁহার সেই অপরাধের ক্ষমা হইল এবং তিনি পুনর্ব্বার সাবধানতার সহিত সংসারের কাজকর্ম্মে মিশ্রিত হইবার আদেশ পাইলেন। এই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই রমণী নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। বৈধব্যাবস্থার পর বারাসতে ৪০ বৎসরের উপর বাস করিয়া পরলোক গমন করেন।

বাল্যাবস্থায় সন্তানদিগের ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগিনী ছিলেন। এক সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা ও মানুষ, পশু, পক্ষী সকল জীবের প্রতি দয়া—এই দুইটী শিক্ষায় তিনি বিশেষ করিয়া সন্তানগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

ইহাঁর দ্বিতীয় পুত্র নবীনকৃষ্ণ মিত্র মেডিকেল কলেজ হইতে সর্ব্বপ্রথম ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসার দ্বারা বিলক্ষণ যশস্বী হয়েন। তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বারাসতে একটী বাগান বাটী প্রস্তুত করেন। এই বাগানেই কালীকৃষ্ণবাবু ও তাঁহার মাতা প্রায় ৪০ বৎসর বাস করেন। এই বাগানে অনেক বড় লোকের সমাগম হইত। কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতার সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য ও পরিতৃপ্ত হইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাঁকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, নিয়মিতরূপে বারাসতে গিয়া ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। এই পরিবারে এই ৪০ বৎসরের মধ্যে যত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সকলকেই এই নারী ঈশ্বরোপাসনা শিখাইয়াছেন। নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের পূজা এই পরিবারে তিনি তাঁহার অলৌকিক ধর্ম্মপ্রতিভার দ্বারা সহজ করিয়া দিয়াছিলেন।

নিকটস্থ পল্লীর কৃষক ও তাহাদের পুত্রগণের সহিত তিনি বাটীর ছেলেদের

কোন বৈষম্য করিতেন না। প্রাতঃকালে "ঈশ্বরের নাম করিয়াছ কি না?" সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া ঘরে যে খাদ্যদ্রব্য থাকিত, তাহা একটু একটু করিয়া ছেলেদের সকলকে ভাগ করিয়া দিতেন। সেই ভাগ এইরূপে কখন কখন হোমিও-পেথি ঔষধের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিত। প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্লে তিনি গীত, যোগবাশিষ্ঠাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ও সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মালাপে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার জন্য বাটীতে ঝগড়া কি কাহারও কোন অন্যায়াচরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি যে পরিবারকে ভূষিত করিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মভাব ও সাধু আচরণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। মৃত্যুর দিবসেও তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ খর্ব্ব দেখা যায় নাই। তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের এতদূর শ্রদ্ধা ছিল যে বারাসতস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সকলে আসিয়া তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া যান।

নূতন সংবাদ।

১। ইংরেজরাজ মণিপুরের সিংহাসনের জন্য চূড়াচাঁদ নামে এক অষ্টম বর্ষের বালক মনোনীত করিয়াছেন, রাজকার্য্য অবশ্যই ইংরেজ সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। ইনি রাজা নরসিংহের প্রপৌত্র এবং কুলচন্দ্রের জ্ঞাতি ভ্রাতষ্পুত্র। মণিপুর এখন হইতে করদ রাজ্য হইল।

২। কাশিমবাজারের রাণী আর্য্যাকালী স্থানীয় স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার্থ নিজব্যয়ে এক স্ত্রী ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

৩। উত্তরপাড়া হিতকরী সভার পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ ৪টী বালিকা ৩ টাকা করিয়া, ২য় বিভাগে উত্তীর্ণা ১২টী ২৲ টাকা করিয়া এবং ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণা ৫৭টী ছাত্রী ১৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইয়াছেন।

৪। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ৺প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের পত্নী রাণী রাজকুমারী দাসী পরলোকগত হইয়াছেন। ইহাঁর হিন্দুধর্ম্মে যেমন নিষ্ঠা ছিল, পরোপকার ব্রতেও ইনি সেইরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন। ইহাঁর সাহায্যে অনেক গরিব ছাত্র লেখাপড়া শিখিতেছিল। ইহাঁর নিজস্ব সম্পত্তিসকল দাতব্য কার্য্যের জন্য ট্রষ্টির হস্তে দিয়া গিয়াছেন।

৫। বরিশাল হইতে এক রমণী লিখিয়াছেন :—

বিগত ১৯ শে শ্রাবণ স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় গৃহে বিদ্যালয়ের

উনবিংশতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বালিকা সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান (দেশীয় ও ইংরেজ মহিলাগণ) একত্র সমবেত হন। স্থানীয় সদাশয় মাজিস্ট্রেট সাহেবের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ছেভেজের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা হইয়াছিল, কোন বিশেষ কারণে তিনি না আসিতে পারায়, জনৈক সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় একটী সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, প্রথমে কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে পর সম্পাদিকা 'ফুলরেণু' নামক একখানি উপহার পুস্তক পাঠ ও বিতরণ করেন। তৎপর কুমারী প্রমদা দাস "রমণীর শিক্ষা" এবং সম্পাদিকা কুমারী কুসুমকুমারী দাস উনবিংশ শতাব্দী ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে সভাপতি সরল ভাষায় বালিকাদিগকে কয়েকটী সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। সঙ্গীতানন্তর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। পতিব্রতা ধর্ম্ম প্রথমভাগ, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।৵০ আনা। হিন্দুশাস্ত্রে পতিব্রতা নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে বিধিব্যবস্থা আছে, তাহার অনেকগুলি এই পুস্তকে সংগৃহীত ও অনুবাদ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষে গৃহিণীর প্রতি কতকগুলি হিতকর উপদেশ আছে। পুস্তকখানি সকল বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী না হউক, বুদ্ধিমতী পাঠিকা এতৎ পাঠে উপকৃত হইতে পারিবেন।

২। হোমিওপ্যাথিক মতে বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এচ, এম, এস, প্রণীত, ২৪পরগণা জয়নগর রিডিং ক্লব হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে বহুমূত্র রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার উৎসাহ লাভের যোগ্য।

৩। সাহিত্যমঞ্জরী—শ্রীভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। ইহাতে বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

বামারচনা।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি *।

ঘন আঁধারের মত বঙ্গদেশ
ছেয়েছে গভীর শোক ;
করি উদ্‌যাপন জীবনের ব্রত,
এথাকার রবি আজি অস্তগত,
কোথায় উদিছে নূতন দিনেশ
উজলিতে নব লোক। ১

সেই দানশীল— বিধাতার দান
জ্ঞান পুণ্য তেজোময়,
কাঙ্গাল ভারতে দিয়াছিলা বিধি
কি তপস্যাফলে সে অমূল্য নিধি ?
বিপন্ন উদ্ধারে তনু ধন প্রাণ
সঁপেছিলা সমুদয়। ২

পরের সেবায় সঁপি আপনারে
শ্রম-কর্ম্ম ময় ভবে।
অনেক খেটেছে, থাকে থাক্ কাল,
সায়াহ্ন-শীতল মৃত্যুর আড়াল,—
ভাবিলা বিধাতা, দিতে হবে পরে,
ছুটী তারে দিতে হবে।৩

ত্যজি ধরা, দুঃখ পাপ দাহ ময়,
আর্ত্তনাদ, কোলাহল,
যশঃ অপবাদ তেয়াগিয়া দূরে
লভিলা বিশ্রাম ঋষি দেবপুরে,
বুঝেও সান্ত্বনা মানেনা হৃদয়
নয়নে উথলে জল। ৪

কাঁদে যারা, কাঁদে নিজ পানে চেয়ে
যে যায় সে চলে যায় ;
করম-অরণ্যে পড়ে আছে যারা,
তাঁহার বিরহে দুঃস্থ বলহারা,
সনাথ আছিল যারা তাঁরে পেয়ে,
আজি পুনঃ অসহায়। ৫

আজি, যুগপৎ ব্যথিত পরাণ,
ভকতি-আনত শির,
সে পুণ্য চরিত মনে পড়ে যত,
বুঝি কি দেবতা ধরা হতে গত ;
আপনার স্থান গেলা পুণ্যবান্
ছিল না সে ধরণীর। ৬

দেব দেবধামে, অদর্শনে তাঁর
কাঁদিছে পুরুষ নারী ;
নারী কাঁদিবেনা ? তাঁর মত কেবা
করেছে ভারতে রমণীর সেবা,
রমণী নয়নে হেরি অশ্রুধার
ফেলেছে নয়ন-বারি ? ৭

সে অশ্রু কি শুধু অশ্রুই রহিল—
ধুয়ে গেল বুক তাঁর ?
সে অশ্রু উত্তপ্ত শোণিতের মত
শিরায় শিরায় বহিল নিয়ত,
উদ্দীপনা হয়ে অরাতি মাঝারে
ঘোরতর রণে নিয়োজিল তাঁরে,
অনলের মত কত না দহিল
দুর্নীতি দেশাচার। ৮

রামমোহনের করুণ হৃদয়
কেঁদেছিল এই মত ;

* বেথুন কলেজের মহিলাসভায় পঠিত।

বীরের রোদন নহে অশ্রু জল
ভিজাইতে শুধু নিজ বক্ষঃস্থল,
প্লাবনের মত উপাড়ি তা' লয়
দুর্গতির মূল যত। ৯

দাঁড়ায়ে আপন প্রতিভা আলোকে
ধর্ম্ম বর্ম্ম পরি,
সে বিদ্যাসাগর করিলেন রণ,
অটল অজেয় পর্ব্বত যেমন,
নিন্দা অপবাদ যা দিয়াছে লোকে
নীরবে মাথায় ধরি। ১০

তাঁর সে মমতা— কোমল হৃদয়,
অপূর্ব্ব দর্প তাঁর—
দাঁড়াত যা চির স্বাধীন গৌরবে,
স্বজন সমাজ অবহেলি সবে,—
কুসুমে বিদ্যুতে হেন সমন্বয়
ভারত দেখিবে আর ? ১১

তাঁহার অভাবে শোন চারি ভিতে
উঠিয়াছে শোক গান,
সেই শোক হেথা ডেকেছে সকলে
ভক্তি-অর্ঘ্য আর পাদ্য অশ্রু জলে
লয়ে, তাঁর স্মৃতি এসেছি পূজিতে
হিন্দু ব্রাহ্ম খৃষ্টান। ১২

কোথা তুমি, তাত, মনীষিপ্রধান,
মূর্ত্তিমান্ দয়া স্নেহ,
লুকালে কি মুখ চির তরে তুমি ?
তোমার অভাবে দীনা জন্মভূমি ;
রহ, আর্য্য, রহ, আলোক সমান,
উজলি হৃদয় গেহ। ১৩

প্রতিষ্ঠিত রহ নারী হিয়া মাঝে,
তোমার চরিত তবে,
শিখাবে সন্তানে জননীরা সবে,
তাহাদের মাঝে তুমি জীয়ে রবে,
জাগিয়া রহিবে তাহাদের কাজে,
স্বদেশ ধন্য হবে। ১৪

ভক্তিভাজন ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণ-চিহ্ন স্থাপনার্থ মহিলাগণের নিকট হইতে দান সংগ্রহ।

১। শ্রীমতী ভূধরবালা সেন, বহরমপুর ২৲
কলিকাতা হইতে
২। শ্রীমতী ঘোষ, ৭৬নং বেণেটোলা ষ্ট্রীট ১৲
৩। উহাঁর বাটীর পরিচারিকা নিত্রাদাসী ১৲
৫৪নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট
৪। কুমারী কুমুদিনী বসু, ১৲
৫। সুষমা সুন্দরী বসু ১৲
৬। শ্রীমতী অচলবালা বসু ২৫৲
শোভাবাজার রাজবাটী
৭। শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী ৫৲
৮-৯। ২টী ভদ্র মহিলা, শোভাবাজার ২৲
৪৪নং রামকান্ত বসুর গলি বাগবাজার
১০। শ্রীমতী ঘোষ, শ্যামপুকুর ২৲
১১। শ্রীমতী জগদীশ্বরী সেন ২৲
১২। ঐ কিরণকুমারী সেন, বহুবাজার ২৲
১৩। শ্রীমতী মৃণালিনী রায় চৌধুরী, ৭১নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট ২৲
১৪। শ্রীমতী রামরঙ্গিণী দত্ত ২৲
১৫। ঐ জ্ঞানদা সুন্দরী দত্ত, ৫৲
১৬। শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৬৬।৵০
১৭। মধ্যভারত—পাণ্ডুয়া ১২৲
১৮। ঐ হোসঙ্গাবাদ ৬৫।০

(ক্রমশঃ)

শ্রীবরদাসুন্দরী ঘোষ
শ্রীসুবর্ণপ্রভা বসু
সম্পাদিকা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২২ সংখ্যা। } কার্ত্তিক ১২৯৮—নবেম্বর ১৮৯১। ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ

ইংলণ্ডেশ্বরীর ভ্রমণের কথা—মহারাণীর দৌহিত্র জর্ম্মণ সম্রাট কয়েকবার ইংলণ্ড দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি মাতামহীকে স্বদেশে আহ্বান করিয়াছেন। এই শীতকালে আমাদের মহারাণী জর্ম্মণ সাম্রাজ্য দর্শন করিবেন।

দীর্ঘজীবিনী স্ত্রীলোক—সম্প্রতি সুখচরে ১১০ বৎসর বয়সে এক হিন্দুরমণীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁর বেশ দৃষ্টি শক্তি ছিল, বিনা সাহায্যে গমনাগমন করিতে পারিতেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সজ্ঞান ছিলেন।

মণিপুর-রাজ সুরচন্দ্র—ইনিই মণিপুরের প্রকৃত রাজা। দুঃখের বিষয় ইনি কেন পদচ্যুত হইলেন, তাহার কারণ অদ্যাপি জানা গেল না। কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ যখন ইহাঁর প্রাণবধ করিয়া ইহাঁর রাজ্যাপহরণ করিতে যান, তখন ইংরাজ প্রতিনিধি গ্রিমউড তাহাদিগের সহায় ছিলেন। এখন তাঁহাদিগের দুরভিসন্ধি ও দুশ্চেষ্টার ফল তাঁহারা পাইয়াছেন, কিন্তু সুরচন্দ্র কি অপরাধে রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন না,২৫০৲ টাকার সামান্য বৃত্তিমাত্র পাইয়া বৃন্দাবন বাসে আদিষ্ট হইলেন?

রুসিয়া-ভীতি—রুসীয় সৈন্য অলক্ষ্যে হিরাটের ৪০ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী পামির নামক স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং কৃষ্ণসাগরে রণতরী সকল সুসজ্জিত করিয়াছেন, ইহাতে অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বসতর্ক হন, এজন্য কতকগুলি সংবাদ পত্র পরামর্শ দিতেছেন। রুসিয়া অচিরে কনষ্টাণ্টিনোপল আক্রমণ করিবেন ইহা একপ্রকার স্থির।

পঞ্জাবে স্ত্রীশিক্ষা— পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় ১০ হাজার বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে।

বৃদ্ধা স্ত্রী-গ্রন্থকার—সুবিখ্যাত "Uncle Tom's Cabin" (টম খুড়ার

কুটীর) পুস্তকের প্রণয়িত্রী হারিয়েট বিচার ষ্টৌ গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁহার অশীতি বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসকেরা বলেন, তিনি এখনও ১০ বৎসর বেশ বাঁচিতে পারেন।

মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ—মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ ক্রমে ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রতিবিধানের উপায় করিতেছেন।

চিনের বিপদ—চিনের লোকেরা চিনপ্রবাসী ইউরোপীয়দিগের উপর অত্যাচার করাতে ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মণ ও মার্কিনজাতি বৈরনির্যাতনের উদ্যোগ করিতেছেন। ইংরাজ রণতরী ইতিমধ্যেই চিন সমুদ্রে দেখা দিয়াছে। চিন গবর্ণমেণ্ট ভয়ে ভয়ে ক্ষতি পূরণে প্রস্তুত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ সম্মিলনী—গত আশ্বিন মাসে সিটী কলেজ ভবনে এই সম্মিলনীর ৯ম সাংবৎসরিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এ বৎসর এই সভার অধীনে ৪৫৬টী অন্তঃপুরবাসিনী পরীক্ষা দেন, তন্মধ্যে ৪২৮টী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষার্থিনীর মধ্যে সধবা ২৪৬, বিধবা ৪৯ জন, অবশিষ্ট কুমারী। পারিতোষিক দ্রব্য সামগ্রী স্বর্ণ রৌপ্যালঙ্কার, তৈজস দ্রব্য এবং পুস্তক খেলনা প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ২৫০৲ টাকা এবং স্থানীয় সহৃদয় জমীদার ও অন্যান্য ভদ্রলোক ও মহিলাগণ অর্থ ও পুস্তকাদি দিয়া পারিতোষিক বিতরণের সাহায্য করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ সম্মিলনার কল্যাণ ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

বিদ্যাসাগর স্মরণার্থ সভা—বেথুন কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগে শোকপ্রকাশের জন্য যে মহিলা-সভা হয়, তাহাহইতে একটী মহিলা-সমিতি নিযুক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষের পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরী ঘোষ এবং ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর পত্নী শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা বসু এই সমিতির সম্পাদিকা। অন্যূন ৫ সহস্র টাকা সংগ্রহ করা ইহাঁদের উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে ৩০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে প্রত্যেক বাঙ্গালী রমণীরই যথাসাধ্য সাহায্য দান করা যে কর্ত্তব্য ইহা বলা বাহুল্য। পাঠিকাগণের মধ্যে যিনি যাহা দান করিতে চান, বালিগঞ্জ ১১নং ষ্টোর রোড সম্পাদিকাদের নামে পাঠাইবেন, আমাদিগের নিকট পাঠাইলেও যথাস্থানে প্রেরিত হইবে। ইতিমধ্যে প্রায় তিন শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

-:০:-

র কথা।

আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মাত্রেই ষষ্ঠীর ভক্ত। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামবাসিনী পুত্রবতী নারী ষষ্ঠীর অবমাননা করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। তাঁহাদের বিশ্বাস ষষ্ঠী কুপিতা হইলে পুত্রের ও কন্যার অমঙ্গল হয় এবং ষষ্ঠী প্রসন্না থাকিলে তাহাদের মঙ্গল হয়। ষষ্ঠী বালক বালিকাগণের পালয়িত্রী দেবতা। বালক উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া গেলে ষষ্ঠী রক্ষা করেন, ঘুমাইলে তাহাদের সহিত ক্রীড়া করেন, কোনও বিপদ হইতে দেন না। এই বিশ্বাসের বশীভূতা হইয়া পুত্রবতী হিন্দু রমণী যাবজ্জীবন ষষ্ঠী পূজার ও ষষ্ঠী ব্রতে কালযাপন করিতে পরাঙ্মুখী নহেন। বার মাসের বারটী শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠীর পূজা হয়, পূজান্তে ষষ্ঠীর কথা শুনা হয়, তৎপরে আহার সংযমাদি নিয়ম পালন করা হয়।

ষষ্ঠীর কথা অতীব কৌতুকাবহ। তাহা এই :—"ষষ্ঠী শিশু-অপত্য ভাল বাসেন, ষষ্ঠীই শিশুর পালয়িত্রী দেবতা, ষষ্ঠী প্রসন্না থাকিলে বালকের বিপদ হয় না, ষষ্ঠী কুপিতা হইলেই বালকের বিপদ, যে মার্জার এই সকল মার্জারের আদি পুরুষ, সেই মার্জার (বিড়াল) ষষ্ঠীর অনুচর, ষষ্ঠীর আজ্ঞায় সে শিশু অপত্যদিগকে বিড়াল, কুক্কুর, শেয়াল প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করে এবং এই উপকার করিয়া অপত্য-মাতার নিকট ভক্তি শ্রদ্ধাসহ পূজা পাইতে ইচ্ছা করে।" এইরূপ কথা ধর্ম্মের আখ্যায়িকা যোগে রচিত। এই কথার এক স্থানে আছে, "এক রমণী ষষ্ঠীকে ভক্তি করিত না, বিড়ালকে ঘৃণা করিত, সেই অপরাধে বিড়াল ষষ্ঠীর আজ্ঞায় তাহার প্রসূত সন্তান অপহরণ করিত। ক্রমে ৭টী সন্তান চুরি করিয়াছিল। প্রসূতি জানিত, সন্তান চুরি হইয়াছে। কিন্তু সেই কার্য্য যে বিড়ালে করে, তাহা সে জানিত না। অনন্তর সে যখন পুত্রশোকে কাতরা হইয়া ষষ্ঠীর ভজনা করিল, বিড়াল তখন সেই সকল সন্তান আনিয়া তাহাকে পুনরর্পণ করিল।* দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সকল সন্তান মাত্র বিড়ালের ন্যায় মেও মেও করিতে শিখিয়াছে, মা বাবা বলিতে শিখে নাই। শিখিবে কি? তাহারা জন্মিয়া অবধি মানুষের মুখ দেখে নাই, মানুষের কথা শুনে নাই, কেবল বিড়ালের অব্যক্ত শব্দই শুনিয়াছে। কিছুকাল ঐরূপে গেল, পরে তাহারা দীর্ঘকাল লোকালয়ে বাসের পর মানুষের মত হইল।"

* শিশু ঘুমাইয়া হাস্য করে, কখন কখন রোদন করে, হস্ত পদ সঞ্চালনও করে, মেয়েরা বলে, শিশু "দ্যায়লা" করিতেছে অর্থাৎ ষষ্ঠী আসিয়া শিশুকে উৎসাহ ভয় দেখাইতেছেন এবং তাহাকে লইয়া খেলা করিতেছেন।

ষষ্ঠীর বিড়াল সদ্যঃপ্রসূত শিশু চুরি করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা মানুষের কথা শিখে নাই, পরে লোকালয়ে আসিয়া বহুদিন পরে মা বাবা বলিতে শিখিয়াছিল, এই কয়েকটী কথা নিতান্ত সারবান্ ও বিজ্ঞানশাস্ত্র-সম্মত। যে দিন আমি অন্তরালে থাকিয়া মেয়েদিগের ষষ্ঠীর কথা শুনিতে শুনিতে ঐ কয়েকটী কথা শুনিয়াছি, সেই দিন অবধি আমি আর কোনও মেয়েলী কথার অবিশ্বাস করি না, অধিকন্তু মনোযোগ সহকারে কাণ পাতিয়া শুনি। আমার বিশ্বাস—পাগলের মুখেও সার কথা পাওয়া যায়। ভাষাতত্ত্ববিৎ জর্ম্মণ পণ্ডিত ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছেন, আমাদের মেয়েলী উপকথা ও ষষ্ঠীর কথা তাহারই "তদয়ং নিষ্কর্ষঃ—তাহারই সার সঙ্কলন" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জর্ম্মণ পণ্ডিত আপনাদের উত্তম ভাষায় সাজাইয়া সাজাইয়া ঐ কথাই বলিয়াছেন ও প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতিরিক্ত বলিতে পারেন নাই। কেন? তাহা অল্প কথায় বুঝাইতেছি, প্রণিধান কর।

মনুষ্যের বাক্‌শক্তি ও তজ্জাত ভাষার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইতে হয়। মানুষ আপনার বাক্‌শক্তিপ্রসূত ভাষার সাহায্যে আপনার অভিজ্ঞতা আর এক জনকে দান করিতেছে, করিয়া তাহাকেও অভিজ্ঞ করিতেছে। সদ্যঃপ্রসূত শিশু জন্ম হইতে বয়োবৃদ্ধি সহকারে, দিন দিন অল্পে অল্পে, আপনার ভাষা ও জ্ঞান অনুবাদ করিতে শিখিতেছে অথবা আপনাতে আনয়ন করিতেছে। শিশু অন্যের ভাষা শুনে বলিয়াই অল্পে অল্পে বাক্‌শক্তি ও ভাষা পদার্থের জ্ঞান লাভ করে। এই ঘটনা প্রতি মুহূর্ত্তেই হইতেছে অথচ আমরা মনে রাখিতেছি না, বা প্রণিধান করিতেছি না যে, অন্যের বাক্‌শক্তি ও তজ্জাত ভাষা আমাদের মূল বা প্রধান জ্ঞানগুরু। বয়ঃস্থ যুবা ও বৃদ্ধ আজ যিনি মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত বলিয়া ইহ সংসারে বিদিত, তিনিও একদিন বোবাসদৃশ ভাষাবিহীন ও অজ্ঞান শিশু ছিলেন, পরে অল্পে অল্পে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন যুবার ও বৃদ্ধের উচ্চারিত ভাষা শুনিয়া শুনিয়া সেই সকল জ্ঞানীর জ্ঞান ও ভাষা আপনাতে আকর্ষণ ও সঞ্চয় করতঃ অবশেষে আমাদের ও অন্যের গুরু, উপদেষ্টা ও গৌরব-ভাজন হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। সদ্যঃপ্রসূত শিশুর জ্ঞান ও ভাষা দুয়ের কিছুই থাকে না। সে যতই বড় হইতে থাকে, ততই তাহার অন্তরে জ্ঞান ও বাহিরে ভাষা প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। জ্ঞান না হইলে, জানা শেষ না হইলে, ভাষার সৃষ্টি অথবা কথা উচ্চারণ হইতে পারে না। শিশুরা সর্ব্বাগ্রে "মা" "বাবা" "দাদা" ইত্যাদি কথা বলে, তাহার কারণ, তাহারা সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বদা ঐ কয়েকটী কথা শুনিতে

পায় ও সর্ব্বাগ্রেই তাহারা বাপ মা ভাই প্রভৃতিকেই চেনে। বস্তুতঃ পাকা জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত শিশুর কথা ফুটে না, ফুটিবার সম্ভাবনাও নাই। এই ঘটনার বা এই ব্যাপারের প্রতি মনোনিবেশ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রুত ভাষার সহিত নিজের জ্ঞানের ও ভাষার নিম্নলিখিত প্রকার কারণ কার্য্য ভাব আছে। জ্ঞান না হইলে বাক্‌শক্তির ক্রিয়া ভাষা আয়ত্তাধীন হয় না অর্থাৎ কথা ফুটে না এবং অন্যের উচ্চারিত ভাষা না শুনিলেও জ্ঞান বা বস্তু চেনা সম্পন্ন হয় না। জ্ঞান হইলেই বাক্‌শক্তি বিকসিত হয়, বাক্‌শক্তি বিকসিত হইলে যথাযথ বাগ্‌যন্ত্র পরিচালন-সামর্থ্য আইসে, বাগ্‌যন্ত্র পরিচালন প্রপুষ্ট হইলেই শিশুর কথা ফুটে। কথা ফুটে কি? না শিশু শ্রুত কথার ও তদুপলক্ষিত জ্ঞানের অনুবাদ করিতে শিখে।

এস্থলে অনুবাদ শব্দের অর্থ—ভাষাপক্ষে অবিকল এক জনের ভাষা বলা এবং জ্ঞান পক্ষে একজনের জ্ঞান আপনাতে আনা। ইংরাজী ভাষার 'রিপিট' শব্দ ঐ অনুবাদ শব্দের স্থানাভিষিক্ত হইতে পারে। এক জনের জ্ঞান ও ভাষা আর এক জনে সঞ্চারিত হইয়া তাহা হইতে অভিব্যক্ত ও নির্গত হয় বলিয়াই আমরা অনুবাদ শব্দের ব্যবহার করিলাম। অতএব, জ্ঞান সঞ্চার উক্ত অনুবাদ প্রণালী অবলম্বনেই হইয়া থাকে, অন্যরূপে হয় না। এই অনুবাদ প্রণালী অনাদি অনন্তকাল হইতে অবিচ্ছেদে সমান ধারায় চলিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে। মানুষ যদি সত্য সত্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে, সত্য সত্যই যদি মানুষের কোন আদি পুরুষ থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিবে যে সেই আদম বা আদি মানুষ কোথায় কাহার নিকট কেমন করিয়া ভাষা শিখিলেন এবং কেমন করিয়াই পদার্থ জ্ঞান অর্জ্জন করিলেন? ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া সহজ নহে; পরন্তু যিনি যেমন বুঝেন তিনি তেমনি প্রত্যুত্তর দেন। হিন্দু বলিবেন, আদম বা আদি মানুষ ঈশ্বর প্রেরিত অশরীরিণী বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার জ্ঞান বিকসিত হইয়াছিল ও কথা ফুটিয়াছিল। যোগসেবী হিন্দু বলেন, তাঁহার জন্মও অমানুষ, জ্ঞানও অমানুষ, তাঁহার জন্ম আকস্মিক এবং জ্ঞান প্রাতিভ। * প্রাতিভ জ্ঞান উদিত হইয়া তাঁহাকে বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়াছিল, ভাষা বা বস্তুবোধক নাম উচ্চারণ করিতে শিখাইয়াছিল। প্রকৃতিসেবক ঋষিরা বলেন, আগে পশু পক্ষ্যাদি, তৎপরে মানুষ। মানুষ প্রথমে পশু পক্ষ্যাদির

* হঠাৎ অকারণোৎপন্ন, অনুশীলনোৎপন্ন ও অনুসন্ধানোৎপন্ন বাহ্য বিজ্ঞান 'প্রতিভ' নামে খ্যাত। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ জ্ঞান শিক্ষাপ্রসূত নহে, উপদেশশ্রবণ বা ভাষাশ্রবণ মূলকও নহে। তাহা এক প্রকার প্রতিভ জ্ঞান। প্রতিভ জ্ঞান বুঝিবার এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

অব্যক্ত ধ্বনি ও ভৌতিক পদার্থের পরম্পরাক্রমজনিত ক্রিয়াদিমূলক শব্দ অবলম্বন করিয়া অল্পে অল্পে স্বতন্ত্র মানব ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। যিনি যাহাই বলুন, না শুনিলে জ্ঞান ও ভাষা হয় না, এ কথা সকলেরই স্বীকার্য্য। আদম বা আদি মানুষ যে ভাষা উচ্চারণ করিয়াছিল, সেই ভাষাই শত মুখে সহস্র মুখে বিকৃত হইয়া শত সহস্র আকার ধারণ করিয়াছে। দেশভেদে, কালভেদে, শারীরিক অবস্থাভেদে ও আহারাদির প্রভেদে সকলের বাগ্‌যন্ত্র ও উচ্চারণ-সামর্থ্য একরূপ না হওয়ায় সেই একই মূলভাষা নানাভাষায় ও নানাউচ্চারণে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে মাত্র, পরন্তু জ্ঞান ও জ্ঞেয় অবিকল সেইরূপই আছে। আমরা যাহাকে "গো" বলিয়া বুঝাই, অন্যে না হয় তাহাকে 'কাউ' বলিয়া বুঝাইবে; তাহাতে জ্ঞানের ও সেই জ্ঞেয় বস্তুর অন্যথা বা ব্যতিক্রম হইবে কেন? বস্তুতঃ দেশভেদে কালভেদে অবস্থাভেদে বাগ্‌যন্ত্রের ভিন্নতা নিবন্ধন উচ্চারণের প্রভেদ দৃষ্ট হইলেও জ্ঞানের অন্যথা হয় না। ফল কথা—ভাষা বা বস্তুজ্ঞাপক শব্দ রাশিই মানব মনে জ্ঞান সঞ্চারের অদ্বিতীয় কারণ।

(ক্রমশঃ)

ট্যাসমেনিয়া।

পাঠিকা! ট্যাস্‌মেনিয়া বা ভান ডিম্যানের দ্বীপের মানচিত্র দেখিয়াছ। তোমার মনে হইতে পারে যে উহা একটী সামান্য দ্বীপ। উহার বিষয় বিশেষ কিছু জানিবার আবশ্যকতা নাই। যদ্যপি এরূপ মনে কর, তাহা হইলে তোমার সম্পূর্ণ ভূল। কি জল বায়ু, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য,কি উৎপাদিকা শক্তি সকল বিষয়েই ইহা নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সকলের শ্রেষ্ঠ। বঙ্গমহিলার কথা দূরে থাকুক, এদেশের অনেক পুরুষেরও ভ্রমণ করিয়া এদেশের জ্ঞান লাভ করা সহজ নহে। এই হেতু ইহার স্থূল বিবরণ এস্থলে প্রকটিত হইল।

ওলন্দাজ এবেল জান ট্যাস্‌ম্যান ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন এবং রাজপ্রতিনিধি ভান্ ডিম্যানের নামে ইহার নাম রাখেন। সেই অবধি ইহা ওলন্দাজদিগের রাজ্যভুক্ত থাকে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে নিউসাউথ ওএল্‌স্ হইতে একদল ইংরাজ আসিয়া ইহা অধিকার করেন এবং আণ্ডামান দ্বীপের মত ইহাতে কয়েদীদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই অবধি ইহা ইংরাজকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া আসিতেছে। প্রথমে কয়েদীদিগের দ্বারা ইহাতে অনেক রাস্তা ঘাট, বাড়ী ঘর নির্ম্মিত হয়। ১৮৫৩ সালে কয়েদী পাঠান বন্ধ হয় ও ইহার নাম

ভান ডিমন্যানের দ্বীপ গিয়া ট্যাসমেনিয়া হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার জল বায়ু অতি উৎকৃষ্ট। এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। ইহার তুল্য মনোহর স্বাস্থ্যকর জল বায়ু জগতের আর কোনও দেশের নয়। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে সূর্য্যকিরণ অপেক্ষাকৃত খরতর হয় সত্য, কিন্তু আমাদিগের দেশের মত অসহ্য হয় না; বাতাস উষ্ণ হয় না, প্রত্যুত, তাহা ভেষজ গুণাত্মক —সেবন করিলে রোগজ্বালা বিদূরিত হয় বলিয়াই বহু দূর দেশ হইতে পীড়িত ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে আগমন করিয়া থাকেন। শীত গ্রীষ্মে প্রভেদ এই যে, শীত ঋতুতে হিমানী পতিত হইয়া স্বভাবকে মুক্তাভরণে বিভূষিত করে, গ্রীষ্মকালে সেরূপ হয় না। অল্প আয়ে এখানে সংসার সচ্ছলে চলিতে পারে। এজন্য অনেক অল্প আয়ের গৃহস্থ ইংরাজ এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। একটি ছোট পরিবার ৩।৪ শত পাউণ্ড বাৎসরিক আয়ে এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। আমাদিগের দেশের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যাউক। ৩০০ শত পাউণ্ড ৪৫০০ সাড়ে চারি হাজার টাকার সমান। বৎসরে ৪৫০০ সাড়ে চারি হাজার টাকা আয় হইলে মাসে পৌনে চারিশত টাকা হয়। সকলেই জানেন এদেশের গরিবের কথা দূরে থাকুক, বেশীর ভাগ গৃহস্থের ২৫।৩০ টাকার অধিক আয় দেখা যায় না। তাহাতে আবার বহু পরিবার। সুতরাং এ দেশের কষ্ট যে কি, তাহা এদেশের গৃহস্থ গরিবই জানে, অন্যে কি জানিবে? অতীব দুঃখের বিষয় দেশে হৃদয়বান্ চিন্তাশীল লোক নাই, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গরিবের জন্য কিছু উপায় অবলম্বন করিতেছেন না। আপনার উপায় আপনি না করিলে অন্যে কি করিবে? আত্মনির্ভরই সংসারে উন্নতির একমাত্র উপায়। সুসভ্য সমৃদ্ধিশালী ইংরাজ স্বদেশের ব্যয়ের সহিত তুলনা করিয়া ইহা সুলভ উপজীবিকা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা গরিব ভারতবাসী পারি না। সে যাহা হউক, প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় আলোচনা করা হউক। গত দশ বৎসরের মধ্যে ট্যাসমেনিয়ায় লোক সংখ্যা ১১২৬ ৪৯ হইতে ১৫৬০০০তে দাঁড়াইয়াছে। ১৮৮৯ সালে ৩৭৪½ মাইল বিস্তৃত রেল পথ প্রস্তুত হয়, এবং ৯৭½ মাইল প্রস্তুত হইতে থাকে। এতদিনে ইহা শেষ হইয়া থাকিবে। ইহাতে বড় বড় সহর ও বাণিজ্য স্থান সমূহে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, ও দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানী হইয়া জাতীয় ধন-ভাণ্ডার পরিবর্দ্ধিত হইতেছে ও উত্তরোত্তর আরও হইবেক। শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে ইহা বলিলে বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে প্রাথমিক শিক্ষা ঔপনিবেশিকদিগের অবশ্য শিক্ষণীয়, গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে প্রাথ-

মিক শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য করিবেন। শিক্ষার এই সুব্যবস্থা অন্য কোনও দেশে বোধ হয় নাই। শিক্ষার আর একটি স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত এখানে আছে, যাহা কুত্রাপি এমন কি ইংলণ্ডেও দৃষ্ট হয় না। ট্যাসমেনিয়ার ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্ট অর্থকরী শিল্প বিষয়ে শিক্ষা (technical Education) দান করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া যাহাতে বৃটীশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া অধ্যয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে, তজ্জন্য বাৎসরিক ২০০ দুই শত পাউণ্ডের দুটি বৃত্তি আছে।

ট্যাসমেনিয়ার ফল ভুবনবিখ্যাত। কলিকাতার গত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে উপনিবেশিক বিভাগান্তর্গত ট্যাসমেনিয়ার উৎপন্ন দ্রব্যজাত প্রদর্শিত হয়। তন্মধ্যে আপেল, লেবু ও মেষলোম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা নামগুলি ভুলিয়া যাইতেছি। তবে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে বিলাতের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের মত এখানে সুপ্রচারিত কৃতবিদ্য মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বড় বড় সংবাদ পত্রও আছে! ট্যাসমেনিয়ায় স্বর্ণখনি আছে। হোয়াইট নদীতে স্বর্ণ কুচি পাওয়া যায়। সুতরাং অনেকে এখানে অনায়াসে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। পশ্বাদির চরণের জন্য সুন্দর তৃণ সুশোভিত মাঠ আছে। তাহাতে আবার মেষাদি গৃহপালিত প্রাণিগণ বিশেষ যত্ন সহকারে লালিত পালিত হয়। একারণে বোধ হয় ট্যাসমেনিয়ার মেষ-জাত লোম এত উত্তম।

লনসেস্টন ও হবার্ট ট্যাসমেনিয়ার প্রধান নগর হয়। ইহাদিগের ব্যবধান ১২০ মাইল। রাস্তা সুপ্রশস্ত। এখানে ভাল ভাল শকট দেখিতে পাওয়া যায়। মশক ও অন্যান্য কষ্টদায়ক পতঙ্গ নাই। সুগন্ধ ফল, ফুল, ঘাসের গন্ধে পথিকের ঘ্রাণেন্দ্রিয় পুলকিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটী আছে। পথঘাট পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যের প্রতি সকলের বিশেষ লক্ষ্য। ট্যাসমেনিয়া প্রভৃতি স্থানের ইংরাজ ও ইংলণ্ডের ইংরাজ এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে ট্যাসমেনিয়ার ইংরাজদিগের মুখ মণ্ডল কিছু সূর্য্যকিরণে বিবর্ণ রক্তিমা; ইংলণ্ডের ইংরাজের ফ্যাঁকাসে লাল। ঔপনিবেশিকের হৃদয় বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সরল। ইহারা সদালাপী, কিন্তু ইংরাজ খাস অন্যান্য জাতির ন্যায় ঔপনিবেশিক ইংরাজকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

গবর্ণর-ইন-চিফ মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন, যেমন আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণ হইয়া থাকেন। ঔপনিবেশিক পার্লিমেণ্ট নাম্নী মহাসভা আছে। আইনাদি সকলই এই সভাকর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হয়। স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়া অতি সুফলপ্রদ হইয়াছে।

আমরা গত সেপ্টেম্বর মাসের থিয়-

সফি পত্রিকায় টাসমানিয়া সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ দেখিলাম। উক্ত প্রবন্ধের লেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই দ্বীপের এবং ইহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপের আদিমনিবাসিগণ মান্দ্রাজ প্রদেশের অতি প্রাচীন অনার্য্যজাতি-সম্ভূত। ইহাতে বিশেষ জানা যায় যে, তাৎকালিক অসভ্য জাতি উক্ত দ্বীপপুঞ্জে গিয়া বাস করে, যাতায়াতের জন্য কতক জল ও কতক স্থল উভয়পথ ছিল। ইহারা অনেক পরিমাণে ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার বজায় রাখিয়া চলিতেছিল এবং এখন ইহাদিগের বংশধরগণ এমন কার্য্যের কিছু কিছু অনুষ্ঠান করে, যাহার সৌসাদৃশ্য এদেশে পরিলক্ষিত হয়। তবে ইংরাজের সংঘর্ষণে ক্রমশঃ ইহারা ইংরাজ হইতেছে। ট্যাসমেনিয়া সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার রহিল।

উদাসীনের চিন্তা।

নীতিবিজ্ঞান।

সৌন্দর্য্যভাণ্ডার বিচিত্র বহির্জগৎ পরিত্যাগ করিয়া একবার অন্তর্জগতে প্রবেশ কর। তথায় পরিবর্ত্তনশীল তরঙ্গমালার চিন্তা ছাড়িয়া দাও। মূলে অপরিবর্ত্তনশীল "আমি"কে ধর। 'আমি' কি চায়? "আমি" যে অবস্থায় বিদ্যমান, 'আমি' সে অবস্থা ভাল বাসে না। 'আমির' নিকট বর্ত্তমান জগৎ অনভীপ্সিত, 'আমি' চায় আদর্শ রাজ্য। 'আমির' নিকট যাহা আছে,তাহা হৃদয়ানন্দকর সুমিষ্ট বলিয়া অনুমিত হয় না। 'আমি' আনন্দধাম খুঁজিয়া বেড়ায়। 'আমি' সৌন্দর্য্যের অনন্ত উৎস, শান্তির অক্ষয় ভাণ্ডার, পবিত্রতার সাগর পাইবার জন্য ব্যগ্র। যে রাজ্য নিকটে নাই, সেই রাজ্য যে আছে, 'আমি' কে একথা কে বলিয়া দিল? বর্ত্তমান জগতের অপর পারে আর এক সুস্নিগ্ধ প্রেমময় রাজ্য বিদ্যমান, অজ্ঞ—বর্ত্তমান লইয়া ব্যতিব্যস্ত 'আমি' কে সে কথা কে বলিল? এইটীই গুরুতর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরের উপরে অচল নীতি দণ্ডায়মান। যাঁহারা ফুৎকারে নীতির রাজ্য উড়াইয়া দিতে চান, তাঁহারা এই প্রশ্নের নানা উত্তর দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের কেহ বলিতেছেন কেন? ঈষৎ প্রস্ফুটিত-চক্ষু শিশু জনক জননীর মুখ হইতে এই রাজ্যের তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকে। তর্কমুখে এই কথা স্বীকার করিলেও আবার জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে

সৃষ্টির প্রারম্ভে আদি জনক জননী এই তত্ত্ব কোথা হইতে শিখিলেন? এই থানেই তার্কিক পরাস্ত। তখন এই কথা বলিয়া থাকেন, আদি তত্ত্ব সমস্তই ঘন তিমিরাচ্ছন্ন, মানবের সেই অন্ধকারের আবরণ সরাইবার শক্তি নাই, সুতরাং সেই অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বিষয় লইয়া বাড়াবাড়ি করা ঠিক্ নয়। যাক্ তবে এদের কথা ছাড়িয়া দি। আর এক শ্রেণীর লোক বলেন "শাস্ত্রকথাই" লোকের নীতির বিধি, শাস্ত্রপ্রণেতা নীতির রাজা। এখন জিজ্ঞাস্য শাস্ত্রপ্রণেতার মনে এভাব কে জাগাইল? শাস্ত্রকারকে অদৃশ্য রাজ্যের কথা কে বলিল? কুট তর্কজালে যাঁহারা মানব প্রকৃতিকে ঢাকিয়া রাখিতে চান, তাঁহারা কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। আমরা এই প্রশ্নের কি উত্তর দিব? আমরা বলি প্রত্যেক নর নারীর প্রাণে স্বতঃই এই রাজ্যের তত্ত্ব জাগৃত হইয়া থাকে। যদি কোন শিশুকে জন্মের অব্যবহিত পরে এক নিভৃত গুহায় রাখিয়া দেওয়া যায়, আর তথায় কোন পুরুষ কিংবা রমণী অতি সাবধানতার সহিত তাহার আহার যোগাইয়া আসেন, তাহা হইলেও দেখিতে পাইব তাহার প্রাণে আদর্শ জগতের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেহ শিখায় নাই, কেহ বলে নাই, পিতা মাতা কিংবা নর নারীর বাক্য শুনে নাই, শাস্ত্র পড়ে নাই, তবুও শিশু যখন যৌবনে পদার্পণ করিবে, তখন তাহার মনে গন্তব্য জগতের কিরণ ছটা আসিয়া পড়িবেই পড়িবে। একজন সুসভ্য দেশের যুবকের মনে এই রাজ্য সম্বন্ধে যে জ্ঞান, আমাদের নির্জ্জন গুহাবাসী যুবকের সে জ্ঞান না থাকিতে পারে, কিন্তু এরূপ যে এক রাজ্য আছে তদ্বিষয়ে তাহার বিন্দু মাত্রও সন্দেহ হইবে না। আমরা যে যুবকের কল্পনা করিলাম, প্রকৃতির কোলে সেরূপ যুবককে পাওয়া যায় না, কিন্তু মানব প্রাণে যে সর্ব্বকালে স্বতঃই নীতির উৎস উৎসারিত হইতেছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক সাধু কাজ পুরাকালে জনসমাজে অপরিজ্ঞাত ছিল, এমন কি কোন কোন নৃশংস ঘৃণিত নীত-বিগর্হিত কাজ সাধুতার সাজ লইয়া তৎকালীন নর নারীর মন মুগ্ধ করিত। কালক্রমে দুই একজন সাধু অথবা সাধ্বী নর নারীর প্রাণে অপরিজ্ঞাত সাধু কাজ পরিজ্ঞাত হইল, কিংবা ছদ্মবেশী দুষিত পাপকার্য্যের অসারতা প্রতিপন্ন হইল। ইহারা অপর কাহারও নিকটে এই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে নাই, তবুও এই তত্ত্ব অবগত হইল। আমরা যাহাকে স্বতঃ উৎসারণ বলিয়া আসিলাম; একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানিতে পারিব যে উহা ভাগবতী শক্তিরই প্রকাশ মাত্র। ঈশ্বর স্বয়ং জীবের প্রাণে এই আদর্শ রাজ্যের কিরণ আনিয়া ছড়াইয়া ফেলিতেছেন, তাই নর নারী উল্লসিত

হৃদয়ে সেই রাজ্যের জন্য ব্যাকুল। যেমন মধুলুব্ধ অলি অতি সামান্য সন্ধান পাইয়াই মধুর জন্য পুষ্পান্বেষণ করিয়া থাকে; যেমন তিমিরাচ্ছন্ন উষার আবির্ভাবে দুই চারিটি আলোকের রেখা দেখিয়া কানন মাঝে বিহঙ্গমগণ কলরব করিয়া উঠে; সেইরূপ সেই পবিত্র সূর্য্যের কিরণজাল যখন নিষ্প্রভ ভাবে আসিয়া জীবের প্রাণে পড়িতেছে, তখন জীবন উন্মত্ত হইয়া সেই অনন্তধামের জন্য অস্থির হইতেছে। অতি সংসারাসক্ত পুরুষ রমণীও সময় সময় চঞ্চল হইয়া উঠেন। এই চিত্তচাঞ্চল্য কেন জন্মে, বিষয়াসক্ত নর নারী তাহা না জানিতে পারেন কিন্তু ইহা সেই অক্ষয় অনন্ত রাজ্য লাভের জন্য অন্তরের স্বাভাবিক ব্যাকুলতা ভিন্ন আর কিছু নহে। নরনারী এই নীতিকে উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই।

ঘটকালি।

শুভমস্তু—নমঃ প্রজাপতি;
পরাপরে সহস্র প্রণতি।—
মেয়ের বাজার বড় সস্তা বাঙ্গালায়,
এত সুবিধার দিন ছাড়া নাহি যায়,
তাই আসা ঘটকালি তরে.;
মেয়ের মা যদি "খুসী" করে!

২

আমাদের শমনের, ভাই!
ঘরে এক "গৃহলক্ষ্মী" চাই;
যে চাও জামাই তাঁরে, এই বেলা ক'ও,
রূপ, গুণ, ধন, মান, কিসে রাজি হও—
পাকা পাকি করিতেতো হয়,
বিয়ে তাঁর না হলেই নয়!

৩

ঘরে তো অপর কেহ নাই,
মেয়েটী সেয়ানা কিছু চাই;
"চাঁদ পানা মুখ হবে গোলাপের রঙ,
দেশী পটে আঁকা হবে বিলাতের ঢঙ্"
সে সব চান না কিছু ছেলে—
বেঁচে যান রাঁধা ভাত পেলে।

৪

চাই নাকো সোণার বাসন,
চাই নাকো রূপার আসন,
চাই না "নগদ" নামে লাখ কি হাজার,
খুলিতে হবেনা "দাস-কোম্পানি" বাজার;
সে সব কিছুতে নাহি ভয়,
মেয়ে যেন পতিপ্রাণা হয়।

৫

ছেলের রূপের নাই সীমা,
ভবভরা গুণের গরিমা;
ধনে মানে নাহি যোড়া, পাশে "মহাপাশ",
স্বাধীন ব্যবসা আছে-নাহি কার দাস।
মুখেতে সদাই ভরা হাসি;
বুকে ভরা মমতার রাশি।

৬

অথবা—

পাকা বাড়ী বাগান পুকুর,
আছে পোষা বিলাতি কুকুর,
তেড়ি আছে আলবর্ট, দাড়ি আছে ভারি,
ছড়ি, ঘড়ি-চেন আছে, হ্যাট্ কোট ধারী;
তা,ছাড়া চস্‌মা আছে নাকে,
সুগন্ধি এসেন্স সদা মাখে।

৭

মোরা সব খাঁটি কথা জানি,
মেয়ে হবে বড় সোহাগিনী;
শিবের পার্ব্বতী যথা অনলের স্বাহা—
রাত দিন "মরি! মরি!" রাত দিন "আহা!"
গহনা পোষাক যাহা চাবে,
আজ্ঞা মাত্রে তখনি তা' পাবে।

৮

ঘরে নাই, শাশুড়ীর জ্বালা,
ননদীর মুখে বিষ ঢালা;
যায়ে যায়ে কটু কথা কভু নাহি হবে,
এমন সুখের বাস কে করেছে কবে?
ঘর বর দেখে শুনে লও,
বুঝে সুঝে তবে রাজি হও।

৯

কার হায় টাকা নাহি বল,
"কন্যাদায়ে" আঁখি ছল ছল?—
কেন দাও পায়ে তেল, কেন কর গোল;
শুধু বিকাইবে মেয়ে, বল হরিবোল!
মেয়েটী দিওনা ফেলি জলে,
দাও শমনের করতলে।

১০

কে তুমি মেয়ের খেতে মাথা,
বিয়ে দিয়ে করিছ বিমাতা,
হিংসা দ্বেষ রাগ আড়ি বুকে চাপাইয়া,
গরবিনী ভুজঙ্গিনী দিলে সাজাইয়া!
মেয়েটী শমনে দাও ডালি,
আমি করে দিব ঘটকালি!*

১১

তুমি কে গো নিঠুর পাষাণ,
কুলীনে করিলে কন্যাদান?—
মিশাইছ অভাগীরে সতিনীর পালে,
ফুরাল সুখের সাধ ও পোড়া কপালে!
পতি নিয়ে কেন কাড়াকাড়ি,
সুখে যা'ক্ শমনের বাড়ী!

১২

কেবা তুমি, হায় রে কপাল,
বর দিলে পাপিষ্ঠ মাতাল,
দুদিন পরে যে মেয়ে ভিক্ষা করি খাবে,
আজিকার বাবুয়ানা কালি সব যাবে!
কেন গো এরূপ মাথা খাও—
আমি বলি, শমনেরে দাও!

১৩

কচি কচি স্নেহের কমল,
বুকে কেন জ্বালাও অনল;
বর যদি নাহি মিলে কেন এত ভয়,
আগুনে জীবন্ত মেয়ে না দিলে কি নয়?
বোঝ যদি, শমনেরে দিও,
মা বাপের গৌরব রাখিও।

* যাঁহারা সপত্নী-সন্তান অপত্য নির্ব্বিশেষে পালন করিতে পারেন, তাঁহারা আমার নমস্য।— এ শুভ সম্বন্ধ তাঁহাদের জন্য নহে। লেঃ—

১৪

যাই তবে, ভাই পাঠিকারা!
পথ হেঁটে হয়ে গেছি সারা;
বেছে বেছে বড় ঘর, বর আনিয়াছি,
কনে পেলে দুই হাত এক ক'রে বাঁচি-
সে দিন সন্দেশ দিব খেও,
বোম্বায়ের শাড়ী প'রে যেও।—
বলি—
ঘটকালি কেমন লাগিল?—
"বিদায়ের" আশা কি রহিল?

পরিচিতা

পুত্রোৎসর্গ

কিছুদিন পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে পুত্রোৎসর্গ নামে এক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছিল এবং তাহাতে মাতারা প্রাণ ধরিয়া একটী পুত্রকেও ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করিতে পারেন কিনা? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। যথার্থ বিশ্বাসী পিতামাতার নিকট ইষ্টদেবতার উদ্দেশে পুত্র উৎসর্গ করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। যিনি সকলই দিয়াছেন, তাঁহার ধন তাঁহাকে দিতে আবার সঙ্কোচ কি? আমাদের দেশে গঙ্গায় সন্তান বিসর্জনের যে প্রথা ছিল, তাহা ভয়ানক কুসংস্কার-মূলক হইলেও তাহাতে মানুষের অদ্ভুত ত্যাগস্বীকার ও ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যাইত। পুত্র-বলি সম্বন্ধে ইহুদী ও হিন্দু শাস্ত্রে যে দুইটী সুন্দর গল্প আছে, তাহা এস্থলে বিবৃত হইতেছে।

পুরাতন বাইবেলে বর্ণিত আছে, ইহুদীদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ আব্রাহাম অসাধারণ ঈশ্বর-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ১০০ বৎসর, তখন তাঁহার বৃদ্ধা স্ত্রী সারার গর্ভে আইজাক নামে এক পুত্র হয়। বৃদ্ধ বয়সের পুত্র পিতামাতার যে কতদূর আদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। আইজাক সবে স্তন্যপান (মাই) ছাড়িয়াছে এবং আইজাকের বয়োবৃদ্ধির জন্য আব্রাহাম আত্মীয় কুটুম্বদিগকে এক মহাভোজ দিয়াছেন, এমত সময় ঈশ্বর আব্রাহামকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমার পুত্র—তোমার একমাত্র পুত্র—প্রিয়পুত্র আইজাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও এবং তথায় একটী নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতের উপরে তাহাকে বলি-দিয়া হোম কর।" আব্রাহাম অতি প্রত্যূষে উঠিয়া হোমের জন্য কাঠ কাটিলেন এবং পুত্র ও দুইটী ভৃত্য সহিত গর্দ্দভারোহণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিলেন। পথে দুই দিন গেল, তৃতীয় দিনে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলেন। পরে গাধা ও ভৃত্যদ্বয়কে পশ্চাতে রাখিয়া প্রিয় পুত্র আইজাকের স্কন্ধে কাঠের বোঝা চাপাইয়া স্বয়ং এক হস্তে অগ্নি ও অপর হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া পর্ব্বতের সমীপস্থ

হইলেন। পথে যাইতে যাইতে আইজাক পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "পিতঃ আগুন ও কাষ্ঠত এই, কিন্তু হোমের পশু কোথায়?" আব্রাহাম বলিলেন "পুত্র! ঈশ্বর হোমের পশু যোগাইবেন।" পরে তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া এক বেদী নির্ম্মাণ করিলেন, তদুপরি কাষ্ঠগুলি সাজাইলেন এবং আইজাকের হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাহার উপর স্থাপন করিলেন। আব্রাহাম পরে পুত্রকে বলিদান করিবার জন্য যেমন ছুরিকা উত্তোলন করিয়াছেন, এমত সময় ঈশ্বরের দূত স্বর্গ হইতে আসিয়া তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন "আব্রাহাম! বালকের অঙ্গ স্পর্শ করিও না। তুমি যে ঈশ্বরকে ভয় কর এবং তোমার একমাত্র পুত্রকেও ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিতে যে কুণ্ঠিত নও, তাহা বুঝিয়াছি।" তখন হঠাৎ সেখানে একটী ভেড়া দেখা গেল এবং আব্রাহাম পুত্রের পরিবর্ত্তে তাহাকে বলি দিয়া হোম করিলেন। তৎপরে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক বরদান করিলেন।

এই গল্পটী বাইবেল পাঠকদিগের নিকট বড় হৃদয়স্পর্শী, কিন্তু আমাদিগের দাতাকর্ণের উপাখ্যান ইহা অপেক্ষা কম আশ্চর্য্য ও হৃদয়ভেদী নহে। অঙ্গদেশের রাজা কর্ণ পরম দাতা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তিনি উপবাসী আছেন—তাঁহাকে পারণ করাইতে হইবে বলিলেন। কর্ণ বলিলেন 'যাহা খাইতে ইচ্ছা হয়, আজ্ঞা করুন তাহাই দিব।' তখন ভগবান্ বলিলেন "তোমার একমাত্র পুত্র বৃষকেতুকে তুমি ও তোমার মহিষী হাসিতে হাসিতে করাত দিয়া কাটিবে এবং তাহার মাংস রন্ধন করিয়া দিবে, তাহা হইলে আমার তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন হইবে।" শিশু বৃষকেতু পল্লী বালকদিগের সহিত খেলাইতেছিল। তাহাকে ডাকাইয়া আনা হইল এবং ব্রাহ্মণের মুখের নিদারুণ কথা তাহাকে বলা হইল। বৃষকেতুর মহা আনন্দ, "আমার মাংসে ব্রাহ্মণের ভোজন হইবে, ইহাতে আমার জীবন সার্থক হইবে বলিতে লাগিল।" পরে রাজা কর্ণ ও মহিষী পদ্মাবতী অম্লানমুখে করাত ধরিয়া পুত্রকে চিরিয়া ফেলিলেন, কাটামুণ্ড ভূমিতে পড়িয়া 'হরি হরি' বলিতে লাগিল। মার প্রাণ, পদ্মাবতী পুত্রের মুণ্ডটী লুকাইয়া রাখিয়া শরীরের মাংস রন্ধন করিলেন, এবং মনে করিলেন এই চন্দ্রমুখ লইয়া গোপনে রোদন করিব। কিন্তু ব্রাহ্মণ অন্তর্যামী জানিতে পারিয়া কর্ণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "মুণ্ডটী লুকাইয়াছ, ইহা দিয়া অম্বল রাঁধিতে হইবে।" অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে ব্রাহ্মণ চারিখানি ঠাঁই করিতে বলিলেন,

"তুমি আমি পদ্মাবতী শিশু একজন,
চারি ঠাঁই কর মিলে করিব ভোজন।"

চারিখানি ঠাঁই হইলে ব্রাহ্মণ বলিলেন "পাড়া হইতে একটী শিশু ডাকিয়া আন।" কর্ণ শিশু ডাকিতে গিয়া সেই সুকুমার প্রিয়পুত্র বৃষকেতুকে দেখিতে পাইলেন এবং সাদরে তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন রাজা ও রাজমহিষী ভক্তিতে গদগদ হইয়া ব্রাহ্মণের পদতলে পড়িলেন ও তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ তখন আত্মপরিচয় দিয়া ও কর্ণের অদ্ভুত ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

পাঠিকাগণ গল্প দুইটী গল্প বলিয়াই মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইহার সার সংগ্রহে পরাঙ্মুখ হইবেন না। ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারা যায় কিনা, ইহাই ধর্ম্মের পরীক্ষা। আমাদের প্রাচীন উপনিষদ্‌কার বলিয়াছেন

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতমো যদয়মাত্মা।"

অন্তরতম এই যে পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়। প্রিয়তম ঈশ্বরের কার্য্যে দেহ, মন, প্রাণ, ধন, সুখ, সম্পদ সকলই অম্লানমুখে বিসর্জ্জন করা চাই। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রকে তাঁহার চরণে উৎসর্গ করা অপেক্ষা পিতা মাতার সৌভাগ্য আর কি আছে?

মহাত্মা কসীস্কুর অশ্ব।

পোলণ্ডের গৌরব কসীস্কুর (Koscinco) নাম উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। স্বদেশ-প্রাণ ম্যাটসিনী ও গ্যারীবল্‌ডীর নাম করিলে যেমন ইতালীর অতীত ঘটনা সকল স্মরণ হয়, কসীস্কুর নাম করিলেও তেমনি পোলণ্ডের অতীত ইতিহাস স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া থাকে। ম্যাটসিনী ও গ্যারীবল্‌ডী ইতালীর স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া ইতালীর যেরূপ গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, রুস-কবলিত পোলণ্ডের উদ্ধার সাধনার্থে অলোকসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়া কসীস্কুও সেইরূপ পোলণ্ডের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। রুসের হস্ত হইতে পোলণ্ডকে উদ্ধার করিবার জন্য, পোলণ্ডবাসী নরনারীগণের পরাধীনতা শৃঙ্খল উন্মোচন করিবার জন্য কসীস্কুকে অশেষ ক্লেশ ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে,—রুস-হস্তে পতিত হইয়া রুসীয় কারাগারে বন্দী হইতে হইয়াছে। কসীস্কু যে কেবল স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রুসজাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এমত নহে; ব্রিটিষ রাজ্যের সহিত যখন আমেরিকার উপনিবেশবাসীদিগের ঘোরতর সংগ্রাম বাধে, স্বাধীনতা-বৎসল কসীস্কু তখন আমেরিকায় গিয়া জর্জ্জ ওয়াসিংটনের প্রধান

সহযোগীরূপে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই বীরস্বভাব কসীস্কুর হৃদয় আবার কতদূর উদারতা ও দয়াপূর্ণ ছিল, নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাটীতেই তাহা প্রকাশ পাইবে।

কোনও সময় মহাত্মা কসীস্কু আপন বাসস্থান হইতে কিছু দূরে কোন ধর্ম্মযাজকের নিকট হইতে কিছু উত্তম সুরা আনাইবার জন্য আপন অশ্ব দিয়া একটী যুবা পুরুষকে প্রেরণ করেন। যুবক কসীস্কুর অশ্বে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মযাজকের নিকট গমন করিলেন এবং যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। যুবক ফিরিয়া আসিয়া কসীস্কুকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনার অশ্বে চড়িয়া গিয়া আমি মহা বিপদে পড়িয়াছিলাম।" কসীস্কু যুবকের কথায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এরূপ বলিতেছ কেন?" যুবক কহিলেন, "হাঁ মহাশয়, এখন হইতে আপনার অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে আপনার টাকার গেঁজেটীও আমাকে দিতে হইবে।" তখন কসীস্কু যুবককে তাঁহার মনের কথা খুলিয়া কহিতে বলিলে যুবক বলিতে লাগিলেন ;—"মহাশয় আপনার অশ্বে চড়িয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে একজন ভিক্ষুক আসিয়া আমার নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাহিল। ভিক্ষুককে দেখিবামাত্রই অশ্ব থামিল এবং যাই ভিক্ষুককে কিছু দেওয়া হইল, অমনি অশ্বটী পুনরায় চলিতে লাগিল।

"এইরূপ অনেক ভিক্ষুক আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহাদের সকলকেই আমি কিছু কিছু দিয়া বিদায় করিলাম। অবশেষে যখন আমার সম্বল ফুরাইল, তখন আমি মহা বিপদে পড়িলাম।" কসীস্কু বলিলেন, "তখন তুমি কি করিলে?" যুবক কহিলেন, "যখন টাকা একেবারে নিঃশেষিত হইল, তখনও এক একটী করিয়া অনেকগুলি ভিক্ষুক আসিয়া আমার কাছে আসিয়াছিল। তখন একটী ভিক্ষুক আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্রই অশ্ব থামিল এবং কোন মতে তাহাকে নড়াইতে পারিলাম না। অশ্বকে চালাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করা গেল, কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল—অশ্ব অটল অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া চতুরতা অবলম্বন করিতে হইল। তখন এমন ভাবভঙ্গি করা গেল, যাহা দেখিয়া অশ্বের মনে বিশ্বাস জন্মিল যে ভিক্ষুককে নিশ্চয়ই কিছু দেওয়া হইয়াছে। অশ্বের মনে এইরূপ বিশ্বাস হইবামাত্র অশ্ব পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল। ইহার পর যত ভিক্ষুক উপস্থিত হইয়াছিল, সকলকেই ঐরূপ ভাবভঙ্গি দেখাইয়া বিদায় করিতে হইয়াছে। আর কি করিব, নিরুপায় হইয়া ছলনা দ্বারা উপস্থিত বিপদ হইতে একরূপ নিস্তার পাওয়া গেল, কিন্তু ভবিষ্যতে আর আপনার টাকার থলেটী সঙ্গে না লইয়া আপনার

ঘোড়ায় চড়া হইবে না।" মানব হৃদয়ের অকৃত্রিম সদ্‌গুণের এমনই প্রভাব যে পশুরাও তাহাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে!

ডিডিরো।

ফরাশী রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে ফরাশী-দেশে যে সকল শক্তিশালী জ্ঞানী লোক জন্মগ্রহণ করেন,ফরাশী রাষ্ট্রবিপ্লব যাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা ও সাম্যভাবের ফলস্বরূপ, জ্ঞানীর শিরোমণি ডিডিরো তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ডিডিরো জন্ম গ্রহণ করেন এবং বড় হইয়া পারিসে আসিয়া সাহিত্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনিই ফরাশী এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রধান সম্পাদক। পণ্ডিতবর ডি এলেমবার্ট কিছুকাল তাঁহার সহকারীরূপে এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই গ্রন্থাবলী ডিডরোরই প্রধান কীর্ত্তি। এই গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত য়ুরোপে এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। জ্ঞানী ডিডিরোর দেশ-প্রচলিত রোমান কাথলিক ধর্ম্মে আস্থা ছিল না, সুতরাং পণ্ডিত সমাজের শিরোভূষণ হইয়াও তিনি দেশের লোক-সাধারণের নিকট নাস্তিক বলিয়া নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁহাকে যতই অবজ্ঞা করুক না কেন, অবজ্ঞা বলিয়া যে একটা জিনিব আছে তিনি বুঝিতেন না। তাঁহার হৃদয় অকৃত্রিম মানব প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। কাহাকেও অর্থ দিয়া, কাহাকেও বা পরামর্শ দিয়া, কাহারও বা লেখা সংশোধন করিয়া দিয়া, এইরূপ নানা প্রকারে ডিডিরো লোকের সেবা করিতেন। কথিত আছে, বন্ধু বান্ধব ও লোক সাধারণের সেবায় তিনি তাঁহার সময়, শক্তি ও অর্থের তিন চতুর্থাংশ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় যে কিরূপ উদার প্রেমে পূর্ণ ছিল, নিম্ন লিখিত ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাতে তাহা প্রকাশ পাইবে।

এক দিন ডিডিরো বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী যুবা পুরুষ আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। যুবকের পরিচয় লইয়া ডিডিরো জানিলেন, তিনি একজন নূতন লেখক,—অল্পদিন মাত্র লেখনী সঞ্চালনে হাত দিয়াছেন। এই যুবক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ডিডিরোকে দেখাইতে আসিয়াছিলেন। যুবক অতি বিনীতভাবে ডিডিরোর হস্তে স্বরচিত গ্রন্থের হস্তলিপি খানি দিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনি যদি দয়া করিয়া আমার এই লেখা টুকু একবার দেখিয়া দেন, তবে আমার পরম উপ-

কার হয়।” ডিডিরো গ্রন্থখানি দেখিয়া দিতে সম্মত হইলেন। যুবক ডিডিরোকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলেন। গ্রন্থখানি দেখা হইল কি না জানিবার জন্য পরদিন যুবক আবার আসিলেন। তখন ডিডিরো হাস্য করিয়া যুবককে বলিলেন, “ওহে দেখিতেছি তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রহসনখানি রচনা করিয়াছ। আমাকে গালাগালি দিয়া তোমার কোন লাভ আছে কি?” যুবক একটু হাসিয়া বলিল, “হাঁ মহাশয়, আপনার নিন্দায় আমার যথেষ্ট লাভ। আমার লিখিবার এমন কোন শক্তি নাই যে আমি গ্রন্থ লিখিয়া অর্থাগম করিতে পারি। দেশের লোকেরা আপনাকে অত্যন্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখে। আপনার কুৎসা করিয়া গ্রন্থ লিখিলে নিশ্চয়ই বহু অর্থ লাভ হইবে এই আশাতে প্রহসনখানি রচনা করিয়াছি।” ডিডিরো পরম আহ্লাদের সহিত কহিলেন, “বেশ করিয়াছ। তবে একটা কাজ কর, আমি তোমার লেখা বেশ মনোযোগের সহিত দেখিয়া রাখিয়াছি। তুমি ইহা মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে কিছু অর্থ হস্তগত করিয়া লও। অমুক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করেন। তিনি একজন গোঁড়া রোমান কাথলিক খৃষ্টান। তুমি যদি গ্রন্থখানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিতে পার, তবে তিনি সুখী হইয়া নিশ্চয়ই তোমাকে বিস্তর অর্থ সাহায্য করিবেন।” যুবক বলিল, “না মহাশয়! অত গোলযোগের মধ্যে আমি যাইতে ইচ্ছা করি না। বিশেষতঃ আমার লিখিবার তত শক্তি নাই যে, আমি তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপযুক্ত করিয়া উৎসর্গ পত্র রচনা করিতে পারি।” তখন ডিডিরো বলিলেন, “উৎসর্গ পত্র রচনা করিবার জন্য তোমার কোন ভাবনার প্রয়োজন নাই। তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে এমন এক উৎসর্গ পত্র লিখিয়া দিতেছি, যাহাতে সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মনোরঞ্জন ও তোমার অভীষ্টসিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে।” এই বলিয়া ডিডিরো একখানি উৎসর্গ পত্র লিখিয়া দিলেন। যুবক তাহা লইয়া একদিন প্রাতে সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি প্রহসন ও উৎসর্গ পত্রখানি পড়িয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং পারিতোষিক স্বরূপ বহু অর্থ দিয়া যুবককে বিদায় করিলেন।

জয়মন্ত্র।

ক্রোধীকে করিবে জয় ক্ষমা বিতরণে,
দুর্জনে করিবে জয় সাধু আচরণে,
নীচকে করিবে জয় উদার সদ্ভাবে,
মিথ্যাকে করিবে জয় সত্যের প্রভাবে।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা।

চতুর্থ প্রস্তাব।

সামাজিক অবস্থা।

বঙ্গমহিলাগণ সমাজেও হীনতর অবস্থায় সময় যাপন করেন। সামাজিক নিয়মে বঙ্গমহিলাগণ অবরোধবাসিনী ও বাহ্যিক স্বাধীনতাহীনা, ইহাই যে তাঁহাদের এ হীনত্বের কারণ এমন কথা বলিতেছি না। বঙ্গাঙ্গনাদিগের সুশিক্ষা, উচ্চ আশা, মানসিক স্বাধীনতা কিছুই নাই, একথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সেই কারণেই ইহাঁরা সমাজের নিকৃষ্ট শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। শিক্ষা ও মানসিক স্বাধীনতা অভাবে লোকের কি ধর্ম্মাচরণ, কি সদাশয়তা—কোনটীই উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বঙ্গমহিলাগণের ধর্ম্মচর্য্যা ও বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্য দেখাইতেছি।

১ম। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গমহিলাগণ ধর্ম্ম বিষয়ে আত্মীয় স্বজনের নিকট বহুল পরিমাণে শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করিতেন। আজি কালি সুরুচিসম্পন্ন পুরুষ ও মহিলাগণের বিবেচনায় সেকালের ধর্ম্মচর্য্যা অনেক কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম জালে জড়িত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তদানীন্তন বঙ্গমহিলাদিগের হৃদয়পূর্ণ ভক্তি ও অটল বিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ না হইবেন, এমন ব্যক্তি অতি বিরল। ধর্ম্মের নামে তখন বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেরই হৃদয় ভক্তির উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইত। তাঁহারা ধর্ম্মের উদ্দেশে—ঈশ্বরের সন্তুষ্টি সাধন আশয়ে কত দুরূহ কার্য্য সহজে নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছেন, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়! এখনও যাঁহারা প্রাচীনা মহিলা, তাঁহাদিগের বিশ্বাস অনুকরণীয়। বড় দুঃখের বিষয় আমাদিগের নব্য সম্প্রদায়েরা মহিলাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে উদাসীন হইয়াছেন। পূর্ব্বকালের ধর্ম্মের যাহা কুসংস্কার, যাহা উপধর্ম্ম, যাহা ভ্রান্তি, সেইগুলি বুঝাইয়া দিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন। ইহাতে নব্য মহিলাদিগকে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিলে সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে। বঙ্গমহিলারা যেরূপ ধর্ম্মের অপকৃষ্ট অংশ ত্যাগ করিতেছেন, সেরূপ কোন উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে পাইতেছেন না, * ইহার ফলে তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও ভক্তির মূল শিথিল হইয়া পড়িতেছে ও ধর্ম্মাচরণ

* এখন ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রসাদে আমরা দুই চারিখানি ধর্ম্ম পুস্তক পাইতেছি সত্য, কিন্তু দৃষ্টান্ত ও বাচনিক উপদেশ অধিক কার্য্যকারী।

সকলও ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। পুরুষের পক্ষে যাহাই হউক (সে কথা এস্থলে বলা তো অনধিকারচর্চ্চা) স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অতি নিদারুণ ঘটনা। দেশীয় ভগিনীগণের নিকটে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, সকলেই নিজ নিজ ভক্তি বিশ্বাস-অনুসারে স্বধর্ম্মে নিরতা থাকিবেন। নাস্তিকা বা অবিশ্বাসিনী কন্যা যেন আমাদের বঙ্গমাতার পবিত্র ক্রোড় কলঙ্কিত না করে। নারীজাতির ধর্ম্মের জন্য বঙ্গজননী চির প্রসিদ্ধ, একথা যেন প্রতি ভগিনীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে।

২য়। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, কত পবিত্র ও মূল্যবান; উহাকে স্বর্গীয় ব্রত বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, উহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অনেক বিধবা সমাজের ভয়েই উহা পালন করেন। যাঁহারা সেকেলে সংস্কার একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের ধারণা এই যে ব্রহ্মচর্য্য করিলে পুণ্য নাই, না করিলেই পাপ হয়। পুণ্যের আশয়ে যে ধর্ম্মাচরণ তাহা ইহারা প্রাণপণে সাধন করিতে অগ্রসর হন, ব্রহ্মচর্য্যে পুণ্য সঞ্চয় হয় না, অতএব পাপের ভয়ে ভীত হইয়া ও সামাজিক কঠোর শাসন ভয়ে অনেকে এই মহাব্রত পালন করেন। যাঁহারা এ প্রকার ব্রহ্মচারিণীদিগের প্রশংসা করিতে চাহেন, তাঁহারা করিতে পারেন, আমরা এরূপ কার্য্যের পক্ষপাতিনী নহি। লোকাচারে বাধ্য হইয়া যে কার্য্য করা যায়, নিজে কেহ তাহার ফলভোগী হইতে পারে না। বিশেষতঃ যদি মনই পঙ্কিল রহিল, আত্মাই কলুষিত রহিল, তবে শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া কি কেহ কখন উন্নত হইতে পারে? আমাদের বিবেচনায় দেশীয় বিধবা মহিলাদিগকে নিষ্কাম ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যের মহত্ত্ব আগে শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগকে ধর্ম্মালোচনা, ত্যাগস্বীকার, আত্মসংযম অভ্যাস প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া সদনুষ্ঠানে রত রাখিলে তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যরূপ মহাব্রত পালনে স্বতঃপ্রবৃত্তা হইবেন। সুশিক্ষিতা, সৎকর্ম্মান্বিতা, ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণ যে বঙ্গসমাজে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্যা, তাহা মহারাণী শরৎসুন্দরী এবং অন্যান্য করেকটী মহোদয়ার স্বর্গীয় জীবনে আমরা প্রমাণ পাইয়াছি। আবার বিদেশে দেখিতে পাই, আমাদের ব্রতনিষ্ঠা ব্রহ্মচারিণী বিধবা হইতে ভগিনী ডোরা, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, কুমারী কাউলার প্রভৃতি পবিত্রপ্রাণা রমণীগণ এ জগতের কম আদর্শ স্থানীয়া নহেন, তাঁহারা সকলেরই পূজা পাইবার উপযুক্ত দেবী। বাঙ্গালী বিধবারা "পরসেবা-বিমুখী," কি "ত্যাগ স্বীকারে অক্ষম" অথবা "অসহিষ্ণু" এমন কথা কেহ বলিতে পারিবেন না, বরং দেশীয় বিধবা মহিলাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি পরিস্ফুট করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে [illegible]

দিলে, দেশে কত ডোরা, কত নাইটাঙ্গেল পাওয়া যাইতে পারে (১)। কঠোরতার বাড়াবাড়ি করিয়া শরীর শুষ্ক করা অপেক্ষা সামর্থ্যানুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া জগতের কল্যাণে নিযুক্ত থাকা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ (২)।

অন্যান্য সভ্যজাতির মহিলাগণ পুরুষ জাতির নিম্ন স্তরে থাকিয়াও সমাজে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বাহ্যিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাধীনতা প্রাপ্তা ও উপযুক্তরূপে জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থা। এই জন্যে তাঁহারা সাহিত্যানুশীলন হইতে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয়েও পুরুষদিগের সহকারিণী হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে কবি ব্রাউনিং-এর সহধর্ম্মিণী, সুবিখ্যাত জন ষ্টুয়ার্ট মিলের পত্নী, লেডী বিকন্‌সফিল্ড, বিবী গ্লাডষ্টোন প্রভৃতির মানসিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আমাদের দেশের পুরুষেরাও বিস্ময়াপন্ন হন, কিন্তু পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। ভারত মহিলারা বেদ রচয়িত্রী ও পুরুষদিগের সহকর্ম্মিণী ছিলেন। তখন শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভবা কুমারীগণ বিশুদ্ধ স্বাধীনতা ভোগ এবং উপযুক্তরূপে জ্ঞান ও ধর্ম্মার্জ্জন করিতে পারিতেন। বিশ্ববারা, সুলভা, গৌতমী, গার্গী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা যে কতদূর উন্নত ছিল, তাহা তৎকাল-প্রচলিত স্বয়ংবরা প্রথাতেই উপলব্ধ হয়। তখনকার রমণীগণ গৃহে সমাদৃতা ও সমাজে সম্মানিতা হইতেন। রাজ-বংশোদ্ভবা রমণীগণ রাজকার্য্যে যোগদান করিতেন। রঘুকুলোদ্ভব অজরাজ, সহধর্ম্মিণী ইন্দুমতীর বিয়োগে বিলাপ করিতেছেন :—

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ,
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলা বিধৌ।
করুণা বিমুখেন মৃত্যুনা,
হরতা তাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥"

সেকালে রমণীগণের সঙ্গীত শাস্ত্রও ফাঁক যাইত না! শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বহু বিপ্লবে ভারত ভগ্নহৃদয় হইয়াছে, হৃদয়স্থিত রত্ন রাজি হারাইয়া ফেলিয়াছে, সেই সঙ্গে আর্য্য মহিলাগণের সে উন্নতাবস্থা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে! এখনও ভারতের অন্যান্য জাতি—পারসী, গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণ অপেক্ষাকৃত উন্নতাবস্থায় সময় যাপন করিতেছেন। দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোকই সর্ব্বাপেক্ষা হীন অবস্থায় রহিয়াছে। বঙ্গসমাজে "স্ত্রীলোক" শব্দের

---

(১) বিধবা রমণীগণ সাংসারিক ভোগ সুখ বিহীনা, সংযতেন্দ্রিয়া এবং ধর্ম্মানুরক্তা হন—ব্রহ্মচর্য্যের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব ইহাঁদিগকে কেবল সংসারে নিয়োজিত না করিয়া অন্যান্য হিতকর কার্য্যে অভ্যস্তা করাইলে ইহাঁদের ও সমাজের উভয়েরই কল্যাণের সম্ভাবনা।

(২) এ সকলই প্রাপ্তবয়স্কা বিধবাদিগের প্রতি প্রযোজ্য। বালবিধবাদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাহা আলোচনা করিবার স্থানও স্বতন্ত্র।

প্রতি অক্ষরে অবজ্ঞা ও অবহেলা বিরাজমান। মুখে বঙ্গসমাজ যাঁহাই বলুন, ব্যবহারে বোধ হয় স্ত্রীলোক-দিগের "মনুষ্যত্ব" স্বীকার করিতেও যেন সময়ে সময়ে কুণ্ঠিত হন!

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসমাজে ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। বোধ হয় স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেশীয় ব্যক্তি-দিগের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারি-য়াছেন। বামাহিতৈষী মহোদয়দিগের একান্ত চেষ্টায় ও গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল হওয়াতে অনেকগুলি গ্রাম ও নগরে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গীয় বালিকা ও মহিলারা অনেকেই বিদ্যাভ্যাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বঙ্গরমণী যাহাই হউন, প্রতিভাহীনা নহেন, এ কথা শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাই স্বীকার করি-য়াছেন। উপযুক্তরূপে শিক্ষা পাইলে ইঁহারা কার্য্যে কতদূর ক্ষমতাপন্না হইতে পারেন, বর্ত্তমান সময়ে যে সকল রমণী সাময়িক পত্র সম্পাদন, উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষতা এবং ডাক্তারের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারাই ইহার উদাহরণ স্থল। এই খানে একটী কথা বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারিণী হইলেই যে স্ত্রীলোকের সকল হইল, এমন কথা কেহ মনে করিবেন না। যে শিক্ষায় জ্ঞানের সহিত ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তি সকল পরি-মার্জ্জিত হয়, যে শিক্ষায় রমণীর চরিত্র পরিস্ফুট হয়, যে শিক্ষায় গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যথোচিত রূপে পালন করা যায়, সেই শিক্ষাই বঙ্গাঙ্গনাগণের সর্ব্বাগ্রে আদরণীয়; ইহার পরে যাঁহাদিগের সুবিধা হয়, তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভার্থে অবশ্যই যত্নবতী হইবেন।

আমরা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় মহাত্মাদিগের যত্ন ও চেষ্টায় বাঙ্গলা দেশের কয়েকটী প্রধান জেলায় স্ত্রীহিতৈ-ষিণী সভা স্থাপিত হইয়া স্ত্রীলোকদিগের বিশেষতঃ অন্তঃপুরিকাদিগের বিদ্যা, শিল্প, গার্হস্থ্য, নীতি প্রভৃতি শিক্ষার সহায়তা করিতেছেন। স্বর্গীয় ব্রজ-মোহন দত্ত স্থাপিত পুরস্কারও স্ত্রীলোক-দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; বালিকা ও মহিলাদিগের জন্যে কয়েক খানি সাময়িক পত্র নিয়মিতরূপে পরিচালিত হইতেছে এবং স্ত্রীপাঠ্য কয়েক খানি—কয়েক খানিই বা বলি কেন, কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়া স্ত্রীলোকের জ্ঞান ধর্ম্ম বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। যে সকল বামাহিতৈষীদিগের অবিশ্রান্ত উৎসাহ ও অবিচলিত অধ্যবসায়ে এই সকল সদনুষ্ঠান হইতেছে, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা যিনি যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত মহাত্মা-দিগের মহানুভবতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল। এইরূপে অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রী নিয়ো-

জিত করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার হইলে, আমাদের অনেক অভাব দূর হইতে পারে।

* এই খানে আমাদের ভগিনীদিগকেও বলি, আমরা নিজেদের দোষেও মাটী হইতে বসিয়াছি ; কেবল পুরুষ জাতির উপরে সমস্ত ভার চাপাইয়া আমরা সময় কাটাইতেছি। একে প্রাকৃতিক নিয়মে তাঁহাদের প্রতি আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়, তাহাতে আবার আমরা সাধ করিয়াও সেই "পিঠের ঘায় ত্রস্ত, পেটের দায়ে ব্যস্ত" ব্যক্তিদিগের উপর সমস্ত ভার বোঝা দিয়া বসিয়াছি ! আমরা নিজের বা দেশীয় ভগিনীগণের অবস্থার উন্নতি করিতে কয় জনে অগ্রসর হই ? আমি স্বীকার করি পুরুষেরা আমাদিগকে যেরূপ জ্ঞান, কার্য্য ও কু অভ্যাসে অভ্যস্তা করিতেছেন, * তাহাতে আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে না। আমি স্বাকার করি তাঁহারা আমাদের কাল্পনিক অভাব দূর করিতে যেরূপ চেষ্টা করেন, বাস্তবিক অভাব দূর করিতে সেরূপ করেন না ; আমি স্বীকার করি তাঁহাদেরই ভ্রম, অবহেলা, অমনোযোগ ও স্বার্থপরতা বশতঃ আমাদের অবস্থা এতদূর নিকৃষ্ট রহিয়াছে। এ সকল স্বীকার করিয়াও বলিতে হইতেছে আমরা নিজেরা নিজেদের অবস্থা কিছুই চিন্তা করি না। আজিকার দিনে "সময় অমূল্য ধন" একথা না জানেন এরূপ নব্য বঙ্গমহিলা অতি বিরল। ইহা জানিয়াও সময় নষ্ট করেন না এরূপ বঙ্গ মহিলাও অতি বিরল। আমরা ঘুমাইয়া, গল্প করিয়া, কি তাস খেলিয়া সময় কাটাইব, তথাপি আপনাদের অবস্থা আলোচনা করিব না ; চিরদিন পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিব, তথাপি স্বাবলম্বন শিখিব না—স্বাবলম্বন বলিতেছি বলিয়া এমন কেহ ভাবিবেন না যে আমি "অসূর্য্যম্পশ্যা" বঙ্গাঙ্গনাদিগকে রাজপথ-চারিণী, রাজকর্ম্ম কারিণী (ক) তদ্রূপ একটা কিছু হওয়ার বন্দোবস্ত করিতে বসিয়াছি। আমরা এই অন্তঃপুরে থাকিয়া, পুরুষ জাতির আশ্রিতা ও পালিতা হইয়াও স্বাবলম্বন করিতে কি পারিব না ? কিসে আমাদের জ্ঞান ধর্ম্ম পরিস্ফুট হইবে, কিসে আমাদের প্রত্যেকের গৃহ সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ হইবে, কিসে আমরা আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিব, কিসে একজনে উন্নতি লাভ করিয়া আর দশজনকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিব,

* বাঙ্গালীর মেয়েকে ধর্ম্মোপদেশ হইতে বঞ্চিত করা, বিবিয়ানা চালে চালান, স্বাভাবিক লজ্জা সম্ভ্রমের হ্রাস করা, প্রভৃতি আমরা কু অভ্যাস বলিলাম।

(ক) কোন ভদ্রবংশীয়া বঙ্গাঙ্গনা যদি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া দেশের বা নিজের উন্নতি আশয়ে কোন কাজ করেন (যেমন ধাত্রী, গৃহ-চিকিৎসাকারিণী, অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি), তাহা হইলে তাহা কখনই নিন্দনীয় হইতে পারে না। তবে মান সম্ভ্রম প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখা চাই।

এই সকল পবিত্র ইচ্ছা, এই সকল সদ্বিষয়ের আলোচনা—ইহাত বঙ্গবাসিনীর জাতি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে। আমাদের অবস্থা আমরা বুঝি না, বুঝিলেও ভাবি না, ভগিনীদিগের সহিত মিলিত হইলে কেবল গহনা পরিচ্ছদ লইয়া আলাপ করি, এবং চিন্তা করিতে হইলে কেবল স্বার্থপরতাপূর্ণ সাংসারিক ভাবনা সকল ভাবিতে থাকি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিতা ও আমাদের উন্নতি সাধনে ব্যগ্রচিত্তা, আমরা তাঁহাদের উপরে খড়্গহস্ত; তাঁহারা যেন কতই অন্যায় কাজ করিতেছেন, এই ভাবে আমরা তাঁহাদিগকে সমালোচনা করিতে বসি। ছি! ছি! ছি! এমন হ'লে কি মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে?—যাঁহাদের মন আজিও এত হীনত্ব—এত নীচত্ব পূর্ণ রহিয়াছে, তাঁহারা যদি সমাজের অতি নিম্ন স্তরে না থাকিবেন, তবে সে স্থান কাহাদের জন্যে? সামান্য শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকেরাও যে "মেয়ে মানুষ" বলিয়া হাসিয়া উড়াইতে চাহে, কতকাংশে আমরা সেই উপহাসের উপযুক্ত—এই কথা অবশ্য মানিতে হইবে। হিংসা, দ্বেষ, লোভ, অহঙ্কার প্রভৃতি কি আমরা ছাড়িতে পারিব না? কুপ্রবৃত্তির নিকটে রমণীর ধৈর্য্য ও মানসিক বল পরাস্ত হইবে, আমরা বাঁচিয়া থাকিব এই কলঙ্কের জন্যে? আমরা কি চির দিন সমাজের উপেক্ষণীয়া, অনাদৃতা ও ঘৃণ্যা থাকিয়া কেবল সাজ গোজ করিয়া, সঙ্গিনীদিগের নিকটে আপনাকে বড় দেখাইয়া বেড়াইব? দেশে অন্নাভাবে লোক মরিতেছে, আমাদের প্রতিপালকেরা গায়ের রক্ত জল করিয়া টাকা পয়সার মুখ দেখাইতেছেন, জন্মভূমির অবস্থা শোচনীয়, এই সকলই উপেক্ষা করিয়া কি আমরা আপনা লইয়াই ব্যস্ত থাকিব? আমার ভগিনীগণ ইহা বিচার করুন—তাঁহারা যাহাই হউন, হৃদয়হীনা হইতে পারিবেননা ইহাই আমার বিশ্বাস।

আমরা বলিয়াছি স্ত্রী স্বাধীনতা লইয়াও দেশে আন্দোলন হইতেছে; কিন্তু স্ত্রীশিক্ষায় যেমন কতক দূর ফল পাওয়া গিয়াছে, স্ত্রী স্বাধীনতায় সেরূপ হইতেছে না। কারণ একেতো বাঙ্গালী রমণীকে "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষিত যৌবনে। রক্ষতি স্থবিরে পুত্রঃ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" তাহাতে আবার (পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যদিগের মত) স্ত্রী স্বাধীনতার সপক্ষে ও বিপক্ষে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল এই দুই সম্প্রদায় আছেন। উদারনৈতিক সম্প্রদায়ের মত (সংক্ষিপ্ত) এইরূপ "স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচলিত না হওয়ায় দেশে স্ত্রীশিক্ষার সুফল ফলিতেছে না, অতএব স্ত্রী স্বাধীনতা এখনি প্রচলিত হউক, স্ত্রীজাতির শিক্ষাপথ সম্পূর্ণ প্রসারিত হউক। স্ত্রীলোকেরা জনসমাজে প্রকাশিত হউন; স্ত্রী পুরুষ পার্থক্য দূর হইয়া উভয়েই সমান অধিকার প্রাপ্ত হউন। চন্দ্র সূর্য্যের মত পবিত্র, নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক

ভাবে বিকসিত হইয়া উন্মুক্ত বায়ু, বিশুদ্ধ আলোক, জনাকীর্ণ নগর, নির্জ্জন কানন, দুরারোহ ভূধর, বিশাল সমুদ্র প্রভৃতি দর্শন, সদাশয় ব্যক্তিদিগের সহিত বাক্যালাপে সদুপদেশ ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ, জগতের নানাবিধ জাতির অবস্থা চক্ষে দেখিয়া পর্য্যালোচন, এবং সমাজ ও স্বদেশের মঙ্গলার্থে সভা সমিতিতে প্রকাশ্যরূপে যোগদান, প্রভৃতি দ্বারা মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, হৃদয় উন্নত হয়, ধর্ম্মে ভক্তি ও স্বদেশ বা সমাজের কল্যাণ চেষ্টায় প্রবৃত্তি জন্মে। পিঞ্জরাবদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় নিয়ত অন্তঃপুরবাসিনী ও শুভানুষ্ঠান পরিবর্জ্জিতা হওয়াতেই বঙ্গাঙ্গনাদিগের মনের অবস্থা ক্ষুদ্রতর; এই কারণেই তাঁহারা নুণটুকু তেলটুকু লইয়া গৃহের আত্মীয় ও প্রতিবাসীগণের সহিত বিবাদ বিসংবাদ করিতে অগ্রসর। স্ত্রীজাতির হীনতা পুরুষ জাতিকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে আক্রমণ করিয়াছে, তাই "দাদার ছেলেটী রুইমাছের মুড়া খাইয়াছে" সুতরাং কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথগন্ন হন (খ), অতএব যদি বাঙ্গালা দেশের উন্নতি করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বঙ্গমহিলাদিগকে উন্নত করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাঁহারা পুরুষদিগের শৈশবে পালনকর্ত্রী, বাল্যে সঙ্গিনী, যৌবনে সহধর্ম্মিণী, প্রৌঢ়ে গৃহিণী ও বার্দ্ধক্যে সেবিকা, চিরকালই যাঁহাদিগের সহিত পুরুষ জাতির বিশেষ সংস্রব রাখিতে হয়, তাঁহারা হীন অবস্থায় থাকিলে পুরুষেরাই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিগ্রস্ত হন। স্বাধীনতা অভাবে শিক্ষার কার্য্যকারিণী শক্তি থাকে না, স্বাধীনতা অভাবে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সদ্বৃত্তি সকল যথোচিতরূপে পরিস্ফুট হয় না; কার্য্যে ক্ষমতাহীন, মহদাশয়হীন, পশুর ন্যায় মানব কখনও মনুষ্যের সাহচর্য্য করিতে পারে না, অতএব স্ত্রীলোক উক্ত প্রকার অবস্থায় থাকিলে দেশে, সুমাতা, সুভগিনী, সুভার্য্যা, সুকন্যা কিছুই মিলিবে না, বাঙ্গালীরও জাতীয় উন্নতি কখনও হইবে না ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

অধ্যবসায়।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র।

বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, সম্পদ, ধর্ম্ম ও সুখ ইত্যাদি মনুষ্যের প্রার্থনীয় যে কোন বস্তু আছে, অধ্যবসায় সে সকলেরই প্রধান সাধন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, নেপোলিয়ন বোনাপার্টি, ওয়েলিংটন, বাল্মীকি, কালিদাস ও শিবজী প্রভৃতি যে অধ্যবসায়ের গুণে বড়লোক হইয়াছিলেন, মহারাজ বিশ্বামিত্র সেই অধ্যবসায়ের গুণে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হইয়াছি-

(খ) এ ঘটনাটি সত্য। কোন এক প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় পরিবারে ঐ কারণে স্বতন্ত্রতা জন্মিয়াছিল; [illegible] হাসিও আইসে, কান্নাও পায়।

লেন। প্রজাহিতনিরত প্রজাপতি-নন্দন কুশ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্র মহাবল ও ধার্ম্মিক কুশনাভ; কুশনাভের পুত্র গাধি, এই গাধির পুত্র খ্যাতনামা বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র যখন পিতৃসিংহাসনাসীন ছিলেন, তখন একদা সৈন্যাদি সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে নির্গত হইলেন, নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া আচমনীয় ও ফল মূল উপহার দিলেন, এবং অতিথি হইতে অনুরোধ করিলেন। বিশ্বামিত্র প্রথমতঃ বিনীতভাবে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিলেন না, অনন্তর বশিষ্ঠের যত্নাতিশয্য দর্শনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। মহামুনি বশিষ্ঠের শবলা নাম্নী একটী হোম-ধেনু ছিল, সেই হোম-ধেনুটীর দুগ্ধে তিনি নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সসৈন্য মহারাজা বিশ্বামিত্রকে সৎকার করিলেন। বিশ্বামিত্র এই দুগ্ধবতী সুন্দরী গাভীটী দেখিয়া বশিষ্ঠকে বলিলেন, "মহাত্মন্ আপনি এক লক্ষ পয়স্বিনী গাভীর বিনিময়ে আমাকে এই শবলা প্রদান করুন। শবলা রত্নস্বরূপা, রাজাও রত্নের অধিকারী, অতএব ঐ গাভী ন্যায়ানুসারে আমারই হইতেছে, উহা আপনি আমাকে প্রদান করুন।" বশিষ্ঠ শবলাকে দিতে অস্বীকৃত হইলে বিশ্বামিত্র ঐ গাভী বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া লইয়া চলিলেন। শবলা যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও বিশ্বামিত্রের লোকেরা তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। শবলা তখন দীননয়নে স্বীয় প্রভু বশিষ্ঠের মুখপানে চাহিয়া অশ্রুধারায় নিজ বদন প্লাবিত করিতে লাগিল। তপঃপরায়ণ ক্ষমাশীল বশিষ্ঠ কিন্তু কিছুই বলিলেন না। শবলা তখন হম্বা রবে তপোবন পরিপূর্ণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সেই উচ্চ হম্বা রব ও বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া আশ্রমের অদূরবর্ত্তী পহ্লব, যবন, শক, কাম্বোজ, বর্ব্বর, হারীত, কিরাত প্রভৃতি বশিষ্ঠভক্ত ম্লেচ্ছগণ যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া তপোবনে যথায় বিশ্বামিত্রের সেনাগণ বশিষ্ঠের গাভী হরণ করিতেছে, তথায় উপনীত হইয়া যুদ্ধার্থে বশিষ্ঠের অনুমতি প্রার্থনা করিল। বশিষ্ঠও শবলাকে যাইতে অনিচ্ছু ও কাতরা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিতচিত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ঐ ম্লেচ্ছগণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এখন বিশ্বামিত্র দেখিলেন যে তিনি যত সহজে গাভী হরণ করিবার আশা করিয়াছিলেন, তত সহজে ঐ গাভী হরণ করা ঘটিবে না। তিনি ভাবিয়াছিলেন বশিষ্ঠ নিঃসহায়, এখন বুঝিলেন যে তাঁহার ঐরূপ বোধ করা সম্পূর্ণ ভুল, অতএব তখন উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল, অব-

শেষে অসভ্য ম্লেচ্ছদিগের হস্তে বিশ্বামিত্রের কয়েকটী পুত্র নিহত হইলেন এবং বিশ্বামিত্রের হতাবশিষ্ট সেনাবল আর যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না; সুতরাং বিশ্বামিত্রের পরাজয় ও বশিষ্ঠের জয় হইল। পরাজিত বিশ্বামিত্র স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু হতপুত্রগণের শোক ও বশিষ্ঠসৈন্যকর্ত্তৃক নিজের পরাজয় রূপ অপমান তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। অবশেষে পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিয়া কিন্নর ও উরগগণ সেবিত হিমালয়ের পার্শ্বে গিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যায় মহাদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "তুমি কি জন্য তপস্যা করিতেছ, এবং কি চাহ ?" মহাদেব এইরূপ বলিলে বিশ্বামিত্র প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট উত্তম অস্ত্র ও তাহার প্রয়োগ শিক্ষা করিতে চাহিলেন, মহাদেবও তাহা দিয়া প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া, আগ্নেয় অস্ত্রাদি দ্বারা আশ্রমস্থ নিরীহ জীবদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। এবার বশিষ্ঠ আশ্রমস্থ নিরীহ জীবদিগকে হত, আহত ও ভয়াকুল দেখিয়া ক্ষুভিত জলধির ন্যায় আলোড়িত হইলেন এবং সচল আগ্নেয় গিরির ন্যায় যেন ক্রোধাগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে আশ্রমস্থ সকলকে অভয় প্রদান করিয়া দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "ক্ষত্রিয়াধম গাধিপুত্র! তোমার যত সামর্থ্য আছে, আমার প্রতি প্রয়োগ কর, আশ্রমস্থ নিরীহ জীবদিগকে কেন হনন করিতেছ? রে দুর্ম্মতে! কোথায় আমার সুমহৎ ব্রহ্ম বল, আর কোথায় ক্ষত্র বল! তুমি অদ্য আমার ব্রহ্মবল অবলোকন কর।" বশিষ্ঠ এই বলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। বিশ্বামিত্র মহাদেবকর্ত্তৃক প্রাপ্ত অস্ত্র সকল বশিষ্ঠের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; বশিষ্ঠও স্বীয় ব্রহ্ম দণ্ড দ্বারা ঐ সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া বিশ্বামিত্রকে পরাস্ত, দর্শকগণকে চমৎকৃত ও আশ্রমস্থ লোক সমূহকে আশ্বস্ত করিলেন। বিশ্বামিত্র নিগৃহীত ও ক্ষুব্ধ চিত্ত হইয়া ক্ষত্রিয় বলকে ধিক্কার দিলেন এবং ব্রহ্মবলকেই প্রকৃত বল বলিয়া মনে করিলেন; বলিলেন, "আমি প্রসন্নেন্দ্রিয় ও প্রহৃষ্টমানস হইলাম, এখন যে তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়, আমি তাদৃশ সুমহৎ তপ করিব।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বিশ্বামিত্র বহু দিবস ঘোর তপশ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎকট তপস্যা দর্শনে পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, "হে রাজন্! এই তপস্যার ফলে আমরা তোমাকে রাজর্ষি বলিয়া বোধ করিলাম।" বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইবার জন্যই তপস্যা করিতেছিলেন, সুতরাং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক রাজর্ষি বিবেচিত হওয়ায় সন্তোষ লাভ করিলেন না। তিনি পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে লাগিলেন।

পুনর্ব্বার পিতামহ আসিয়া বলিলেন, "তুমি স্বীয় অর্জ্জিত শুভ কর্ম্ম দ্বারা ঋষিত্ব লাভ করিলে।" কিন্তু তাহাতেও তিনি নিরস্ত না হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে মেনকা নাম্নী একটী স্বর্গ বেশ্যার ছলনায় ইনি দশ বৎসরকাল তপস্যা ভ্রষ্ট হইলেন, পরে বহুবিধ অনুতাপ করিয়া আবার ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সুমহৎ তপস্যায় বিশ্ব কম্পিত হইয়া উঠিলঃ পিতামহ এবার আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র মনে করিলেন যে তিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, এবং ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভো! আমার ইন্দ্রিয়গণ কি বিজিত হইয়াছে?" ব্রহ্মা বলিলেন, "না, তোমার ইন্দ্রিয়গণ আজও পরাজিত হয় নাই, ইন্দ্রিয় জয় করিতে যত্ন কর।" এই কথা বলিয়া পিতামহ প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র এখন বুঝিলেন যে তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ আজও পরাভূত হয় নাই, তখন তিনি বিশ্বকে কম্পিত করিয়া আবার সুমহৎ ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত রম্ভা নাম্নী অপ্সরা বিশ্বামিত্রের সেই তপস্যা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা পাওয়ায়, বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাস্তি প্রদান করিলেন। এই রূপে কোপ দ্বারা তাঁহার তপ অপহৃত হইলে তিনি সন্তাপিত হইয়া মনে কিছুমাত্র শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না, এবং বুঝিতে পারিলেন যে ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার বশে আইসে নাই। এবার তিনি দ্বিগুণ অধ্যবসায় সহকারে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখনও ক্রুদ্ধ হইবেন না এবং কাহাকেও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ কিম্বা শাস্তি প্রদান করিবেন না; এবং অনাহারী ও অনুচ্ছ্বাস হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার সেই ঘোর তপস্যা দর্শনে পিতামহপ্রমুখ সুরগণ আসিয়া বলিলেন, "কৌশিক বিশ্বামিত্র! তুমি ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলে, এখন যথাসুখে বিচরণ কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে চতুর্ব্বেদ, ওঁকার ও বষটকার আমাকে বরণ করুন্ এবং ক্ষত্র বেদবিৎ ব্রহ্মবেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ আমাকে "ব্রহ্মর্ষি" বলিয়া সম্ভাষণ করুন।" অনন্তর দেবতারা তাপস শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে ঐরূপ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বিশ্বামিত্রের সহিত সখ্য করিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, "তোমার অভীষ্ট সফল হউক।" সুরগণ বলিলেন, "তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ, তোমার মনোরথ সকলই সম্পন্ন হইতে পারে।" এই বলিয়া দেবগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিলে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে পূজা করিলেন এবং কৃতার্থ হইয়া তপস্যা-তৎপর থাকিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।*

বিশ্বামিত্র ক্রোধী, লোভী ও অন্যান্য

---

* পাঠান্তরে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ সংবাদের অন্য রূপ বর্ণনা আছে, কিন্তু প্রস্তাবের মূল কথা বিশ্বামিত্রের অধ্যবসায় সম্বন্ধে বিসম্বাদ নাই। বা,বো, স।

ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়াও অধ্যবসায় গুণে ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করতঃ সাধু চরিত্র ও বিশ্বমিত্র ব্রহ্মর্ষি হইয়া স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। "সাধনাতে সিদ্ধি" ইনি এই বাক্যের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারিলে অধ্যবসায় গুণে আমরাও আমাদের চরিত্রের দোষ সকল সংশোধন ও আত্মোন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া জীবনের মহোদ্দেশ্য সফল করিতে পারি।

কু, রা।

সতীধর্ম্ম।

৭ম প্রবন্ধ।

(দাম্পত্যই ত্রিবর্গের মূল)

পুরোহিত। "ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ম্"—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে তুমি কদাচ ইহাঁকে (বধূকে) উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিতে পারিবে না।

বর। "নাতিচরামি"—কখনই উল্লঙ্ঘন করিব না।

রাজকুমার কুবলয়াশ্ব যখন মদালসাকে বিবাহ করিয়া আনেন, তখন মদালসার সখী কুণ্ডলা রাজকুমারকে বিদায় দিবার সময় বলিয়াছিলেন,—হে প্রিয়দর্শন কুমার! আপনার প্রজ্ঞা অসীম, আমা হেন স্বল্পবুদ্ধি অবলা আপনাকে আর কি উপদেশ দিবে। অতএব আপনাকে উপদেশ দিতেছি না, আমার প্রিয়সখীর স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াই বলিতেছি ;—

"ভর্ত্তব্যা রক্ষিতব্যা চ ভার্য্যা হি পতিনা সদা।
ধর্ম্মার্থকামসংসিদ্ধ্যৈ ভার্য্যা ভর্ত্তৃসহায়িনী ॥১॥
যদা ভার্য্যা চ ভর্ত্তা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গতম্ ॥২॥
কথং ভার্য্যামৃতে ধর্ম্মমর্থং বা পুরুষঃ প্রভো!।
প্রাপ্নোতি কামমথবা তস্যাং ত্রিতয়মাহিতম্ ॥৩॥
তথৈব ভর্ত্তারমৃতে ভার্য্যা ধর্ম্মাদিসাধনে।
ন সমর্থা ত্রিবর্গোঽয়ং দাম্পত্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৪॥
দেবতাপিতৃভৃত্যানামতিথীনাঞ্চ পূজনম্।
ন পুংভিঃ শক্যতে কর্ত্তুমৃতে ভার্য্যাং নৃপাত্মজ ॥৫॥
প্রাপ্তোঽপি চার্থো মনুজৈরানীতোঽপি নিজং গৃহম্
ক্ষয়মেতি বিনা ভার্য্যাং কুভার্য্যাসংশ্রয়েঽপিবা ॥৬॥
কামস্তু তস্য নৈবাস্তি প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে।
দম্পত্যোঃ সহধর্ম্মেণ ত্রয়ীধর্ম্মমবাপ্নুয়াৎ ॥৭॥
পিতৄন্ পুত্রৈস্তথৈবান্নসাধনৈরতিথীন্ নরঃ।
পূজাভিরমরাংস্তদ্বৎ সাধ্বীং ভার্য্যাং নরোঽবতি ॥৮॥
স্ত্রিয়াশ্চাপি বিনা ভর্ত্রা ধর্ম্মকামার্থসন্ততিঃ।
নৈব তস্মাৎ ত্রিবর্গোঽয়ং দাম্পত্যমধিগচ্ছতি ॥৯॥
এতন্ময়োক্তং যুবয়োর্গচ্ছামি চ যথেপ্সিতম্।
বর্দ্ধ ত্বমনয়া সার্দ্ধং ধনপুত্রসুখায়ুষা ॥১০॥"

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

—পতিই ভার্য্যাকে সদা ভরণ ও রক্ষণ করিবে ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সামঞ্জস্যভাবে সাধনার বিষয়ে ভার্য্যাই পতির একমাত্র সহায়।১। যথায় পতি ও পত্নী পরস্পরের বশতাপন্ন, তথায়

ত্রিবেণীর ন্যায় ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম তিনটীই একত্র মিলিত হয়। ।২। ভার্য্যা নহিলে পুরুষ কিরূপে ত্রিবর্গ লাভ করিবে? পুরুষের ত্রিবর্গ ভার্য্যা-মূলেই অবস্থিত।৩। সেইরূপ পতি নহিলে ভার্য্যাও ত্রিবর্গের সাধনে সমর্থ হয় না; উভয়ের ত্রিবর্গ দাম্পত্য-মূলেই প্রতিষ্ঠিত।৪। হে রাজকুমার! স্ত্রী না থাকিলে পুরুষ দেবতা, পিতৃলোক, ভৃত্যবর্গ ও অতিথি প্রভৃতির সেবা করিতে কখনই পারে না।৫। অর্থ হস্তগত করিলেও এবং তাহা গৃহে আনিলেও, যদি তাহার ভার্য্যা না থাকে, অথবা কুভার্য্যা থাকে, তবে তাহার সে ধন কড়ি উড়ে পুড়ে যায়।৬। ভার্য্যাহীন পুরুষের যে পবিত্র কামভোগে অধিকার নাই, সে ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই তিনটীই দম্পতীর পরস্পর সাহায্যসাপেক্ষ।৭। সন্তান উৎপাদন দ্বারা পিতৃলোকের, অন্ন দান দ্বারা অতিথি পরিজনের এবং পূজা দ্বারা দেবতার প্রীতিসাধনের জন্যই পুরুষ সাধ্বী ভার্য্যাকে পরম যত্নে রক্ষা করেন।৮। স্বামী বিনা স্ত্রীরও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও সন্তান লাভ হয় না, অতএব এই ত্রিবর্গ একমাত্র দম্পতীকেই আশ্রয় করিয়া আছে।৯। আমি আপনাদের উভয়কে এই কথা বলিলাম। এখন আমি চলিলাম; হে রাজকুমার! আপনি এই পত্নীর সহিত ধন, পুত্র, সুখ ও দীর্ঘ জীবন সম্ভোগ পূর্ব্বক দিন দিন পরমোন্নতি লাভ করুন।১০।

বহুবিবাহ দাম্পত্য অধিকারের অন্তর্ভূত নহে। বহুবিবাহের সঙ্গে দাম্পত্য ধর্ম্মের কোনও সম্পর্কই নাই। যাহারা বহুবিবাহ করে, তাহারা রত্ন বলিয়া কাচ ক্রয় করে। "অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ"—যাহা সুখে, দুঃখে, নির্ব্বিকার, সকল অবস্থাতেই অনুকূল, সেই প্রেম 'একে' ভিন্ন 'দুয়ে' হয় না। এজন্য সীতা রাম, সাবিত্রী সত্যবান্ জগতে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ। রাম সীতাকে বনবাস দিলেন। সকলেই ভাবিল, হায়! সীতার ন্যায় অভাগিনী বুঝি কেহই নয়! কিন্তু,—

"শ্লাঘ্যস্ত্যাগোঽপি বৈদেহ্যাঃ পত্যুঃ প্রাগ্‌বংশবাসিনঃ।
অনন্যজানেঃ সৈবাসীদ্ যস্মাজ্জায়া হিরণ্ময়ী।"

(রঘুবংশ, ১৫শ সর্গ, ৬১ শ্লোক)

রাম যে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেও সীতার শ্লাঘার কথা, কেন না, তাঁহারই স্বর্ণময়ী প্রতিমা যজ্ঞদীক্ষিত দারান্তরশূন্য রামের একমাত্র সহধর্ম্মচারিণী হইয়াছিলেন। কথিত আছে,—সীতা যখন শুনিলেন যে তাঁহারই স্বর্ণপ্রতিমা পতির মহাযজ্ঞের একমাত্র সহায়, তখন তিনি সকল দুঃখই ভুলিয়া গেলেন এবং আপনাকে পতিসৌভাগ্যবতীগণের মধ্যে ধন্যা বলিয়া জ্ঞান করিলেন। সীতা জানিতেন রাম লোকাপবাদভয়ে এবং অবশ্য কর্ত্তব্য প্রজারঞ্জনের অনুরোধে তাঁহাকে গৃহ হইতেই অন্তর করিয়াছেন, তাঁহাকে হৃদয় হইতে অন্তর করেন নাই;—

"কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা।
ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ॥"
(রঘুবংশ, ১৪শ সর্গ, ৮৪ শ্লোক)

স্বারোচি নামক মনু বহু স্ত্রী বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি একদা স্ত্রীগণকে লইয়া কোনও বনমধ্যে বিহার করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া এক রাজহংসী স্বারোচির দাম্পত্যসুখের প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া এক চক্রবাকী কহিল,—সখি রাজহংসি!—

"নায়ং ধন্যো যতো লজ্জা নান্যস্ত্রীসন্নিকর্ষতঃ।
অন্যাং স্ত্রিয়মযং ভুঙ্‌ক্তে ন সর্ব্বাস্বস্য মানসম্॥১॥
চিত্তানুরাগ একস্মিন্নধিষ্ঠানে যতঃ সখি।
ততোহি প্রীতিমানেষ ভার্য্যাসু ভবিতা কথম্॥২॥
এতা ন দয়িতাঃ পত্যুর্নৈতাসাং দয়িতঃ পতিঃ।
বিনোদমাত্রমেবৈতা যথা পরিজনোহপরঃ॥৩॥
এতাসাঞ্চ যদীষ্টোহয়ং তৎ কিং প্রাণান্ ন মুঞ্চতি।
আলিঙ্গত্যপরাং কান্তাং ধ্যাতো বৈ কান্তয়ান্যয়া॥৪॥
রূপপ্রদানমূল্যেন বিক্রীতো হ্যেষ দাসবৎ।
প্রবর্ত্ততে নহি প্রেম সমং বহ্বীষু তিষ্ঠতি॥৫॥
কলহংসি! পতির্ধন্যো মম ধন্যাহমেব চ।
যস্যৈকস্যাশ্চিরং চিত্তং যস্যাশ্চৈকত্র সংস্থিতিঃ॥৬॥
একা ত্বনেকানুগতা তথা হাস্যাস্পদং জনে।
অনেকাভিস্তথৈবৈকো ভোগদৃষ্ট্যা নিরীক্ষিতঃ॥৭॥
তস্য ধর্ম্মক্রিয়াহানিরহন্যহনি জায়তে।
সক্তোহন্যভার্য্যয়া চান্যকামাসক্তঃ সদৈব সঃ"॥৮॥
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

এই বহুদারবিহারী ব্যক্তি কখনও শ্লাঘ্য নহে, এ যখন অন্য স্ত্রীর সমক্ষে অপরের সহিত ভোগাসক্ত হইতেছে, তখন ইহার ন্যায় নির্লজ্জ আর নাই।১। সখি! চিত্তের অনুরাগ সেই একমাত্র আধারেই থাকিতে পারে, তবে এ ব্যক্তির সকলের প্রতি সেই অদ্বৈত অনুরাগ কিরূপে সম্ভবে?।২। এই স্ত্রীরাও পতির প্রণয়পাত্রী নহে, আর পতিও এই সকল স্ত্রীর প্রণয়পাত্রী নহে; দাস দাসী প্রভৃতির ন্যায় ইহারা কেবল ভোগেরই সহায়।৩। যদি ইহারা সত্য-সত্যই পতিকে ভাল বাসিত, তবে সেই ধ্যেয় বস্তু পতিকে অন্যে আলিঙ্গন করিতেছে দেখিয়া প্রাণত্যাগ করে না কেন?।৪। মূল্য দিয়া দাস ক্রয় করার ন্যায় ইহারা রূপ দিয়া এই ব্যক্তিকে কিনিয়াছে; অদ্বৈত প্রেম কদাচ বহু আধারে থাকিতে পারে না।৫। সখি রাজহংসি! আমার পতিই ধন্য আর আমিই ধন্য! তিনিও আমা ভিন্ন জানেন না, আমিও তাঁহা ভিন্ন জানি না।৬। বহুতে আসক্তা স্ত্রীর ভালবাসা যেমন, বহুতে আসক্ত পুরুষেরও ভালবাসা তেমনি হাস্যকর; ইহারা কেবল ভোগ-দৃষ্টিতেই পরস্পরকে দর্শন করে।৭। যথায় প্রণয়ের এরূপ ব্যভিচার ঘটে, তথায় অহরহ ধর্ম্মকর্ম্মসকল লোপ পাইতে থাকে।৮।

সামঞ্জস্য ভাবে (১) ত্রিবর্গের সাধনাই যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে বহু-বিবাহ কদাচ বিবাহবিধির অধিকার-ভুক্ত হইতে পারে না। অতএব ঐ দূষিত বহুবিবাহ উঠিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে আর এক নূতন বহুবিবাহ প্রচলিত হউক, সমস্ত মানবমণ্ডলী সেই একমাত্র বরণীয় ব্রহ্মাণ্ডপতিকে বরমাল্য প্রদান করুক। এ বহুবিবাহে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, কলহ ও অশান্তির সম্ভাবনা নাই, কেন না, প্রত্যেকেই মনে করিবে, সেই প্রাণেশ্বর আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। সমস্ত নদ নদী একমাত্র মহাসমুদ্রের বক্ষেই সমান স্থান পায়।

(১) 'সামঞ্জস্য ভাবে'—ধর্ম্মের অবিরোধে।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

নূতন সংবাদ।

১। ইউরোপের মধ্যে রুসিয়া সভ্যতা অংশে হীন বলিয়া পরিচিত, কিন্তু এখানে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক। রুসীয় স্ত্রীলোকেরা ডাক্তার, শিক্ষক আছেন, আবার নিম্নস্থ শাসন কর্ত্তৃপদে অনেকে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। জর্ম্মণিতে স্ত্রী-স্বাধীনতা অল্প। কিন্তু আজি কালি কোন কোন বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের, পুরুষদিগের সহিত তুল্যাধিকার দেওয়া হইতেছে। ব্যায়ামশালা স্ত্রীলোকদিগের জন্যও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

২। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বিদ্যাসাগর স্মরণ ফণ্ডে কুচবিহারের মাহারাজা আড়াই হাজার ও কুমার বিনয়কৃষ্ণ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৩। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার অনেক বৈষম্য দেখা যায়। সম্প্রতি গণনাদ্বারা স্থির হইয়াছে ইংলণ্ডে প্রতি হাজার ৫৮টী স্ত্রীলোক অধিক, সুইটজর্লণ্ডে ৪৬, স্পেনে ৪৪, পর্টুগালে ৪১, জর্ম্মণিতে ৩৫, ডেন্মার্কে ৩২, এবং ফ্রান্সে ৮টী অধিক। ইটালিতে হাজার পুরুষে স্ত্রীলোক ৯৮৫ এবং বেলজিয়মে ৯৫০ জন মাত্র। আফ্রিকা, আমেরিকা, এসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়াতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম—হাজার করা যথাক্রমে ৯৯০, ৯৭৭, ৯৪৪ ও ৮১২ মাত্র।

বামারচনা।

শরৎ যামিনী।

অই যে দেখিতে পাই নির্ম্মল আকাশ,
কোন ঠাঁই নাই বিন্দু নীরদ কালিমা;
খেলেনা চপলা দাম—হয় না প্রকাশ,
বিরাজিছে তারা সহ শারদ চন্দ্রমা। ১

কুমুদিনী জলাশয়ে সমুন্নত শিরে,
প্রিয়মুখ বিলোকনে হয়ে বিকসিত,
আনন্দে মারুত মন্দে দোলে ধীরে ধীরে,
কৌমুদী তরঙ্গে দেখে জগৎ প্লাবিত। ২

শশধর দরশনে চকোর চকোরী
পাদপ শাখার আসি বসিয়া নির্জ্জনে;
কত অনুরাগে তারা অজস্র আচরি
করিছে চন্দ্রিকা পান প্রফুল্লিত মনে। ৩

ঝিল্লীগণ মনসুখে বিবরে থাকিয়া,
পরিশ্রান্ত জীবগণে করিয়া মোহিত,
নীরব মেদিনী পরে সুতান ছাড়িয়া
ঝিঁঝীরবে চন্দ্রালোকে গাইছে সংগীত। ৪

সরোজিনী সরোবরে বিষণ্ণ বদনে,
হারাইয়া দিবা অন্তে প্রিয় প্রাণেশ্বরে,
ঢাকিয়া নয়ন মণি দল আবরণে,
ধরিয়াছে শোকচিহ্ন কম কলেবরে। ৫ *

শ্রীঅছিমন্নেসা খাতুন ছিদ্দিকা।

* কবিতার দুই এক স্থান সংশোধিত হইল। আহাহউক মুসলমান রমণীগণ বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিয়া সুন্দর কবিতা লিখিতেছেন, ইহা বড় পর নাই আনন্দের বিষয়। বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৩ সংখ্যা | অগ্রহায়ণ ১২৯৮—ডিসেম্বর ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ঝটিকা ও স্ত্রীলোকের দয়া— সে দিবস কলিকাতা অঞ্চলে যে ঝটিকার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, আণ্ডামান দ্বীপে তাহার প্রবল পরাক্রম প্রকাশিত হইয়াছে। তথায় বাটী চাপা পড়িয়া ৬০ জন কয়েদী মৃত ও প্রায় ২০০ জন আহত হইয়াছে। তীরস্থ নৌকাদি এককালে ধ্বংস হইয়াছে। বন্দরে "এণ্টারপ্রাইজ" নামক একখানি জাহাজ ৭৭ জন আরোহীর সহিত জলমগ্ন হয়, তন্মধ্যে ৬ জন মাত্র ভগ্ন কাষ্ঠাদি অবলম্বনে কোনরূপে প্রাণরক্ষা করে, কিন্তু তাহারা তীরে উঠিতে গিয়া ভীষণ তরঙ্গাঘাতে প্রতিহত হইতে থাকে। এই সময় কয়েকটী স্ত্রী দার-মাল হাত ধরাধরি করিয়া তরঙ্গ ঠেলিয়া জলমগ্নপ্রায় লোক কয়েকটীর নিকট আসিল এবং তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল। নারীর প্রাণ কখনও দয়াশূন্য হয় না।

মাদকতা নিবারণ চেষ্টা— আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ইংলণ্ডে ওয়েষ্টহাম নিবাসিনী ৫১৬৩টী রমণী তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট যেন মদ ও অহিফেন ব্যবহারে আর সহায়তা না করেন।

ভারত পৃথিবীর ষষ্ঠাংশ— বোম্বাই গার্ডিয়ান লিখিয়াছেন পৃথিবীতে সদ্যোজাত প্রত্যেক ৬টী শিশুর মধ্যে ভারতে ১টী জন্মে, ৬টী নিরাশ্রয় বালিকার মধ্যে ভারতে ১টী ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রত্যেক ৬টী বিধবার মধ্যে ১টী হাহাকার করে এবং প্রত্যেক ৬টী

মৃত পুরুষের মধ্যে ভারত হইতে ১টী অনন্তধামে যাত্রা করে। ভারতমাতার মত দুঃখিনী কে?

ভিন্ন ভিন্ন দেশে বেলার পরিমাণ—জর্ম্মণির হাম্বর্গ প্রদেশে দীর্ঘতম দিন ১৭ ঘণ্টা, ষ্টকহলমে ১৮৷৷, সেণ্ট-পিটার্সবর্গে ১৯, ফিনলণ্ডে ২১৷৷ ঘণ্টা। নরওয়ে দেশের উত্তর ভাগে ২১ এ মে হইতে ২রা জুলাই পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১৷৷ মাস ক্রমাগত দিন, এ সময়ের মধ্যে সূর্য্য আর অস্ত যায় না। উত্তর কেন্দ্রের নিকট গ্রীষ্মকালে দিবা ৬ মাস ও শীতকালে রাত্রি ৬ মাস হইবে আশ্চর্য্য কি?

কাশ্মীরের নূতন বন্দোবস্ত—লর্ড ল্যান্সডাউন সস্ত্রীক ভূস্বর্গ কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। রাজা প্রতাপ সিংহ এত দিন পদচ্যুত ছিলেন, এখন তিনি তথাকার কৌন্সিলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

রয়াল্ রেড ক্রশ—আমাদিগের সুযোগ্য প্রধান সেনাপতির পত্নী লেডি রবার্টস আহত ও পীড়িত সেনাদিগের প্রতি দয়াশীলতার জন্য এই রাজসম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব—বর্ত্তমান সময়ে থিয়জফীর আকারে বৌদ্ধধর্ম্ম, ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতের অনেক কৃতবিদ্য লোককে স্বদলভুক্ত করিয়াছে। বুদ্ধ গয়ায় কিছু দিন হইল চিন, জাপান, সিংহল ও ভারতের বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণের এক সমিতি হয়, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বুদ্ধগয়া মন্দির প্রার্থনা করিয়াছেন এবং ইহার নিকট জমি কিনিয়া এক বৌদ্ধাশ্রম স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

জাপানে ভূমিকম্প—সম্প্রতি এক ভূমিকম্পে জাপানদ্বীপে ৪০০০ লোক হত ও ৫০০০ আহত হইয়াছে। ৫০০০০ পাকা বাড়ী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। "মারে গোঁসাই রাখে কে?"

রুমানিয়ার রাজ্ঞী এলিজেবেথ্।

সভ্যজগতের বিদ্বন্মণ্ডলীতে ইনি কবি কারমেন্ সিলভার নামে পরিচিতা। এলিজেবেথ, উইর্ডের মৃত রাজপুত্র হারম্যানের কন্যা। জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের অন্তঃপাতী নিউইড নামক স্থানে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। কৌমারেই কবিত্ব শক্তির পরিচয় দেন,—দশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই অবলীলাক্রমে ছন্দোরচনা করেন এবং অতি তরুণাবস্থা হইতে সুবিখ্যাত লেখক, কবি, শিল্পী ও পণ্ডিতগণের নিকট পরিচিতা হন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে ইনি শিক্ষণীয় সকল বিষয়ে বিশেষ বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করেন এবং অধুনাতন ও

পূর্ব্বকালীন ভাষা সমূহে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কবি রুম্যানিয়ার রাজপুত্র চালার্সের সহিত পরিণীতা হন এবং ১৮৮১ সালের ২২মে তারিখে রাজ্ঞী উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক খণ্ড উপন্যাস ও কবিতা রুম্যানিয়া ভাষা হইতে জর্ম্মণ-ভাষায় প্রকাশ করেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান ১৮৭৪ সালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। রাজ্ঞী এই অতীব শোচনীয় ঘটনোপলক্ষে যে কবিতাগুলি রচনা করেন, সে গুলি অতি উৎকৃষ্ট। তৎসমুদয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় বিশেষরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। হেলেন ভেকারেস্কো ইহাঁর প্রাচীনা পরিচারিকা। ইনিও রাজ্ঞী এলিজেবেথের মত গুণশালিনী কবি। রাণী চান ইহাঁর সহিত স্বপুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী ফার্ডিনাণ্ডের বিবাহ হয়। সদস্য বর্গ চান এ বিবাহ না হয়। এই বিষয় লইয়া এখন রুম্যানিয়ায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। মন্ত্রিগণ বলিতেছেন যে, একাধারে এরূপ রাজ্যভার ও অলৌকিকী কবিত্ব শক্তি থাকা শ্রেয়স্কর নহে। ইহাতে রাজ্যের বিপদ ব্যতীত মঙ্গল হইতে পারে না। তাঁহারা আরও বলিতেছেন যে, বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে রুম্যানিয়া রাজ্যে যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল পুনর্ব্বার তাহা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। রাণী অনুনয় বিনয় করিয়াও—এমন কি প্রধান মন্ত্রীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাজপুত্রকে ইত্যবসরে জর্ম্মণিতে পাঠান হইয়াছে। এইত অবস্থা। আবার দেখ রাণী মৃত্যুশয্যায় রহিয়াছেন। বকারেষ্ট নগরের রাজপ্রাসাদে ইনি এক্ষণে অবস্থিতি করিতেছেন। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত অবস্থা বড় মন্দ ছিল। ঈশ্বর এরূপ প্রতিভাশালিনী রমণীকে দীর্ঘজীবিনী করুন্ এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

আর্য্যমহিলা।

পার্ব্বতী।

সংস্কৃতে উক্ত হইয়াছে "দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা"—আমরা বুঝিতে পারি যদি মহাত্মাদিগের ভার্য্যাগণ সর্ব্বতোভাবে স্বামীর অনুরূপ হইতে পারেন, তাহা হইলে আর স্বতন্ত্র স্বর্গ অন্বেষণ করিতে হয় না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল্, লর্ড গ্লাডষ্টোন ও জেনারেল বুথ হইতে এ বিষয়ে আমরা অনেক শিক্ষা পাইতে পারি। কিন্তু এই সকল মহাত্মা যে ভাগ্যবান্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,

সেই জাতির অস্তিত্ব যখন জগতের অগোচর, তখনই ভারতে এক দেব দম্পতীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহারাই হিন্দু সম্প্রদায়ে "হর পার্ব্বতী" বলিয়া পূজিত হইতেছেন। হর পার্ব্বতী হিন্দু সম্প্রদায়ে আদর্শ দম্পতী। উভয়ের হৃদয়ের যেরূপ বিনিময় হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়াই গুণগ্রাহী আর্য্যগণ মহাদেবের "অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি" কল্পনা করেন। †

"যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

প্রকৃত পক্ষে এ মহা শপথ হর পার্ব্বতীতেই সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইয়াছিল। হর পার্ব্বতীর চরিত্র আলোচনা করিলে "পরিণয় দুর্ব্বলের পক্ষে পাশস্বরূপ, সবলের পক্ষে মুক্তির সোপান" একথা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। হরগৌরীর দাম্পত্য প্রণয়ে নিষ্কাম ধর্ম্মচর্য্যা ও বিশ্ব প্রেমিকতা বিদ্যমান। তাই হিন্দুর অনেক ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশে মহাদেব বক্তা ও পার্ব্বতী শ্রোত্রী। ইহাই দাম্পত্য জীবনের চরম উৎকর্ষ। যে মেয়ে কেবল পতিপরায়ণা তাঁহাকে সুভার্য্যা বলিতে পারি না, যে মেয়ে কেবল সুগৃহিণী তাঁহাকেও সুভার্য্যা বলিতে পারি না, যিনি স্বামীর ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী, কর্ম্মে সহকর্ম্মিণী ও সর্ব্বতোভাবে সহযোগিনী, স্বামীর ভিতরে যিনি অনুপ্রবিষ্টা, তিনিই প্রকৃত আদর্শ ভার্য্যা। এই সকল বিষয়ে পার্ব্বতী-চরিত্র সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণ। তাই পার্ব্বতী গুণগ্রাহী হিন্দুর গৃহে "সর্ব্বার্থসাধিকা দেবী" বলিয়া পূজিতা! এমন দেবীকে পূজা করিলে মানব জন্ম সফল হয়, এই জন্য আমরা অযোগ্যতা সত্ত্বেও পার্ব্বতীর পুণ্যময় চরিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, আমাদের অপূর্ণ প্রতিভা প্রতিহত হইলেও পার্ব্বতী-জীবন কোন ক্রমে অসম্পূর্ণ নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগকে, পার্ব্বতী চরিত্র সংগ্রহ করিতে পুরাণ ও কাব্যাদির আশ্রয় লইতে হইতেছে, আর্য্যদিগের প্রকৃত ইতিহাসের অভাবই ইহার কারণ। যাহাহউক এই পুরাণ ও কাব্যাদিতে পার্ব্বতী যে রূপ বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা ভারত মহিলাদিগের "আদর্শ" স্বরূপ হইতে পারে।

পার্ব্বতী দেবী গিরিরাজ-তনয়া। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে অনুমিত হয়, গিরিরাজ পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা ছিলেন বলিয়া আর্য্যগণ গৌরবার্থে তাঁহাকে "হিমালয়" আখ্যা দিয়া থাকিবেন। যাহাহউক পার্ব্বতী এই গিরিরাজের পত্নী মেনকার অষ্টম গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সন্তানদিগের মধ্যে মৈনাক, একপর্ণা, দ্বিপর্ণা প্রভৃতি পুত্রকন্যার নাম জানা যায়। পার্ব্বতী পিতা মাতার যেরূপ "সর্ব্বস্ব ধন" ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে

† অর্দ্ধ নারীশ্বর বিষয়ে যিনি আমাদের কথা অবিশ্বাস করেন, তিনি ১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারত পত্রে "ব্রহ্মময়ী" স্তোত্র দেখিতে পারেন।

সন্তান বলিয়াও বিবেচনা হয়। মৃত-বৎসার সন্তান বলিয়াই হউক, অথবা সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তানটীর প্রতি পিতা মাতার মমতা কিছু বেশী বলিয়াই হউক, পার্ব্বতী পিতা মাতার বড় "আদরের মেয়ে" ছিলেন। এই কারণে তাঁহার "উমা, গৌরী, হৈমবতী" প্রভৃতি আরও অনেক নামও ছিল। পার্ব্বতী যে অতি সুবোধ ও সুশীলা ছিলেন, তাহা তাঁহার বাল্যজীবনের যে টুকু বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতেই বুঝা যায়। বস্তুত: "সুকন্যা" নামের উপযুক্ত।

পার্ব্বতী যখন বালিকা, তখন মহাদেব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। সতীর দেহত্যাগের পরেই পার্ব্বতীর জন্ম হইয়াছিল। মহাদেবের দেবোচিত গুণ গ্রামের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এই গুণের কথা শুনিয়াই পার্ব্বতী অতি বাল্যকাল হইতে আদর্শ পুরুষ মহাদেবকে একান্ত ভক্তি করিতেন। কথিত আছে বালিক খেলা ধূলা ছাড়িয়া শিবপূজাতেই রত থাকিতেন। শিবের নাম শুনিলে তিনি বিশুদ্ধ ভক্তি-ভাবে প্রণোদিত হইয়া আত্ম-বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। এই কারণে অনেকের বিশ্বাস ছিল "সতী"ই পার্ব্বতীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন!" আমরাও এইখানে পার্ব্বতীর অলৌকিক গুণানুরাগের পরিচয় পাইতেছি।

পার্ব্বতীর বয়স যত বাড়িতে লাগিল, শিব-ভক্তিও তত বাড়িতে লাগিল। পার্ব্বতী যখন তরুণবয়স্কা বালিকা, সেই সময়ে সতী-বিয়োগ-কাতর মহাদেব হিমালয়ে তপস্যা করিতে আসিলেন। মহাদেব প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণীর বিয়োগে ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বিশ্ব-হিত-ব্রতে নিযুক্ত হইয়াছেন। মহাদেব, সতী বর্ত্তমানে গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসীর ন্যায় ত্যাগস্বীকার-পরায়ণ, আবার ত্যাগী হইয়াও দাম্পত্য প্রণয়ের আদর্শ। মহাদেবের ভোগ-বাসনা পরিত্যাগের জন্যেই তিনি দক্ষাদির নিকটে নিন্দিত; সেই ঘৃণার জন্যেই সতী আত্মঘাতিনী; সতীর মৃত্যুর পরেই সেই আত্মত্যাগী মহাদেব ভার্য্যার শব-দেহ লইয়া উন্মত্ত! শিশু মৃত হইলে মা তাহাকে ছাড়িয়া দেন, স্বামী মৃত হইলে ভার্য্যা তাঁহাকে—যেমন করিয়াই হউক বিদায় দেন, কিন্তু মহাদেব তাঁহার সতীর দেহ "শব" বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই! কোম্‌ত ক্লোটিডাকে পূজা করিয়াছেন, শুনিয়া আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু মহাদেব তাহার বহুকাল পূর্ব্বে সতীর উদ্দেশে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! এ দেবোচিত অনুরাগ কেবল মহাদেবেই সম্ভবে! এমন স্বামীর জন্যে প্রাণত্যাগ করিয়াই সতীর স্বর্গলাভ হইয়াছে! আমার ইহাও বলি, প্রতিপ্রাণা সতীর জন্যে এইরূপ ত্যাগস্বীকার না করিলে, মহাদেবের সহস্র দেবত্ব সত্বেও হৃদয়হীনতা অনুভব করিতে হইত, কিন্তু সে দেবতা সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণ।

যাহাহউক মহাদেবকে হিমালয়ে

তপস্যা করিতে দেখিয়া পার্ব্বতী এক পবিত্র সংকল্প করিলেন। সে কল্প কি? মহাদেবের চরণ সেবা করা। শিব পার্ব্বতীর নিকটে আদর্শ দেবতা-রূপে পূজিত ছিলেন, তাই শিবের সেবিকা হইতে পার্ব্বতী-হৃদয় ব্যগ্র হইল।

পার্ব্বতী পিতার নিকটে মনোভাব প্রকাশ করিলেন। পিতা দুহিতার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তিনি জানেন মহাদেব দেবতা; মহাদেব ভোগ-সুখ-প্রিয় সুকুমার নহেন; মহাদেব দুর্ব্বল চেতা তরুণ বয়স্ক পুরুষ নহেন; মহাদেব আত্মসংযমী যোগী, পরব্রহ্ম পরায়ণ সাধু এবং আদর্শ চরিত্রবান্ দেবতা। তাঁহার সাহচর্য্যে পার্ব্বতীর জীবন ধন্য হইবে। স্পর্শমণির সহযোগে লৌহও যেরূপ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সাধু পুরুষ বা সাধ্বী রমণীর সাহচর্য্যে সেইরূপ পঙ্কিল হৃদয়ও দেবত্ব লাভ করিতে পারে। এই সকল মনে করিয়া পিতা তাঁহার স্নেহের মুকুলটীকে মহাদেবের চরণে সংস্থাপিত করিলেন। পার্ব্বতী, শিবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শিব-চরিত্র বিচিত্র, শিব-চরিত্র অতুল। পার্ব্বতী বালিকা হইলেও তাঁহার গুণগ্রাহিতা শক্তি অলৌকিক। তাই মহাদেবের চরণ-প্রান্তে বসিয়া পার্ব্বতী তাঁহার যতই গুণের পরিচয় পাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এই সময়ে পাঠিকা-ভগিনী মনে করিবেন, পার্ব্বতী কুমারী, মহাদেব মৃতদার। পার্ব্বতীর মনে হইল, এই আত্মসংযমী বিশ্ব-প্রেমিক দেবতার সহধর্ম্মিণী হইতে পারিলেই তাঁহার জীবন সফল হয়। এই দেবতা যদি পার্ব্বতীর জীবনের পরিচালক হন, তাহা হইলেই এই জীবন-কলিকা উপযুক্ত রূপে বিকাস পাইতে পারে। এই খানে বালিকা পার্ব্বতী ও অন্য রমণীর ইতর বিশেষ সহজে বুঝা যায়! ইন্দ্রাদি দেবতার প্রতি অনুরক্ত হওয়া অনেকের পক্ষে সহজ, কিন্তু পার্ব্বতীর মত হৃদয় না থাকিলে নিবৃত্তি-পরায়ণ সন্ন্যাসী মহাদেবের মূল্য কেহই বুঝিতে পারে না! এই জটা-বিলম্বিত ভস্মাচ্ছাদিত দেহের অভ্যন্তরে যে কি মহত্ব কি দেবত্ব বিরাজমান, তাহা বুঝিতে পারা সামান্য শক্তির কার্য্য নহে! অথচ পার্ব্বতী বালিকা! (এই জন্যেই বুঝি লোকে কথায় বলে "মূলা কত বড় হবে, তাহা প্রথম পাতায়ই বোঝা যায়"।) আর পার্ব্বতীর পতি-ভক্তিই বল, আর পতি-প্রেম বল, পার্ব্বতীর যে অনুরাগ এক সময়ে "আদর্শ" হইয়া উঠিবে, তাহা প্রথমে আমরা দেখিতেছি—গোড়ার দিকে ভক্তি, আগার দিকে ভালবাসা; ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া ভালবাসা দাঁড়াইয়াছে। রমণীর দেবতাও স্বামী, তাই ভালবাসার মূলে ভক্তিভাব চাই, এই রকম ভালবাসার নামই "পবিত্র ভালবাসা!" এই রকম ভালবাসাই আর্য্যের শিক্ষণীয়।

কিন্তু এই গৌরবান্বিত ভালবাসাও পার্ব্বতীকে অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখিতে হইয়াছিল, কারণ শিব সন্ন্যাসী, তাহাতে সতী-গত প্রাণ। পার্ব্বতী শিবের প্রতি অনুরক্তা একথা জানিতে পারিলে, প্রতিদান দূরে থাকুক, হয়ত পার্ব্বতীর সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন। তাই পার্ব্বতী আত্মগোপন পূর্ব্বক শিব-সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। ইহাতেই পার্ব্বতীর ভালবাসার নিঃস্বার্থ ভাব ও গভীরতা, এবং বুদ্ধিবৃত্তির তেজস্বিতা অনুমান করা যাইতেছে।

পুরাণে বর্ণিত আছে একদিন (পার্ব্বতীর গভীর অনুরাগ বুঝিয়াও দেবগণের চক্রান্তে) মহাদেবের অজেয় হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল—একদিন ক্ষণকালের জন্য শিব পার্ব্বতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ইহা দুর্ব্বলতা নহে, শিব-চরিত্র দুর্ব্বলতার অতীত। তাঁহার একদিকে সহৃদয়তা ও কোমলতা, অন্যদিকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও বীরত্ব। সহৃদয়তার জন্যই শিব পার্ব্বতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য বুদ্ধির উত্তেজনায় তৎক্ষণাৎ এ ইচ্ছা সংযত হইল। অন্য লোকের পক্ষে যাহাই হউক, পার্ব্বতীচরিত্র সম্পূর্ণরূপে না জানিয়া, পার্ব্বতী শিবের সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্য কি না তাহা বিশেষরূপে না বুঝিয়া, শিব তাঁহাকে জীবন-পথের সহচরী করিতে পারেন না। দুর্ব্বলচেতা মানবেরা আপনাকে "অবস্থার বা ঘটনার দাস" বলিতে পারে, ঘটনা-স্রোতে তাহাদের সকল কর্ত্তব্য-জ্ঞান ভাসিয়া যাইতে পারে; বিবেক শক্তি সজীব না থাকিলে, চরিত্রের দৃঢ়তা না থাকিলে, যোগাভ্যাস ও আত্ম-সংযম লাভ হয় না।* মহাদেবে সংযম শক্তি সজীব, বিবেক জাগ্রত, তাই তাঁহার দেব-শক্তিতে দুর্ব্বলতা হারিয়া গেল, পবিত্রতার আগুনে প্রলোভন পুড়িয়া "ভস্ম" হইল। ইহাইতো বীরত্ব! আয়াসে আত্মসংযম ত প্রকৃত দেবত্ব!—দুঃখ না থাকিলে সুখের মধুরতা কে বুঝিত? প্রবৃত্তি না থাকিলে নিবৃত্তির গৌরব কেমনে থাকিত? এইরূপ চিত্ত-জয়ী না হইলে মহাদেবের "দেবত্ব" কে জানিতে পারিত? যিনি ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া সংসারে প্রতি পদক্ষেপ করিবেন, যিনি ঈশ্বরের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি মহদ্ব্যক্তিই হউন আর ক্ষুদ্র ব্যক্তিই হউন, আত্মসংযমে তাঁহার পূর্ণ অধিকার। আর কিছু না পারিলেও তিনি "চরিত্রবান্" হইতে পারিবেন। "চরিত্র" রক্ষা বিষয়ে মহাদেব আদর্শ স্থানীয়—সে জ্ঞানের জন্য নহে; অভ্যাস গুণে।

এই দিন হইতে মহাদেব পার্ব্বতীর সংস্রব ছাড়িয়া দিলেন। মহাজ্ঞানী মহাদেব, পার্ব্বতীতে সহৃদয়তা, উচ্চাশয়তা ও পরিণামদর্শিতা প্রভৃতি

*বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি ঋষিরা ইহার উদাহরণ।

সদ্গুণাবলী আছে কিনা, তাহা না জানিয়া তাঁহাকে চিরজীবনের সহকারিণী রূপে নিযুক্ত করিবেন না; এরূপ স্থলে পার্ব্বতীর সংস্রব পরিত্যাগ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। যাহা "কর্ত্তব্য" বলিয়া তাঁহার নিকট বিবেচিত হয়, সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে মহাদেব সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত আছেন। এরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান যাঁহার, তাঁহার মত মহানুভব কে?* যিনি সংসার সমুদ্রের গরল আত্মসাৎ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার স্পর্শে পাপও পুণ্য হয়, বিষও অমৃত হয়, তাঁহার মত মহাশক্তিমান্ কে? ভূত পিশাচেরা যাঁহার স্নেহাস্পদ—চিতার ভস্ম যাঁহার চন্দন, তাঁহার মত সমদর্শী কে? যিনি কুবেরের ধনেও নিস্পৃহ, শ্মশান যাঁহার সুখের গৃহ, তাঁহার মত নির্ব্বিকার কে? যিনি বিশ্ব-হিতৈষণা-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া শারীর বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন (১) যাঁহার পারিবারিক জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্ব সেবা, তাঁহার মত বিশ্বপ্রেমিক কে? যিনি গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসী, আসক্তিবিহীন অনুরাগী, তাঁহার মত ক্ষমতাবান্ কে? যিনি পার্ব্বতীর মত রমণী রত্নের অনুরাগভাজন হইয়া, নিজে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া ধর্ম্মের জন্যে, কর্ত্তব্য পালনের জন্যে পার্ব্বতীকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার মত চিত্তজয়ী বীর কে?—এই জন্যেই বলিতেছি শিব-চরিত্র সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণ, মহাদেব সকল জাতিরই পূজ্য, নমস্য ও ভক্তিভাজন হইতে পারেন।

শিব হিমালয় পরিত্যাগ করিলেন, পার্ব্বতীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। এত দিন শিবের চরণ সেবা করিয়াই তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ হইতেছিল, সে সৌভাগ্য ও সহসা ফুরাইল! আর এ জীবনে মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার ভরসাও রহিল না! কিন্তু শিবকে না পাইলে পার্ব্বতীর জীবন বিফল! পার্ব্বতীর যদি চাহিবার কিছু থাকে, তবে সে মহাদেব। তাই শিব হিমালয় ছাড়িয়া গেলে তিনি আর পিতৃগৃহে গেলেন না—পিতা মাতার স্নেহপূর্ণ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না, যেখানে মহাদেব সতীর জন্যে তপস্যা করিয়াছিলেন। পার্ব্বতী, তরুণ বয়সে তপস্বিনী হইয়া সেইখানে মহাদেবের জন্যে তপস্যা করিতে লাগিলেন। প্রিয় ব্যক্তির অভাবে তাঁহার স্মৃতিই সুখের, তাঁহার জন্যে ত্যাগ স্বীকারেই শান্তি। বিধবা রমণীর ব্রহ্মচর্য্য যে কারণে, পার্ব্বতীর তপস্যাও সেই কারণে।

মহাদেব এ তপস্যার কথা জানিতে পারিলেন। সত্য সত্যই পার্ব্বতী,

* আর একজন আদর্শপতি রামচন্দ্র, সে কথা পরে বলিতে ইচ্ছা রহিল।

(১) মহাদেব শবচ্ছেদন করিতেন, সে কথা প্রসিদ্ধ। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে যে সুপণ্ডিত ছিলেন, "বৈদ্যনাথ" ও "তারকেশ্বর" হইতে ইহা বোধগম্য হয়।

প্রঃ লেঃ

তাঁহার অজ্ঞাতে (?) তাঁহার সতীর স্থান অধিকার করিতেছেন! পার্ব্বতীর হৃদয়পূর্ণ ভালবাসা সত্য সত্যই সেই সন্ন্যাসী শিবের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইতেছে! তুমি বঙ্গীয় ভগিনি! স্বামীর স্নেহভাগিনী হইতে পারিলে না বলিয়া নীরবে কাঁদিও না—রাগ করিও না, উপবাস করিয়া স্বামীকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিও না। তোমার স্বামীকে খুব ভালবাসা দাও, স্বার্থপরতা ছাড়িয়া শুধুই ভালবাসা দাও, কেবলই দিতে থাক, একদিনও ফিরিয়া চাহিও না, ভালবাসিয়াই সুখী হও, দেখিবে একদিন তোমার স্বামী "পাষাণহৃদয়" হইলেও সহৃদয় হইবেন; একদিন তোমার নিষ্ঠুর স্বামী স্নেহময় স্বামী হইবেন, একদিন—তাঁহাতে যদি এক বিন্দু মনুষ্যত্ব থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই একদিন তিনি তোমার ভালবাসার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবেন। ভালবাসা ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাস্ত্র, বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। যাহাতে মহাদেবের অন্তের হৃদয়ও আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা মর জগতে "অব্যর্থ" কে না বলিবে?

তথাপি মহাদেব বীর, মহাদেব দেবতা। পার্ব্বতী মহাদেবের সহধর্ম্মিণী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্রী কি না, যুগল হৃদয় মিশিয়া এক হইতে পারে কি না, বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কিনা সে বিষয়ে এখনও তাঁহার সন্দেহ আছে। এমনও হইতে পারে পার্ব্বতীর হৃদয়পূর্ণ অনুরাগ, বালিকাহৃদয়ের স্বাভাবিক চঞ্চলতা মাত্র। মহাদেবের হৃদয়ের ইতিহাস বুঝিয়াছিল একজন মাত্র, শিবচরিত্রের বৈচিত্র্য জানিয়াছিল একজন মাত্র, সেই স্নেহময়ী প্রেমময়ী "সতী"। বালিকা পার্ব্বতী তাঁহার স্থান অধিকার করিবে কি করিয়া? বালিকা, সতীর মত মহাদেবের হৃদয়জ্ঞা মনোজ্ঞা হইবে কি করিয়া? তাই মহাদেব পার্ব্বতীর চিত্ত পরীক্ষার্থ ছদ্মবেশে পার্ব্বতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" মতাবলম্বী হইলে, "যেমন জোটে তেমনি" ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু মহাদেবের উদ্দেশ্য অনেক উপরে।

ছদ্মবেশী মহাদেব পার্ব্বতীর সম্মুখে গিয়া "শিব-নিন্দা" করিতে লাগিলেন। বলার উদ্দেশ্য, মহাদেবের ভোগবিলাস নাই, তাঁহার স্ত্রী যে দশখানা অলঙ্কার পরিবেন সে আশা নাই; মহাদেবের গৃহ শ্মশানে, রাজকুমারী সেখানে থাকিতে পারে না; তার পরে মহাদেবের আত্মজ্ঞান (বা কাণ্ডজ্ঞান) কিছুই নাই, এরূপ অবস্থায় মহাদেবের সহিত বিবাহ হওয়াতে কেবল ক্লেশই লাভ হইবার সম্ভাবনা। যদি বিবাহ করিতেই "সাধ" হইয়া থাকে, তবে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণের পত্নী হইলে সকল সুখভোগ হইবে। মহাদেব—বিজ্ঞ

মহাদেব বুঝিয়াছিলেন, যদি বালিকা কোনও পার্থিব সম্পদের লোভে শিবকাঙ্ক্ষিণী হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সকল শুনিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে।

পার্ব্বতী বয়সে বালিকা হইলেও তাঁহার হৃদয় বিশালতর। তাঁহার অনুরাগ, চক্ষের ভালবাসা নহে। রূপ, গুণ, ধন, মান প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা নহে। তাহা হইলে ইন্দ্র চন্দ্র ছাড়িয়া, বায়ু বরুণ ছাড়িয়া (আমাদের দেশের ভাষায় বলিতে হইলে বলি যে, হ্যাট্ কোটপরা তেড়িকাটা, ছড়িওয়ালা ছাড়িয়া) সংসারত্যাগী, সুখভোগবিরক্ত, মহাদেবের চরণাকাঙ্ক্ষিণী কেন? পার্ব্বতী বুঝিয়াছেন, শিব বিশ্বজগতে অমূল্য রত্ন। তাই তিনি মহাদেবেই মুগ্ধ; মহাদেবই সুন্দর, মহাদেবের যাহা কিছু তাহাই সুন্দর। মহাদেবের দেহ ভস্মাবৃত হইলে ভস্মও সুন্দর, মহাদেব ব্যাঘ্রবাসধারী হইলেও ব্যাঘ্রবাসও সুন্দর, মহাদেবের শ্মশান গৃহ, ভূত প্রেত সঙ্গী, ভিক্ষা জীবিকা, বৃষ বাহন হইলে সেই সকলও সুন্দর। মহাদেবই সৌন্দর্য্যময়!—শিবের শিবত্বই সৌন্দর্য্যময়! এ রকম তন্ময়তা না থাকিলে কি পার্ব্বতী "আদর্শ পতিপ্রাণা" শব্দের যোগ্যা হইতেন? জগতে যে (ধার্ম্মিকের বা মহাত্মার) পত্নী এইরূপ পতিপ্রাণা, তিনি যে জাতিতে জন্মিয়া থাকেন, আমি তাঁহাকে সহস্র প্রণাম করি, আর সমগ্র বঙ্গমহিলাকে তাঁহার পদাঙ্ক লক্ষ্য করিয়া চলিতে বলি।

সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যময় আরাধ্য দেবতার নিন্দা পার্ব্বতীর সহ্য হইল না, কেহই সহিতে পারে না। তাই হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসভরে বালিকা, যোগীর সমক্ষে বলিতে লাগিলেন,—

"বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং
নিষেব্যতে ভূতিসমুৎসুকেন বা।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ
কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ॥
অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে
ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ॥
বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা
গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দুশেখরং
ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ॥
তদঙ্গসংসর্গমবাপ্য কল্পতে
ধ্রুবং চিতাভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে।
তথাহি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং
বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্॥
অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ
প্রভিন্নদিগ্বারণবাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা
বিনিদ্রমন্দাররজোহরুণাঙ্গুলি॥"

শুনিয়া মহাদেবের সন্দেহ দূর হইল—আত্মপ্রশংসা শুনিয়া নহে। নিজের প্রশংসায় প্রীত হইয়া তারকের নিকটে আত্মবিক্রয় করা মহাদেবের

মত দেবতার কার্য্য নহে। মহাদেব বুঝিলেন, যদি জগতে শিব-চরিত্রের মর্য্যাদা কেহ বুঝিয়া থাকে, তবে সে এই বালিকা! যদি মহাদেবের বাম পার্শ্বে আদর্শ সতী "সতী"র অধিকৃত স্থানে বসিবার উপযুক্ত কেহ থাকে, তবে সে এই মহাপ্রাণা বালিকা! এই বালিকাকে বিবাহ করিতে পারিলেই মহাদেব জীবন-পথের প্রকৃত সঙ্গিনী পাইতে পারেন। বালিকা পার্ব্বতীতে শিবের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। মহাদেব যথাবিধি পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। মণি-কাঞ্চনে যোগ হইল।

ইহার পরে পার্ব্বতীর গার্হস্থ জীবন। গৃহকার্য্যে পার্ব্বতী কিরূপ সুশিক্ষিতা ও ও সুনিপুণা ছিলেন, তাঁহার "অন্নপূর্ণা" মূর্ত্তিই ইহার প্রমাণ। যে স্ত্রী স্বহস্তে স্বামীর অথবা স্বামি-গৃহের কার্য্য করিতে চাহেন না, তাঁহার "পতিপ্রাণতা" যতই গৌরবান্বিত হউক না কেন, ভারতভূমির উপযুক্ত নহে। প্রাণপণে স্বয়ং পতিসেবা করিবে, তাঁহাকে স্বহস্তে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে, তাঁহার অসুখের সময়ে নিজে তাঁহার কাছে বসিয়া শুশ্রূষা করিবে, তাঁহার গৃহে যাহাতে কোনও অভাব না আসিতে পারে—তাঁহার আয় যেরূপ হউক না কেন, তাঁহাকে অঋণী রাখিয়া সুগৃহিণীপণায় গৃহের সকল অভাব দূর করিতে হইবে—ইত্যাদিই ভারতমহিলার শিক্ষণীয়। দেবী পার্ব্বতীতে আমরা ইহাই দেখিতেছি। মহাদেব অন্নপূর্ণার প্রস্তুত অমৃতান্ন আহার করেন। পার্ব্বতীর শুশ্রূষায় শিব বিষপানেও অমর। মহাদেব "ভিখারী" হইয়া—অর্জ্জনস্পৃহা ত্যাগ করিয়াও রাজরাজেশ্বর; অন্নপূর্ণার গুণে তাঁহার গৃহে অভাব নাই। কেবল মহাদেব কেন, অন্নপূর্ণা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি মাত্রকেই আহার দান করেন; তাঁহার নাম স্মরণ করিয়াই ভারতকন্যাগণ রন্ধনকার্য্যে নিয়োজিত হন, তাঁহাদের বিশ্বাস "অন্নপূর্ণার নামেও অন্নাদি 'অমৃতান্ন' হইবে, একগুণ আয়ে পাঁচ গুণ ব্যয় করা যাইবে;" ইহার অপেক্ষা গার্হস্থ জীবনে আর গৌরবের কি আছে?

পার্ব্বতীর ধর্ম্মজীবনও অপূর্ব্ব। মহাদেব সনাতন ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শ। তাঁহার সেই অমূল্য উপদেশগুলি পার্ব্বতীকে দেবীরূপে, মহাশক্তিরূপে গঠিত করিয়াছিল। "ভার্য্যা-ধর্ম্ম" শিক্ষা দিয়া মহাদেব পার্ব্বতীকে সম্পূর্ণরূপে, আপনার অনুরূপ করেন। ইহাই ভার্য্যাজীবনের চরমোৎকর্ষ। জ্ঞানী ও সাধু পতির সহিত আধ্যাত্মিক মিশ্রণই ভার্য্যার ভার্য্যাত্ব। পার্ব্বতীতে তাহার সম্পূর্ণতা বিদ্যমান। আর কি চাও?

পার্ব্বতী আদর্শ রমণী, শিব আদর্শ পুরুষ। পার্ব্বতী শিবগতপ্রাণা, শিবও শক্তিগতপ্রাণ। আর্য্যগণ এই অলৌকিক প্রেম এই আধ্যাত্মিক মিলন বুঝিয়াছিলেন, তাই শিবের "অর্দ্ধনারীশ্বর"

মূর্ত্তির অবতারণা। স্নেহ, ভক্তি, প্রণয়—ভালবাসার যত রূপান্তর থাকে হরপার্ব্বতীতে সে সমস্তই পূর্ণরূপে বিদ্যমান। তাই কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বলিয়াছেন—"বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্যসম্বদ্ধ জগতের পিতা মাতা হরপার্ব্বতীর বন্দনা করি"! *

ফুল—সুগন্ধি ফুল বনে ফুটিলে স্নিগ্ধ বায়ু সুগন্ধ বহন করিলেই তাহার ফুলজন্ম সার্থক হয়! আর গুণবতী রমণী গুণবান্ স্বামীর "ভার্য্যা" হইলেই তাঁহার নারী-জন্ম সার্থক হয়। পার্ব্বতী রমণীকুলের রত্ন ছিলেন, মহাদেবের মত দেবতার দেবত্ব হইতেই সে রত্ন এত উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছিল। পুরুষরত্ন মহাদেব সেই গুণবতী দেবীকে কিরূপ সম্মান করিতেন, তাহা নিম্ন লিখিত কয়েক ছত্রেই বোধগম্য হয়; মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

"শক্তিং বিনা মহেশানি! শিবোঽহং শবরূপকঃ।
শক্তিযুক্তো যদা দেবি! শিবোঽহং সর্ব্বকামদঃ।
ঈশ্বরোঽহং মহাদেবি! কেবলং শক্তিযোগতঃ॥" ইত্যাদি

পার্ব্বতীর অভাবে শিবের শিবত্ব থাকে না। নিজগুণে যে রমণী, মহাদেবের মত আদর্শ স্বামীর নিকটে এতাদৃশী গৌরব ও প্রীতির পাত্রী তাঁহার পদধূলি স্পর্শ করিয়াও রমণীরা কৃতার্থ হইতে পারেন (১)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মহাদেব বিশ্বসেবাব্রতে ব্রতী। যাহাতে পৃথিবী সুখশান্তির আগার হয়, "অসুরের" পরিবর্ত্তে "দেবতার" রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকে, "ভূত পিশাচেরাও" কৃপাপাত্র বিবেচিত হয়, শিব এই সকল মহদুদ্দেশ্য রক্ষা করিতে ব্যস্ত। পার্ব্বতী এ সকল কার্য্যেও শিবের সহযোগিনী—সহকর্ম্মিণী। পাঠিকা ভগিনি! তুমি কি পার্ব্বতীকে "দেবী" বলিতে লজ্জিতা হইবে?—যদি হও তাহা হইলে মনে ভাবিয়া দেখিও, যে আর্য্যজাতি এই পার্ব্বতীকে "দেবী" বলিয়া পূজা করিয়াছেন তাঁহারা কুসংস্কারাপন্ন? না যাঁহারা বলিতে ইতস্ততঃ করেন তাঁহারা কু[illegible]রাপন্ন? এ রকম দেবী যে দেশে পূজিতা হন, সে দেশের লোক এক দিন না এক দিন গৌরবাস্পদ হইতে পারে।

এই আদর্শ দম্পতীর পরিণয়-ফলস্বরূপ যে সন্তানটী জন্মিয়া ছিলেন তিনিও "দেবকুমার"—পার্ব্বতী যাঁহার মা, মহাদেব যাঁহার বাপ, সেই সৌভাগ্য-

* বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ। রঘুবংশ।

(১) অদ্যিও হিন্দুবালিকারা ব্রতবিশেষে বর চাহে "যেন দুর্গার মত পতি-সোহাগিনী হই" "দুর্গার মত" পতিসোহাগিনী হওয়া কুমারীদিগের প্রার্থনীয় একথা স্বীকার করি, কিন্তু ভার্য্যা যদি দুর্গার মত নিঃস্বার্থ পতিপ্রাণা হন—নচেৎ স্বামীকে "স্ত্রৈণ" কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইবে। প্রঃ সেঃ।

বানের যেরূপ দেবত্ব লাভ হইতে পারে, হর-পার্ব্বতীর পুত্র কুমার বা কার্ত্তিকের সেইরূপ দেবত্ব লাভ করিয়া ছিলেন। শৌর্য্যে বীর্য্যে ও জিতেন্দ্রিয়তায় কার্ত্তিকের "আদর্শ" স্বরূপ। বিশ্বহিত বা লোকহিতে নিযুক্ত হইয়া তিনি কৌমার্য্য অবলম্বন করেন, সেই জন্যেই "কুমার" আখ্যা প্রাপ্ত হন। অতএব আমরা বুঝিতেছি, পার্ব্বতী আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভার্য্যা, আদর্শ মাতা ও আদর্শ গৃহিণী। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ জীবন অতি বিরল। তাই আমাদের এই ক্ষীণ ও অস্ফুট প্রতিভা সে দেবী-জীবন বর্ণনা করিতে অক্ষম। কিন্তু আমরা অক্ষম হইলেও সে দেবী সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণা।

আর একবার পার্ব্বতি! সিদ্ধেশ্বরীরূপে অভাগিনী বঙ্গ-জননীর মনোরথ সিদ্ধ করিতে আসিবে কি মা? এই নিরানন্দ ভবনে আনন্দময়ীরূপে আসিবে কি মা? এই কাঙ্গালের পুরে একবার রাজরাজেশ্বরী রূপে আসিবে কি মা? এই নিরন্ন দেশে একবার অন্নপূর্ণারূপে আসিবে কি মা? একবার বঙ্গভূমির মৃতবক্ষে অমৃতধারা ঢালিবে কি মা? যে মহাশক্তি রূপে "মহামোহকে" বিনাশ করিয়া "মহিষমর্দ্দিনী" আখ্যা পাইয়াছিলে, সেই দেবীমূর্ত্তিতে এই অশক্ত দেশে দাঁড়াইবে কি মা? এস! মা! এস! ভারতের অমূল্য রত্ন! মা'র কোলে ফিরিয়া এস!—একবার শক্তিহীনা ভক্তিহীনা, মলিনপ্রাণা বঙ্গকুমারী তোমার চরণতলে মাথা লুটিয়া বলিবে—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে!
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি
নমোঽস্তু তে।"

শ্রীমা।

ষষ্ঠীর কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভাষা অতি অদ্ভুত সংক্রামক পদার্থ। ভাষার ন্যায় সংক্রামক আর নাই। মানবের মনোভাব—যাহার অন্য নাম জ্ঞান, তাহা মানবের বাক্‌যন্ত্র প্রসূত ধ্বনিতে বাহির হইয়া বাহিরে আইসে এবং বাহিরে আসিয়া যাহার যাহার কর্ণপথে প্রবিষ্ট হয়, তাহার তাহারই জ্ঞানসংক্রম সমাধা করে অর্থাৎ তাহাকে তাহাকেই জ্ঞানী করায়। যে মনুষ্য জন্মাবধি কোনও মানবীয় ভাষা শুনে নাই, সে মানবে মানবীয় জ্ঞানের ও মানবীয় ভাষার অভাব থাকিবেই থাকিবে, অন্যথা হইবে না। সদ্যঃপ্রসূত শিশু ও মূক অর্থাৎ বোবা তাহার দৃষ্টান্তস্থল! শিশু শুনে নাই বলিয়া বলিতে পারে না। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক হইতেছে

যে, বোবা ও গোঙা এক নহে। বোবা স্বতন্ত্র, গোঙা স্বতন্ত্র। বোবা আদৌ বলিতে ও বুঝিতে পারে না, কিন্তু গোঙা অস্পষ্ট বলে ও সমুদায় কথা বুঝে! বোবা মাত্রেই বধির; কিন্তু গোঙা বধির নহে। অনেকেই ভাবেন, বোবার বাগিন্দ্রিয় নাই, তাই সে কথা বলিতে কহিতে পারে না। বস্তুতঃ তাহা নহে! তাহাদের কর্ণ, তালু, আলজীব, প্রভৃতি স্থানাষ্টকবিশিষ্ট বাগ্‌যন্ত্র থাকিলেও তাহারা ভাষা জ্ঞানে বঞ্চিত। বাগ্‌যন্ত্র নাই এমন নহে, পরন্তু তাহাদের ভাষ্য বস্তুর জ্ঞানের অভাব আছে। তাহাদের কণ্ঠ ধ্বনির প্রতি মনোনিবেশ করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের সেই ধ্বনি বাগ্‌যন্ত্র বিহীন পশুর ধ্বনি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাদের বাগ্‌যন্ত্র আছে; পরন্তু তাহাদের বলিবার যোগ্য জ্ঞান নাই। বোবারা বচনীয় পদার্থ জানে না, চেনে না, শুনে না, তাই তাহারা বোবা অর্থাৎ বলিতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বোবা মাত্রেই জন্মবধির। জন্মবাধির্য্য ব্যতীত বোবা হয় না। বোবা বধির কিনা, তাহা তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে শব্দ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। বোবারা জন্মাবধি মানবীয় ভাষা প্রয়োগে বঞ্চিত থাকে বলিয়া তাহারা মানবীয় নানাজ্ঞানে থাকে। তাহারা যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মানবীয় ব্যবহারাদি দর্শন করে, তাহারই দ্বারা যৎ আনুমানিক জ্ঞান জন্মে এবং তাহাতেই তাহাদের দেহযাত্রা কথঞ্চিৎ নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু যাহারা মানবীয় ব্যবহার পর্য্যন্ত দেখে নাই বা দেখিতে পায় না, তাহারা পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। আমাদের পুরাণলেখক ঋষিরা ও উক্ত মেয়েলী ষষ্ঠীর কথা এই তথ্যটুকু গল্পছলে বুঝাইয়া দিয়াছেন বলিয়া অনুভূত হয়। পুরাণে অনেকগুলি মৃগ-পালিত, পশু-পালিত ও পক্ষিপালিত মনুষ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং প্রোক্ত ষষ্ঠীর কথাতেও মার্জ্জারপালিত মনুষ্যের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। অবশ্যই এই সকল কথা উপরোক্ত মিলনানন্তর পোষকতা করিতে সমর্থ। হয়ত পুরাণের কথায় ও মেয়েলী ষষ্ঠীর কথায় বিশ্বাস হইবে না। যদি তাহা না হয়, তবে আধুনিক সংবাদ পত্রের প্রচারিত ব্যাঘ্র পালিত মানবের বৃত্তান্ত স্মরণ কর, তাহাতে অবিশ্বাস করিলে চলিবে না। করিতে পারেই বা কে? ইংরাজদিগের দেখা ও লেখা মিথ্যা হইলে জগৎ সংসার সর্ব্বৈব মিথ্যা হইবে। যাহাই হউক, আমরা প্রস্তাবিত ষষ্ঠীর কথার পোষকার্থে পশ্চাৎ ২টী বাঘ মানুষের বিষয় উদ্ধৃত করিলাম। পাঠিকাগণ দেখুন, সে গুলি যদি সত্য হয় ত তোমাদের ষষ্ঠীর কথা সত্য হইবে। আমরা ষষ্ঠীর কথা সত্য বলিতে প্রস্তুত নহি। আমরা ইহাই দেখাইতে চাহি যে, পূর্ব্বকালের রচিত মেয়েলী কথার মধ্যে কত জ্ঞান ও কত বিজ্ঞান লুক্কায়িত আছে।

বাঘ মানুষ। *

১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহের সময় ফতেপুরে বাঘের ঘর হইতে একটি মানুষের বাচ্চা আনা হইয়াছিল। সেখানকার সিভিল সার্জনের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, বালকটীর বয়স তখন ৬ অথবা ৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। ছেলেটী কথা বলিতে পারিত না, কাপড় পরিতে চাহিত না। সে যে অনাথনিবাসে থাকিত, সেখানকার পাদ্রি সাহেব ভয়ে তাহাকে আটক করিয়া রাখিতেন। ডাক্তার সাহেব গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং মাংস ও হাড় রান্না করিয়া খাইতে দিতে বলিলেন। এই মানুষ বাচ্চাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, তাহার দৌরাত্ম্যে সকল লোকই অস্থির হইয়া উঠিল। একদিন ডাক্তার সাহেব গিয়া দেখিলেন, সে বাগানে ছুটাছুটী করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সে দৌড়িয়া আসিল এবং তাঁহার পায়ের উপর হাত দিয়া মুখের দিকে কাতরভাবে তাকাইতে লাগিল। কিন্তু অতি কষ্টেও কিছু বলিতে পারিল না, কেবল "শাক" এই কথাটি বাহির হইল। ডাক্তার সাহেব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে শাক ও ভাত খাওয়াইতে বলিলেন। ক্রমে তাহার ছেলেবেলাকার কথা মনে আসিতে লাগিল এবং "মা" ও "বাবা" এই দুই কথা বলিতে শিখিল। কিন্তু এরূপভাবে তাহাকে অধিক দিন বাঁচিতে হইল না। বালক খাইতে খাইতে তাহার ভয়ানক পেটের পীড়া হইল। সেরূপ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল অবস্থায় পড়িয়া তাহার উদ্ধত ব্যাঘ্রের স্বভাব দূর হইতে লাগিল এবং সে ক্রমেই পোষমানিতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব কাছে গেলে সহজে ছাড়াইয়া আসিতে পারিতেন না। যদিও তাহার গায় বাঘের ন্যায় দুর্গন্ধ ছিল এবং দেখিতে অতিশয় কদাকার, তথাপি দয়ালুস্বভাব ডাক্তার তাহার কাছে অনেকক্ষণ গিয়া থাকিতেন ও তাহাকে আদর করিতেন। কত চেষ্টাতেও তাহার সে ব্যারামের উপশম হইল না। মৃত্যুদিন যখন ডাক্তার সাহেব তাহাকে দেখিতে গেলেন, তখনও সে তাঁহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিল এবং যখন সাহেব আদর করিয়া তাহার মাথার উপর হাত দিলেন, তখন সে সন্তোষের ভাব প্রকাশ করিল। হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ হইতে "শাক" এই কথাটি বাহির হইল। ডাক্তারসাহেব চাহিয়া দেখিলেন, হতভাগ্য ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে।

[উদ্ধৃত]

কিছু দিন হইল, কানপুরে একটি

---

* নারীশিক্ষা ১ম ভাগে এ সম্বন্ধে যে দুইটী আখ্যায়িকা আছে, তাহা বামাবোধিনীতে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাঘ-মানুষের কথা শুনা গিয়াছে। এক জন ইংরাজ মহিলা যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, ইহার বয়স ২৫ কি ৩০ বৎসর হইবে, দেখিতে খুব বলবান্ এবং দৃঢ়কায়। চুলগুলি ও পরিধেয় বস্ত্র বেশ মোটামুটি পরিষ্কার। দেখিলে খুব ছোটলোক অথবা ভিক্ষুকের মত বোধ হয় না। ইহার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, বাঘ মানুষকে কেমন ভদ্র লোকের মত দেখায়। চক্ষু দুটি ভয়ানক রক্তবর্ণ, দেখিলে ভয় করে এবং জিহ্বা হিংস্র জন্তুর মত লকলকে, কাহারও প্রতি কোন উপদ্রব করে না, কিন্তু সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে, ছোট ছোট ছেলেপিলে দেখিলেই যেন খাইবার জন্য জিহ্বা বাহির করে ও সতৃষ্ণনয়নে তাকায়। যাহাই হউক, সকলেই তাহাকে ভয় করে এবং তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য অথবা পয়সা দিয়া থাকে।

বাঘ মানুষকে জিজ্ঞাসা করাতে সে একটী ১০ বৎসরের মেয়েকে দেখাইয়া বলিল যে, যখন সে দেখিতে তত বড়, তখন এক জঙ্গল হইতে রোজ সাহেব তাহাকে ধরিয়াছিল, তখন সে চারি হাত পায়ে চলিত। কিছুকাল হাঁসপাতালে রাখার পর রোজ সাহেব নিজেই তাহাকে রাখিয়া দিলেন ও মা বাপের মত যত্ন করিতেন। রোজসাহেব বিলাত চলিয়া যাইবার পর হইতে সে অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। উক্ত ইংরাজমহিলা যখন তাহাকে সেই সময় সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে যোড়হাত করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় ঈশ্বর ও স্বর্গ সম্বন্ধে কত কথা বলিল। এই মানুষাকৃতি ব্যাঘ্রস্বভাব জীব মদ খাইতে শিখিয়াছিল। একটী ইংরাজ মহিলা ইহাকে অনেক দিন খাওয়া পরা দিতেন, কিন্তু হতভাগা ভয়ানক মদ খাইত ও খারাপ ব্যবহার করিত। সেই দোষে ইংরাজ মহিলা আর তাহাকে তত যত্ন করেন নাই। না করিলেও সে সেখান হইতে পলাইয়া অন্যত্র যায় নাই। এখনও সে পয়সা কড়ি পাইলে তাহা দিয়া মদ খাইয়া থাকে।

এই অদ্ভুত জন্তুর আচার ব্যবহার এখন প্রায়ই মনুষ্যের ন্যায় হইয়াছে। এখন কাহার কোন ক্ষতি করে না। শুনা গিয়াছে, কয়েকবৎসর পূর্ব্বে একদিন কোন স্ত্রীলোক তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াতে সে ভয়ানক রাগান্বিত হইয়াছিল এবং তাহাকে কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাহার বিষয়ে আর কোন কথা শুনা যায় নাই। *

* এরূপ ঘটনা অর্থাৎ বাঘের দ্বারা মনুষ্য শিশুর প্রতিপালন কি প্রকারে সংঘটন হয় তাহা কেহ বলিতে পারেন না। যাহারা বাঘ মানুষ দেখিয়াছেন, তাহারা অনুমান করেন, আসন্নপ্রসবা নারী ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্যাঘ্র ক্রোড়ে প্রসব করিয়া মৃতা হয়। ব্যাঘ্রী সেই ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া ক্রোড়স্থ শিশুকে আপনার মনে করে ও স্তন্য দিয়া বাঁচায়, অথবা ঈশ্বরের অনুগ্রহে শিশু আর কোন রূপে বাঁচে।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা

চতুর্থ প্রস্তাব-শেষাংশ।

রক্ষণশীল সম্প্রদায় আবার ইহার ঠিক্ বিপরীত কথা বলেন। তাঁহাদের মতে স্ত্রী স্বাধীনতা বিষম অনর্থকরী। উচ্চ শিক্ষার আশয়ে স্ত্রীজাতি স্কুল কলেজে পড়িতে যাইবে, তাহা হইলে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিবে কে? সন্তানের প্রসূতি যদি দেশে বিদেশে, সমুদ্রে, পাহাড়ে বেড়াইতে যাইবে, তাহা হইলে ছেলেদের চলিবে কি করিয়া? তাহারা ক্ষুধার সময়ে আহার্য্য, পীড়ার সময়ে শুশ্রূষা ও সর্ব্বদা যত্ন, কাহার কাছে পাইবে? অতএব স্ত্রীজাতি যেরূপে আছে, সেইরূপেই থাকুক—স্ত্রীলোকদিগকে সমাজ বা স্বদেশের ভাবনা ভাবিয়া মাথা ব্যথা করিতে হইবে না, সংসারে তাহাদের ভাবিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য নূতন করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে না—গৃহকর্ম্ম সম্পাদন, সন্তান পালন এবং পুরুষের আজ্ঞা বহন করাই স্ত্রী জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। এই সকল নিয়ম পালন করিতে পারাই তাহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। এখনও যে বাঙ্গালা দেশ স্বনামখ্যাত রহিয়াছে, সে কেবল স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের শাসনাধীনে রহিয়াছে বলিয়া। রমণী পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিবে না, প্রত্যেক বিষয়ে পুরুষের সহিত সমান আসন পাইবে, ঘরের বউ রাজপথে দাঁড়াইয়া একজন ইংরেজ কি জর্ম্মণের সহিত আলাপ করিবে, সে কি ভীষণ দৃশ্য! ভাবিতেও হৃৎপিণ্ড চমকিয়া উঠে!—জাতি বিশেষে যাহাই হউক, বাঙ্গালী কখনই সেরূপ হইতে পারে না, হইলে তাহাদের সংসার বা সমাজ কিছুই থাকে না। স্ত্রীশিক্ষা যাহা হইতেছে তাহাই ভাল, অধিক শিখাইয়া বঙ্গীয়

(গ) শিক্ষা ও সংসর্গ মানুষের মনুষ্যত্বের কারণ ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। পুরাকালের মাতা ও ভার্য্যাগণ স্বামী প্রভৃতিকে কীর্ত্তিমান দেখিতেই প্রয়াস পাইতেন। শত্রুভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়গণকে তাঁহাদিগের আত্মীয়াগণ উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পুনঃ প্রেরণ করিতেন। আর্য্য মহিলাগণ স্বামী প্রভৃতির বীরোচিত মৃত্যুতে কাতর হইতেন না, কাপুরুষোচিত কার্য্যে তাঁহাদিগকে রত দেখিলেই মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। বর্ত্তমান বঙ্গনারীগণ স্বামী পুত্র প্রভৃতিকে গৃহাভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতে পারিলেই কৃতার্থ হন। বঙ্গবাসী উৎসাহে উত্তেজিত হইয় কোন শুভকার্য্য করিতে গেলে, মাতার আর্ত্তনাদে, স্ত্রীর অনুনয়ে, ও কন্যার অশ্রুধারায় বিকলচিত্ত হইয়া সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। এই হেতু বাঙ্গালীরা বলেন "স্ত্রীলোক উন্নতির অন্তরায়," কিন্তু সেও তাঁহাদের গুণে; শিক্ষা সংসর্গ ও সংস্কার এ দুর্ব্বলতার মূল। বাঙ্গালীরা আর্য্যবংশোদ্ভব, তাই বঙ্গ মহিলার কথা বলিতে আর্য্য মহিলার কথা বলিলাম।

ললনাকে "পাহাড়ে মেয়ে" সাজাইবার আবশ্যক রাখে না। পুরাতন প্রথা সমূহে দুই একটী দোষ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে সমাজের অধিকতর অপকারের সম্ভাবনা। এই সকল কারণে বলা যায় বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা যাহা আছে তাহাই থাকুক। ইত্যাদি।

এই পরস্পর বিরোধী মত লইয়াই দেশ আন্দোলিত হইতেছে এবং এইরূপ মতবৈষম্য দ্বারাই বঙ্গসমাজে, অনেক গুরুতর কার্য্যে সুফল পাওয়া যাইতেছে না। যাহাহউক উল্লিখিত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, উভয় মতের আংশিক সত্যগুলি স্পষ্ট অনুভূত হয়। এসম্বন্ধে আমাদের সহজ বুদ্ধিতে যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা পরে সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

মঙ্গলময় জগদীশ্বরের অভিপ্রায়ে স্ত্রী ও পুরুষ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মে ইহাদিগের পরস্পর পার্থক্য আছে। যে বিশ্ববিধাতা জগতে জড়াণু জীবাণু প্রভৃতি পদার্থকে স্ব স্ব কার্য্যোপযোগী করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তিনিই স্ত্রী পুরুষদিগকে তাহাদিগের কার্য্যোপযোগী বিভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন। পুরুষজাতি স্বভাবতঃ দৃঢ়চেতা, বলবান্, সাহসী ও তেজস্বী; স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ কোমলহৃদয়া, দুর্ব্বলা মৃদুস্বভাবা, লজ্জাশীলা ও ভীরু। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পুরুষজাতি স্ত্রীলোকের রক্ষাকর্ত্তা ও আশ্রয়দাতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এবং স্ত্রীজাতি পুরুষজাতিকে ভয়ে অভয়দাতা, বিপদে সহায় ও কার্য্যে সৎসাহসবিধাতা জানিবেন; পুরুষ জাতিও রমণীগণের নিকট দয়া, ক্ষমা, সেবা, সুখ, শান্তি পাইবেন। কিন্তু তাই বলিয়া পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিবেন, কি স্ত্রীজাতিকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া কেবল নিজেরা জ্ঞানালোকে আলোকিত হইবেন, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। সন্তান প্রসব করণ, শিশু পালন, গৃহধর্ম্ম সংরক্ষণ এগুলি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ঐশিক নিয়ম হইলেও উহা যে রমণী-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, একথা নিঃস্বার্থভাবে বিবেচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন। পুরুষের জীবনের উদ্দেশ্য যেমন আত্মোন্নতি করিয়া পরোন্নতি করা, রমণীরও সেইরূপ; তবে আধুনিক সময়ে দেশের সাধারণের মন যেরূপ অমুন্নত ও স্ত্রীজাতির প্রতি সমাজের যেরূপ অবজ্ঞা, তাহাতে রমণীদিগের বাহ্যিক স্বাধীনতা যে সময়োপযোগী এমন কথা বলিতে পারি না। বাহ্যিক স্বাধীনতা তো দূরের কথা, বঙ্গবাসিনীদিগের পরিচ্ছদের যেরূপ হীনত্ব, তাহাতে সময়ে সময়ে আত্মীয় পুরুষদিগের সম্মুখীনা হইতেও সঙ্কুচিতা হইতে হয় *। যাহাহউক

* বঙ্গাঙ্গনাদিগের পরিচ্ছদের হীনত্ব সকলেই জানেন খালি সাড়ী ইঁহাদের লজ্জানিবারক অঙ্গাবরণ। আজিকালী বডী, জ্যাকেট

বঙ্গাঙ্গনাকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা দিতে পুরুষ জাতি উদাসীন থাকিলে বড় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। রমণী অন্তঃপুরে থাকিয়া উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হউন; তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম আচার ব্যবহার পরিচ্ছদ ও গৃহ উপযুক্ত রূপে উন্নত হউক; যাহাতে রমণীর স্বাভাবিক চরিত্র পরিস্ফুট হয়, তদ্বিষয়ে পুরুষেরা যত্ন করুন; রমণীর ইচ্ছামত তাঁহাকে পবিত্র ও শিক্ষাপ্রদ স্থান, নিজেরা সঙ্গে করিয়া দেখান, দেশ ভ্রমণ কালে রমণীদিগকে সঙ্গে লইয়া নৈসর্গিক শোভা সকল তাঁহাদিগকে দেখাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও তত্তৎদেশীয়দিগের স্বতন্ত্র রীতি নীতি পর্য্যালোচনা করাইয়া অভিজ্ঞতা শিক্ষা দিন; সুশিক্ষিতা রমণীগণকে রমণী জাতির নেত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত করুন, এবং নিজেদের সহকারিণী করিয়া দেশের উন্নতি স্রোত উন্মুক্ত করিতে থাকুন, তাহা হইলে দেশের —এ দুরবস্থাপন্ন বাঙ্গালা দেশের অনেক অভাব দূর হইবে এবং পুরুষেরাও সুশিক্ষিতা রমণীগণের নিকটে অনেক প্রত্যুপকার পাইতে পারিবেন। এইরূপে কার্য্য করিলে পূর্ব্বোক্ত বিরোধী মতেরও সামঞ্জস্য হইতে পারে।

বাঙ্গালী রমণীদিগের অবস্থা যাহ এতদূর বিবৃত করা হইল, তাহাই যথোচিত হইল না; ইহা ব্যতীত অপোগণ্ড বালিকার পাণিপীড়ন, বহু বিবাহ, কন্যা বিক্রয়, কৌলীন্য প্রথা প্রভৃতি, সম্প্রদায় বিশেষে প্রচলিত থাকায় বঙ্গীয় রমণীর অবস্থা সমধিক ভীষণ ও শোচনীয় করিয়াছে। তবে আমরা যখন সাম্প্রদায়িকতা পরিহার পূর্ব্বক বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতেছি, তখন সে সকল কথা বিশেষরূপে অনালোচ্য। কিন্তু এই টুকু বলিতে চাহি যে সম্প্রদায় বিশেষে বঙ্গাঙ্গনার অবস্থা দারুণ বিভীষিকাময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সাধারণতঃ বঙ্গাঙ্গনাগণের মানসিক অবস্থা কতকদূর উন্নত হইয়াছে। রুচিও অনেক পরিমাণে মার্জ্জিত হইয়াছে। এখন উল্কির পরিবর্ত্তে গহনা, শাঁখার পরিবর্ত্তে কত সুন্দর চুড়ী, নথের পরিবর্ত্তে মুক্তা, রাঙা সাড়ীর পরিবর্ত্তে তিন, চারি পেড়ে (গবর্ণর জেনেরলের নাম পর্য্যন্ত পেড়ে) সাড়ীপরিধান করেন, সেকেলের কিছুই পসন্দ করেন না। বাঙ্গালায় স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচার অল্পদিন হইয়াছে, ইহার মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই লেখা পড়া শিখিয়াছেন; কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি লাভ করিয়াছেন, কেহ কেহ উচ্চ দরের সাময়িক পত্রের সম্পাদন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন, কেহ গ্রন্থকর্ত্রী, কেহ বিজ্ঞানের কেহ দর্শনের গভীরতত্ত্ব সকলও গ্রন্থাকারে (সহজে) প্রকাশিত করিয়াছেন। অনেকে উচ্চ-

প্রভৃতি ধনী পরিবারেরই ব্যবহার্য্য, সাধারণে অন্যে নহে। এবিষয় আন্দোলন হইতেছে সহরে অপেক্ষাকৃত উন্নতিও হইয়াছে, পল্লিগ্রামে প্রতি দৃষ্টি আবশ্যক।

শ্রেণীর কবি আখ্যাও পাইয়াছেন— অধিক কি জাতীয় মহাসমিতিতেও কেহ কেহ বঙ্গমহিলার প্রতিনিধি হইয়াছেন। কিন্তু আগে যেরূপ বলিয়াছি, ইহা সাধারণ বঙ্গমহিলার চিত্র নহে; আর অনেক মহিলার অবস্থাও এসকল কার্য্যের অনুকূল নহে; তবে এ সকল কার্য্য দ্বারা তাহাদের মানসিক উন্নতির প্রারম্ভ হইয়াছে, একথা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ডি আলেমবার্ট।

ইনি ১৭১২ খৃষ্টাব্দে পারিস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। যখন সদ্যোজাত শিশু, তখন পারিস নগরের এক বৃদ্ধা রমণী ইহাঁকে একটী ধর্ম্ম মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত হন। বৃদ্ধা শিশুটীকে পাইয়া পরম রত্ন জ্ঞানে আপন কুটীরে লইয়া গেলেন এবং অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন। শিশুটীকে পাইবার দুই এক দিন পরেই জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক বৃদ্ধার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকটী বৃদ্ধকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর শিশু-টীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা কোথায় কি প্রকারে শিশুকে পাইয়া-ছিলেন, সমস্ত বর্ণনা করিলেন। তখন সেই ভদ্রলোক বৃদ্ধার দয়ার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তুমি এই অনাথ শিশুকে আপন বুকে স্থান দিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছ। বেশ তুমি শিশুটীকে লালন পালন কর, খরচ পত্রের জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই, আমিই সমস্ত যোগাইব।" বৃদ্ধা বাঁচিয়া গেলেন এবং দুহাত তুলিয়া ভদ্রলোকটীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তদবধি সেই ভদ্রলোক শিশুর খরচ পত্র যোগাইয়া আপন বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। শিশু বৃদ্ধার যত্নে ও সেই ভদ্রলোকের সাহায্যে ক্রমে মানুষ হইলেন এবং ফরাশী দেশীয় লোক সমাজে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ডি আলেমবার্ট ফরাশী দেশের গৌরব স্বরূপ হইয়াছিলেন। সুবি-খ্যাত ফরাশী "এনসাইক্লোপিডিয়া" গ্রন্থাবলীর গণিতের অংশটী সমস্তই তাঁহাদ্বারাই লিখিত হয় এবং এই গ্রন্থা-বলী সম্পাদন বিষয়ে তিনি ডিডিরোকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রুসি-য়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক ডি আলেম-বার্টের পরম সুহৃদ ছিলেন। তিনি তাঁহাকে বার্লিন নগরে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে বৃদ্ধার কুটীর হইতে

স্থানান্তরিত করিতে পারেন নাই। রুসিয়ার রাজ্ঞী ক্যাথারিন্ তাঁহাকে আপন পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া চিঠি লিখিলেও ডি আলেমবার্ট বলিয়াছিলেন, যে যত দিন জীবিত থাকিবেন, তিনি এই সামান্য কুটীর পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইবেন না। ধন মান টাকাকড়ি লইয়া ডি আলেমবার্ট পারিস নগরে মহা সুখ ভোগে দিন কাটাইতে পারিতেন, যেরূপ আয়োজন থাকিলে জন সমাজে গণ্য মান্য হওয়া যায়, ডি' আলেমবার্টের সেইরূপ বস্তুর কোন অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রাণ সেদিকে গেল না। তিনি মান ও সুখ্যাতি অপেক্ষা শান্তি ও স্বাধীনতাকে অধিক ভাল বাসিতেন। তিনি অনাথ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, অনাথিনী দুঃখিনীর কোলে মানুষ হইয়াছিলেন এবং চিরকাল সেই দুঃখিনী পালনকর্ত্রীর কুটীরে থাকিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন।

বিদ্যাসাগরের জননী।

দরিদ্রের গৃহে জগদ্‌বিখ্যাত মহা পণ্ডিত, তেজস্বী ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুসন্তানের জন্মগ্রহণ পাশ্চাত্য দেশ সমূহে নিতান্ত বিরল না হইলেও ভারতবর্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। দুঃখ দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাত সহ্য করিয়া, একাহার ও অনাহারে জীবন যাপন করিয়া পরিশেষে জনসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারা এই অলস উদ্যমবিহীন দেশে—বিশেষতঃ বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া অনুভূত হইলেও পরলোকগত মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র জীবন কাহিনীতে সে দৃষ্টান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দরিদ্রাদপি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তর কালে সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুরুষরত্নে পরিণত হইলেন, ইহার গোপন তত্ত্ব কোথায়? কেহ কি অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, কেন ক্ষুদ্র দরিদ্রসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরে পরিণত হইয়াছিলেন? কেহ কি সূক্ষ্মদর্শন সহকারে অনুসন্ধান করিয়াছেন, কি কি উপকরণ একত্রিত হইয়া মহামনা মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের মহাচরিত্র গঠন করিয়াছিল? চিন্তাশীল বুদ্ধিমান লোক দেখিতে পাইয়াছেন যে বিদ্যাসাগররূপ পুত্তলিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ে তাঁহার জননী সেই পুণ্যবতী সহৃদয়া বঙ্গললনার কোমল হস্ত দুইখানি নিরন্তর পশ্চাৎ হইতে খাটিয়াছে, সেই দয়াবতী সাধ্বীর কোমল হৃদয় বিন্দু বিন্দু ক্ষরিয়া বিদ্যাসাগররূপ

মহাসাগরের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই হিন্দুললনাই পরম যত্নে ঈশ্বরচন্দ্রকে লালন পালন করিয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যাসাগর আজ বাঙ্গালী জাতির মুখশ্রী উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার পুণ্য কাহিনীর গীতধ্বনিতে সমগ্র ভারত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাই আজ আমরা সেই গরীয়সী রমণী রত্নের গুণ-পনার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতে প্রয়াস পাইব।

তিনি বড় সরলহৃদয়া রমণী ছিলেন। লোকের দুঃখ কষ্টের কথা শুনিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ বিপন্ন ব্যক্তি যদি দরিদ্র হইল, যদি কোন প্রকারে শুনিতে পাইতেন যে কোন অসহায় পুরুষ বা স্ত্রীলোক সাহায্যাভাবে ক্লেশ পাইতেছে, তাঁহার হৃদয় অমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তিনি নিরন্তর পরসেবাতেই সময়াতিপাত করিতেন। বীরসিংহ গ্রামের অনেক দরিদ্র লোক এখনও সাক্ষ্য দিবে যে তিনি দিবারাত্রি জাতি-নির্ব্বিশেষে হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদের বাড়ীতে পীড়িত লোকদের পথ্যের ব্যবস্থা করিতেও তাহাদিগকে ঔষধ খাওয়াইতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাকে সন্ধান করিতে গিয়া দেখা যাইত যে তিনি কোন অস্পৃশ্য জাতির দ্বারে বসিয়া সে বাড়ীর রোগীর পথ্যের বা ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন। অনেক সময়ে সাগু ও মিছরি সঙ্গে থাকিত, যাহাদের রাঁধিবার লোক না থাকিত, তাহাদের জন্য নিজে বাড়ী আসিয়া পথ্য রাঁধিয়া লইয়া যাই-তেন। এইরূপে দরিদ্রের সেবা করি-তেই তাঁহার দিবসের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত।

একবার বাড়ীর জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ছয়খানি লেপ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী লেপ কয়খানি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। জননীর নিজের ব্যব-হারের জন্য এবং অন্য কাহারও কাহারও জন্য সে গুলি আসিয়াছিল। পাড়ার প্রতিবেশীগণের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন যে এক গৃহের পরিবারেরা শীতে অতিশয় ক্লেশ পাইতেছে—এমন শক্তি নাই যে শীত নিবারণের উপযোগী কোন বস্ত্রাদি ক্রয় করে। সেই জননীসদৃশা গৃহিণী সেই দরিদ্র গৃহস্থকে একখানি লেপ দিয়া অবশিষ্ট কয় খানিও শেষে ঐরূপে নিতান্ত শীতক্লিষ্ট লোকদিগকে দান করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিলেন যে "ঈশ্বর, তোমার প্রেরিত লেপ কয়খানি এই রূপ বিপন্ন লোকদিগকে দিয়া দিয়াছি, আমাদের ব্যবহারের জন্য লেপ পাঠা-ইয়া দিবে।" অনেক সময় দুই প্রহরের পর পর্য্যন্ত অনাহারে বসিয়া থাকিতেন, কেন না যদি কোন অতিথি বা ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা-দিগকে না খাওয়াইয়াত আর খাওয়া হবে না। এরূপও শুনা গিয়াছে যে তিনি

ভাত রাঁধিয়া ধামায় করিয়া লইয়া পাড়ায় যাহারা খাইতে পাইত না তাহাদিগকে আহার করাইয়া শেষে আহার করিতেন।

হ্যারিসন সাহেব যখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনি একবার বীরসিংহ গ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল পরিদর্শনে গমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময়ে বাটীতে ছিলেন। মায়ের নিকট অল্পবয়স্ক সিভিলিয়ান হ্যারিসন সাহেবের আগমন সংবাদ দিবামাত্র জননী অমনি বলিলেন "ছেলেটিকে একবার আমাদের বাটিতে আনিবে না? তাহাকে একবার আমাদের বাটিতে আনিয়া কিছু খাওয়াইলে ভাল হইত।" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ জননীর নামে হ্যারিসন সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাহেব নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন। সাহেব বাঙ্গালা বুঝিতে পারেন শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। স্বহস্তে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ও অন্ন নিজ পাক করিয়া সাহেবকে খাওয়াইতে বসিলেন। এক এক করিয়া যেটির পরে যেটি খাইতে হয়, তাহা নিজে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। হ্যারিসন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মায়ের এরূপ উদারতা, স্নেহমমতা ও ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন "আমি আপনার বাটীতে আসিয়া, এখানে আহার করিয়া, সর্ব্বোপরি আপনার মায়ের করুণস্বভাব ও আদর যত্নে মুগ্ধ হইয়াছি। চিরদিন এ স্মৃতি আমার প্রাণ মন অধিকার করিয়া থাকিবে।"

আহার করাইয়া শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী সাহেবকে বলিলেন "দেখ বাছা, তুমি যে কাজ লইয়া আসিয়াছ, এ বড় কঠিন কাজ, খুব সাবধান হইয়া এ কাজ করিবে, যেন গরিব দুঃখীলোক তোমাকে আপনার লোক মনে করিয়া সুখী হইতে পারে, তুমি সর্ব্বদা সকলের কথা ভাল করিয়া শুনিবে, লোকের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, তুমি এমন ভাবে এখানে থাকিবে যে, তুমি চলিয়া গেলে এখানকার লোক চিরদিন যেন তোমার নাম করিয়া কৃতজ্ঞ হয়। তুমি দুঃখীর বন্ধু হইয়া যেন এখান হইতে যাইতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে।"

হ্যারিসন সাহেব মেদিনীপুর অবস্থান কালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মায়ের পরামর্শমত চলিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ হইতেন। তাঁহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে পরে বলা যাইবে।

মানুষ কতদিন অনিদ্রায় থাকিতে পারে ?

অনাহারে কতদিন জীবিত থাকা যায়, বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর হইল ডাক্তার টেনার চল্লিশ দিবস কাল অনাহারে থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার পর আমেরিকার অন্য এক শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ৬০ ষাটি দিবস কাল অনাহারে ছিলেন। এখন কেহ কেহ মনে করেন যে ষাটি দিবসের অধিক কালও অনাহারে থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব নহে। অনাহারে যদি মানুষ বাঁচিতে পারে, নিদ্রা ব্যতিরেকে মানুষের কত দিবস বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, কিছুকাল হইল আমেরিকার কয়েকজন শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিত তাহা স্থির করিতে কৃতসংকল্প হয়েন। তাঁহাদের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে ছয় জন সুস্থকায় ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করেন। অন্যূন অষ্টাহ নিদ্রা যাইব না তাঁহারা এইরূপ সংকল্প করেন। ৩০এ মার্চ্চ সোমবার দিবস হইতে তাঁহারা নিদ্রা পরিত্যাগ করেন। ছয় জনের মধ্যে চারিজন বিশেষ চেষ্টা করিয়া বৃহস্পতিবার রাত্রি পর্য্যন্ত জাগরিত থাকিতে সক্ষম হইয়া তৎপরে নিদ্রামগ্ন হয়েন। অবশিষ্ট দুই জনের নাম টাউন্‌সেণ্ড ও কনিংহাম। টাউন্‌সেণ্ড রবিবার দিন বৈকালেই নিদ্রিত হইয়া পড়েন। একমাত্র কনিংহামই পূর্ণ আট দিবস কাল জাগরিত থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নিদ্রা ত্যাগ করিলে কি প্রকার শারীরিক কষ্ট হয়, তাহা টাউন্‌সেণ্ড্ ও কনিংহাম্ সবিবেশষ অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন অনিদ্রা জন্য শারীরিক ও মানসিক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব হয়, এমন কি বলপূর্ব্বক নিদ্রা হইতে বিরত থাকা ঘোর অপরাধীর পক্ষে কঠোর দণ্ডস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে। আহার না করিলে যেমন মানুষ কৃশকায় হইয়া যায়, দীর্ঘকাল নিদ্রা ত্যাগ করিলেও যে শরীর কৃশ হয় তাহা টাউন্‌সেণ্ড ও কনিংহামের দৃষ্টান্ত হইতে জানা যাইতেছে। তাঁহারা উভয়েই আট দিবসের অনিদ্রায় কৃশ হইয়া যান। টাউন্‌সেণ্ড ও কনিংহাম্ তিন সের কমিয়া গিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই জোর করিয়া একদিন অনাহার অনিদ্রায় থাকা যেখানে কঠিন, ধর্ম্মার্থে হৃদয়ের অনুরাগে সেখানে ৩ দিন ৩ রাত্রি থাকিলেও কোনও ক্লেশ হয় না। আমরা অবগত হইয়াছি কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম সাধনার্থ দুই মাসকাল বিনা নিদ্রায় নির্ব্বিঘ্নে কাটাইয়াছেন। ইহার মধ্যে অবশ্য কিছু রহস্য আছে।

নারী-হৃদয়ের মহত্ত্ব ।

না জানি কি অপরাধে গেছে আণ্ডামান ?
চির-নির্ব্বাসিতা নারী,জীবনের মায়া ছাড়ি
ভীষণ তরঙ্গে কেন ভাসাইছে প্রাণ ?
শিকলি বাঁধিয়া করে,আশ্চর্য্য কৌশল ক'রে
তুলিছে নাবিকগণে সাগরের তীরে,
ভাবিয়ে অবাক্ মন, বিস্ময়েতে নিমগন,
দেখাবে বীরত্ব হেন বল কোন্ বীরে ?
নর-কর পরশনে, নারীর পবিত্র মনে,
পাপ প্রলোভন পাশ করে সর্ব্বনাশ,
পলকে ফিরিয়া মতি, পাপ পথে হয় গতি,
পবিত্র হৃদয় হয় নরক নিবাস ।
কুসংসর্গ ছাড়ি যবে, বিচরণ করে ভবে,
স্বর্গদেবী আবির্ভূতা যেন গো ধরায় ;
উদার নিঃস্বার্থ প্রাণ, পরহিতে করে দান,
আত্মসুখ স্বার্থ পানে ফিরেও না চায় ।
সোণার প্রতিমা খানি, সুধামাখা মিষ্টবাণী,
দয়াতে করেছে নারী বিশ্ব পরাজয় ;
এসেছে পরের তরে,সে কিরে শমনে ডরে,
নামিছে আকণ্ঠ জলে অটল নির্ভয় !
বিপন্নজনেরেহেরে,নারীকিথাকিতেপারে?
পাষাণে বাঁধিয়া বুক ? বাঁচাইবে তায়
মনেতে সংকল্প করি, জীবনাশা পরিহরি,
পশিছে জীবনে যেন পাগলিনী প্রায় ।
ছিল বটে পাপীয়সী, এত যে নির্ম্মল শশী,
সেও দেখ কলঙ্কিত-নিষ্কলঙ্ক নয় ;
যে কাজ করেছে তারা,হয়েসবে আত্মহারা,
সে কাজের পুরস্কার যদি কিছু হয় ;
এক মাত্র মুক্তিদান, (উপযুক্ত প্রতিদান)
নহিলে কি দিবে আর তার বিনিময়ে ?
আসিয়ে আপন দেশে, বন্ধুবান্ধবের পাশে,
সুখেতে ভুঞ্জুক দিন তাহাদের লয়ে
যতনারী এ ভারতে,সবে মিলি এক মতে,
যাচ জননীর কাছে করি প্রাণপণ ;
নিশ্চয় ভারতেশ্বরী, অপরাধ ক্ষমা করি,
দিবেন মুকতি দান ওহে ভগ্নীগণ !
পশিল মায়ের কাণে, এ বারতা মুক্তিদানে,
কুণ্ঠিতা হবে কি মায় ? দয়াময়ী যিনি !
ধন্য ধন্য ক্ষমা গুণে, তুল্য নাই ত্রিভুবনে,
অবলার অপরাধ ক্ষমিবেন তিনি ।
বিচূর্ণ অর্ণবযান, আরোহীরা ভাসমান,
অকূল পাথারে আজ কে বাঁচাল প্রাণ
তুলিয়া সাগর তীরে, জলমগ্ন নাবিকেরে ?
ছিল নয় এক দিন রাক্ষসী পাষাণ !
বারাঙ্গনা নাহি ভুল, দেখায়ে বীর্য্য অতুল,
রাখিল অতুল কীর্ত্তি রমণীসমাজে,
তাদের উদ্ধার লাগি,এও সবে ভিক্ষা মাগি,
মুক্তিদান দিতে রাজি হবেন ইংরাজে।
ধরামাঝে বীর জাতি,ইংরাজের সে সুখ্যাতি,
বাড়িবে দ্বিগুণতর দিলে মুক্তিদান ।
তাঁরা না করিলে আর,কোথা হবে সুবিচার
বীরাঙ্গনা বলি কেবা করিবে সম্মান ?
বঙ্গের ভগিনীগণ, কর সবে প্রাণপণ,
জ্বলন্ত উৎসাহে মাতি চালাও লেখনী,
করি ঘোর আন্দোলন, গলাও মায়ের মন
কৃপাদৃষ্টি করিবেন মোদের জননী ।
সাধিতে এ মহাকাজ,করিও না কালব্যাজ,
বীর-নারী বলি আজ দেও পরিচয় ;
নির্ব্বাসিতা দুখিনীর, ঘুচাও নয়ন-নীর,
নিরখি নয়ন তৃপ্ত করি এ সময় ।
কি করি ভেবে না পাই,এমন শকতি নাই,

জ্বলন্ত কবিতা লিখে জাগাই সবায়,
যেন গো পরের তরে, সকলেরি অশ্রু ঝরে,
পায় সে সহানুভূতি যেবা নিঃসহায়।
সেদিন আসিবে কবে,আমাদের ভাগ্যে সবে
দেখিব ভারতে নব-জীবন সঞ্চার,
ভারত রমণীকুল, দেখায়ে দয়া অতুল,
পরিচয় দিবে হেন মহা-প্রাণতার ?

শ্রীচ।

বিবিধ তত্ত্ব।

১। আমেরিকার অন্তঃপাতী কালিফরনিয়া প্রদেশের ভূমি অতি উর্ব্বর। ইহার উর্ব্বরতা শক্তির বিশেষ গুণ এই যে তদ্দেশের বৃক্ষসকল পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা প্রকাণ্ড ও দীর্ঘ-কালস্থায়ী হয়। ঐ সকল দেশে এক্ষণে যে সকল প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর অন্যান্য কোন স্থানে দেখা যায় না। ইহার মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা দীর্ঘে দুই শত হাত এবং তাহার প্রস্থ কুড়ি হাত। দৈর্ঘ্যে একশত এবং প্রস্থে পনর হাত এরূপ বৃক্ষ কালিফারনিয়ায় সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ প্রস্তরের ন্যায় কঠিন এবং সহস্র বৎসরেও কিছুমাত্র বিকৃত হয় না।

১। দক্ষিণ আমেরিকার চকৃটোয়া নামক অসভ্য জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত যে তাহারা মৃত দেহ দাহ না করিয়া বিবিধ দ্রব্য সংযোগে তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস যে প্রত্যেক মানবাত্মা এক সময়ে পুনরায় তাহার ভৌতিক দেহে প্রবেশ করিয়া এই জগতে বিচরণ করিবে।

৩। পীড়িতা মাতার দুগ্ধ পান করিলে যেমন সন্তানের পীড়া হয়, সেইরূপ যে গাভী রোগগ্রস্ত, তাহার দুগ্ধ পান করিলে সেই রোগ হয়, অথবা শরীরে সেই রোগের বীজ প্রবিষ্ট হইয়া অস্বাস্থ্য উৎপাদন করে। মাতা কোন অস্বাস্থ্যকর খাদ্য আহার করিলে যেমন তাঁহার দুগ্ধ সন্তানের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়, সেইরূপ যে গাভী কুদ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহার দুগ্ধ পান করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়। গাভীর দুগ্ধ নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যপ্রদ করিতে হইলে গাভীর আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ঘাসের মধ্যে অনেক বিষাক্ত বা দোষবিশিষ্ট ক্ষুদ্র তৃণাদি বা চারা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। গাভীকে যে ঘাস খাইতে দেওয়া হয়, তাহার সহিত কোন অজ্ঞাত গাছ বা তৃণ না থাকে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপ বিষাক্ত তৃণ ভক্ষণে গাভীর কোন অপকার না হইতে পারে, কিন্তু তাহার দুগ্ধ অত্যন্ত দূষিত হয়। গাভীর আহার ও গাভীর স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ প্রদর্শিত হয় না বলিয়া দুগ্ধের সহিত আমাদিগের শরীরে রোগের বীজ প্রবেশ করে।

৪। ওজোন্ নামক বাষ্প অম্লজন বাষ্প অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে সুগন্ধযুক্ত পুষ্প নিচয়ের মধ্যে অধিকাংশ জাতীয় পুষ্প হইতে প্রচুর পরিমাণে এই পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর বাষ্প নিঃসৃত হয়। অনেক বৈজ্ঞানিকের এরূপ মত যে যে প্রদেশ অস্বাস্থ্যকর সেখানে যদি প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি পুষ্পের বৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহা হইলে সে প্রদেশের অস্বাস্থ্যকরতা নিশ্চয়ই বিদূরিত হয়।

৫। নিউগ্রানাডায় একটী বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার ত্বকের রস কালী রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ঐ রসে লিখিয়া দেখা গিয়াছে যে কালীর ন্যায় উহা বহু দিন স্থায়ী হয়। প্রথমে লিখিলে উহা ঈষৎ লালবর্ণ দেখা যায়, পরে উহা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে এই বৃক্ষের চাষ করিলে কালী প্রস্তুত করিবার আর আবশ্যকতা থাকিবে না।

৬। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত বিবাহ-রীতি অতি অদ্ভুত। কোন যুবক কোন বালিকাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বালিকার কর্তৃপক্ষীয়েরা কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসের প্রাতঃকালে বালিকাকে বনের মধ্যে রাখিয়া আইসে এবং এক ঘণ্টার পরে তাহারা যুবকের নিকট আসিয়া বালিকাকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করে। যুবক যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে বালিকাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারে, তাহা হইলে সে তাহার পাণি গ্রহণের অধিকারী হয়, নচেৎ তাহাকে বিবাহ করিবার তাহার দাবী জন্মে না।

দোষ ও গুণ।

ঠিক্ যদি সকলের জীবনী সংকলন করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে মনুষ্য মাত্রেরই জীবনে অন্ততঃ একটী ভুল চুক কিম্বা একটী গুণ পাওয়া যায়। "ঈশ্বর মনুষ্যকে কখনও নিরবচ্ছিন্ন গুণ কিম্বা নিরবচ্ছিন্ন দোষ দিয়া নির্ম্মাণ করেন না," প্রকৃতি নিজেই যেন এই কথা ঘোষণা করিতেছেন। যেমন আঁধারকে পরিত্যাগ করিলে আলোর গৌরব বুঝিয়া উঠা যায় না—যেমন দুঃখকে পরিত্যাগ করিলে সুখের স্বাদ গ্রহণ করা যায় না, তেমনি দোষ না থাকিলে গুণের উজ্জ্বলতা কেহ দেখিতে পাইতেন না। আমরা আলো আঁধার, সুখ দুঃখ, দোষ গুণ ইত্যাদি ঠিক্ পরস্পর পরস্পরের বিপরীত দেখিতে পাই; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে ঠিক্ তাহা নহে—আমাদের চক্ষের অগোচরে ঈশ্বর ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়কে (অর্থাৎ সুখ দুঃখের প্রতিদ্বন্দ্বী,

আলো আঁধারের প্রতিদ্বন্দ্বী, দোষ গুণের প্রতিদ্বন্দ্বী ইত্যাদি) এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন, কেননা উহার একটী না থাকিলে অপরটী অর্থশূন্য হইত। যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যকে আমরা পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিতে পাই অর্থাৎ সূর্য্য দিবাপতি আর চন্দ্র নিশা-পতি ; সূর্য্যের উত্তাপ গরম, চন্দ্রের উত্তাপ শীতল, চন্দ্র সূর্য্যে যেমন বিলক্ষণ ঘনিষ্টতা আছে অর্থাৎ সূর্য্যের করে চন্দ্র উজ্জল, তেমনি দোষ গুণ যেন বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াও একসূত্রে গ্রথিত। মনুষ্যের জীবনী নিজে না লিখিলে কিম্বা না বলিলে কেহ কাহার প্রকৃত জীবনী বলিতে বা জানিতে পারেন না। ইতি-হাস সমূহে যে সমস্ত লোকের জীবনী আমরা দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে হয়ত অল্প দোষীর কেবল গুণ মাত্রই বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহাতে দোষমাত্রও স্পর্শ করিতে পায় নাই, আবার অন্য পক্ষে অল্প গুণীর যে অল্প পরিমাণে গুণ আছে তাহা-রও অপলাপ করা হইয়াছে। তাই বলিতে-ছিলাম যে মনুষ্য নিজ-জীবনী নিজে অপকটচিত্তে লিখিলে যেমন বিশুদ্ধ সত্য জীবনী দেখিতে পাওয়া যাইবে, অন্যের সঙ্কলিত জীবনী তেমন হইবে না। কবিবর বায়রণ যদি অসঙ্কুচিত মনে নিজের জীবনী নিজে না লিখিয়া যাইতেন কিম্বা কোন কোন অংশ গোপন করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় ভক্তিভাজন অত বড় কবি চরিত্রে অতটা দাগ কখনও দেখিতে পাইতাম না। আমরা যে লোকনিন্দার ভয়ে জীবনে সর্ব্বদা আত্ম দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করি, কি ভুল! জীবনান্তেও সেই লোক-নিন্দা যাহাতে না হয় সে জন্যও আত্ম-কার্য্য গোপন করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি না। বায়রণ যদিও চরিত্র দোষে দোষী, তথাপি তাঁহার নিজ জীবনের সত্য ঘটনাগুলি লিখিয়া তিনি আমাদের ভক্তিভাজন হইয়াছেন, কেননা সত্যের কর্কশতাও ভাল। একটী মন্দ কার্য্য করিতে যাঁহার লজ্জা বোধ না হইয়া লোকে প্রকাশ হইবে বলিয়া লজ্জা হয়, তাঁহার সে লজ্জার মূল্য অতি কম-নাই বলিলেও চলে। যাহাহউক পূর্ব্বা-পর সকল লোকেই যদি নিজ নিজ জীবনী' অর্থাৎ জীবনের সত্য ঘটনা গুলি লিখিয়া বাক্সে রাখিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনী পাঠে লোকের স্বভাব, মানসিক গতি, ও কি কার্য্যের কি ফল ইত্যাদি বিষয়ে বিলক্ষণ উপদেশ কিম্বা শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যাইত। যদিও উপদেশ ও শিক্ষার জন্য অনেক পুস্তক আছে, কিন্তু সেই সকল পুস্তক আবার অনেকের নিকট কেবল "তোতার পড়া" মাত্র। যেমন "মিথ্যা কথা কহিলে পাপ হয়," "নবমীতে অলাবু গোমাংস" "উত্তর শিয়রে শুইলে দোষ" ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে কে কিরূপ ফল প্রাপ্ত

হইয়াছেন, তাহা যদি বর্ণিত থাকে, তাহা হইলে ঐ উপদেশ গুলি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, অন্যথা কেবল "তোতা পড়া"। তাই বাস্তবিক মনুষ্যের জীবনের ঘটনা ও কার্য্যাকার্য্যের ফলাফল আদ্যোপান্ত সমস্তই জানিতে পারিলে অতি সহজে উপদিষ্ট হইতে পারা যায়। "মনে কর রবিনসন-ক্রুসো" "জোসেফ উইলমট" "হরিদাসের গুপ্ত কথা" ইত্যাদি পুস্তক যদি কল্পনা-প্রসূত না হইয়া কোন এক ব্যক্তির বাস্তবিক জীবন হইত, উহা আমাদের মন কত আকর্ষণ করিত!

কবিগণের কাব্য ও নভেল নাটকের নায়ক নায়িকাকে লেখক নিখুঁত সুন্দর করিতে নিজের সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করেন না, (অবশ্য বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসোদ্দীপক নাটকের কথা বলিতেছি না।) তিনি যেরূপ চরিত্র-সৌন্দর্য্য ভাল মনে করেন, নায়ক নায়িকাকেও সেইরূপ সৌন্দর্য্যে চিত্র করেন, তিনি যেরূপ বাগ্মিতা সভ্যতাকে বুদ্ধির পরিচায়ক মনে করেন, নায়ক নায়িকাকে কিম্বা নায়ক নায়িকার অনুকূলে অন্য কাহার দ্বারা সেরূপ বাগ্মিতা ও বুদ্ধির কার্য্য প্রদর্শন করেন। কাল্পনিক কাব্যাদির কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। যে সকল গ্রন্থে ঐতিহাসিক সত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, আমরা সেই সকল ইতিহাস ও কাব্যের লোকদিগকে লইয়া দোষ গুণের একত্র সমবেশ দেখাইতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, যাঁহার জীবনের ঘটনা তিনি ব্যতীত অন্য কেহ যে তাহা বিশুদ্ধভাবে লিখিতে সক্ষম, সে বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তাহা থাকিলেও উক্ত কাব্য ও ইতিহাসে যাহা লেখা আছে, তাহা ধরিয়া "দোষ গুণ" লিখিব। এইখানে বলিয়া রাখি যে, যিনি বিখ্যাত গুণবান্ তাঁহার গুণের বিষয় ত সকলেই জানেন, অতএব তাঁহার যে অল্পমাত্র দোষের উল্লেখ তাহাই দেখাইব, আর যিনি বিখ্যাত দোষী, তাঁহার দোষাবলী ত সকলেই জানেন, সুতরাং তাঁহার যে অল্প গুণ আছে তাহাই দেখান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, কারণ ঐ সকল গ্রন্থস্থ লোকদিগের নাম, গোত্র, কুল, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, যুদ্ধ, রাজত্ব ইত্যাদি প্রধান প্রধান ঘটনা সমূহ অনেকাংশে সত্য হইলেও ঐ লোকদিগের মধ্যে গ্রন্থকার যাঁহাকে সুন্দর আঁকিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহার দোষাংশ বর্ণন করিয়াও গুণ বলিয়া ঐ দোষের প্রশংসা করিয়াছেন আর দোষীর দোষগুলি কোন কোনস্থলে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। সে গুলি এস্থলে সবিস্তর লেখা অনাবশ্যক, কেন না আমাদের প্রবন্ধের নাম "দোষ ও গুণ।" এখন অনেক লোকের দোষ ও গুণ দুই আছে, কি না দেখা যাউক।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম শ্রীমতী নির্ম্মলা সোম এবৎসর ইংরাজী সাহিত্যে 'এম এ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কুমারী চন্দ্রমুখী বসু বাঙ্গালী রমণীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'এম এ', ইনি দ্বিতীয়।

২। যে মুক্তিফৌজের অদ্ভুত বিবরণ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংস্থাপক জেনারেল বুথ আগামী ৮ই জানুয়ারী কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন। ইনি বর্ত্তমান সময়ে একজন অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান্ লোক।

৩। মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব রাজা সুরচন্দ্র যিনি রাজ্যসম্পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া কলিকাতায় অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন, গত ৩রা ডিসেম্বর তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণা এড়াইয়াছেন।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। শিশুরঞ্জন রামায়ণ—শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। সরল সুমিষ্ট কবিতায় ৬০ পৃষ্ঠার মধ্যে রামায়ণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে গ্রন্থকারের বিশেষ গুনপনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া বালকগণ রামায়ণের স্থুল গল্প ও নীতি যেমন শিখিতে পারিবে, সেইরূপ মূল রামায়ণ পাঠেও অনুরাগী হইবে।

২। প্রেমের জয়—শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তি প্রণীত, মূল্য /১০ আনা। কয়েকবার বামাবোবিনীতে মুক্তিফৌজের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, আমাদিগের লেখক বন্ধু তাহা পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছেন। বামাবোধিনীর প্রবন্ধের আর আমরা কি সামালোচনা করিব? তবে পাঠক পাঠিকাগণকে ইহা এক একবার পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

৩। বঙ্গে মহাপ্রলয়—শ্রীগৌরী প্রসাদ মজুমদার প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য /০ আনা। মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত, কবিতাগুলি শোকোদ্দীপক।

বামারচনা।

পথিক

অচেনা পথিক আমি তোদের দুয়ারে;
ঘুরি ঘুরি সারাদিন
হয়েছে শকতি হীন,
তোরা কা'রা এলি মোরে ভালবাসিবারে?
আমি তো অচেনা পান্থ রয়েছি দুয়ারে!

আমারে ডাকেনা কেউ 'আয় কাছে আয়;'
যতন মমতা স্নেহ,
আমারে করেনা কেহ,
কে তোরা—ডাকিলি কেন মধুর কথায়?

এ যে গো তোদেরি ঘর,
আমি তো এসেছি পর,
কেনরে বাঁধিলি মোরে স্নেহ মমতায়,
আমারে ডাকেনা কেউ "আয় কাছে আয়!"

৩

ভুলে আসিয়াছি আমি ভুলে চলে যাই,
তোদের এ দেবপুর,
আমার অনেক দূর,
হেথাকার রবি শশী মোর দেশে নাই;
এখানে চলিছে ভাসি,
আনন্দ অমৃত রাশি,
আমার সে ঘরভরা এক রা'শ ছাই;
ছেড়ে দে আমারে আমি অধম বালাই!

৪

বুকে বুকে জ্বলে মোর চিতার অনল,
আমার বাতাসে হায়
বসন্ত পলায়ে যায়,
শুকায় আমার তাপে বরষার জল!
বেঁধে এক কুঁড়ে ঘর,
সবে ভাবি "পর পর"
ভরেছি আপনা দিয়ে বিশ্ব ভূমণ্ডল!—
পরের সহস্র দুখে,
"আহা"টী আসেনা মুখে,
পর লাগি চোখে নাই এক ফোঁটা জল,
মরমে মরমে শুধু
আগুণ জ্বলিছে ধূধূ,
"সসাগরা ধরা" মোর মহা মরুস্থল!—
আমার কাহিনী তোরা কি শুনিবি বল?

তোদের ও দেব-প্রাণ চির সুখময়,
নাই শোক নাই রোগ,
নাই "কপালের ভোগ"
জীবনে জড়া'ন নাই মরণের ভয়!
শুনিলে মধুর গীতি,
উছলে অমৃত-স্মৃতি,
চাহিলে মুখের পানে জুড়ায় হৃদয়;
তোদের স্নেহের ঘরে,
আনন্দ বিরাজ করে!—
এখানে আসিলে "পর" আপনার হয়,
এ বিশ্ব জগত ধরি
হৃদয়ে রেখেছ ভরি,
তাই ও পরাণে মরি, কেউ "পর" নয়;
তোদের ও দেব-প্রাণ নিত্য মৃত্যুঞ্জয়!

৬

তবু কি বাসিবি ভাল, স্বরগের মেয়ে,
তবু কি বাসিবি ভাল, দীন হীনে পেয়ে?—
ভালই বাসিবি যদি
এ মর মলিন হৃদি,
স্বরগ আলোক ঢালি দাও না গো ছেয়ে;
লইয়া তোদের হাসি
মুছিব এ অশ্রুরাশি,
আমারে ভুলিয়া রব কত "পর" পেয়ে!—
ব্রহ্মাণ্ডে বাঁধিব ঘর
কোথাও রবে না "পর"
ছুটিব অনন্ত-পথে হরিনাম গেয়ে;
আমারো আমারো লাগি
জগত উঠিবে জাগি,
আমিও অমর হ'ব সুধা-ধারা পেয়ে,
মোরে কি শিখাবি হ'তে "দেবতার মেয়ে"?

শ্রীপ্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

দুঃখমিলন।

বল দেখি কেন, বাল্যের বদন হেরি তোর,
স্মৃতিপথে আসে পুনঃ বাল্যের সে ঘুম ঘোর?
কত দিন দেখি নাই, বল কেন তবু ভাই
বাল্যের সে স্মৃতি গুলি ভাসিতেছে তোর মুখে,
কত দিন কত বর্ষ চলে গেছে সুখে দুখে,

তবু যেন সেই তুই পুরাণ ফুলিটী মোর,
লোকে বলে বাল্য চেয়ে বাড়িয়াছে দেহ তোর,
যে বড় বলেছে তোকে দেখুক নূতন চোকে,
পুরাণ দেখিছে তোরে কিন্তু আমার নয়ন;
কত ভাবে একেবারে উথলি উঠিছে মন।

২

কোমরে কাপড় বেঁধে দিতাম জলে সাঁতার,
জিদ করে একেবারে হতেম পুকুর পার!
তব জয় মম জয় সবই আনন্দময়
উল্, স্কুল্ গৃহকার্য্য উৎসাহে পূরিত প্রাণ,
প্রতিযোগিতার দোষ পেতনা হৃদয়ে স্থান,
সেই তুই সেই আমি তবে কেন আজ বোন
হেরিয়া আমাকে দুঃখে হয়েছ অধোবদন?
সেই বোন সেই তোরে সুদীর্ঘ দিনের তরে
বিদায় করিতে এসে পেয়ে অশ্রু প্রতিদান
ফিরিলাম গৃহে লয়ে আধ ভাঙ্গা হৃদিখান।

৩

ধরিয়া এ হাত দুটি সজল নয়ন ভরে
বলেছিলে "ভুলিস না এই ভিক্ষা মাগি তোরে।"
সেই হ'তে তোরে ভাই এক দিন ভুলি নাই,
কত দিন কত মাস কত বর্ষ ধীরে ধীরে
দুঃখেসুখে,হেসে কেঁদে গিয়াছে কাল সমীরে,
বাল্যের সাঙ্গনী তুই ছিলি সুখ সহচরী,
সুখের সময় তাই কাঁদিয়াছি তোরে স্মরি;
দুঃখের সময় সই ভুলিয়াছি তোরে কই?
হৃদয়ের দুঃখ যত রেখেছি হৃদয় ভার,
দেখাইতে তোরে সব দ্বার উদ্ঘাটন করি।

৪

বহু দিন পরে আজ শুনাতে দুঃখকাহিনী
আসিয়াছি তোর ঠাঁই কেন তুই অভিমানী?
ফুলেছে দুটি নয়ন কাঁদিয়াছ বুঝি বোন,
তোর কি আমারি মত হোয়িয়া স্বামীর মুখ
উথলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ের যত দুখ?
কেঁদনা কেঁদনা বোন দুঃখোচ্ছ্বাস রোধ কর,
আমিত কাঁদিনি তবে তুমি কেন কেঁদে মর?
সুখ দুঃখ যাহা পাও মঙ্গল বলিয়া লও,
লেগেছে তোমাকে তাই ভেবনা এ অমঙ্গল,
মঙ্গলময়ের ইচ্ছা সকলই সুমঙ্গল।

৫

জাননাকি কোন্ মহাজেতে জন্ম লয়েছ,
কোন্ মা'র গর্ব্ভে জন্মে এত বড় হয়েছ?
পবিত্র চরিত্রে যারা মোহিত করেছে ধরা,
চিরদিন সহিষ্ণুতা গুণে সুবিখ্যাতা;
বোন! সেই মহাজাতি হিন্দু নারী তোর মাতা।
মৃত পতি কোলে লয়ে নিশায় ঘোর কাননে,
প্রহারিতা সন্ত্রাসিতা লঙ্কার অশোক বনে,
পতিত্যক্তা বন মাঝে পতি খুঁজি ফিরিয়াছে,
শত পুত্র ঘাতককে পুত্র রূপে হৃদে ধরি,
সহিষ্ণুতা পরাকাষ্ঠা দেখায়েছে হিন্দুনারী।

৬

এই যে সংসার ক্ষেত্র পরীক্ষার স্থল ভাই,
উত্তীর্ণ হইতে গেলে সহিষ্ণুতা গুণ চাই।
ধূপ পুড়ে হুতাশনে তোষে বিশ্বে গন্ধ দানে,
কাঞ্চন পরীক্ষা লোক করিয়া থাকে অনলে,
মানব দেবতা হয় জানিত চরিত্র বলে।
সে চরিত্র সুপরীক্ষা হয় শোক দুঃখানলে,
না বুঝিয়া অমঙ্গল বলে লোক সুমঙ্গলে!
তাই বলি শোন বোন্ সান্ত্বনা কররে মন,
অতীতের শোক, দুঃখ জ্বালা সব ভুলি,
হাসিয়া বদন তোল শৈশবের ফুলি,
আগে কি কখন আর ভেবেছি স্বপনে,
দুঃখরাশি উথলিবে এ সুখ মিলনে?

শ্রীকুমুদিনী রায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৪ সংখ্যা। } পৌষ ১২৯৮—জানুয়ারী ১৮৯২। } ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বন্ধু হস্ত হইতে রক্ষার প্রার্থনা—স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রের কলে ১১ ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে পারিবে না, এই বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমেদাবাদের শ্রমজীবিনী রমণীগণ তাহার অন্যথার জন্য কাতরোক্তিপূর্ণ প্রার্থনা বোম্বাইয়ের গবর্ণরের নিকট অর্পণ করিয়াছেন। রাজব্যবস্থায় এদেশের কলের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখিনী স্ত্রীলোকদিগেরও উপার্জ্জনের যে ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই। বিলাতের তাঁতিদের লাভের জন্য প্রজার ক্ষতি করা রাজধর্ম্ম নহে।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষা দিয়া নিম্নলিখিত তিনটী পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং প্রত্যেকে ৮০০০৲ টাকা করিয়া ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছেনঃ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ও যে, হুইলার। আজিও কোন রমণী এ পরীক্ষায় প্রতিযোগিনী হন নাই!

লর্ড ডফারিণের পদ বৃদ্ধি—তিনি রাজদূত হইয়া ৭০০০ টাকা বেতনে রোমে কার্য্য করিতেছিলেন, এখন ৯০০০ টাকা বেতনে পারিসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভারত-হিতৈষিণী লেডী ডফারিণের সৌভাগ্যে আমরাও সুখী।

লর্ড লিটনের মৃত্যু—আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন সম্প্রতি ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। পারিসের ইংরাজ চর্চ্চে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উপাসনায় অনেক বড় বড় লোক উপস্থিত হন, রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হয় এবং পদাতিক,অশ্বারোহী ও গোলো-

ন্দাজ সৈন্যদল তাঁহার মৃতদেহের সম্মাননা রক্ষা করে।

লোকসংখ্যা গণনা—সেন্সসের বিবরণ এখনও পূর্ণাবয়বে বাহির হয় নাই। কয়েক স্থানের লোকসংখ্যা যেরূপ জানা গিয়াছে, প্রকাশিত হইলঃ—বোম্বাই প্রদেশে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ, সিন্ধু ২৮ লক্ষ ৭২ হাজার, আজমীর ৫ লক্ষ ৫২ হাজার, পঞ্জাব ব্রিটীষাধিকৃত ২ কোটী ও মিত্ররাজ্য ৪২ লক্ষ, বেরার ২৯ লক্ষ, আসাম ৫৪ লক্ষ, আন্দামান ১৫৬০৯, মহীশূর ৫০ লক্ষ, কাশ্মীর ২৫ লক্ষ।

উদাসীনের চিন্তা।

পুণ্যের জয়।

ঘোষদের বাড়ী বিবাহ। কমল কামিনী দশ দিন পূর্ব্বেই স্বর্ণকারের বাড়ী স্বর্ণ পাঠাইয়াছেন। বিবাহের দিন প্রাতঃকালে কমলকামিনীর স্বামী শিশির বাবু স্বর্ণকারের বাড়ী ছুটিয়াছেন। কিন্তু স্বর্ণকার বেচারী ছোট লোক, কথা ঠিক্ রাখিতে পারে নাই। শিশির বাবু নিরুপায় হইয়া বিরসবদনে ফিরিয়া আসিলেন, এদিকে কমলকামিনী আশার কুহকে পড়িয়া মনে মনে কত জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। কোথায় কোন্ গহনা খানি কিরূপ বসাইবেন, নিমন্ত্রিত অন্যান্য মহিলাগণ অলঙ্কারের কে কিরূপ সমালোচনা করিবেন; তাহারই বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় শিশিরকুমার নিদারুণ সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কমলকামিনীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। ভগ্ন আশার শোক অসহ্য হইয়া উঠিল। শোকাশ্রু গণ্ডদেশ প্লাবিত করিল। শিশির কুমার দেখিলেন বড়ই বিপদ। তিনি অলঙ্কার ঋণ করিবার জন্য প্রতিবেশী বন্ধু শরৎ বাবুর বাটীতে দৌড়িলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেও অকৃতকার্য্য হইলেন। তৎপরে বাড়ী বাড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু মিলিল না। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কমলকামিনী মনে মনে কখন স্বামীকে, কখন বা অদৃষ্টকে দোষী করিতে লাগিলেন। যাহাহউক তিনি অবশেষে স্থির করিলেন যে ভিখারিণীর বেশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন না। শিশির কুমার কত বুঝাইলেন, কত অনুরোধ করিলেন, ভবিষ্যতে কত বেশ ভূষার প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কমলকামিনীর সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। বেলা যখন দ্বিপ্রহর, যখন প্রতিবেশী অন্যান্য মহিলাগণ বেশ ভূষা করিয়া বিবাহ বাড়ীতে যাত্রা করিলেন, তখন কমলকামিনীর শোকের তরঙ্গ আবার

উথলিয়া উঠিল। এবার একটু উচ্চৈঃ-স্বরেই কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী ভগিনীদিগের দুই চারিজনের অনুরোধে অবশেষে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহাদিগের অনুগমন করিলেন। বিবাহ বাড়ীর অন্তঃপুর মহিলাবৃন্দে পরিশোভিত হইল। প্রায় সকলেই সাজ সজ্জা করিয়া আসিয়াছেন, কেবল আসেন নাই কমলকামিনী। মিথ্যা-বাদী নিষ্ঠুর কর্ম্মকার ইহার কারণ। আর আসেন নাই বিভাবতী। কারণ তাঁহার স্বামী দরিদ্র, পঁচিশ টাকা বেতন-ভোগী একজন কেরাণী। ইনি অতি কষ্টে দারিদ্র্যের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। জঠর জ্বালা নিবারণ করিয়া পত্নীকে দুই চারি খানি অলঙ্কার, কি এক খানি মূল্যবান বস্ত্র ক্রয় করিয়া দেন, এমন সাধ্য তাঁহার নাই। তাই বিভাবতী সন্ন্যাসিনীর মত অতি সামান্য বেশ-ভূষা করিয়া আসিয়াছেন।—বাবুর স্ত্রী সরোজিনী এখনও আসেন নাই। বেশভূষার জন্য তিনি মহিলাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রায় ধুমধামের উৎসবেই দুই এক খানি নূতন রকমের অলঙ্কার পরিধান করিয়া উৎসব বাড়ীতে উপনীতা হন। আজ তিনি কোন্ সাজে উপস্থিত হইবেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সকলেই ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময় একটি বালিকা সংবাদ দিল— বাবুর স্ত্রী আসিয়াছেন। ঘোষ পরি-বারের গৃহিণী তাঁহার অভ্যর্থনা করি-বার জন্য অগ্রসর হইলেন, কারণ সরোজিনী সমাজের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সম্ভ্রান্ত মহিলা-সমাজের সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকেন। এ সম্মান তাঁহার সোপার্জ্জিত ধন নহে; তাঁহার স্বামী ধনী এবং জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং সরোজিনী স্বামীর গুণে সর্ব্বত্র আদৃতা। যাহাহউক যখন সরোজিনী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে দেখিয়া অবাক্। আজ সামান্য এক খানি শাড়ী পরি-য়াছেন। অলঙ্কার নাই বলিলেই হয়। অতি দীনবেশে উপস্থিত হইয়াছেন। অথচ বদনমণ্ডলে বিরসতার চিহ্ন মাত্র নাই, হাস্যপ্রফুল্ল মুখ। সকলেই এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া কারণ জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই প্রথমে মুখ ফুটিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে এক বর্ষীয়সী মহিলা তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা আজ এ বেশে কেন? তোমার আর কি এ বেশ শোভা পায়? তোমার ত কিছুরই অভাব নাই। যাদের কিছু নাই, ভাত থাকিতে কাপড় নাই, কাপড় থাকিতে ভাত নাই, তাহাদের এ গরিবের বেশ সাজে। তুমি ধনীর মেয়ে, তা বড় ধনীর হাতে

পড়েছ, তুমি সোনা হীরায় জড়িত হইবে, তুমি কেন কাঙ্গালীর বেশে এসেছ?" দ্বিতীয় বর্ষীয়সী—"এখন এর পয়সার দিকে চোখ পড়েছে। দেখ্‌বে দুদিন পরে বাত্তাহারী হবে। কৃপণতার হদ্দ। তা না হলে কি আর এরূপ হয়। এদের বয়সে আমরা কত পরেছি, ভাই এদের কথা ছাড়িয়া দাও। এদের বাক্‌স বোঝাই করার চেষ্টাই অধিক।" গৃহকোণে বসিয়া সরলা বিমলাকে বলিতেছে "ভাই জান, সরোজিনীর ওসব কি? ওসব বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। বৈরাগ্যের জ্বালায় অস্থির হলেম।" বিমলা—"হাঁ ভাই। কতকগুলা ভণ্ড লোকের জ্বালায় জ্বালাতন হলেম। আমাদের গয়না গুলি যেন তাঁদের চোখের শূল। যখনই একটু সাজগোজ করি, তখনই তাঁহারা আক্রমণ করেন। যেন এসংসারে সকলই তাঁদের বাড়ীর গিন্নিদের মত সৃষ্টিছাড়া মেয়ে হবেন। ভাই তাহাদের সভাতে "বৈরাগ্য চাই, বৈরাগ্য চাই' বলিয়া চীৎকার করেন। কাগজে বৈরাগ্য বিষয়ে যেরূপ লেখেন, এতে অনেকের মন সে দিকে ঝুকিতে পারে। যাক্‌ ভাই, আমি কিন্তু তাঁদের সেকথায় মন দিই না, যারা দুর্ব্বল তাঁরাই পরের কথায় নাচিয়া থাকে। আমাকে দিয়া হবে না।"

সরলা—ভাই! ঠিক্‌ বলেছ। কিন্তু আর এক কথা, যাঁরা বৈরাগ্য প্রচার করেন, তাঁদের ত তেমন কিছু দেখতে পাই না। নিজের সার্টেতে সোনার বোতাম, পায়েতে উলের মোজা বুট, চোখে সোনার ফ্রেমওয়ালা চসমা, মেয়েদের গায়ে সোনা রূপার গয়না, বেনারসী সাড়ী। তবে প্রকৃত বৈরাগী ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। লক্ষ টাকার অধিকারী হয়েও পায় কখনও চটিজুতা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। গায়ে এক খানি লাংক্লথের চাদর। কোথায় তাঁর মত লোকত আর দুটি দেখতে পাই না। কথায় বৈরাগ্যের প্রচার অনেকেই কত্তে পারে, ও আমরাও পারি। কাজের বেলার ত সকলেই পিছ পা।"

বিদ্যাসাগরের নাম শুনিয়া সরোজিনী সেদিকে চলিয়া গেলেন এবং সরলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বিদ্যাসাগর মশায়ের জীবনচরিত পাঠ করিয়া আমার মন কেমন হইয়াছে। তুমিও ত তাঁর প্রশংসা কল্লে, তবে আমায় ঠাট্টা করিতেছ কেন? তুমি যা ভাল বল্লে, তা যদি কেহ করে তা'হ'লে তোমার তার নিন্দা না করে প্রশংসা করাই উচিত।" সরলা—"হা বিদ্যাসাগর হয়েছেন কিনা? তাই সাজ গোজ করেন না! কাল ছিলেন রাজরাণী, আজ হ'লেন ভিখারিণী। দুদিন বাক সব দেখ্‌তে পাব।"

একথা শুনিয়া সরোজিনীর মনে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই চতুর্দ্দিক হইতে তীব্র

সমালোচনা শুনিয়া মনে মনে আপনাকে দুই একবার তিরস্কার করিতেছিলেন। বেশ ভূষা পরিত্যাগ না করিলে তাঁহার এরূপ কথা শুনিতে হইত না, ভাবিয়া দুই একবার মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে আর ওরূপ করিবেন না। বাস্তবিক মানুষ লোকনিন্দার ভয়ে যেরূপ অনেক সময় অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ কখন কখন কোন কাজকে সৎ বলিয়া বুঝিয়াও তাহা করিতে সাহসী হয় না—কখন সাহসপূর্ব্বক কাজ করিয়া পুনর্ব্বার পশ্চাৎপদ হন। সরোজিনীর দশা ঠিক্ এইরূপ ঘটিয়াছিল। জাঁকাল রকমের বেশভূষা করা যে অন্যায়,সরোজিনী তাহা বুঝিয়াই উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশিনীদিগের সমালোচনায় বিষাক্ত বাণে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার মনের সাধুভাব যেন একটু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। সরোজিনীর মনে এখন ঘোরতর সংগ্রাম। সাধুপ্রবৃত্তি তাহাকে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছিল। এদিকে লোকপ্রশংসাপ্রিয়তা কর্ত্তব্য সাধনের পথে দুর্ল্লঙ্ঘ্য গিরির মত দণ্ডায়মান। সরোজিনী মনে মনে একবার অগ্রসর হইতেছেন, একবার ভয়ে ভীত হইয়া নিরস্ত হইতেছেন। হঠাৎ কবির সেই জলন্ত কবিতাটী তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। অমনি মনে আওড়াইলেন :— "কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা জীবনে পালিব তাহা, থাকে থাকে যায় যাক ধন প্রাণ মানরে, পিতারে ধরিয়া রব পর্ব্বত সমানরে।" গভীর অমানিশিতে নির্জ্জন কান্তারে পথভ্রান্ত পথিক দীপ হস্তে একজন চালককে পাইলে যেরূপ সন্তুষ্ট হয়, ঘোরতর সংগ্রামে শক্তিশূন্য হইয়া পরাস্তপ্রায় সেনাপতি নিকটে সাহয্যার্থ সমাগত সৈনিক সমূহের কোলাহল শুনিয়া যেরূপ আশ্বস্ত হয়, নিরাশার হস্তে সমর্পিতা সরোজিনীর প্রাণে এই কবিতাটি সেরূপ আশার আলোক আনিয়া দিয়াছিল। সরোজিনী তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "লোকে যাহাই বলুক না কেন, কখনও সাধুসঙ্কল্প হইতে বিচ্যুতা হইব না।" তিনি এ সময়ে প্রাণে আর এক নবতেজ প্রাপ্ত হইলেন। সংস্কারক সত্যের আলোক লাভ করিয়া প্রাণে যে তেজ পান, এ তেজ সেই তেজ। কে যেন অন্তর হইতে বলিল, সরোজিনী কেবল আত্মরক্ষা করিবার প্রয়াসী হইও না, মহিলাদিগের প্রাণে তোমার সাধুভাব প্রেরণ করিতে সচেষ্ট হও।" কোথা হইতে এই আদেশ প্রচারিত হইল, সরোজিনী তাহা কিছু বুঝিল না। কিন্তু তদবধি তাহার জীবনের ব্রত যেন অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সকল কাজের মধ্যে যেন এ ভাব তাঁহার জীবনে জাগরূক। সকল কার্য্য এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়মিত হইতে লাগিল। তখন সরোজিনী আর ইচ্ছা করিয়াও পূর্ব্বভাব

আনয়ন করিতে পারিতেছেন না! যে অলক্ষ্য শক্তি অনন্ত বিশ্বকে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চালাইয়া লইতেছেন, সে শক্তি অন্তরালে থাকিয়া সরোজিনীর জীবনের সমস্ত কার্য্য কলাপ নিয়মিত করিতেছিল। যিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি সাধুতার আশ্রয় এবং অসাধুতার বিনাশক, তিনিই সরোজিনী দ্বারা এক মহা সত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে দুর্দ্দম তেজ ও অমেয় বল আনয়ন করিতেছেন, যে বল প্রাপ্ত হইয়া সরোজিনী লোক প্রশংসাকে তুচ্ছ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন, যে বল লাভ করিয়া সরোজিনী বহুমূল্য বেশ ভূষায় অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনের প্রবল ইচ্ছাকে অনায়াসে দূরাপনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন্ অনির্ব্বচনীয় অনন্ত উৎস হইতে এই বল ও তেজ আসিয়াছিল সরোজিনী প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু কালক্রমে সরোজিনীর মোহের যবনিকা অপসারিত হইল। বিশ্বাসের আলোক দ্বারা সরোজিনী তখন সেই অনন্ত মহাপুরুষের মঙ্গলময় বিধান বুঝিতে সমর্থা হইলেন। যতই তাঁহার শক্তি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাণে অধিকতর বল সঞ্চিত হইতে লাগিল এবং দুর্দ্দম উৎসাহের সহিত মহিলা সমাজে বেশভূষার অসারতা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সদ্দৃষ্টান্তে অনেক মহিলা অকিঞ্চিৎকর বেশভূষার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রদিগের দুঃখ বিমোচনের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। যে কমলকামিনী অলঙ্কার অভাবে ক্ষুব্ধা হইয়া চক্ষের জল ফেলিয়াছিলেন, তিনিও পরিবর্ত্তিত হইলেন। তিনি সরোজিনীর একজন সহকারিণী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন এবং ক্রমে আরও অনেক রমণী ইঁহাদিগের দলভুক্ত হইল।

বিপ্লব ও সমালোচন।

নবযুগ প্রাচীন যুগের উত্তরাধিকারী। প্রাচীন যুগের প্রথা পদ্ধতি আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি নবযুগের স্কন্ধ দেশে। জগৎ উন্নতিশীল; প্রতি নিয়ত উন্নতির পথে ধাবিত হইবার জন্য সকল যুগেরই অবিশ্রান্ত চেষ্টা। কিন্তু প্রাচীন যুগের প্রথা পদ্ধতির ভার, নবযুগের গতির বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। প্রাচীনার অলঙ্কার রাশি, নবীনার শোভা বর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, বরং পীড়াদায়ক বোঝা হইয়া পড়ে। সুতরাং নবীনার পক্ষে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যজ্ঞাপক বেশ, শারীরিক ও মানসিক ক্লেশদায়ক এবং বর্ব্বর রুচির পরিচায়ক ভূষণ রাশি অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রতি নবযুগের সমাজ

বিপ্লবে প্রথমতঃ গঠন অপেক্ষা ধ্বংস অধিক, সৌন্দর্য্য সংস্থাপন অপেক্ষা নীরস পবিত্রতা বিধান অধিক। যাহা এক যুগের উন্নতির স্বরূপ ছিল, তাহা অন্য যুগে নিতান্ত নিষ্প্রোয়জনীয় হইয়া দাঁড়ায়। পুষ্পদল ফল বিকাশের হেতুভূত; কিন্তু ফলবৃদ্ধি সময়ে, পুষ্পদল যদি ঝরিয়া না পড়িত, তবে ফল বিকাশের উন্নতি হইতে পারিত না। কিন্তু একটী বিষয়ে নবযুগের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন। কোন্‌টি তাহার উন্নতির বাধক, এবং কোনটি তাহার উন্নতির অনুকূল, তাহা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করা চাই। পুষ্পের দল ঝরিয়া পড়ে; কিন্তু উপপত্র বা উপদল, অনেক সময়ে ফলের সহিত সংলগ্ন থাকে। যদি ঐ উপদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইত, তবে ফলের বিকাশ সাধন বিষয়ে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইত। সুতরাং কাহার কি কার্য্য অনুধাবন করিয়া না বুঝিয়া লইলে, বিপ্লব-যুগে অনেক মহানিষ্ট সাধিত হয়। ধর্ম্ম বিশ্বাস বা ঈশ্বর প্রত্যয়, সমাজস্থিতির মূলভিত্তি; কিন্তু অন্যান্য কুসংস্কারসহ, যখন এই ধর্ম্মভাব, রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদিগের তরবারির আঘাতে বিনষ্ট হইল, তখন পারিস নগরী বারবনিতার পদতলে দলিত হইয়া উন্নতির নামে, ঘোর পৈশাচিকতার মধ্যে ডুবিয় গিয়াছিল। সুতরাং বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে অপক্ষপাতী গভীর দৃষ্টিতে প্রাচীন রীতি নীতি প্রথা পদ্ধতি প্রভৃতি সমালোচিত হওয়া চাই।

বলা বাহুল্য যে বিদেশাগত নবভাব তরঙ্গের অভিঘাতে, এদেশের অনেক প্রাচীন সংস্কার চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। উন্নতিপ্রয়াসী নব্যসম্প্রদায়, পদে পদে প্রাচীন ভাবের বাধা অনুভব করিতেছেন; এবং কোথাও কোথাও বা উন্নতির পথের আবর্জ্জনা বিবেচনা করিয়া অনেকে অনেক প্রাচীন প্রথা, বিদূরিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহারা এই অবশ্যম্ভাবী আসন্ন বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনকে বাধা দিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা ইতিহাসানভিজ্ঞ ও বাতুল। উন্নতি কালের ধর্ম্ম; এবং উন্নতি বা বিকাশ অর্থই পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তন ও উন্নতি আবার গতিসাপেক্ষ; এবং বিজ্ঞানে গতি ও তাপ সমার্থবোধক। সুতরাং এই উন্নতিতে যে তাপ সঞ্জাত হইবে তাহা অনিবার্য্য। যাহারা প্রাচীনতার অন্ধকার মধ্যে ডুবিয়া আছে, তাহাদের চক্ষে নবালোকের দীপ্তি অসহ্য হইবেই হইবে; এবং সহস্র হাহাকার ও প্রতিকূলাচরণ সত্ত্বেও, অচল প্রাচীন গৃহ ধূলিসাৎ হইবে এবং তৎ স্থানে, নবগৃহ মস্তক উত্তোলন করিবে। সুতরাং যাঁহারা বাধা দিতে প্রয়াসী, তাঁহারা আত্মঘাতী মাত্র। বাধা না দিয়া বরং যাহাতে উন্নতিপ্রয়াসীদিগের কার্য্যে হটকারিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা দোষ না স্পর্শে, তাহার

জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করা চাই, নিরপেক্ষ ভাবে প্রাচীনের দোষ গুণ সম্যক্ আলোচনা করিয়া দেখা চাই এবং দেখান চাই।

এইজন্যই পরিবর্ত্তন যুগে সমালোচনা বড় প্রয়োজনীয়। একজন ইংরাজ সমালোচক লিখিয়াছেন যে প্রকৃত সমালেচনার অর্থ "To see things as they are"—অর্থাৎ যে যাহা তাহাকে ঠিক্ সেই স্বরূপে দেখা এবং বোঝা। আমাদিগের দেশে যদি কোন কিছুর অভাব থাকে, তবে এই সমালোচনার সম্পুর্ণ অভাব আছে বলিতে পারি। আত্মাভিমান, জাত্যভিমান, অন্ধ দেশ-হিতৈষণা, পরবিদ্বেষ, অনভিজ্ঞতা, মূর্খতা প্রভৃতির চাপে, চিত্তের সুব্যবস্থিত ভাব, দৃষ্টির সমতা, এবং বিচারের গাম্ভীর্য্যের অনেক ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে। আমরা প্রাচীন আর্য্যজাতি, আমরা আবার কোনও অংশে ইংরাজদিগের অপেক্ষা হীন, একথা প্রাণান্তেও স্বীকার করিতে চাই না। ইংরেজের কোন কোন গুণ যে আমাদের বিশেষ অনুকরণীয়, তাহা দেখিতে পাই না। আমাদের সমাজ মধ্যে যে কত কুসংস্কারের বিষবীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, তাহা আদৌ জানি না। পরের ভাল গ্রহণ করিবার শক্তি নাই; অথচ চিত্তের অব্যবস্থিত ভাবের ফলে, অনেক সময়ে প্রবৃত্তির অনুরোধে বা তাড়নায়, অন্যের যাহা মন্দ তাহা গ্রহণ করিয়া ফেলি, এবং নিজের যাহা মঙ্গলপ্রদ, তাহা পদতলে বিদলিত করি। অনেক সময়ে আমরা পরের যাহা যাহা অনুকরণ করি, বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, যে প্রবৃত্তির উত্তেজনায়, যখন বুদ্ধির জড়তা উপস্থিত হইয়াছিল সেই সময়েই সেই গুলি গ্রহণ করিয়াছি। মার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া অনুকরণ করিতে গেলে, ফল অন্যরূপ হইয়া পড়িত। যখন বুদ্ধি জাগরূক থাকে, তখন বৃথা অভিমান বা একটা কল্পিত দেশহিতৈষণার ভাব দ্বারা পরিচালিত যইয়া, অনুকরণ দূষ্য মনে করি; কিন্তু বুদ্ধির মূঢ়াবস্থায় যখন প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হই, তখন আর নিজের কার্য্যের উপর নিজের কোন প্রভাব থাকে না। তাই অজ্ঞাতসারে আর্য্যজাতির আড়ম্বরশূন্যতা এবং চিত্তসংযম পদদলিত করিয়া আমরা বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া পড়িতেছি; এবং অন্য জাতির উদ্যম এবং কার্য্যশীলতা, বণিকজনোচিত বা হীনজাতির উপযোগী বলিয়া বৃথা জাতিকুলের বড়াই করিয়া, দিন দিন দারিদ্র্য সাগরে ডুবিতেছি। চিত্তের যে সমতা সমালেচনার জন্য প্রয়োজন, তাহা যে সমাজে জন্মিতে পারিতেছে না, সেখানে উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র।

যদি কেহ আমাদের সমাজের কোন দোষ দেখাইয়া দেয়, আমরা কদাচ সেই দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখি না বাস্তবিকই সেটি

দোষ কি না; বরং সে দিকে পশ্চাৎ ফিরাইয়া অন্য সমাজের কত দোষ আছে তাহারই একটা গভীর গণনায় প্রবৃত্ত হই। ইহাতে লাভ তো কিছুই নাই; অতিরিক্ত লোকসানের ভাগ দ্বিগুণ। প্রথমতঃ আত্মদোষের প্রতি অন্ধ হইয়া আপনার উন্নতির মূলে আপনি কুঠারাঘাত করা হয়; দ্বিতীয়তঃ পরদোষ দর্শন ও পরদোষ কীর্ত্তনের ফলে চিত্তের ভয়ঙ্কর নীচতা জন্মিয়া উঠে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আমরা আত্মদোষ দর্শনে বিমুখ নহি; তবে অন্য জাতি যদি আমাদের দোষের কথা উল্লেখ করে, তবে তাহা বড় অসহ্য হইয়া উঠে। রাগ করিয়া তাহাদের দোষ দেখাইতে প্রবৃত্তি হয় এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য অভিলাষ হয়। ইহারই নাম চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়া। যদি তোমার অন্তঃকরণে বাস্তবিকই উন্নতি লাভের ইচ্ছা থাকিত, তবে তুমি দোষ প্রদর্শন-কারীকে পরমবন্ধু ভাবিয়া তাঁহার কাছে বরং কৃতজ্ঞ হইয়া আত্মত্রুটী সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে। কিন্তু তোমার আচরণ যখন বিপরীত, তখন তুমি মুখে যাহাই বল, তোমাকে মূর্খ এবং অর্ব্বাচীন ভিন্ন কেহ আর কিছু বলিবে না। স্থিরচিত্তে, স্নিগ্ধ মস্তিষ্কে, এবং প্রবল উন্নতির ইচ্ছা পোষণ করিয়া যিনি সামাজিক রীতি-নীতির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। অমুক প্রথা দেশীয়, অমুক প্রথা বিদেশীয়, অমুক প্রথা প্রাচীন, অমুক প্রথা নবীন, একথার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সংকীর্ণচেতার কর্ম্ম। অবলম্ব্য প্রথা ভাল কিনা ইহারই বিচার করা চাই। যদি ভাল হয়, তবে বিদেশীয় বা নূতন বলিয়া উপেক্ষিত হইবে কেন? যদি মন্দ হয় তবে দেশীয় বা প্রাচীন বলিয়া রক্ষিত হইবে কেন? স্থির দৃষ্টিতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইবে এই মাত্র। তাহার পর তোমার অনুষ্ঠানে প্রাচীন ভাঙ্গিল, কি নবীন গঠিত হইল; দেশের মর্য্যাদা রক্ষা পাইল, কি বিদেশের গৌরব বৃদ্ধি হইল, সে কথা আদৌ চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার একমাত্র লক্ষ্য কর্ত্তব্যপালন, তাহাতে পৃথিবী তোমার অনুকূল হউক বা প্রতি-কূল হউক তাহা গ্রাহ্য করিও না। তবে তোমার উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ যেন হঠকারিতা বা উষ্ণমস্তিষ্কতার দ্বারা না হয়। সর্ব্বদা সাবধানে চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্নিগ্ধ মস্তিষ্কে এবং স্থিরচিত্তে তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া সামাজিক দোষগুণের বিশেষ সমালোচনা করিবে। এ কার্য্যে সর্ব্বদা অকুতোভয় হইতে হইবে এবং মনে রাখিও যে যিনি ন্যায়পথের দিকে অগ্রসর হয়েন, বিধাতা তাঁহার নিত্য আমুকূল্য বিধান করিয়া থাকেন। একটি প্রাচীন কবিতায় আছে যে—

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদিবা স্তুবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্,
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা,
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

নীতিবিশারদেরাঃ নিন্দাই করুন বা প্রশংসাই করুন, ধনাগমই হউক অথবা দারিদ্র্যই হউক, অদ্যই মৃত্যু হউক বা আর এক যুগ পরে হউক, ধীর ব্যক্তি-গণ এসকল চিন্তা উপেক্ষা করিয়া থাকেন এবং কদাচ ন্যায়-পথ হইতে বিচ্যুত হয়েন না।

বি, ম।

বিবী গ্রিমউড।

ব্রিটন-ঈশ্বরী কেন সমাদরে,
'রয়াল্ রেড্ ক্রস্' তব বক্ষ পরে,
পরাইছে আজ ?—রমণী-সমাজ,
কেন উল্লসিত স্মরি তব কাজ ?
বীরাঙ্গনা বলি—সমস্ত ব্রিটনে,
পূজিছে তোমায় কেন কায়মনে ?
যে বীরত্ব তুমি দেখাইলে সবে,
সে বীরত্ব আর কাহারে সম্ভবে ?
বীরজাতি মাঝে জনম তোমার,
যে জাতির যশ সর্ব্বত্র প্রচার।
বীর দাপে যাঁর কাঁপে বসুমতী,
অবনতশির কত নরপতি—
যে ব্রিটন কাছে—তাঁহার গৌরব,
বাড়াইলে তুমি দিয়ে অভিনব
অলঙ্কার এক—অমূল্য রতন—
অসম সাহস—অতুল বিক্রম !
মণিপুর হতে—হাঁটিয়ে কাছার,
রমণী হইয়ে গেলে কি প্রকার ?
লঙ্ঘিলে কিরূপে সে দুর্গম পথ,
শ্বাপদসঙ্কুল পাহাড় পর্ব্বত ?
যতবার শুনি—অদ্ভুত কাহিনী,
আতঙ্কে শিহরি উঠি যে অমনি !
ভাবিয়ে অবাক্—রমণীর কাজ,
বীরেরাও হেরি পায় মহালাজ !

কে দেখাবে হেন বীরত্ব আর ?
সন্তান যেমন পাইলে জননী,
আহত সৈন্যেরা তোমারে তেমনি,
পেয়ে সন্নিকটে—বিষম সঙ্কটে,
গিয়েছিল ভুলি সে গিরি-সঙ্কটে।
ঘোর বিপদেও অটল-নির্ভয়,
ধন্য ধন্য ধন্য রমণী-হৃদয়।
সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ,
নিয়োজিত যেন নারীর পরাণ।
ভুলি স্বার্থ সুখ—পরের কারণ,
নারীবিনে কেবা করিবে পালন,
সেই মহাব্রত—পর উপকার ;
কে আছে এমন নিঃস্বার্থ উদার !
দয়ার প্রতিমা—স্নেহের পুতলি,
কোমল হৃদয়—দুঃখে যায় গলি।
ঘুচাইতে বুঝি অবনীর ভার,
সৃজিলা নারীরে—সৃষ্টির আধার।
শিরায় শিরায় দিলা স্নেহরস,

কে দেখেছে কবে নারীরে কর্কশ!
জানেনা সে কারে কঠিনতা কয়,
দয়াগুণে তাঁর বিশ্ব পরাজয়!
সংসার-উদ্যানে স্বর্গ পারিজাত,
দুঃখের আঁধারে সুখ-সুপ্রভাত।
সৌন্দর্য্যের সার-গুণের গরিমা,
মিলে কি জগতে নারীর উপমা?
অতুলনীয়া নারী এ জগতে।
সত্য বটে তুমি হারায়েছ সব
ইহ সংসারের আনন্দ উৎসব।
ভাঙ্গিয়াছে এবে সুখের স্বপন
(স্বপন সফল হয় কি কখন?)
ঘেরিয়াছে ঘোর নিরাশা আঁধারে
আশার অলোক নাহি এসংসারে।
অতুল সম্পদে ছিলে মণিপুরে,
অস্থায়ী সে সুখ গেছে তাই দূরে।
দাসদাসী সেথা ছিল অগণন,
কোথায় সে সব গিয়েছে এখন?
কাটিতেছ দিন হয়ে ভর্ত্তৃহীন,
বৈধব্য-যাতনা দুর্দ্দশা দুর্দ্দিন
পেষিছে তোমারে—সদা অনুক্ষণ,
দুখের সাগরে রয়েছ মগন।
কিন্তু ভেবে দেখ চিরদিন কার
একভাবে যায়!—অনিত্য সংসার।
ওই দেখ চেয়ে—রাজপরিবার
অদৃষ্টের চক্রে ঘুরি অনিবার
কর্ম্মফল ভোগ করিছে কেমন?
সহস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে এমন।
নিয়তির করে নাহিক নিস্তার,
কেবা রাজা প্রজা সব-একাকার,
আজ যে উত্থিত সম্পদ শিখরে,
কাল সে কাতর মুষ্টি ভিক্ষা তরে।
আজ যে বিপুল বৈভবের স্বামী,
কাল সে বিপত্তি সাগরেতে নামি
বহিছে দুঃখের অতি গুরু ভার,
শ্মশান সমান সুখের সংসার।
কিন্তু ভেবে দেখ বলি আর বার
চিরদিন যায় সুখেতে কাহার?
অদৃষ্টের ভোগ ভুগিতে হয়।
বীরাঙ্গনা বলি দেখ কি প্রকারে—
সমস্ত জগত পূজিছে তোমারে,
তব বেদনায় ব্যথিত সকলে।
'কণ্ডোলেন্স লিপি' ওকরকমলে
আসিয়াছে কত সংখ্যা নাহি তার।
হিমালয় হতে কুমারিকা পার—
সমস্ত ভারত শোকেতে মগন
তোমার কাহিনী করিয়ে শ্রবণ।
য়ুরোপ এশিয়া আমেরিকা সব,
পরিহরি সুখ আনন্দ-উৎসব,
ভাসিতেছে সবে নয়নের জলে;
হত্যাকাণ্ড কথা শ্রবণ যুগলে
পশেছিল যাই, পাষাণ হৃদয়
গলে গিয়াছিল হয়ে দ্রবময়!
আজিও স্মরণে বিদরে বুক।
যে বীরত্ব তুমি দেখাইলে ভবে
সে বীরত্ব বল কজনে সম্ভবে?
ইহ কালে তার নাহি পুরস্কার;
স্বর্গে যবে যাবে ছাড়ি এসংসার,
তোমার জননী যতনে আদরে
চুম্বন করিয়ে ডেকে লবে ঘরে!
শোক তাপ দুঃখ ঘুচাইবে সব
আবার দিবেন আনন্দ উৎসব।

সোণার কিরীট পরাইয়া শিরে,
বসাইবে তায় মণি মুক্তাহীরে।
বসনে ভূষণে সাজাইয়ে কায়,
রত্ন সিংহাসনে বসাবে তোমায়,
বীরাঙ্গনা যত রমণী পাশে।

শ্রীচ।

সত্য-পরায়ণতা।

১-শক্তসিংহ।

স্বদেশবৎসল বীরবর প্রতাপসিংহ ও শক্তসিংহের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় যে দিন মিবাররাজ-পুরোহিত সেই বিবাদজনিত অনর্থ বুঝিতে পারিয়া শাণিত ছুরিকা দ্বারা স্বীয় হৃৎপিণ্ড ছেদন পূর্ব্বক আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন—যে-দিন তাঁহার পূত শোণিতে সিক্ত হইয়া পৃথিবী আপনাকে পবিত্রা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই দিন রাজা প্রতাপ-সিংহের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহা-দের ভ্রাতৃদ্বয়ের এই বিবাদই হিতৈষী পুরোহিতের মৃত্যুর কারণ, এবং তজ্জন্য তিনি ক্রোধারক্ত নয়নে শক্তসিংহকে বলিলেন যে "তুমি আমার অধিকার হইতে দূর হও।" শক্ত অগ্রজের সেই কঠোরাদেশ শ্রবণেপ্রতিহিংসার্থে মোগল-পতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তদবধি শক্তসিংহ প্রতাপের ঘোর শত্রুরূপে পরিণত হইলেন, এমন কি যখন হলদি-ঘাটের ঘোর সংগ্রামে প্রতাপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনও শক্ত অগ্র-জের প্রতি কিছুমাত্র দয়া বা আনুকূল্য প্রকাশ করেন নাই, বরং প্রাণপণে বৈর-সাধনেই সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

যখন প্রতাপসিংহ একাকী সেই রণ-স্থল পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তখন দুইজন মোগল সৈনিক অশ্বারো-হণে প্রচ্ছন্নভাবে প্রতাপের অনুসরণ করিল। এই দুইজন সৈনিকের মধ্যে এক জন খোরাসানী, অপর ব্যক্তি মুলতানী। প্রতাপ, পশ্চাদ্ধাবিত সৈনিকদ্বয়ের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। তিনি শোণিতাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার প্রিয়তম অশ্ব চৈতক ও অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি সে স্বীয় প্রভুকে বহন করিয়া দ্রুতবেগে চলিতেছে। শক্তসিংহ মোগলবাহিনীর মধ্যে থাকিয়া এই সমস্ত দর্শন করিতে-ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ক্ষণিক পূর্ব্বে যিনি জ্যেষ্ঠের হৃদয় শোণিত দ্বারা বিদ্বে-

ষানল নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এখন তিনি স্বদেশবৎসল বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাকে শোণিতসিক্ত, ক্ষতাঙ্গ, নিঃসহায়, পলায়নপরায়ণ, বিপন্নজীবন ও স্বাধীনতাভ্রষ্ট দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, তাঁহার প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল। তিনি তেমন স্বদেশানুরাগী ভ্রাতার পরম শত্রু, আর তেমন বিপন্নাবস্থায়ও ভ্রাতার প্রতি কিছুমাত্র আনুকূল্য প্রদর্শন না করিয়া কেবল তাঁহার জীবন ও স্বাধীনতা বিনাশের চেষ্টা করিয়া মাতৃভুমির সর্ব্বনাশে সমুদ্যত, এই সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় যাতনা প্রদান করিতে লাগিল, তিনি অনুতাপে অধীর হইয়া পড়িলেন। বিপন্ন ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বারোহী মোগলসৈনিকদ্বয়কে ধাবিত দর্শনে তাঁহার কঠিন হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি আর এখন প্রতাপের শত্রু থাকিতে পারিলেন না—তিনি এখন প্রতাপের ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতা ও বিপদের বন্ধু। প্রকৃতির আদেশ ও কর্ত্তব্য কার্য্য উল্লঙ্ঘন করিয়া সংসারে লোক কয় দিন সুখ শান্তি ভোগ করিতে পারে? প্রকৃতির আদেশ ও কর্ত্তব্য অবহেলা জনিত যে অশান্তি রাশি লোক-হৃদয়ে অবস্থান করে, সেই অশান্তিই মনুষ্যকে নিসর্গের আদেশ ও কর্ত্তব্য পালনে শিক্ষা দেয়, তাই শক্তসিংহ আজ অনেক দিন পরেও ভ্রাতৃস্নেহে ও স্বদেশের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া প্রতাপসিংহের অনুকূলে ধাবমান হইলেন।

একটী গভীর ও অপ্রশস্ত গিরিনদীর পুলিনে আসিয়া প্রতাপ উপনীত হইলেন। প্রতাপের ঘোটকরাজ চৈতক এক লম্ফে সেই গভীর সংকীর্ণ তটিনীর পরপারে উত্তীর্ণ হইল, কিন্তু সৈনিকদ্বয়ের অশ্ব চৈতকের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিতে পারিল না, তথাপি প্রতাপ নিরাপদ হইতে পারিলেন না, কারণ তাঁহার জীবনরক্ষক চৈতকও রণশ্রমে শ্রান্ত, শোণিতাক্ত ও ক্ষতাঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতে আবার স্বীয় প্রভুকে বহন করিয়া এতদূর দ্রুতবেগে আসিয়াছে, সুতরাং তাহার দ্রুতগতি এক্ষণে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। অতএব মোগলসৈনিকদ্বয় নিজ নিজ অশ্বকে দ্রুত চালিত করিয়া প্রতাপের সন্নিহিত হইল। এমত সময় প্রতাপ বন্দুকের ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, চৈতকও যথাসাধ্য চলিতে লাগিল, বন্দুকধ্বনির ক্ষণকাল পরেই প্রতাপ শুনিতে পাইলেন যে দূরে পশ্চাৎ হইতে কে তাহার মাতৃভাষায় গম্ভীর স্বরে বলিতেছে "হো নীল-ঘোড়ারা আসাওয়ার।" প্রতাপ চমকে চাহিলেন, চাহিয়া কি দেখিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে রোষ, অভিমান ও জিঘাংসা যুগপৎ তাঁহাকে অভিভূত করিল, তিনি পাদদলিত ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন ও অশ্বকে ফিরাইয়া নিজ তরবারি উদ্যত করিয়া শত্রুর সন্নিকটে আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শক্ত যখন তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, তখন তাঁহার ভ্রম দূর হইল,

শক্তের ম্লান, বিষণ্ণ ও লজ্জাবনত বদন দর্শনে তিনি বিস্মিত হইলেন—বিস্মিতের অধিক আনন্দিত হইলেন, যে শক্ত তাঁহার রাজ্য রক্ষার্থে দক্ষিণ হস্ত, বিপদে বন্ধু, সম্পদে সুহৃদ্ ও মন্ত্রী, স্নেহে পুত্র-তুল্য, সেই শক্ত তাঁহার জীবনের স্বাধীনতা ও মাতৃভূমির ঘোর শত্রু ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়? আর সেই শত্রুকে পুনরায় ভ্রাতারূপে প্রাপ্ত হওয়া যে কি আনন্দের বিষয় তাহা তখন এই শিশোদীয় বীরদ্বয়ই জানিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, শক্ত সত্বর জ্যেষ্ঠের চরণ বন্দনা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং বলিলেন "আপনি দেবতা, আমি নারকী; আপনি স্বদেশবৎসল, আমি কুলাঙ্গার স্বদেশবিদ্বেষ্টা হইয়া পড়িয়াছি; আপনি মাতৃভূমির উপযুক্ত পুত্র, আমি অযোগ্য তনয়; অতএব অধুনা আমি আপনার কৃপার পাত্র, আমাকে দাস ও শিষ্য জ্ঞানে ক্ষমা করুন।" প্রতাপ ভ্রাতার বচন শ্রবণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাসে অভিভূত হইলেন, তিনি পদতলে পতিত ভ্রাতাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরস্পর অশ্রুসেকে পরস্পরের বক্ষ প্লাবিত করিলেন। প্রতাপ বলিলেন, আজ আমি আমার অনেক দিনের হারারত্ন প্রাপ্ত হইয়া দারুণ দুঃখ ও মনোবেদনা সকল ভুলিয়া গিয়াছি; প্রতাপ ভ্রাতাকে পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার অধিক উপকারী জীবনরক্ষক প্রিয়তম চৈতককে সেই স্থানে হারাইলেন, তাঁহার সেই আনন্দ-সমুদ্রে কে যেন বিষরাশি ঢালিয়া দিল। যে চৈতক ব্যতীত তিনি সেই দিন বিশাল মোগলবাহিনীর মধ্য হইতে বহির্গত হইতে পারিতেন না, সেই চৈতক এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে তুরঙ্গরাজ চৈতক যথাসাধ্য স্বীয় প্রভুর উপকার সাধন করিয়া অশ্বলীলা সম্বরণ করিলে শক্ত নিজ অশ্ব ভ্রাতাকে প্রদান করিয়া বলিলেন, আমি যত শীঘ্র পারি আপনার সহিত মিলিত হইব।" অনন্তর শক্তসিংহ খোরাসানী সৈনিকের অশ্বে আরোহণ করিয়া মোগল শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন, প্রতাপও শক্তের আনকারো নামক অশ্বের পৃষ্ঠে উঠিতে বাধ্য হইলেন।

শক্তসিংহ মোগল শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া সম্রাটতনয় সেলিমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেলিম শক্তের বিলম্ব হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তেজস্বী শক্ত কোন কথাই গোপন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি অকুতোভয়ে খোরাসানী ও মুলতানী সৈনিকদ্বয়ের বধবৃত্তান্ত ও প্রতাপকে আনুকূল্য প্রদান বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিয়া বলিলেন একটী বিশাল রাজ্যভার আমার অগ্রজের স্কন্ধে, তাহাতে এখন তিনি নিতান্ত দুরবস্থায় গুপ্ত সৈনিকদ্বয়ের হস্তে জীবনহারা হন দেখিয়া আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? সেলিম শক্তের সত্যপরায়ণতা দর্শনে চমৎকৃত ও প্রীত হইলেন, এবং বলিলেন

"রাজপুত! আমি আপনার সত্যপরায়ণতা দর্শনে অতীব প্রীতি লাভ করিয়াছি, নতুবা আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন এই কার্য্যকারী ব্যক্তি অবশ্যই দণ্ডার্হ। কিন্তু আমি সন্তোষ সহকারে আপনাকে বিদায় দিতেছি, আপনি স্বেচ্ছানুসারে আপনার ভ্রাতার সহিত মিলিত হউন।"

শক্তসিংহ সেলিমের বাক্য শ্রবণে আর তথায় তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া ভ্রাতা বীরপুঙ্গবের নিকট যাত্রা করিলেন। জ্যেষ্ঠকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত ভিনসর দুর্গ পরাজয় করিয়া উদয়পুরে উপস্থিত হইয়া অগ্রজের চরণ বন্দনা করিলেন।

কু, রা।

ভিখারিণীর গীতি।

বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া রমণী-কণ্ঠে ডাকিতেছে—"জয় হরে কৃষ্ণ! ভিক্ষা চাই গো!"

ভিখারিণীকে দেখিয়া গান শুনিবার সাধটা আমার বড়ই জাগিয়া উঠিল, "বলিলাম দিচ্ছি ভিক্ষা, আগে একটা গান গাও না?"

আমার কথা না ফুরাইতেই ভিখারিণী মধুর কণ্ঠে মধুর তানে গান ধরিল—

"এ জনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে?"—

আমি মনে করিয়াছিলাম, সে গাহিবে "বল্ হরিবোল বলে পাগল" ইত্যাদি—নয়ত ঐ রকম আর কিছু—ওমা! তা নয়, পোড়ার মুখী এ কি ছাই গান গাহিতেছে?—বেগতিক দেখিয়া বাধা দিয়া বলিলাম, তুমি ও কি ছাই আরম্ভ করিলে? দেবতার গান গাও।"

তা আমার কথা শোনে কে?—দেখি গায়িকা ভাবে বিভোর হইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছুটাইয়া, গদগদ কণ্ঠে প্রাণের উচ্ছ্বাস ঢালিতেছে—

"এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ
ফুরাইবে,
কিবা জন্মান্তরে মোর সেই সাধ
পুরাইবে?
বিধি! তোরে সাধি শুন,
যদি জন্ম দিবে পুন,
আমারে আবার যেন রমণী-জনম দিবে;
লাজ ভয় তেয়াগিব,
এ সাধ মোর পূরাইব,
সাগর-ছাঁচা রতন নিব, কণ্ঠে রাখ্‌ব নিশি
দিবে"।

গাহিতে তাহার দুই চক্ষে ধারা বহিল! গলাটিও খুব মিষ্ট!—কিন্তু তা হইলে কি হয়? ভদ্রলোকের বাড়ীর মধ্যে এ রকম গান করিতে শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল—তাহাকে বলিলাম, "তুমি এ রকম গান গাহিলে কেন? ছি!"

ভিখারিণী হাসিল, তার পরে বলিল

"আমি ভিখারিণী, আমার পুঁজি কেবল এই গান।"

আমি। তা, আর কোন ভাল গান শিখিতে পার তো?

ভিখা। আর কোনও গানে আমার প্রয়োজন দেখি না।

আমি। তোমার নিজের জন্যে প্রয়োজন দেখ আর নাই দেখ, দশ জনের জন্যে অবশ্য প্রয়োজন আছে। গৃহস্থ বাড়ীতে ও রকম গান গাইতে নাই।

ভিখারিণী আবার হাসিল, তারপর বলিল "সত্য বলিয়াছ ভাই, আমার নিজের প্রয়োজন সবই প্রায় ফুরাইয়াছে, এখন দশজনের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন। তা তোমাদের গৃহস্থ-বাড়ীতে এ গান গাইব না কেন? তোমাদের গৃহস্থ বাড়ী কি প্রবৃত্তির রাজ্য? সেখানে কি কেবল স্বার্থপর-তারই ছড়াছড়ি?

আমি অবাক্! এমন তর কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য মেয়েও আছে?—মুখে বলিলাম "তোমার গানটার মানে বুঝিলে ওসব কথা বলিতে পারিতে না, "প্রবৃত্তি," স্বার্থপরতা" কাহাকে বলে বোঝ কি?"

ভিখা। "প্রবৃত্তি কি স্বার্থপরতার বিষয়ে আমার বেশি জ্ঞান নাই—কিন্তু গানটা কতক দূর বুঝি। বলিলে তুমি বুঝিতে পারিবে কি?"

দেখ দেখি পাঠিকা ভগিনি! হাড় জলিয়া উঠে না? যেন তর্কবাগীশ মহাশয় আমার কাছে বেদ বেদান্ত ব্যাখ্যা করিবেন, তাই আমি বুঝিতে পারিব না? কিন্তু এতক্ষণ সহিয়াছি তো আরও একটু সহিব,তার পর পাঠিকা ভগিনীতে আমাতে মিলিয়া মাগীকে দিয়া বিদায় করিব। এই ঠিক্ করিয়া বলিলাম, "বুঝি না বুঝি সে ভার আমার, তুমি বুঝাইতে পারিবে তো?"

ভিখা। তুমি বোঝ না বোঝ, আমি শুনাইব। এই গানেই আমার প্রয়োজন কেন—আমি সংসার-বন্ধন-শূন্যা, পরমুখাপেক্ষিণী, ভিক্ষা-বৃত্তি-ধারিণী, কেন যে এ গীতি-তরঙ্গে প্রাণ ঢালিয়াছি, তা তোমার কাছে বলিব—নরদেবতা কমলাকান্ত ঠাকুর বেণা বনে মুক্তা ছড়াইতে ছড়াইতে যে পথে গিয়াছেন, আমি নরাধমা সেই পদাঙ্কই লক্ষ্য করিয়াছি। আমি প্রথমে গাহিয়াছি—

"এ জনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে?"

এজনমে সাধ অনন্ত—পিপাসা অনন্ত; সকল সাধ পোরে না, জনমের সঙ্গেই ফুরাইয়া যায়। যে সকল সাধ পশুবৃত্তি প্রসূত তাহা মানবের সহিত ফুরাইলেই মঙ্গল। কিন্তু যে সাধ, দয়াময় জদীশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন, যে সাধ পূর্ণ হইলে এই পৃথিবী স্বর্গ-রাজ্য বলিয়া অনুভূত হয়, সে সব পবিত্র সাধ কি কোনও দিন পূর্ণ হইবে না? আমি ভিখারিণী, মনুষ্যকুলে নগণ্যা, দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করাই আমার জীবিকা, আমার প্রাণের প্রাণে

সাধ জাগিতেছে, একদিন দেখিব মা জন্মভূমির মলিন মুখে হাসি ফুটিয়াছে, একদিন দেখিব মা'র বক্ষ পুত্ররত্নে কন্যা-রত্নে শোভিত হইয়াছে, দেখিব সকলেই পাপমলিনতার অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, সকলেই দেবতা এবং দেবী হইয়াছেন, আমি একবার সেই দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিব—আমার এই যে একমাত্র সাধ, ইহা কি এই জনমের সঙ্গেই ফুরাইবে? এ দেহ ভস্মীভূত হইবার সঙ্গে বিলীন হইবে?

"কিবা জন্মান্তরে মোর এই সাধ পূরাইবে?"

সে প্রাণভরা দৃশ্য না দেখিলে কিন্তু আমার ভাল করিয়া মরা হবে না—আমি মরিতে পারিব না! এ পঞ্চ-ভৌতিক অথবা বহুভৌতিক দেহ শ্মশান-ধূলি হইবে, তাহাতে দুঃখ নাই; এ যত্নমার্জ্জিত দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া নদী-সৈকতে পড়িয়া রহিবে তাহাতে আমার ক্ষোভ নাই; আসিয়াছি, ফিরিয়া যাইতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু যাহা বলিয়াছি—আমার প্রাণের সাধ পূর্ণ না হইলে, সে প্রাণভরা দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিতে না পাইলে, আমার ভাল করিয়া মরা হবে না—তাই আমার জিজ্ঞাস্য এ জন্মে না হইলেও জন্মান্তরে আমার সাধ পূর্ণ হইবে কি? আমি "দর্শন বিজ্ঞান" চাহি না, স্বর্গে আমার কাজ নাই, সালোক্যসাযুজ্যের আমি অযোগ্য, নির্ব্বাণ মোক্ষ আমার মত নরাধমার জন্যে নহে; আমি "পুনর্জন্ম" চাহি—এই জগতী-তলে বিচরণ করিয়া "কৃপা পাত্রা" হইব, দশজনের কাছে ভিক্ষা করিব, দশজনের "রাঙা মুখ" দেখিতে পারিব—এ প্রাণে সবই সহিবে—একদিন যদি মা'র মুখে হাসি দেখিতে পারি—তাহা হইলে আমার প্রাণে সবই সহিবে-আমি আমার সুখ দুঃখ বুঝি না—রাজার যেমন প্রজার সুখে সুখ, ভার্য্যার যেমন স্বামীর সুখে সুখ, মা'র যেমন সন্তানের সুখে সুখ, আমি ভিখারিণী আমার সর্ব্বস্ব ধন তুমি মা জন্মভূমি, তোমার সুখেই আমার সকল সুখ, তাই আমি "জন্মান্তর" চাহি। পরজন্ম আর কাহারও না থাকে, আমায় দিও জগদীশ! আমি তোমার এই অসীম কার্য্যক্ষেত্রে তোমার হইয়া তোমার কার্য্য করিব, এবার এ ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম ক্ষমতায় কুলাইল না—অনেক বাকি রহিল, জন্মান্তরে এসাধ পূর্ণ হইবে কি?—

"বিধি! তোরে সাধি শুন,
যদি জন্ম দিবে পুন,
আমারে আবার যেন রমণী জনম দিবে"

আমায় রমণী করিও প্রভো! লোকে শুনিয়া হাসে হাসুক, আমি রমণী-জন্মই প্রার্থনা করি। আমি পরাধীনা—যখন হৃদয়হীন, কর্কশভাষী, মানবগুলার কাছে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইতে হয়, যাহারা অসত্যকে "সত্য" বলে, সেই গুলা যখন বিধাতা হইয়া দাঁড়ায়, তখনই আমরা পরাধীন—সেই অধীনতাই বড় দুঃখের। আর যখন দেবতার সম্মুখে

হাত যোড় করিয়া দাঁড়াই—জগদীশ! তোমার পবিত্রতা, তোমার মধুরতা, তোমার প্রদত্ত সদাশয়তা, যাঁহাদের হৃদয়কে "স্বর্গ" করিয়া রাখিয়াছে, সেই দেবতাদিগের সম্মুখে যখন হাত যোড় করিয়া দাঁড়াই, তখন—তাঁহাদিগের পবিত্র আদেশ পালন করিবার মত সুখের আর কিছুই দেখি না, এ সুখ রমণীরই একচেটিয়া!

আমায় রমণী জন্ম দিও প্রভো! আমি অবরোধবাসিনী বলিয়া আমার দুঃখ কিসে? যেখানে ভূত প্রেতের দৌরাত্ম্য, সেখানে অবরোধ প্রথা ত আমায় সাধিয়া লইতে হয়। তবে দেবমন্দিরে যাওয়ার অধিকার আমাদের চিরকালই আছে।

আমায় রমণীজন্ম দিও প্রভো! আমরা জ্ঞানহীনা সত্য, অজ্ঞানতা বড় ক্লেশকর তাহাও সত্য। কিন্তু যে জাতি, পুরুষজাতির শৈশবে মাতা, কৈশোরে ভগিনী, যৌবনে ভার্য্যা, শেষে কন্যা, যে জাতির জন্যে পুরুষজাতির সমাজ বন্ধন, যে জাতিকে নিষ্পাপ ও নির্ম্মলা দেখিতে পুরুষজাতির প্রাণপণ, সে জাতিকে অজ্ঞানাবস্থায় কতদিন রাখা যায়? আমি বেশ বুঝিতেছি, একদিন, যে জ্ঞানে আত্মগরিমা চূর্ণ হইয়া যায়, পরের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিতে পারা যায়, আত্মসংযম ও ত্যাগ স্বীকার অভ্যাস করা যায়, যে জ্ঞানে রমণীর ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তিগুলি উপযুক্তরূপে বিকসিত হয়, প্রতি মানব-পরিবার দেব-পরিবার বলিয়া প্রতীত হয়, সেই অমূল্য জ্ঞান আমাদিগকে সাধিয়া দিতে হইবে—নহিলে পুরুষের সংসার থাকিবে না, সমাজ চলিবে না; যিনি পরার্থপর, তিনি পরার্থপরতার জন্যে আমাদিগকে জ্ঞান দান করিবেন; যিনি স্বার্থপর, তিনি আমাদিগকে জ্ঞান দান করিবেন—স্বার্থই হউক, পরার্থই হউক, সর্ব্বত্রই রমণী।

আমাকে আবার রমণীজন্ম দিও প্রভো!—যে কুলে সীতা জন্মিয়াছেন, সাবিত্রী জন্মিয়াছেন, খনা জন্মিয়াছেন, লীলাবতী জন্মিয়াছেন, রাণী রাসমণি জন্মিয়াছেন, দেবী সোনামণি * জন্মিয়াছেন, স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতা জন্মিয়াছেন, আর আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মা—সেই জগজ্জননী ভগবতী † জন্মিয়াছেন, সেই কুলে জন্মিলে আমি যতই নরাধমা হই না কেন, তবু আমার জাতীয় গৌরব রহিবে।

আমায় রমণীজন্ম দিও প্রভো!—মেয়ে যেমন মা'র মর্ম্ম বোঝে—আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত ছেলের কথা বলিতেছি না, মার্ট্‌সিনীর মত, ছেলের কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি মেয়ে যেমন মা'র মর্ম্ম বোঝে, জগা খগার মত ছেলেরা সেরকম কোনও

* সোণামণি দেবী—জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা।

† বিদ্যাসাগরের মাতার নাম ভগবতী।

দিন বুঝিবে না। তাই বলিতেছি আমাকে রমণী জন্ম দিও, আমি মেয়ে হইয়া মা'র কাজে লাগিব।

আর এক কথা—যে দিন (সাধারণের অলক্ষ্যে) রমণীহস্ত মাতৃভূমির কার্য্যে নিয়োজিত হইবে, যে দিন রমণী গৃহ-শিক্ষয়িত্রী হইয়া পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী ও পিতার ত্রিবিধ ‡ উন্নতির সহায় হইবেন, যেদিন ঘরে ঘরে সকলেই সুমাতা, সুভগ্নী, সুভার্য্যা ও সুকন্যা হইবেন, যে দিন রমণীর মঙ্গলের জন্যে স্বদেশের মঙ্গলের জন্যে—জগতের কল্যাণের জন্যে রমণী-আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবে, রমণী হৃদয়ে পাপমলিনতার ছায়াও থাকিবে না—সেই শুভদিনেই বঙ্গসমাজ প্রকৃত উন্নত হইবে ; আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—কিন্তু যে জাতির অভ্যুদয়ে এত বড় কাজ সাধিত হইতে পারে, বাঙ্গালির—"মুখ-সর্ব্বস্ব" কথাটা দূর হইতে পারে, আমি সেই জাতিতে পরিগণিতা হইব! সেই মহাসমুদ্রেরর এক জলবিন্দু হইব।—

তারপর—

"লাজ ভয় তেয়াগিব,
এ সাধ মোর পূরাইব"

এবার কিছুই পারিলাম না—বড় ক্ষোভ রহিল, এবার কিছুই পারিলাম না। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়া ছিলাম, যে কাজ করিতে প্রাণের প্রাণে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, সে কাজ এবার বুঝি করা হইল না। কেন?—আমি ভিখারিণী, তাহার জন্যে নহে ; কাজ করিবার পক্ষে এই দরিদ্রতাপূর্ণ, এই স্নেহবন্ধন-শূন্য, এই জীবনকণাই যথেষ্ট। কর্ত্তব্য পালন করিতে রাজরাণীরও যেমন অধিকার, ভিখারিণীরও সেই রকম অধিকার ; তবু আমার এবার বুঝি কিছুই হইল না, আমার বড় লজ্জা করে! ভাই যখন শ্রান্ত হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার কাছে গিয়া শুশ্রূষা করিতে পারি না, আমার বড় লজ্জা করে! গরিবের ছেলে রাস্তায় দাঁড়াইয়া যখন কাঁদে, "যাদু গোপাল" বলিয়া তাহাকে বুকে লইতে পারি না, আমার বড় লজ্জা করে! অন্যায় কথা শুনিলে প্রতিবাদ করিতে গিয়া সরিয়া আসি, আমার বড় লজ্জা করে! মোটে ঘোমটা খুলিতে পারি না—কি যেন ছাই, বড় লজ্জা করে! স্ত্রীস্বাধীনতার কথা শুনিলে—সামাজিক সাম্য ভাবের কথা শুনিলে, কেমন যে পোড়া মন, আমার বড় লজ্জা করে! তোমরা যাই বল, আমরা কিন্তু ঘোমটা খুলিয়া রাস্তায় দাঁড়াইতে পারিব না আমাদের বড় লজ্জা করে!—

তা শুধু কি লজ্জা, বড় ভয়ও করে যে কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়া, এ দে[শে] এ জীবন সফল করিব ভাবি, তা করিতে পারি না, আমার বড় ভয় করে! দে[বতা] দেবতা কয় জন, আর প্রকৃত মানব কয় জন, তা ছাড়া ভূত পিশাচেরই ছড়াছড়ি ; অত ভূতের গল্প শুনিয়া

‡ আধ্যাত্মিক।

এখন রাত্রি দিন আমার বড় ভয় করে! তাহারা নাকি সদুপদেশ লইয়াও হাসে, ধার্ম্মিককেও গালি দেয়, ভাল কাজ করিলেও কলঙ্ক করে, শুনিয়া শুনিয়া বড় ভয় করে! তাহারা নাকি পরের সুখ দেখিতে পারে না, শান্তি সহিতে পারে না। "উন্নতি" দেখিলে পুড়িয়া মরে! শুনিয়া আমার কেবলই ভয় করে! সকল কথা গুলা বলিতে পারিলাম না!—বলিতেছি আমার ভয় করে!

কিন্তু যেদিন আমি পরজন্ম পাইয়া আসিব—সেই শত বৎসরের পরে কি সহস্র বৎসরের পরে যখন মা'র কোলে ফিরিয়া আসিব, তখন আর এমন দিন রহিবে না। শীতের পরে বসন্ত, অমাবস্যার পরে পূর্ণিমা, অবনতির পরে উন্নতি, অবশ্যম্ভাবী। তাই এক দিন যাহারা নগ্ন দেহে বনে বনে বেড়াইত, আজি আর্য্যসন্তানদের পরিচ্ছদের হীনাবস্থা দেখিয়া তাহারাই উপহাস করে!—আজি আর্য্যসন্তানেরা তাহাদের প্রদত্ত পরিচ্ছদে কৃতার্থ! তাই বলিতেছি শত বৎসর পরেই হউক, আর সহস্র বৎসর পরেই হউক, এক দিন দেশের গতি ফিরিবে, আজি যাহারা হিরণ্যকশিপু, তাহাদের বংশে প্রহ্লাদ আসিবে; ধর্ম্মের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, পরোপকারের জন্যে সকলে শরীর ও প্রাণ উৎসর্গ করিবে। একদিন সমস্ত জগৎ একপরিবার হইবে, সকলে ভাই, সকলে ভগিনী হইবে, যাহার যাহা প্রকৃতি দত্ত অলঙ্কার, সে তাহা মাজিয়া ঘসিয়া লইবে; সে রাজ্য স্বর্গ রাজ্য হইবে, পুরুষগুলি দেবতা হইবেন, মেয়েগুলি দেবী হইবেন, সকলেই সকলের শরীর মন ও আত্মার উন্নতির সহায় হইবেন—সে শুভ দিনে, সে অমৃতময় দিনে আমি লজ্জাই বা করিব কেন, ভয়ই বা করিব কেন?—দেবদেবীদের কাছে লজ্জা সঙ্কোচই বা কিসে? ভয়ই বা কিসে?—তাই সেদিন লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া" আমার "সাধ" পূর্ণ করিব—সে কি?—

"সাগর ছাঁচা রতন নিব, কণ্ঠে রাখ্‌ব নিশি দিবে!"

ইহাই আমার একমাত্র সাধ! এই হইলেই আমার সম্পূর্ণ সুখ! এই সুখের আশায় মরিয়া পুনরায় জন্ম পাইতে— রমণী জন্ম পাইতে চাহি। ওমা জন্মভূমি! তুমিই আমার সেই অমূল্য, দেব দুর্লভ রত্ন! তুমি অতল শোক সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছ—ইংরাজ রাজা হইয়াছে বলিয়া নহে।—বরং ইংরাজ রাজা হইয়াছে বলিয়া কেবল "দলাদলি" হইয়া কেবল "মুখোমুখি" হইয়া দেশীয়েরা ক্ষান্ত হইতেছে; নয় তো দুইবেলা বুঝি "ভাই ভাই" মারামারি, কাটাকাটি, খুনোখুনি হইতে!—সে দিন এক মীরজাফরের জ্বালায়' জ্বলিয়াছিলে, ইংরাজ রাজা না হইলে বুঝি শত সহস্র মীরজাফরের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতে! তাই বলিতেছি ইংরাজ রাজত্বে তোমার সুখ থাক্ না থাক্, শান্তি আছে। তুমি

শোকসাগরে ডুবিয়াছ, ছেলেদের নিষ্ঠুরতা আর পরমুখাপেক্ষিতার জন্যে! মেয়েদের অবহেলা আর বিবিয়ানার জন্যে! তুমি ডুবিয়াছ মা অনৈক্যতার জন্যে—আর ডুবিয়াছ মা গলা বাজির জন্যে!!

যে দিন দেবতার আশীর্ব্বাদে তোমার নারদ ব্যাস, বশিষ্ঠ, ফিরিয়া আসিবেন, যে দিন, রঘু, রাম, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, প্রতাপ, বাদল প্রভৃতি তোমার কোলে আসিবেন, যে দিন সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, প্রভৃতি তোমায় আবার মা বলিয়া ডাকিবেন, যে দিন হরপার্ব্বতী ঘরে ঘরে বিরাজ করিবেন, পার্ব্বতী আবার মা অন্নপূর্ণা হইয়া দাঁড়াইবেন, যেদিন আবার পান্না, কর্ম্মদেবী প্রভৃতি মিবার উজ্জ্বল করিবেন—সেই শুভদিনে মহাসাগর মন্থন করিয়া তাঁহারাই তোমাকে উদ্ধার করিবেন।—সেই দিনে সেই স্বপ্নময় অভীষ্ট লাভের দিনে, আমার চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, আমার চিরতপস্যার ফল মিলিবে, সেই দিন মা আমার সাগর ছাঁচা রত্ন! আমার চির বাঞ্ছিত নিধি! তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া, ভিখারিণী আমি রাজরাজেশ্বরীর অধিক সুখ ভোগ করিব। আমি ভিখারিণী—আমি সোণার হার বা মুক্তার হারের গৌরব বুঝি না, আমি সংসার-বন্ধন শূন্যা রমণী-কণ্ঠে আর কোন্ হার বাঞ্ছিত, তাহাও বুঝি আমার মনে পড়ে না, আমার কেবল তুমি—আমার সর্ব্বস্বধন তুমি! আমার কণ্ঠ-রত্ন তুমি! যদি আমার "আমার" বলিতে কিছু থাকে, তবে সে তুমি! যদি আমার ভাল বাসিতে কিছু থাকে, তবে সে তুমি! আমার বুক পূরাইবার কেবল তুমি! এস! আমার সব! আমার সমুদ্র-নিহিত রত্ন! আমার প্রাণের প্রাণে লুকাইবে, এস! তোমায় দিবানিশি কণ্ঠে রাখিব!

ইহাই আমার গান, আমি এই গান গাহি, জন্মে জন্মে গাহিতে চাহি। যতদিন আমার মা'কে না পাইব, আমার সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রসাদে সিদ্ধিলাভ না করিব, ততদিন আমি এই গীতি গাহিব, এই তপস্যা করিব! লোকের দুয়ারে ভিক্ষা করিতে গিয়া গাহিব, নীরব নিভৃতে বসিয়া গাহিব, বাসন্ত কাননে "বউ কথা ক" যখন মধুর হিল্লোলে আকাশ মাতাইবে, তখন তাহার সঙ্গে গাহিব, বর্ষার আকাশে কাদম্বিনী যখন বজ্র নিনাদে জগৎ চমকিত করিবে, তখন তাহার সঙ্গে গাহিব, অগ্নিময় মরুভূমিতে দাঁড়াইয়া গাহিব, শ্মশানের সৈকতে পড়িয়া গাহিব, জীবনে মরণে কেবল এই গানই গাহিব—আর যে কবি এই প্রাণময়ী গীতির রচয়িতা তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতার প্রণাম দিতে থাকিব।*

---

* শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃত "মৃণালিনী" দেখ।

যদি কাহারও ভাল লাগে, সে আমার গান শুনিবে—নচেৎ সকল শব্দের যেখানে শেষ সীমা, কোকিল, শ্যামা, বুল্‌বুল্‌, কাক, চীল, ফিঙা, সকলের গীতির যেখানে পরিণাম, আমার গানও সেইখানে কিনারা পাইবে, সেই মহা-শূন্যের যিনি অধীশ্বর, তাঁহারই চরণে পৌঁছিবে, আমি অন্য শ্রোতা চাহিনা!

"কেমন, শুনিলে তো?"

শুনিলাম বটে!! ভিখারিণীর আবল তাবল বকুনিতে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, অর্দ্ধ চন্দ্রের কথাটা একে-বারেই ভুলিয়া গেলাম! আপদ বিদায় হইলেই বাঁচি, তাই তাড়াতাড়ি ভিক্ষা দিতে গেলাম, কিন্তু সে লইল না, হাসিয়া হাসিয়া বলিল "তোমার নিজের ঘরেই চা'ল বাড়ন্ত, তা আমায় দিবে কি?" আমি অবাক্‌ হইলাম।

ভিখারিণী যে পাগল সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, পাঠিকা ভগিনীরও বোধ হয় তাই। কিন্তু সেই অবধি, কি করিয়া কে জানে, আমি তো জানি না, সেই ছাই গান তো আমার ভাল লাগিয়া-ছিল না, তবু আমায় যেন 'স সে মি রা'য় ধরিয়াছে, সেই অবধি উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে, জাগিতে, ঘুমাইতে, আমার প্রাণের প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

"এ জনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে?"—ভাই, তোমার প্রাণে কি দাগ পড়িবে না? স্নেহময়ী পাঠিকা ভগিনি! তুমি কি আমায় একবিন্দু সহানুভূতি দিবে না?

শ্রী মা—

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা।

উপসংহার।

"শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্য-কারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী" এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তি লইয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। (১) ইহার কোনওটীর অভাবে মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়; একটীকে খাঁটো করিয়া অপরটীকে বড় করিলে মানুষকে "অর্দ্ধ মাত্রার মনুষ্য" হইতে হয়; আমাদিগের দেশের কোন ভক্তিভাজন ও সুবিখ্যাত লেখক এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন; আমাদেরও সহজ জ্ঞানে এই কথার সত্যতা অনেক বোধগম্য হয়। কিন্তু জাতীয় চরিত্র—স্ত্রী পুরুষের বৃত্তিগুলি স্বতন্ত্র রূপে অনুশীলিত হওয়াই আমা-দের স্বাভাবিক নিয়ম। তাই বঙ্গ-মহিলার জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির মধ্যে ধারণা,

(১) এ বিষয়ে যিনি সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" দেখিবেন।

কল্পনা, স্মৃতি, ইহার কোন একটীকে হীনপ্রভ দেখিলে আমরা যত ক্ষতিগ্রস্ত মনে না করি, কার্য্যকারিণী বৃত্তির মধ্যে যাহা ধর্ম্মনৈতিক বৃত্তি বলিয়া আখ্যাত, —সেই স্নেহ, ভক্তি, দয়া, লজ্জা, ক্ষমা, ইহার মধ্যে কোন একটীকে হীনপ্রভ দেখিলে আমাদিগকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত মনে করি। আমাদের পুরুষেরা জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি বাড়াইতে গিয়া কার্য্যকারিণী বৃত্তি হ্রাস করিতেছেন, স্ত্রীলোকেরাও সুরুচি ও সভ্যতার গোলোযোগে ইহা হারাইতে বসিয়াছেন, এই শেষোক্ত দিগকে লইয়াই আশঙ্কা বেশী। "নিষ্ঠুর মেয়ে, পাহাড়ে মেয়ে, নির্লজ্জ মেয়ে" (২) প্রভৃতি অস্বাভাবিক প্রকৃতিসম্পন্না রমণী জগতের চক্ষুঃশূল; ইহার কাছে "বোকা মেয়ে, মূর্খ মেয়ে" বরং সহনীয়।—ভরসা করি এ কথায় কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে দুর্ভাগ্য বঙ্গমহিলাগণের মূর্খতা বা নির্ব্বোধতার সমর্থন করা আমার অভিপ্রেত। আমাদের দেশের একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়াছেন "সন্তান মূর্খ হইয়া সৎ হয়, তাহাও ভাল; তথাপি অসৎ বিদ্বান্ সন্তান নিষ্প্রয়োজন"। এই কথাটীর ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, আমার উপরি উক্ত সামান্য কথাটী লইয়া গোলযোগ হইবে না।

স্বার্থবিস্মৃতি, পরহিতে আত্মসমর্পণ, ধর্ম্মের উদ্দেশে গৃহধর্ম্ম-পালন ও সমাজ সেবা, ঈশ্বরে অটল ভক্তি ও বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অসীম দৃঢ়তা, স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি ও দয়ার অলৌকিক মহানুভবতা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার উচ্চাশয়তা, লজ্জা, নম্রতা, ক্ষমা ও কৃতজ্ঞতার মনোহর ভাব, এই সকল উপকরণ একত্রে সমাবেশ করিয়া যে পদার্থ গঠিত হয়, বঙ্গমহিলা সেই পদার্থ। হীনত্ব দেখিলে বঙ্গ মহিলা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, মহত্বে তাঁহারা হিমশিলা, একাধারে কবি ভবভূতির সেই

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।"

অতএব যাঁহারা বঙ্গ মহিলার জীবন পরিচালক, তাঁহারা বঙ্গমহিলার "বঙ্গমহিলাত্ব" মনে রাখিবেন। যেমন বাঙ্গালির ছেলে সাহেব সাজিলেই উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন না, সেইরূপ বঙ্গমহিলাও 'উন্নতির পরিচায়ক'

(২) লজ্জা ও বিনয় রমণীকুলের যথার্থ আভরণ একথা আজ নূতন বলিতেছি না, বহুকাল পূর্ব্বে জ্ঞানীরাও বলিয়াছেন—"নির্লজ্জাশ্চ কুলাঙ্গনাঃ।" তবে বর্ত্তমান কালে শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে গিয়া অনেক রমণী নির্লজ্জা হইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া লজ্জায় মরিতে হয়; আর এক কথা, বর্ত্তমান সময়ে অনেক পুরুষ কবি, এক একটী কবিতায় এরূপ কুরুচি ও কুভাবের পরিচয় দেন যে তাহা দেখিয়া ঘৃণা রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠে—আমরা করযোড়ে প্রার্থনা করি যেন লজ্জাশীলতা ও পবিত্রতার পূর্ণ ছবি বঙ্গরমণীর লিখিত কবিতায় ঐরূপ কবিত্বের ছায়াও না পড়ে। তাহা দেখিবার পূর্ব্বে মৃত্যুও বাঞ্ছনীয়। আর দুর্ব্বিনীতা নারী, সে তো শ্মশানের ডাকিনী! অধিক বলা বাহুল্য

নহে। তাই বলিতেছি স্বদেশ ও স্বজাতিবৎসল মহোদয়েরা বঙ্গমহিলাকে বঙ্গমহিলা করিয়াই গঠন করিবেন।

উপসংহার কালে বলিতেছি মুখে যিনি যাহাই বলুন, কার্য্যতঃ বঙ্গবাসীগণ, সকলে সমবেত হইয়া দেশীয় অবলাগণের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা না করিলে ইহাঁদিগের অবস্থা সম্যক্ প্রকারে উন্নত হইবেক না। যে দিন দেখিব কন্যার জন্ম মাত্রে পিতা মাতা দুর্ভাবনায় আকুল হন না, বালিকার শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিণেয় যুবকের মনস্তুষ্টি বলিয়া অভিভাবকদিগের ধারণা হয় না, বিদ্যালয়ে স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা পাইতে বালিকার ত্রুটী হয় না, সুশিক্ষা সুদৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে বালিকাকে ক্লেশ পাইতে হয় না, কৃতবিদ্য যুবকগণ অর্থলোভে কুমারী পাণি গ্রহণে অগ্রসর হন না, পিত্রাদি অভিভাবকেরা অর্থ বা বংশ মর্য্যাদায় ভুলিয়া অথবা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া অপাত্রে কন্যা দান করিয়া রমণী-জীবন বিভীষিকাময় করেন না, যে দিন অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া বঙ্গাঙ্গনাদিগকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিদ্যা, শিল্প ও গৃহকার্য্য প্রণালী রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইবে, অযথা শাসন ও অন্যায় অধীনতার হস্ত হইতে বঙ্গাঙ্গনার মুক্তিলাভ হইবে, বঙ্গীয় রমণী অবরোধবাসিনী ও অবগুণ্ঠনবতী হইয়াও পবিত্রতাপূর্ণ, শান্তিময়, শিক্ষাপ্রদ ও বিশুদ্ধ আমোদজনক স্থানে, আত্মীয় পুরুষদিগের সঙ্গে যাইতে সক্ষমা হইবেন, যে দিন বঙ্গাঙ্গনা, পুরুষদিগের হস্তে ক্রীতদাসীর পরিবর্ত্তে যথার্থ দেবীর ন্যায় সমাদৃতা ও সম্মানিতা বিবেচিত হইবেন, যে দিন বঙ্গাঙ্গনা সুশিক্ষা ও সদিচ্ছা প্রভাবে আদর্শ ভগিনী, আদর্শ ভার্য্যা ও আদর্শ কন্যা এবং আদর্শ গৃহিণী হইয়া দেশের পারিবারিক ও সামাজিক মঙ্গল সাধনে যত্নবতী হইবেন, মহদাশয়া রমণীগণ নারীজাতির নেত্রীরূপে তাঁহাদিগকে উন্নতি পথে—*চতুর্ব্বিধ বৃত্তির সামাঞ্জস্যে ত্রিবিধ উন্নতি পথে লইয়া যাইবেন, যে দিন তাঁহারা সাধারণের চক্ষুর অগোচর থাকিয়াও দেশের সমস্ত পবিত্র এবং মঙ্গলময় কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের পবিত্র শক্তি ও মঙ্গলেচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যে দিন দেশের প্রত্যেক নর নারী, পরস্পরের প্রতি বিশুদ্ধ ভ্রাতৃ ভগিনী ভাব বিতরণ করিতে পারিবেন, এবং পুরুষেরা রমণীগণের নিকটে যথার্থই রক্ষাকর্ত্তা ও দেবোপম চরিত্রবান্, বলিয়া বিবেচিত হইবেন, সেই দিনই বুঝিব যে এত দিনের পরে বামাহিতার্থীর আশা যথার্থই পূর্ণ হইল, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা বাস্তবিক উন্নত হইল, এবং বঙ্গদেশ সত্য সত্যই উন্নতি

* চতুর্ব্বিধ বৃত্তি, শারীরিক, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী,। ত্রিবিধ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক।

পক্ষে অগ্রসর হইল। আহা! কল্পনা-চক্ষে সে শুভদিন দেখিয়াও হৃদয়ে কত না সুখের উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে!

"কবে বামাগণ হয়ে সুশিক্ষিতমনা,
হিতকর নানা গ্রন্থ করিবে রচনা,
জ্ঞান-শিক্ষা ধর্ম্মদীক্ষা করিবেক দান,
প্রাণপণে সাধিবেক স্বজাতি-কল্যাণ?
বিষাদ কলহ স্থানে হইবে সদ্ভাব,
আলস্য ঘুচিয়া হবে পরিশ্রম লাভ।
রূপের স্থানেতে হবে গুণের গৌরব,
স্বার্থ ছাড়ি ধর্ম্মে মন দিবে নারী সব।
সতীত্ব, নম্রতা, লজ্জা, দয়া, সুশীলতা,
ধর্ম্মনিষ্ঠা, সাধুচেষ্টা, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা,
সকল পবিত্র গুণ করিয়া ভূষণ,
গৃহলক্ষ্মী সম শোভা করিবে ধারণ।
কবে হবে অন্তঃপুরে নারীর সমাজ,
হইবে ঈশ্বর-পূজা নানা সাধুকাজ?
কবে ভ্রম মোহ সব হইবে সংহার,
সত্য ধর্ম্ম সকলের হবে কণ্ঠহার;
ধর্ম্মের অধীনে নারী হইবে স্বাধীন,
মনের আনন্দে সুখে রবে চির দিন?"

(নারীশিক্ষা ১ম ভাগ)

বিদ্যাসাগরের জননী

২য় প্রবন্ধ।

পূর্ব্ববারে বলা গিয়াছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী কেমন স্নেহের সহিত হারিসন সাহেবকে আহার করাইতে করাইতে সদুপদেশ দ্বারা তাঁহাকে কেমন দরিদ্রদের বন্ধু হইতে—বিপন্নের সহায়তা করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন! পূর্ব্ববারে বলা হইয়াছে তিনি কেমন প্রেম-প্রণোদিত হইয়া সতত সকলের বাড়ীতে সেবা করিয়া বেড়াইতেন। পূর্ব্ববারে আরও বলা হইয়াছে তিনি নিজের ও নিজ পরিজনের অসুবিধা ও ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া অপর দশ জনের সুবিধা ও আরামের জন্য নূতন লেপ কয়খানি শীত-ক্লিষ্ট দরিদ্র পরিবারবর্গকে দান করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল সদনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার জীবনকে পুণ্য কীর্ত্তিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই এইরূপ কোন না কোন প্রকার সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতেন। লোকের সেবা লোকের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি, লোকের দুঃখ কষ্টে সহায়তা ও সমানুভূতি প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বদাই তাহাদিগকে আপনার করিতেন। বঙ্গরমণী যে পরদুঃখকাতর—বঙ্গললনা যে নানাপ্রকার অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিয়া আত্মীয় স্বজন ও অপর দশ জনের সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারেন, বিদ্যাসাগর-জননী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনের প্রধান অধিনায়ক হইয়াছিলেন, তাঁহার যে আয়োজন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে বিধবাবিবাহ

প্রচলিত হয়, সেই গুণবতী উদার-হৃদয়া রমণীই সে মহাব্যাপারের মূলে লুক্কায়িত ভাবে দণ্ডায়মানা। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণ করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তখন তাঁহার জননী তাঁহাকে সে কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।*

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-সঙ্গত, বিধবাদের জন্য যদি চেষ্টা করি, তাহাতে তোমার মত কি? তখনি সেই বঙ্গললনা অশ্রুপূর্ণনয়নে পুত্রকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "বাপ, যে হত-ভাগিনীদের সকল আশা ভরসা ফুরাই-য়াছে, যাহারা ঘরের বালাই হইয়া দাস দাসীর ন্যায় পড়িয়া থাকে, সকলপ্রকার মঙ্গল কর্ম্মে লোকে যাহাদিগকে অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া মনে করে, কোন শুভকর্ম্মে যাহারা যোগ দিতে পায় না, দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুজল যাহাদের একমাত্র সম্বল, তাহাদিগকে সংসারে সুখী করিবে ইহাতে আবার আমার মত কি জিজ্ঞাসা করি-তেছ? যদি কোন উপায় থাকে, তবে এখনই তাহার চেষ্টা কর!"

বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতার আদেশ ও জননীর সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া বীর পরাক্রমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, বিধবাবিবাহ আরম্ভ হইল। এক একটি করিয়া অনেকগুলি বিধবাবিবাহ বিদ্যা-সাগর মহাশয় সম্পন্ন করিলেন, জননী পশ্চাৎ হইতে নানাপ্রকার উৎসাহ বচনে পুত্রকে আরও অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য এই যে যখন দেশের অধিকাংশ লোক নানাপ্রকার নিন্দাবাদে ও সামাজিক উৎপীড়নে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন সেই সহৃদয়া জননী প্রসন্নবদনে সস্নেহবচনে বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের চিত্ত-বিনোদনে প্রয়াস পাইতেন। তিনি যখন দেশের লোক-দের দুর্দ্দশা ও অপদার্থতা দেখিয়া শোক প্রকাশ করিতেন, জননী তখন নানা-প্রকার মিষ্ট বচনে তাঁহার অন্তরে বলবিধান করিতেন। একবার কয়েকটী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা পুনর্ব্বার বিবাহ হও-য়ার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে নবীনা বধূদের কেহ কেহ তাহাদের জাতি গিয়াছে বলিয়া ঘৃণাপ্রদর্শন করায় সেই মেয়ে কয়টি দুঃখিত অন্তঃকরণে গৃহের এক প্রান্তে দাঁড়া-ইয়া রোদন করিতেছিলেন। সহসা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী মেয়ে কয়েকটিকে একান্তে রোদন করিতে

* জনশ্রুতি আছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী গ্রামস্থ এক বালবিধবাকে পুত্রের নিকট উপস্থিত করিয়া বলেন "ঈশ্বর, তোদের পোড়া শাস্ত্রে কি এদের সদ্‌গতির জন্য কোন বিধান পাওয়া যায় না?" তাহাতেই তিনি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বৃত্তান্তটী সত্য বলিয়া অনুমোদন করেন নাই। লেখক।

দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কারণ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া তাহাদের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে আদর করিয়া বলিলেন, "বাছা, ওরা ছেলে মানুষ ওদের কথায় কি রাগ করিতে আছে? না বুঝিয়া কি বলিতে কি বলিয়াছে, ও কথায় কাণ দিতে নাই।" এই বলিয়া তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া ঘরে আনিয়া বসাইলেন। তখন তাঁহাদের আহারের সময়; আহারের আয়োজন হইয়াছে। সেই মেয়ে কয়টিকে লইয়া এক পাত্রে আহার করিতে বসিলেন। একবার নিজে আহার করেন, আবার একবার তাহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দেন। এইরূপে তাহাদিগকে লইয়া আহার করিতে করিতে বলিলেন "দেখ, তোমাদের জাতি যায় নাই, তাহলে কি আমি তোমাদের নিয়ে এক পাত্রে আহার করিতাম? তোমাদের জাতি যায় নাই। এই ত তোমাদের নিয়ে এক পাতে আহার করিলাম, আবার যারা তোমাদের জাতি গিয়াছে বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছে, তারাও আমার পাতে খাইবে। তোমাদের জাতি যায় নাই।" কেমন উদারতা! এমন উদারতা, এমন সহৃদয়তা, এমন কোমল ভাবের আধার সেই জননীর ক্রোড়ে বিদ্যাসাগর লালিত পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া আজ বঙ্গের গৃহে গৃহে তাঁহার স্তুতি বন্দনা হইতেছে!

বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কিম্বা সীতার বনবাস লিখিয়া বড়লোক হন নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় দরিদ্রজনে অর্থ সাহায্য করিয়াও বড় লোক হন নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি উৎকৃষ্ট কলেজের স্থাপয়িতা বলিয়াও বড় লোক হন নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক দুর্নীতি ও কদাচারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিয়া বাল-বিধবাদিগের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া বড় লোক হইয়াছিলেন। একজন পুরুষ ইচ্ছা করিলে স্ত্রী বর্ত্তমানে কিম্বা অবর্ত্তমানে গঙ্গাযাত্রার কাল পর্য্যন্ত যত ইচ্ছা বিবাহ করিবে। কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধকে পতিত্বে বরণ করিয়া অনতিকাল মধ্যে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন আপন ভাগ্যকে নিন্দা করিতে করিতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিবে। অপর দিকে উক্ত বালিকার পূজ্যপাদ পিতৃদেব হয়ত শতাধিক বিবাহ করিয়া পরমানন্দে শ্বশুরালয়ে কালাতিপাত করিতেছেন। বিদ্যাসাগর ইহারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া—ইহাই সংশোধনে জীবন মন সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া বড় লোক। আর তাঁহার জননী—সেই পুণ্যবতী জননী প্রসন্নসলিলা তটিনীর ন্যায় বিদ্যাসাগররূপ মহাবৃক্ষের সরসতা ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহারই উৎসাহ-বলে—তাঁহারই সুপরামর্শে বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের ব্রত পালনে

কৃতকার্য্য ও ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন। মা যদি হয়, তবে যেন এমন মাই হয়। কবে এমন সুদিন হইবে, যে দয়া প্রেম ও পুণ্যের প্রতিমা বিদ্যাসাগর জননীর ন্যায় গরীয়সী জননী বঙ্গের গৃহে গৃহে বিরাজ করিবেন এবং তাঁহাদের পবিত্র হস্তে গঠিত হইয়া আমাদের দেশের বালক বালিকাগণ মনুষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদনে সক্ষম হইবে?

ললিতমোহিনী দেবী

পাঠক পাঠিকাকে বোধ হয় অধিক যত্ন সহকারে বুঝাইয়া দিতে হইবে না যে, এদেশে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ-কুমার অনেক—এমন কি শতাধিক কুলীন ব্রাহ্মণকুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। এই কুপ্রথা যে একবারে বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইয়াছে, তাহা কখনও বলিতে পারি না; তবে এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ইহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে মাত্র। পীড়া আছে, নিঃশেষ হয় নাই, একটু উপশম মাত্র লক্ষিত হয়। রোগ হিন্দুসমাজ-দেহে প্রবেশ করিয়া জর্জ্জরীভূত করিতেছে। সমাজ মৃতপ্রায়। কত কুলকামিনী অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে ও অদ্যাপিও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই প্রবন্ধের শীর্ষস্থানে যাঁহার নাম, তিনি সেই অভাগিনীদিগের মধ্যে একজন। তাঁহার দুঃখের জীবন বৃত্তান্ত সজলনয়নে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এতৎপাঠে নিতান্ত কঠিন হৃদয়ও অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

ললিত মোহিনী কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা, কুষ্ঠিয়ার অন্তর্গত চাপড়ায় বাস করিতেন ইঁহার পিতা অর্থগৃধ্নু হইয়া নিজ কুল গৌরবের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া অতি শৈশবাবস্থায় পূর্ব্বদেশীয় একজন গণ্যমান্য জমিদারের সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। বালিকা শ্বশুরালয়ে সুখে বাস করিতে বা দীর্ঘকাল থাকিতে পায় নাই। শাশুড়ীর সহিত সদ্ভাব হয় নাই। ইহাতে আমরা ললিতকে দোষ দিই না, কারণ সেতো বালিকা, সে কি জানে? মুখে এখনও স্তন্য দুগ্ধের গন্ধ আছে, সে ভাল মন্দ কি জানে? সে জানিত (যেমন সকল শিশু বধূ জানে) যে, পিত্রালয়ে যে প্রকার আদর পাই, শ্বশুরালয়েও সেই প্রকার পাইব। আহা! অভাগিনী এই মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিল, অচিরে জানিতে পারিল যে, মরীচিকা অনন্ত উত্তপ্ত বালুকারাশিতে পরিণত, উত্তরোত্তর তাহার সংসার-সুখ-পিপাসা বাড়াইয়া ব্যথিত করিতে লাগিল। শাশুড়ী কঠিনহৃদয়া বধূপীড়নপ্রিয়া ছিলেন। বধূকে অশেষ প্রকারে কষ্ট দিতে লাগিলেন। কুমারীর

প্রাণে সকলই সহিল। ইহা করিয়াও কর্ত্রী ঠাকুরাণী ক্ষান্ত রহিলেন না। ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করিলেন, করিয়া জীবনের একমাত্র সহায় স্বামীর বিরাগ উৎপাদন করিলেন। ললিতের স্বামী পুনরায় বিবাহ করিলেন! জন্মের মত ললিতের সুখ-রবি অস্তমিত হইল। শুধু ইহা নয়। তিনি পাগল হইয়াছেন, এই কথা বিঘোষিত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি বিধবা জননীর নিকট রহিলেন। তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, কথা মধুর ছিল। তিনি লেখা পড়াও জানিতেন। স্বামিলাভের জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াও সফল হইলেন না। শেষে বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। স্বামী পাইবার জন্য তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু স্বামী পাইলেন না, প্রচুর অর্থ পাইলেন। যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বেশ স্বচ্ছন্দে দিন নির্ব্বাহ হইত। তিনি চাহিলেন স্বামী,পাইলেন অর্থ। বিধাতার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইল। তিনি পরম করুণাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। কৌলীন্য-কালকূটে তাঁহার পবিত্র হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল। তিনি সুযোগ পাইলেই কৌলীন্য ও বাল্যবিবাহের বিষম অপকারিতার বিরুদ্ধে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। নানাপ্রকার মনোবেদনা পাইয়া ললিতমোহিনী দেবী বৎসরাধিক হইল কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি স্বকৃত উইলে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পর বাল্য বিবাহের বিপক্ষে ও তাঁহার নিজের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে ৩০০৲ তিন শত টাকা প্রাপ্ত হইবেন। আমরা এই হিন্দু মহিলার জীবন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবগত নহি। সমস্ত বিবরণ পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হই নাই। যাহা পাইয়াছি, তাহা এস্থলে প্রকটিত হইল। ইঁহার ক্ষুদ্র জীবন বাস্তব দুঃখের ছবি।

হিন্দুসমাজ! দেখিতেছ না, জানিতে পারিতেছ না যে, আপনার পাপ আগুণে আপনি ছারখার হইয়া যাইতেছ। সধবা, বিধবা ও সধবাবস্থায় বিধবা কত বালিকার প্রাণ জিয়ন্তে দগ্ধ করিতেছ। সুকুমারী বালিকাদিগের অশ্রু কি তোমার পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করিতেছে না? তাহাদিগের আর্ত্তনাদ কি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না? তাহাদিগের অকালমৃত্যুতে সকলেই সন্তপ্ত হইতেছে, কেবল তুমিই নও। সংস্কারকগণ! অগ্রসর হউন! অদ্য এক ললিতমোহিনীর নামোল্লেখ করিলাম, এইরূপ কত শত বালিকার যে কি দশা হইতেছে, তাহা কি আপনাদিগের কখনও কর্ণগোচর হয়! হইলেই

না কি হইবে, আপনারা কি তন্নিবারণ জন্য কোনওরূপ উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত? বেশী করিলেন তো একটু বীতরাগ হইলেন, দুই একবার হা হু করিলেন। ইহাতে কি কোনও গুরুতর কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে? সকলে বদ্ধ-পরিকর হইয়া "মন্ত্রের সাধন কি শরীর পাতন" এই প্রতিজ্ঞা অবলম্বনপূর্ব্বক সমাজের কুপ্রথা সকলের সমূলোন্মূলনে সচেষ্ট হউন্।

নূতন সংবাদ।

১। মুক্তিফৌজের সংস্থাপক দরিদ্র ও পাপীর বন্ধু জেনারল বুথ কলিকাতায় ৫ দিন থাকিয়া নানাস্থানে বক্তৃতাদি করিয়া বহুলোককে দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছেন। কলিকাতায় পতিতা রমণীদিগের উদ্ধারার্থ একটী গৃহ এবং রাজদ্বারে অপরাধী ব্যক্তিদিগের সংশোধনার্থ একটী আশ্রয় স্থান করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইঁহার শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

২। জাতীয় মহাসভার (কনগ্রেস) অন্যতর সম্পাদক পণ্ডিত অযোধ্যানাথ সম্প্রতি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার মত সুবিজ্ঞ, উৎসাহী ও সাধারণের প্রিয় দেশহিতৈষী ব্যক্তি অতি বিরল। ইঁহার অকাল মৃত্যুতে ভারতমাতা একটী অতি উপযুক্ত পুত্র হারাইলেন।

৩। বিলাতের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। আমেরিকায় একপ্রকার গায়ক বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পত্র সকল বায়ু সঞ্চালিত হইয়া সুন্দর সুস্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে।

৫। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, আণ্ডামান দ্বীপের যে স্ত্রী-দায়মালগণ ঝটিকাপীড়িত জলমগ্ন লোকদিগকে বাঁচাইয়াছিলেন, তাহাদের নেত্রী থাকুরণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, অন্যান্য বন্দিনীদিগের প্রতিও কিছু কিছু অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে। সকলে খালাস পাইলেই ভাল হইত।

৬। আমাদের যুবরাজপত্নী সৈনিকদিগের নিকট চাঁদা করিয়া প্রায় ১৬ হাজার টাকা তুলিয়া বিবী গ্রিনউডকে উপহার দিয়াছেন।

৭। বিলাত হইতে বড় শোচনীয় সংবাদ আসিয়াছে। ভারতের ভাবী সম্রাট প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর ১৪ই জানুয়ারি ইনফ্লুয়েঞ্জা পীড়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার শুভবিবাহ সম্বন্ধ ঠিক্ হইয়াছিল, আর এক মাসের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন হইত। জগদীশ্বর এই বিষম শোকে ভারতেশ্বরী ও রাজপরিবারস্থ সকলের হৃদয়ে শান্তিবিধান করুন্।

বামারচনা।

মা

কি সুমিষ্ট মার নাম কি আছে এমন,
তাপিত অন্তরে করে অমৃত সিঞ্চন ;
মা বলে ডাকিলে ভয়ে ভয় দূর হয়,
দুর্ব্বলের প্রাণে হয় বলের উদয় ;
দারুণ রোগের ক্লেশ অসহ্য হইলে,
শান্তি পাই স্বস্তি পাই মা বলে ডাকিলে।
শিশুকাল হতে মাতা করেন যতন,
নিজ রক্ত দিয়া পুত্রে করেন পালন,
ভূমিষ্ঠ হ'বার আগে উদরেতে লন,
সন্তানের তরে তিনি কত কষ্ট সন,
সন্তান জন্মিলে পর তার সব ভার
লইয়া করেন নিজ সুখ পরিহার।
যেমন পশুরা ভাল নাহি বাসে আর,
যখন ছানার হয় বৃহৎ আকার,
তেমন কখনো নহে মানবের প্রাণ
বড় হইলেও থাকে পরাণের টান,
সন্তানের যদি হয় কিঞ্চিৎ উন্নতি,
জননী তাহলে হন অতি হৃষ্টমতি।
সন্তানের সুখে সুখী দুঃখে হন দুঃখী,
শুনিতে মুখের কথা থাকেন উন্মুখী।
যখন সে ডাকে মাকে আধ আধ স্বরে,
তখন মা কোলে লন অতি স্নেহভরে।
বিদেশে যদ্যপি যায় প্রাণের কুমার,
মায়ের পরাণ স্থির নাহি থাকে আর ;
কিছুতে না পান সুখ শয়নে ভোজনে,
পুত্রমুখ জাগরূক নিরবধি মনে ;
আইলে আলয়ে পুনঃ প্রাণের পুতুলি,
চুমি মুখ পাতি বুক লন কোলে তুলি !
এমন মানুষ নাকি আছে পৃথিবীতে
অবহেলা করে মাকে ভকতি করিতে ?
যে করে তাহার নাম নরাধম হয়,
প্রকৃত মানুষ সেত কখনই নয়।

কুমারী বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়
বরাহনগর মহিলাশ্রম।

প্রেম।

প্রেমের ভিখারী পরাণ আমার
বেড়ায়েছে কত ঘুরে,
খুঁজিয়া জানিল না প্রেম
বাস করে কোন্ পুরে।
আঁখি জলে ভেসে, ফিরি দেশে দেশে
তবু সুধালেনা কেহ,
প্রেমের নিবাস জিজ্ঞাসেছি যারে,
নীরব হয়েছে সেহ।
প্রেম যদি নাই কঠিন ধরায়
কেমনে মানুষ বাঁচে,
প্রেম প্রেম করি ফিরে নর নারী
কল্পনায় প্রেম আঁকে,
প্রেম স্বরগের অমূল্য রতন,
যেথা সেথা সেকি থাকে ?
কণামাত্র সেই স্বরগের ধন
হৃদয়ে নিহিত যার,

এ মর ধরায় যায় নাক দেখা
তুলনা একটি তার।
প্রেমময় ওগো একবিন্দু প্রেম
করেছেন যারে দান,
যাতনা-পীড়িত মানবের তরে
কেঁদেছে তাহার প্রাণ।
একবিন্দু প্রেম সাগর হইয়ে
ভাষায় সকল ধরা।
বিদ্যাসাগরের অতুল হৃদয়
ছিল সেই প্রেমে ভরা।
বাঁধা থাকে কিগো এ প্রেম কখন
সঙ্কীর্ণ সীমার মাঝে,
আপনি উথলে করুণার ধারা
দীন দুঃখীদের কাছে।
কাঁদিছে বিধবা উপবাসী তায়
সন্তান করিয়ে কোলে,
আছে কত ধনী আত্মীয় স্বজন
চাহিল না মুখ তুলে।
বিদ্যাসাগরের কোমল হৃদয়ে
বহিল করুণা ধারা,
মুছাইতে গিয়ে আঁখি জল তার
আপনি কাঁদিয়ে সারা।
কত শত শত দুঃখিনীর বাছা
করুণায় আজি যাঁর
ধনী মানী মাঝে হইয়ে গণিত
গাহিছে সুযশ তাঁর।
শুনি নিদারুণ মরণ বারতা
অনাথ অনাথা যত,
ঘরে ঘরে আহা আকুল হইয়ে
কাঁদিছে আজি কে কত।
যাঁরমুখ দেখে পিতৃহীন শিশু
পিতৃশোক যেত ভুলে,
দীন নিরাশ্রয় সন্তানেরে যিনি
লইতেন কোলে তুলে।
পিতৃ মাতৃহীন বালক বালিকা
ফেলিছে নয়ন ধারা,
কি হবে ভাবিয়ে স্বদেশের লোক
হয়েছে বিহ্বলপারা।
প্রতি নর নারী কাতর হৃদয়ে
দয়াময়ে আজি ডাক,
করুণাসাগর বিদ্যাসাগরেরে
চিরশান্তি সুখে রাখ।*

শ্রীমতী উমাশশী দেবী।

লক্ষ্যহীন জীবন।

লক্ষ্যহীন প্রাণ মোর ঘুরিতেছে দিশাহারা,
সুখ নাই শান্তি নাই, যেন গো পাগলপারা।
হেথা বসি সেথা বসি কিছুতে আরাম নাই,
আকুল নয়নে হায়! জগতের পানে চাই।

সবাই করিছে কাজ,জীবনের দুঃখ নাশি,
আমার জীবন শুধু বিফলে যেতেছে ভাসি।
যার হাতে আছে কাজ দেখি তার হাসিমুখ,
লক্ষ্যহীন প্রাণ মোর নাহি আশা নাহি সুখ

লক্ষ্যহীন তরি খানি কাল সিন্ধু পানে,
চলিয়াছে বেগে যেন মরণ লাগিয়া;
ঘুরিতেছে অহরহ ঘূর্ণিপাক টানে,
অতল দহেতে কোথা যাইবে ডুবিয়া।

বিশ্বদেব! বলে দাও কোন্ পথে যাব,
চালাইয়া লয়ে চল তোমার সন্তানে;—
জীবনের লক্ষ্য মোর কোথা গেলে পাব,
তুমিহে কাণ্ডারী! লক্ষ্যহীন এ জীবনে।

শ্রীমতী কুমারী সরলাবালা দেবী।

* স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তিত।

// masthead
বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৫ সংখ্যা। | মাঘ ১২৯৮— ফেব্রুয়ারী ১৮৯২। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ-পরিবারের শোকে সহানুভূতি—আমাদিগের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বংশধর প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের অকাল মৃত্যুতে পৃথিবীব্যাপী শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্ব স্থানের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রজাবর্গ কেবল নয়, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের রাজা ও অধিনায়কেরাও তারযোগে সহানুভূতি জানাইতেছেন এবং সাম্রাজ্ঞী কৃতজ্ঞতার সহিত সকলের প্রত্যুত্তর দিতেছেন। এই শোচনীয় ঘটনোপলক্ষে ইংলণ্ডের কোর্ট ৬ সপ্তাহ এবং জনসাধারণ ৩ সপ্তাহকাল শোক পরিচ্ছদ ধারণ করিবেন। আমাদের রাজ-প্রতিনিধিও আশা করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ মৃত্যু দিন হইতে ৩ সপ্তাহ অর্থাৎ ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শোক চিহ্ন ধারণ করিবেন। এখানকার সিবিল মিলিটারী ও সামুদ্রিক কর্ম্মচারীগণ ২৬এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত শোক পরিচ্ছদ ধারণ করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—গত ২৩এ জানুয়ারি ইহার উপাধি বিতরণ সভার কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। চান্সেলর রাজ-প্রতিনিধি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করেন, ভাইস চান্সেলর অনরেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডিপ্লোমা বিতরণ করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। অনেক রমণী সভাস্থল ভূষিত করিয়াছিলেন, স্ত্রী এম এ, বি এ ও এম বি স্ত্রীজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

দান—(১) কাশীর পয়ঃ প্রণালীর জন্য পাতিয়ালার মহারাজা ১১,৮০০৲ টাকা দিয়াছেন। (২) আজমীড়ের অনাহারক্লিষ্ট মনুষ্য ও পশুদিগের সাহায্যার্থ হোলকারের মহারাজা ৬৩৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

মাঘোৎসব—৬২ সাংবৎসরিক মাঘোৎসব কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন দলস্থ ব্রাহ্মগণ মহা সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের নারীগণ মহিলা সভা, ছাত্রীনিবাস, বালিকা শিক্ষালয়, নীতিবিদ্যালয় প্রভৃতির কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, ইহা বড় আশা ও আনন্দের সংবাদ। ব্রাহ্মসমাজের শিরোমণি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে ব্রাহ্মদিগের এক সম্মিলন হইয়াছিল, বৃদ্ধ মহাত্মা উৎসাহের সহিত স্বয়ং তাহার কার্য্য সম্পাদন করেন।

কুমারী এঞ্জিলিনা মারগারেট হোর।

পাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো ইহাঁর সহিত পরিচিত ছিলেন, অনেকে বোধ হয় ইহাঁর নামও শ্রুত আছেন। ইনি (S P G) সুসমাচার প্রচার নামক রমণী সমিতির প্রধান সভ্য ও তৎসংক্রান্ত জেনানা মিসনের প্রতিষ্ঠাত্রী। সুন্দরবনের আবাদী প্রদেশ ইহাঁর কার্য্যক্ষেত্র। দেশী সাটী ও উচ্চবুট জুতা পরিয়া তিনি কর্দ্দমময় প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া পল্লীতে পল্লীতে প্রচার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। উক্ত প্রদেশের কৃষকরমণী ও তাহাদিগের বালক বালিকাদিগের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি প্রভূত আয়াস ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া অনেক স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এবং স্বয়ং গৃহে গৃহে গমন করিয়া বয়স্থাদিগের শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতির উপায় বিধান করিতেন। কৃষকপত্নী ও বালক বালিকাগণ তাঁহাকে "ব্রহ্ম মা" বলিয়া ডাকিত এবং একান্ত গোপনীয় কথা সকলও তাঁহার নিকট প্রকাশ করিত। সাংসারিক সুখ দুঃখ, আপদ বিপদ প্রভৃতি সকল অবস্থার কথা তাঁহাকে বিদিত করিয়া তাঁহারা হৃদয়ের ভার লাঘব করিত এবং তিনিও অর্থ, উপদেশ ও সান্ত্বনা দান করিয়া যতদূরসাধ্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার কলিকাতার পিপুলপটীস্থ ভবনের দ্বার সকলেরই জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। এখানে কেবল যে তাঁহার প্রিয় কৃষক-পত্নী ও বালক বালিকাগণের প্রবেশ অধিকার ছিল এমন নহে, সকল শ্রেণীর দরিদ্র অনাথা-

গণ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল, ইহাদিগের দুঃখ মোচনার্থ তিনি স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিতেন। কত সময় মিসন ফণ্ড তাঁহার আবশ্যকমত ব্যয় দিতে সম্মত হইত না, তখন তিনি নিজ হইতে কোন না কোন প্রকারে সঙ্কল্পিত সৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জেনানা মিসন প্রতিষ্ঠিত করেন। গত ১৬ বৎসরের মধ্যে ইহঁার কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তারিত করিয়াছেন যে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই কাল মধ্যে তিনি কৃষকপল্লী সকল শিক্ষিত ও সংস্কৃত করিয়া বাসিন্দাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার প্রগাঢ় যত্নে ও অধ্যবসায়ে কৃষকবালা সকল কেবল যে শিক্ষিত হইয়াছে এমত নহে, নীতিপরায়ণা হইয়া সুশৃঙ্খলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়াছে। গত বৎসর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় হইতে অন্যূন ৫০ জন বালিকা গবর্ণমেণ্ট নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষা দিতে কলিকাতার সেনেট ভবনে আসিয়াছিল। এই বিশ্বব্রতধারিণী মহানুভবার একমাত্র প্রযত্নে একটী অজ্ঞানাচ্ছন্ন অসুস্থ জনপদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছিল, কিন্তু এ দেশের গরিবদিগের দুর্ভাগ্যহেতু গত ১০ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে ইনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। ইনি ইংরাজ কুলে একটী সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহঁার পিতার নাম হেনরি হোর, লণ্ডনের ফ্লিট ষ্ট্রীটে ইহাদের একটী (Messrs Hoar's Bank) ব্যাঙ্ক আছে। ইহঁার মাতা রোমানির দ্বিতীয় আর্ল চার্‌লসের দুহিতা লেডি মেরি। ইনি সুশিক্ষিতা ছিলেন। এমন উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ও সাংসারিক অবস্থার সচ্ছলতা সত্বেও তিনি এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়াও এমন একটী তমসাবৃত অসুস্থ প্রদেশ নিজের কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া মনোনীত করিলেন, যে তাহা ইতিপূর্ব্বে কোন ধর্ম্মপ্রচারক প্রচার কার্য্যের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। তিনি গত বৎসর বর্ষাকালে বিলাতে প্রত্যাগমন করেন এবং স্বীয় কার্য্য-ভার সেণ্ট জন্ বাপ্তিষ্টের ক্রুই ভগ্নী সম্প্রদায়ের হস্তে দিয়া যান। তিনি মনে করিয়াছিলেন আর বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না, কিন্তু তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের উচ্চভাব সকল তাঁহাকে আপনার অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র গৃহে অধিক দিন আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও তিনি তৎসমুদয়ে কর্ণপাত না করিয়া অবিচলিতচিত্তে শীতের প্রারম্ভেই এখানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। এখানে আসিয়া অবধি যদিও তিনি উক্ত ভগ্নী সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে প্রকাশ্যরূপে নিজ কার্য্যভার প্রতিগ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার

অবসর ছিল না; পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত কার্য্যই স্বয়ং সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন কার্য্য করিতে করিতেই রোগাক্রান্ত হন—ক্রমে সেই রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠে। তাঁহার শরীর অত্যন্ত সুস্থ ছিল; ইতিপূর্ব্বে আর কখনও জ্বর হয় নাই। সুতরাং এই জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। জ্বরের সহিত ঘোর সন্নিপাত, সুতরাং আর আরোগ্যের সম্ভাবনা রহিল না। ক্রমে অবসন্ন হইয়া উল্লিখিত ১০ই জানুয়ারী মৃত্যু সংঘটিত হয়। তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর হইয়াছিল। এমত ধর্ম্মপরায়ণা মহাব্রতধারিণীর মৃত্যুতে কেবল যে খৃষ্টীয় রমণীসমাজ একটী মহামূল্য রত্ন হারাইলেন এমন নহে, দুর্ভাগ্য বঙ্গভূমিও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। হা মৃত্যু! তোমার কার্য্যের গূঢ়মর্ম্ম কে বুঝিবে?

শোকাশ্রু!

(প্রিন্স বিক্টরের মৃত্যু উপলক্ষে)

কি কঠিন হিয়া তোর—রে নিঠুর কাল!
এমন স্নেহের কলি,বৃন্ত হ'তে ছিঁড়েফিলি,
তোর বিচারেতে বুঝি নাহি কালাকাল?
পুত্রশোকে পাগলিনী হারায়ে নয়নমণি
বিহঙ্গিনী-ছট্‌ফট্ করে যে প্রকার,—
শাবক বিহনে তার,—ঠিক্ সেই দশা মা'র
শূন্যময় দেখিছেন সমস্ত সংসার!
বাজিছে বিষম বাজ সংজ্ঞাহীন যুবরাজ!
হায় কি ঘটিল আজ!--রাজা হবে রাম,--
সে রাম অযোধ্যা ছাড়ি বনে গেল! ঘরবাড়ী
অট্টালিকা—কিছুনয়!—বিধি যারে বাম।
হ'ক না ধরণীশ্বর এড়াতে নারে সে কর,
বিধির অলঙ্ঘ্য বিধি লঙ্ঘিবার নয়!
কে জানিত বিঁধিশেলে দ্বিতীয়ার চাঁদছেলে
জনকেরে ফাঁকিদিয়ে যাবে এসময়?
সত্তর হয়েছে পার, বৃদ্ধা পিতামহী তাঁর,
ভানু অস্ত নাহি যায় রাজ্যেতে যাঁহার,
তরুণ অরুণ সম নাতি—রূপে-অনুপম
হারায়ে সে ধনে আজ জগৎ আঁধার
দেখিছেন বর্ষীয়সী,—রাজসিংহাসনে বসি
নারিলেন শমনেরে করিতে দমন,
নিয়তির কাছে আর, আছে কিরে প্রতিকার
যমদণ্ড এড়াইতে পারে কোন্ জন?
ওই দেখ রাজবালা, গলায় পরাবে মালা,
আশা করে বসে আছে তার প্রতীক্ষায়,
কোথায় সে আশা হায়! পরিণত নিরাশায়
অদৃষ্টে রহেছে তাঁর—আজীবন জ্বালা!
সকলি স্বপনবৎ প্রহেলিকা-এজগৎ
নশ্বর—ক্ষণ-ভঙ্গুর মানব শরীর——
রাজৈশ্বর্য্য বীর্য্যবল পদ্মপত্রে যেন জল
টলমল করে সদা নহে ক্ষণ স্থির!
কিবলে প্রবোধি মনে,প্রবোধমানে কেমনে?
কালে হইবেন যিনি—রাজরাজেশ্বর,—
তিনি আজ তিরোহিত! যেন চিরপরিচিত
কি মিষ্ট চেহারাখানি--অতি মনোহর!
ভ্রমণে ভারতে এসে সুবিশাল দূর দেশে
প্রজার অবস্থা সব নিরখি নয়নে,—
গিয়েছেন সেইদিন, এখনো হয়নি লীন,

দেখিতেছি যেন ছবি হৃদয় দর্পণে;
স্মরিয়ে সে সব কথা মরমে পাইছে ব্যথা
ভারত—কেমনে তাঁরে পাসরিবে হায়!
তাঁহার অভাবে আজ, বাঙ্গলা বম্বে মান্দ্রাজ,
গভীর শোকেতে মগ্ন রয়েছে সবায়।
ওই সে বিলাপ ধ্বনি তুলিতেছে প্রতিধ্বনি
পর্ব্বত গহ্বরে পশি—নিবিড় গহনে,
পশু পক্ষী তরুলতা কেহই কহেনা কথা
নীরবে রয়েছে সবে বিষণ্ণ বদনে!
ভারতের নরনারী, উৎসব আনন্দ ছাড়ি,
ধরিয়াছে শোকচিহ্ন জাতি নির্ব্বিশেষে,
ইংরেজেরা কালফিতা, দেশীয়েরা দেশীপ্রথা
অনুযায়ী আচরণ করিছেন বেশে।
কোটি প্রাণে মিলি আজ করসবে এইকাজ,
মায়েরে সান্ত্বনা দেও—শোকের সময়,
শুনিলে প্রজার কথা কিঞ্চিৎ মনের ব্যথা
উপশম হবে তাঁর—কহিনু নিশ্চয়।
বিশ্ব জননীর কোলে গেছেন তোমার ছেলে
পায়ে ঠেলে যত কিছু অনিত্য অসার,
জরা-মৃত্যু নাই যথা, শান্তি-প্রেম-পবিত্রতা,
নিত্য নিকেতনে,-সুখ-আনন্দ অপার!
এহেন দেশে যে যায় আর কি সে ফিরে চায়
(এ) পাপ-মরুভূমি পানে, অশান্তি আলয়?
ছাড়িগেলে একবার, দূরে যায় দুঃখভার
কি এক স্বর্গীয় সুখে মগন হৃদয়!
অমৃতধামের যাত্রী, যাইতেছে দিবারাত্রি,
সুযোগ ঘটিলে কেহ থাকিতে না চায়;
কাটি মহা মোহপাশ, চ'লে যায় স্বর্গবাস,
প্রবাসের পদ মান সব ঠেলি পায়।

শ্রীচন্দ্র নাথ দাস।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

একদা মহাভারত-প্রসিদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" ধর্ম্ম রহস্য বুদ্ধিরূপ গুহায় লুক্কায়িত। কথা অসত্য নহে। যাহার যেমন বুদ্ধি সে সেইরূপেই ধর্ম্ম-রহস্য অনুভব করে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রচলিত থাকায় অনেকেরই আজ কাল বুদ্ধিমোহ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে যখন এই ভারতবর্ষে কেবল মাত্র হিন্দু জাতি বসতি করিত, তখন এ দেশে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইবার সেরূপ কারণ না থাকায় ধর্ম্ম প্রায় একরূপেই অনুষ্ঠিত হইত; কিন্তু আজ কাল এ দেশে নানা দেশীয় লোকের সমাগমে নানা প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচার হইয়াছে, তাহাতেই এ দেশ আজ কাল ধর্ম্মবিপ্লব-স্রোতে ভাসমান। ধর্ম্মের স্থিরতা নাই, অনুষ্ঠানের নিয়ম নাই, প্রত্যেক মনুষ্যই আপন আপন ইচ্ছার ও বুদ্ধির অবলম্বনে উচ্ছৃঙ্খল। অনেকেই বলেন ও মনে করেন, সংসারে পরমেশ্বরের প্রণীত কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। দেশভেদে ও জাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ দেখা যায়, সে সমস্তই মনুষ্যকল্পিত। মানব-

জাতি যাবৎ না সভ্যতার আলোক দেখিতে পায়, তাবৎ তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে নানা প্রকার কুসংস্কারাপন্ন হইয়া বিবিধ বৃথা আচারে রত হয়। তাহারা জগৎ যন্ত্রের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করতঃ তত্তাবতের কারণ অনুসন্ধানে অক্ষম হইয়া সে সমুদায়কে ঈশ্বরকৃত মনে করে এবং যাহার যে প্রবৃত্তি বলবতী থাকে, সে সেই প্রবৃত্তির তৃপ্তিকর নকেই ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া অবধারণ করে। সেইজন্যই হিন্দুদিগের তন্ত্র শাস্ত্রে মদ্য মাংস ও স্ত্রীসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বা আশ্রয়স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কাহারও মতে পশু হিংসাদি নিষ্ঠুর কার্য্যও ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। আবার অন্যের মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। এইরূপে প্রবৃত্তি অনুসারে বিবিধ অজ্ঞ মনুষ্য ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ কল্পনা করিয়া লয়; পরন্তু তাহারা জানে না যে, এই বিশ্বই বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের প্রথম রচিত মূল ধর্ম্মশাস্ত্র। জ্ঞানিগণ সেই পরমারাধ্য বিশ্বনাথের রচিত এই বিশ্ব শাস্ত্রের অন্তস্তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করতঃ কোন্ বস্তুর কিরূপ স্বভাব, কোন্ বস্তুর সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ, এই সকল রহস্য জ্ঞাত হইয়া করুণাময় পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নিয়ম প্রতিপালনরূপ পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকেন এবং অবশেষে কৃতার্থ হন যাহাঁরা পরমেশ্বরের অনুমোদিত কার্য্য কলাপের প্রকৃত তথ্য বুঝিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিরসে আর্দ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরপরায়ণ হন এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই বিশ্বপতি পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি স্তুতি ও প্রণামাদি করিতে অলস্যপরবশ হন না। পরমেশ্বর যে সকল বস্তু সৃজন করিয়াছেন, সে সমস্তই জীবের হিতের নিমিত্ত। অপিচ তিনি যে জীবকে যেরূপ স্বভাবান্বিত করিয়াছেন, তাহার সহিত বাহ্যবস্তুর তদনুরূপ সম্বন্ধও স্থির করিয়া দিয়াছেন। ব্যাঘ্রজীবকে অতি ক্রূর স্বভাবান্বিত করিয়াছেন, সেই নিমত্তই তাহাদের সেই হিংসা স্বভাবের তৃপ্তিসাধক বহু পশু সমাকীর্ণ অরণ্য ভূমিকেই তাহাদের বাসোপযোগী করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ছাগ মেষাদি জীব মৃদুস্বভাব ও ভীতিপরায়ণ, সেই নিমিত্তই লোকালয়ে তাহাদিগের বাস অবধারণ করিয়া দিয়াছেন। অধিক কি বলিব, যে জীবের যাদৃশ স্বভাব, বাহ্য বস্তুর সহিত তাহাদের তদনুরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

মনুষ্য জীব এক প্রকার স্বভাবান্বিত নহে। জগদীশ্বর ইহাদিগকে বহু বিরুদ্ধ স্বভাবান্বিত করিয়া সৃজন করিয়াছেন। মনুষ্য এক সময়ে ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া নৃশংস স্বভাব ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষা ভীষণ হয়, অন্য সময়ে আবার কারুণ্যরসে আপ্লুত হইয়া পিতা মাতা অপেক্ষাও হিতকর ও প্রিয়দর্শন হয়। বিশ্বনিয়ন্তা যেমন এই মনুষ্য

জীবকে বিরুদ্ধ বহু গুণের আধার করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তেমনি ইহাদিগকে সেই সকল গুণের সামঞ্জস্য করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন। যে সকল জ্ঞানী এই তথ্য জ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই আমাদের মতে ধার্ম্মিক। কেন না তাদৃশ জ্ঞানশালী মনুষ্যেরা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নিয়ম পালন করতঃ সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; অজ্ঞানের ন্যায় ভ্রমজালে হইয়া আপনাকে ও অন্যকে বৃ দুঃখ-ভাজন করেন না। অতএব, পরমেশ্বর-প্রণীত প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিতে পারিলেই যখন মানবজাতির ধর্ম্মানুষ্ঠান করা সিদ্ধ হয়, তখন আর তাহাদের জন্য তাঁহার অন্য প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না এবং তাহা সম্ভবও নহে। তিনি মানবদিগকে আপনার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে বাচনিক নিষেধ করেন নাই। কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠানে যে দুঃখোদয় হয়, সেই কারণ কার্য্যসম্বন্ধ স্থির করিয়া দেওয়াতেই সে সকলের নিষেধ সাধিত হইয়াছে। তিনি যেমন স্বপ্রণীত প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিবার নিমিত্ত কার্য্যবিশেষে দুঃখ সংযোগের বিধান করিয়াছেন, তেমনি নিজাজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কার্য্য বিশেষে সুখসংযোগের বিধান করিয়াছেন। শারীরিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে যদ্রূপ শারীরিক দুঃখ আগত হয়, তদ্রূপ মানসিক নিয়ম প্রতিপালন না করিলেও মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হয়। এই সকল ব্যাপার ও অদ্ভুত রচনা কৌশল দেখিয়া শুনিয়া স্থির করা যায় যে, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ প্রকৃতি-শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্ময় শাস্ত্র আমাদের নিমিত্ত প্রস্তুত করেন নাই। জগৎ বিধাতা পরমেশ্বর যদি মনুষ্য জীবের হিতার্থে কোন বাচনিক শাস্ত্র প্রস্তুত করিতেন বা প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বদেশে একই প্রকার হইত এবং সকলকেই তাহার অনুবর্ত্তী হইতে হইত। তাহা হইলে আর কোনও ব্যক্তির সহিত কাহারও আচার ব্যবহার ও ভক্ষ্যপেয়ের অনৈক্য থাকিত না। প্রচলিত ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদযুক্ত মতবাদ থাকাতেই স্থির হয় যে, সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রই মনুষ্য-কল্পিত, একটীও ঈশ্বরের আদেশ নহে। এইরূপ বিচার এক সম্প্রদায়ের মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক, আবার অন্য সম্প্রদায়ের মনে অন্যবিধ ধারণাও লক্ষিত হয়। পশ্চাৎ এবিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে। *

* এই বিষয় আলোচনা করিতে অনেক সময় আবশ্যক হইবেক ইহাতে পাঠক পাঠিকা-গণের বিরক্তি না হয়।

স্বর্গীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথ।

আবার কি শুনি—নিদারুণ বাণী!
সত্যই কি সেই—অয়স্কান্ত মণি
হয়েছে শমন? অদৃষ্টে কেমন
ফাঁকি দিয়ে যায়—সুপুত্র যেজন!
সেদিন গিয়েছে—রাজেন্দ্র—ঈশ্বর,
দিবানিশি শোকে দহিছে অন্তর!
আছিল অযোধ্যা—অঞ্চলের নিধি,
সেধনে বঞ্চিত করিলেন বিধি!
শিক্ষিত সমাজ—সবে মিলি আজ,—
করি অনুনয়,—কর এই কাজঃ—
অযোধ্যার তরে ফেল অশ্রুবারি,
যুবক প্রাচীন—কিবা নরনারী।
হিমালয় হতে কুমারিকা পার,
ক্রন্দনের রোল উঠুক আবার!
দেখুক জগৎ—অযোধ্যার তরে
সমস্ত ভারত ব্যথিত অন্তরে—
বিলাপ করিছে! রামাভাবে যথা—
অযোধ্যার দশা—ঘটেছিল হায়!
পঞ্জাব মান্দ্রাজ বম্বে—বাঙ্গালায়
আসুক সে দৃশ্য—দেখুক সকলে,
জাতীয় সমিতি—একতা শিকলে
বাঁধিয়াছে সব! ভাব অভিনব
দিয়েছে ভারতে,—জাতীয় উৎসব—
বসেছে সেথায়—এই সাত বার।
যতনে উৎসাহে হিউম্ অযোধ্যার!
সে অযোধ্যানাথ—জীবিত নাই!
সমিতির প্রাণ—জানেন সবাই।
নাগপুর হ'তে—ফিরিয়ে যখন
যাইতেছিলেন আপন ভবন।
সামান্য সরদি হ'তে 'নিমোনিয়া'—
(কি বিষম ব্যাধি!) গেছে তাঁরে নিয়া।
কংগ্রেস হবে না—শুনি সেই কথা—
হ'ল দৃঢ় পণ!—(কে করে অন্যথা?)
ব্যয়ভার সব—বহিব শিরে—
একাকী,—দিব না যেতে সমিতিরে!
এলাহাবাদেতে,—হ'ল স্থিরতর—
বসিবে সমিতি আগামী বছর।
উৎসাহে উদ্যম—অসীম অতুল!
অতি উচ্চপদ—সম্পদ বিপুল;
দেশহিতে তাঁর সদা প্রাণপণ
কিসে দৃঢ় হবে—জাতীয় বন্ধন,
সেই চিন্তা-সার—শয়নে-স্বপনে;
এই যে সমিতি তাঁহারি যতনে!
যাও স্বর্গধামে—লভগে বিরাম,—
বিষয় বাসনা—ভোগলিপ্সাকাম
দেও বিসর্জ্জন—বিস্মৃতি সাগরে;
কত সুখরত্ন—জননীর ঘরে
ভুঞ্জিবে সেথায়,—তার তুলনায়
সংসার-সম্পদ—তৃণাদপি প্রায়!
ওই দেখ মায় কুসুমের হার
গলে পরাইয়ে দিছেন তোমার!
বসাইয়ে দিব্য রত্ন-সিংহাসনে,
তুষিছেন কিবা মধুর বচনে!
আশীষ করি হে তুলি দুই কর,
ভুঞ্জ শান্তি সুখ সেথা নিরন্তর।

শ্রীচ

কে সতীদাহ নিবারণ করেন ?

সহমরণ-নিবারণে রাজা রামমোহন রায় ও পাদরিরা কত দূর কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এখনও অনেকের কুসংস্কার রহিয়াছে। অনেকের বিবেচনায় খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারকেরাই গবর্ণমেণ্টকে উক্ত বিষয়ে উৎসাহী ও উদ্‌যোগী করিয়া তোলেন। হিন্দুদিগের অধিকাংশের বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের ও কতিপয় পাদরিরও ধারণা ছিল ও আছে, যে রাজা রামমোহন রায় উল্লিখিত ব্যাপার রহিত করিবার জন্য একমাত্র উদ্‌যোগকর্ত্তা না হউন, প্রথম ও প্রধান উদ্‌যোগী। এরূপ বিষম্বাদী মতের সত্যাসত্য আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে মধুময় সুফলের প্রত্যাশা করা না যাউক, সত্য নির্দ্ধারণের পক্ষে সহায়তা হইতে পারে, বলা বাহুল্য মাত্র।

সর্ব্বাগ্রে সহমরণ ও অনুমরণ এই দুই শব্দের ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। স্বামীর সহিত এক চিতায় দগ্ধ হওয়াকে সহমরণ বলে। আর স্বামী, বিদেশে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া পতিগত-প্রাণা অঙ্গনা, চিতা প্রস্তুত করিয়া বা করাইয়া উপরত ভর্ত্তার উদ্দেশে অনলে জীবনাহুতি সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন, স্বামি-ভক্ত নারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংসাধন করিলেন, ইহাকে অনুমরণ কহা গিয়া থাকে। কোন্ সুপ্রাচীন কাল হইতে এদেশে সহমরণ ও অনুমরণ চলিয়া আসিতেছিল, তাহার নির্ণয় অসাধ্য না হউক, দুঃসাধ্য বটে। হিন্দু শাস্ত্রে অরুন্ধতী, আদর্শ সতী। ত্রেতাযুগে অরুন্ধতী দেবী ভারতাকাশ মণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকিয়া সকলের মন প্রফুল্ল করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ হইতে প্রাচীন কালে হিন্দুগণকর্ত্তৃক সতীদাহ রহিত করিবার নিমিত্ত কখনও কোনও চেষ্টা হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। মোগল বা পাঠানদের দ্বারা কি কোন চেষ্টা হইয়াছিল ? এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি, মুসলমান রাজত্বকালে মোগলকুল-শিরোভূষণ আকবর কর্ত্তৃক উহার তিরোধানার্থে একবার উদ্‌যোগ হইয়াছিল, এতাদৃশ প্রবাদ শুনা গিয়াথাকে। পাঠান-শাসনকালে কিন্তু কিছুই ঘটে নাই—কর্ত্তৃবর্গের উদ্যোগে কিছুমাত্রও কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই, আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

লর্ড ওয়েলেস্‌লির রাজত্ব সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি ঐ বিষয়ে প্রথম চেষ্টা হয়। উক্ত শাসনকর্ত্তা, নিজামত আদালতকে আদেশ দেন যে, ঐ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মতামত কি, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। অতএব বলিতে হইবে, সতীদাহের ইতিবৃত্তে ঐ বৎসর, ঐ মাস ও ঐ তারিখ, চিরস্মরণীয়। আর সেই সঙ্গে উল্লিখিত রাজ-

শাক অবধি এদেশের গবর্ণর জেনেরেল ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই সহমরণ সংক্রান্ত এক নিয়ম প্রচারিত হইয়াছিল। ঐ নিয়ম, হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয় নাই। তখন বৃটিষরাজ সভয়ে অথচ ক্রমশ হিন্দু-ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন। তখনও প্রজাদের অসন্তোষের কারণ প্রকাশ পায় নাই; যে মহতী ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারী হিন্দুকুলাঙ্গনাগণের পরলোকগত পতির সহমরণ ও অনুগমন-নিবারণে সমুৎসুক হইয়াছিলেন, তাহার অঙ্কুর এই সময় উদ্ভিন্ন হইল। এই অঙ্কুর উদ্গমের পূর্ব্বে রাজপুরুষগণ নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সারকুলার আদেশে সহমৃতার সংখ্যা নিরূপণার্থে এক তালিকা প্রস্তুত হয়। এতদ্দ্বারা রাজপুরুষগণের বহুদিনের নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত হইল। তাঁহারা যেন সুপ্তোথিতের ন্যায় নিদ্রাভঙ্গে প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। পরিশেষে মনে মনে অসীম সাহসে ভর দিয়া অথচ বাহ্য ভঙ্গীতে মনের ভাব গোপন করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তখনকার তাঁহাদের মানসিক ভাব-রাজ্যের তথ্য অনুসন্ধান করিতে পারে, দূরদর্শী এমন কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। সর্ব্বসমেত ৬ ছয়টি বিভাগে যত সতী সহমৃত হইয়াছিলেন তাহার তালিকা এইরূপ :—

(ক) কলিকাতা বিভাগে	২৫৩	নারী
(খ) ঢাকা বিভাগে	৩১	„
(গ) মুরশিদাবাদ বিভাগে	১১	„
(ঘ) বারাণসী বিভাগে	৪৮	„
(ঙ) পাটনা বিভাগে	২০	„
(চ) বেরেলী বিভাগে	১৫	„

ভূয়োদর্শী সহৃদয় গবর্ণর জেনারেল, স্বাধিকার-সময়ে ব্যবস্থাপক সমাজের প্রতিনিধি সভাপতির ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বরের আদেশানুসারে নিজা-মত আদালত, মাজিষ্ট্রেটের ও পুলিশের পর্য্যবেক্ষণার্থে যে সাধারণ নিয়ম প্রচার করিয়া দেন, তাহাতে তিনি ভারত-বর্ষীয়দের কৃতজ্ঞতার পাত্র সুতরাং প্রীতির আধার হইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ কি? ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না হইলেই প্রজারা আপনাদিগকে সুখী জ্ঞান করে।

যাঁহাদের ধারণা রহিয়াছে, বল-পূর্ব্বক সকল সতীকে দাহ করা হইত, তাঁহাদের মহান্ ভ্রম। আমরা এরূপ বলি না, কোন স্থলেই বলপ্রয়োগ হইত না। উভয়ই ছিল। স্থলবিশেষে বল-প্রয়োগে সতীদাহ, কোথায় বা স্বেচ্ছায় স্বর্গলাভের নিমিত্ত সতীদাহ ঘটিত। ইহার প্রমাণ আবশ্যক মতে দিতে পারিব।

এত ক্ষণের পর আমরা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে উপনীত হই-লাম। তাঁহার কার্য্য-সম্বন্ধে ত্রিবিধ মত প্রচলিত আছে। যথা—

(ক) রামমোহন রায়, অনেকের মতে সতীদাহের প্রথম উদ্যোগী।

(খ) কতক গুলির বিবেচনায় তিনিই একমাত্র উদ্যোগকর্ত্তা।

(গ) অবশিষ্ট এক দল বলেন, তিনি প্রথম উদ্যোগী বা একমাত্র উদ্যোগী নহেন বটে, কিন্তু একজন প্রধান উদ্যোগী।

এখন ঐ তিনটি বিষয় বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলেই ইহার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

(ক) রাজা রামমোহন যে সহমরণ রাহি-ত্যের প্রথম উদ্যমে কোন কার্য্য করিতে পারেন নাই, তাহা আমাদের এই প্রব-ন্ধের সূচনাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং স্বতন্ত্র প্রমাণ অপ্রয়োজনীয়।

(খ) তিনি একমাত্র উদ্যোগকর্ত্তাও হইতে পারেন না। কেন না, তাঁহার চেষ্টার বহু পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টের আয়োজন চলিতেছিল।

(গ) তবে তিনি যে এক প্রধান উদ্যোগকারী, তাহাতে কিছু মাত্রও দ্বিধা হইতে পারে না। যে কারণে এই গুরুতর ব্যাপার, তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা এই,—১২১৬ সালে ২৭ চৈত্রে রবিবার শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে (১৮১০ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিলে) তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহন রায়ের মৃত্যু হইলে, তদীয় মধ্যমা প্রিয়তমা অলকমঞ্জরী (বা অলকমণি) স্বামীর অনুগমন করেন। এই প্রবন্ধে জগন্মোহন বাবুর মধ্যমা প্রিয়তমা ঐ দুই নামের অন্তরে উল্লিখিত হইবেন। জগন্মোহন

রায়ের সর্ব্বশুদ্ধ চারি পত্নী ছিলেন। জ্যেষ্ঠার নাম যশোদা। দ্বিতীয়ার নাম অলকমঞ্জরী বা অলকমণি। তৃতীয়ার নাম অজ্ঞাত। চতুর্থীর নাম দুর্গামণি। অলকমণি কনিষ্ঠা সপত্নী ভিন্ন আর দুই জনকে (প্রথমা ও তৃতীয়াকে) স্বামীর সহগামিনী হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই,—সতীদের সংস্কার ছিল, যিনি ভর্ত্তৃসঙ্গিনী হইবেন, পর জন্মে তিনিই কেবল ঐ পতির প্রেয়সী হইবেন। অনেক সতী সেই কারণে অপর সপত্নীগণকে সঙ্গিনী করিতে চাহিতেন না। আমাদের সতী অলকমঞ্জরী কিন্তু সেরূপ স্বার্থপরতায় পূর্ণা ছিলেন না। ঐ আহ্বানেই তাঁহার উদারতার পরিচয় দিতেছে। সে যাহা হউক, প্রথমা ও তৃতীয়া, তাঁহার সঙ্গিনী হন নাই। প্রথমা বলিয়াছিলেন, "আমি কেন পুড়ে মর্‌ব্? অপঘাতে কেন মর্‌তে যাব? বেঁচে থেকে স্বামীর জন্যে ব্রহ্মচর্য্য কর্‌ব।" তৃতীয়ার কোন উত্তর, আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। কনিষ্ঠা সপত্নী কেন সহমরণে অনুরুদ্ধা হন নাই, এই প্রশ্ন হইতে পারে। তাঁহার অষ্টম বৎসরের এক পুত্র ছিল। তিনি মরিলে পুত্রের দশা কি হইবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহাকে অলকমঞ্জরী আহ্বান করেন নাই। পুত্রের নাম গোবিন্দপ্রসাদ রায়। যাঁহার সঙ্গে রামমোহনের পরে মোকদ্দমা চলিয়াছিল, তিনিই রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র। গোবিন্দপ্রসাদের জননী সহগামিনী হইলে, পাছে গোবিন্দপ্রসাদ, অযত্নে মরিয়া যান, এই কারণে তাঁহার সহমরণ প্রার্থনীয় নয়, এই বিবেচনায় তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। তখন রাজা স্বীয় জন্মভূমি-প্রদেশে (খানাকুল কৃষ্ণনগরে) উপস্থিত ছিলেন না। তখনও তিনি কলিকাতাকে কার্য্যক্ষেত্র করিতে পারেন নাই। এই সময়ের প্রায় চারি বৎসর পরে যখন তিনি কলিকাতায় বসতি গ্রহণ করেন, তখনই আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সতীদাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইত। সতীদাহের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া আমরা এত বাক্যব্যয় কি নিমিত্ত করিতেছি, অনেকেই হয়তো এই কথা ভাবিবেন। তাহার কারণ এই,—কোন সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী লেখক বলিয়াছেন, রামমোহন রায়, ঐ সময়ে গৃহে উপস্থিত ছিলেন, এবং উক্ত সময়ে বলপ্রয়োগ করিয়া অলকমঞ্জরীকে দগ্ধ করা হইয়াছিল। এই বর্ণনা ঠিক্ হয় নাই। রামমোহন রায় উপস্থিত থাকিলে, ঐ কাণ্ড কদাচ সংঘটিত হইতে পারিত না। প্রকৃত ঘটনা এই,—রামমোহন রায় মহোদয় তখন রঙ্গপুরে থাকিতেন। ঐ শোচনীয় ঘটনার পর লাঙ্গুড়পাড়ার বাটীতে আসিয়া তিনি নিজ জননীর সঙ্গে অনেক বাদানুবাদ করেন। পুত্র ভাবিয়াছিলেন, জননী উদ্যোগিনী হইয়া ঐ ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি মাতার সহিত ঘোর-

তর বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ওরূপ বলিবার যুক্তি প্রবলতর ছিল। ঐ বধূ, জীবদ্দশায় সুখিনী ছিলেন, এরূপ বলিতে পারা যায় না। সপত্নী থাকিলে, যে প্রকার মনঃকষ্ট ঘটিবার কথা, তাঁহাকে সেরূপ ক্লেশ অশেষ মতে ভোগ করিতে হইত, ইহা রাজা রাম মোহনের অগোচর ছিল না। কিন্তু রামমোহন-জননীর তাহাতে কিছুমাত্রও দোষ দেখিতে পাই না। তিনি ঐ কার্য্যে কেবল উদাসীনা ছিলেন, এমন নয়; কিন্তু উহা তাঁহার অজ্ঞাতে ঘটিয়াছিল। প্রকৃত কথা এই,—জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্মোহনের মৃত্যুতে তিনি উন্মাদিনীর মত বিবশা হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিয়া একটা গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং দ্বিতীয়া পুত্র-বধূর সহগমনে তাঁহার সম্মতি কোথায়? সম্মতি থাকা দূরে থাকুক, তিনি ঐ ঘটনার বিন্দু বিসর্গ সেই দিন জানিতে পারেন নাই। রায়-গোষ্ঠীতে এই সতীদাহই একমাত্র ঘটনা। ইহার পূর্ব্বে বা পরে ঐ রূপ আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই। রামমোহন রায়ের বয়োজ্যেষ্ঠ জেঠতুতো ভাই নবকিশোর রায় মহাশয়, ঐ ঘটনা বিলক্ষণ জানিতেন। কেবল জানা নয়, সকলই তাঁহাকে নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। তৎকালে তিনি ঐ পরিবারের কার্য্যকর্ত্তা ছিলেন। তিনি পরম হিন্দু হইয়াও, উক্ত ভ্রাতৃজায়াকে ঐ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে তিনি কাকুতি মিনতি করিয়া সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কামিনীকে বলিয়াছিলেন, "আপনি জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়া। অপনি আমাদের মাতৃতুল্যা। আপনি দেহত্যাগ করিলে, আমরা মাতৃহীন হইব।" ইত্যাদি কত কথাই বলিয়াছিলেন। ঐ সকল অনুনয়ের প্রত্যুত্তরে অলকমণি বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুরপো! আমাকে নিষেধ করিও না। আমি আর এ সংসারে থাকিতে পারিব না। আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।" যথার্থ সতীর এই উক্তিই বটে। কেন না, অলকমণি, সাক্ষাৎ সাধ্বী অরুন্ধতী-তুল্যা বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। তিনি তখন পঞ্চাশ বৎসরের কিছু ন্যূন-বয়স্কা ছিলেন। ২৭ চৈত্র অপরাহ্ণে ঐ কার্য্য সমাধা হয়। নবকিশোর রায়, রায়-গোষ্ঠীর প্রতি গৃহে ঐ সংবাদ দিয়া আসিলেন। বসতি বাটীর অনতিদূরে রঘুনাথপুরে ঐ চিতা সুসজ্জিত হইয়াছিল। সেই স্থানে এখনও অশ্বথ বৃক্ষ বর্ত্তমান আছে। এই সতীদাহে কোন রূপ বল প্রয়োগ করা হয় নাই। এই সময় হইতে সতীদাহ রহিত করিবার জন্য রাজার অন্তরে ব্যাকুলতা জন্মিল, তিনি ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এক খানি দরখাস্ত, গবর্ণর জেনারেলের নিকট

অর্পিত হয়। তাহার বিরুদ্ধে আর এক খানি আবাদেন, গবর্ণরের গোচরে প্রেরিত হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আসিয়াটিক জর্ণালে উহা মুদ্রিত হইয়াছিল। কোন কোন লোকের মতে এই আবেদনের মূলে রামমোহন রায় ছিলেন। ইহার অকাট্য প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ঐ কার্য্যে রামমোহনের লিপ্ত থাকা অসম্ভব নয়।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে (১২২৫) সালে রামমোহন রায়, সহমরণের বিরুদ্ধে "সহমরণ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব" নামে প্রথম পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রচারিত করেন। ঐ বর্ষেই ইংরাজিতে ঐ গ্রন্থ অনুবাদিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। হিন্দু মহোদয়গণের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হইতে লাগিল। রামমোহনও নিষ্কর্ম্মা বা অলস হইয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ঐ প্রতিবাদের প্রতিবাদ বাহির করিলেন। ১২২৬ সালে ১৬ই অগ্রহায়ণে (১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ৩০ নবেম্বর) উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাই তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক।

এতদ্বিষয়ে তিনি যত গুলি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেগুলির নাম ও প্রকাশের সময় নিম্নে লিখিত হইতেছে। তাহা দেখিলে বোধগম্য হইতে পারিবে ও সুবিচারের সুবিধা হইবে।

পুস্তকের নাম।	সাল।	খৃষ্টাব্দ।
(১) সহমরণ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব	১২২৫,	১৮১৮।
(2) Translation of a conference, between an advocate for, and an opponent of, the practice of burning widow alive, from the original Bengali.		1818.
(৩) সহমরণ বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব	১২২৬	১৮১৯।
(4) A Second conference between an advocate for, and an opponent of, the practice of burning widow alive.	1227	1820.
(৫) সহমরণ বিষয়ক তৃতীয় প্রস্তাব	১২৩৭	১৮৩০।
(6) Anti-suttee Petition to the House of commons.		1830.
(7) Abstract of the Arguments regarding the burning of widows considered as a religious rite.		"

(ক্রমশঃ)

ক

তাদৃশী তাহার কাছে, যাদৃশ যে জন;
স্ব স্ব মুখ-প্রতিবিম্ব মুকুরে যেমন।
চিত্রজীবী কাছে, উহা চারু চিত্রপট;
বিচিত্র বিজ্ঞান-গ্রন্থ, পণ্ডিত নিকট।
সৈনিক সমীপে পৃথ্বী সমর-প্রাঙ্গণ;
বিলাসী ধনীর ঠাঁই,—প্রমোদকানন।
ভীষণ শ্মশান-ক্ষেত্র, শোকার্ত্তের পাশে;
নিদ্রা-হেতু সুখশয্যা, অলস সকাশে।
বণিকের সন্নিধানে, বিচিত্র বিপণি;
বৃদ্ধের নিকটে, যেন মৃত্যুর সরণি।
শিশু-পাশে, ক্রীড়া-স্থলী হেন নাহি আর,
পরান্নভোজীর পক্ষে, ভীম কারাগার।
নর-নারী এ' সংসারে নাট্যশালা মাঝে,
করে নিত্য অভিনয় সাজি নিজ সাজে।

নীতিকথা ও দৃষ্টান্তমালা।

১। সদ্‌বংশে জন্মিলেই যে সৎ হয় এরূপ নহে, উর্ব্বর ক্ষেত্রে যে কণ্টক বৃক্ষ জন্মে, তাহার কি বেধন শক্তি থাকে না? চন্দন কাষ্ঠের সঙ্ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহার কি দাহিকা শক্তি থাকে না?

২। মহতের দুর্বাক্য বরং সহ্য হয়, কিন্তু মহতের বলে বলীয়ান ক্ষুদ্রের দুর্বাক্য সহ্য হয় না। প্রচণ্ড সূর্য্য তাপ সহ্য হইয়া থাকে, কিন্তু সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত বালুকাকণার উত্তাপ সহ্য হয় না।

৩। উত্তম, মধ্যম ও অধম লোকের মিত্রতা এবং অধম, মধ্যম ও উত্তম লোকের শত্রুতা, প্রস্তর, বালুকা ও জল নিহিত রেখার ন্যায়।

৪। হাস্যও সময় সময় মহা অনিষ্টের সূচনা করে। প্রিয়দর্শন বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইলে ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি হইয়া থাকে।

৫। নিরন্তর শাস্ত্রপাঠ করিলেই যে জ্ঞানী হয় এরূপ নহে। ঔষধ সুসেবিত না হইয়া কেবল নামোচ্চারিত হইলেই রোগের উপশম হইতে পারে না।

মূর্খ উপদেশ প্রাপ্ত হইলে শান্ত না হইয়া প্রকুপিত হয়। সর্পকে দুগ্ধ পান করাইলে তাহার বিষ হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৭। কোমলমতি বালকগণের মনে যে বিশ্বাস একবার বদ্ধমূল হইয়া যায়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা আর উৎপাটিত হইবার নহে। কুম্ভকার লিখিত মৃণ্ময়-পাত্রে রেখা পড়িলে তাহা আর সহজে যায় না।

৮। সময় বিশেষে আত্মীয়ব্যক্তিও শত্রু এবং অনাত্মীয়ব্যক্তিও মিত্র হয়। দেহজ ব্যাধি জীবননাশ করে, কিন্তু আরণ্য ঔষধ জীবন দান করিয়া থাকে।

৯। সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর

সুখ সংসারে অব্যর্থ নিয়ম। চক্রনেমির গতি পরিবর্ত্তন ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

১০। ক্ষুদ্র ব্যক্তিও মহতের সহায়তা পাইলে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। স্বল্পসলিল পল্বল মহানদীর সহিত মিলিত হইয়া মহাসাগরে পতিত হয়।

১১। দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণগ্রহণ করা ও গুণ পরিত্যাগ করিয়া দোষগ্রহণ করা সাধু ও অসাধুর প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। শিশুর স্তন্যপান ও জলৌকার রক্তপান ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

১২। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্যই মহতের গুণ শ্রবণ করিয়া থাকে। ব্যাধ কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্ত না করিয়া সপ্তনলী সন্ধান করিবার জন্যই কোকিলের মধুর কাকলী শ্রবণ করিয়া থাকে।

পক্ষী কি আনন্দে গান গায়!

পক্ষী কি আনন্দে গান গায়! আমরা বলি গায়। ভাল, যদি গাইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্য জিজ্ঞাস্য পক্ষীর আবার আনন্দ কি প্রকার? বিধাতা সকল প্রাণীকে প্রাত্যহিক জীবনের কিয়দংশ আনন্দে, কিয়দংশ নিরানন্দে, কিয়দংশ উৎসাহে কিয়দংশ নিরুৎসাহে অতিবাহিত করিতে দিয়াছেন, না দিলে সংসার চলিত না। পক্ষিজাতি এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে। ইহার আনন্দ বা নিরানন্দ বেশ উপলব্ধি হইতে পারে। মনে কর কোন নিষ্ঠুর লোক নীড় হইতে শাবক অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। পক্ষীটী ...ক খাওয়াইয়া কিম্বা তাহার নিকট ...দিয়া যে ভাবে ছিল, তখন কখনও সে ভাবে থাকিতে পারে না; তখন তাহাকে দেখিলেই বা তাহার ডাক শুনিলেই অনায়াসে অনুমিত হয় যে সে শোক-বিহ্বলা হইয়াছে কিম্বা আর্ত্তনাদ করিতেছে। পূর্ব্বের চীৎকারের সহিত এখনকার চীৎকার তুলনা করিলে পার্থক্য বিশেষরূপ বোধগম্য হয়। পূর্ব্বের অবস্থা বা ডাক ছিল সুখের ও আনন্দের, এখনকার অবস্থা বা ডাক শোকের ও নিরানন্দের। মানবের হৃদয় আহ্লাদে ও আমোদে উদ্বেলিত হইলেই মানব গান গায়, না গাইয়া থাকিতে পারে না; কারণ, এমন মানব জগতে অদ্যাবধি জন্মগ্রহণ করে নাই, যে কখনও গান গায় নাই, কিম্বা যাহাকে কখনও সঙ্গীতে মুগ্ধ করে নাই। মানুষেরা যদ্যপি এইরূপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইতর পশু পক্ষী

যে এই পরমসুখে বিবর্জ্জিত হইবে, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। ঈশ্বর আমাদিগের ও তাহাদিগের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ করিয়া দিয়াছেন যে আমরা অনির্ব্বচনীয় শক্তি ভাষা দ্বারা মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে সবর্থ হই, তাহারা তাহা পারে না। কিন্তু তাহাদিগের যে স্বতঃসিদ্ধ অসংলগ্ন অপরিস্ফুট শব্দাদি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার মূলে যে বাগ্দেবী মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছেন। * অতএব অবাধে বলা যাইতে পারে যে, পশু পক্ষিগণ যাহা দ্বারা স্ব স্ব সুখ দুঃখাদি প্রকাশ করে, তাহাই উহাদিগের ভাষা। ইহাদ্বারা উহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট স্ব স্ব ভাব ব্যক্ত করিতে পারে—আনন্দধ্বনি করিতে পারে, বিলাপও করিতে পারে। পশু পক্ষীর কথা দূরে থাকুক, ক্ষুদ্রতম কীটপতঙ্গাদিতে এই ঐশ্বরিক ভাব পরিলক্ষিত হয়। এতৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বকার বামাবোধিনীতে "পিপীলিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে।

আমেরিকার সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ব ও পক্ষিতত্ত্ববিৎ ডাক্তার সিঃ সিঃ আবট উপরি-উক্ত মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। প্রায় বিশ বৎসর অতীত হইল ইনি ইংলণ্ডের কোনও এক সাময়িক পত্রিকায় এতৎসম্বন্ধীয় এক সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। সম্প্রতি ইনি ফিলাডেলফিয়ার কোন সংবাদ পত্রে লেখেন যে, পূর্ব্ব ইংলণ্ডীয় সাময়িক পত্রিকায় যে মত প্রকাশিত হয়, এতদিন পরেও তিনি তাহার পোষকতা করিতেছেন। শুধু তাহা নহে। এবিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস উত্তরোত্তর বদ্ধমূল হইতেছে। ইনি বলেন যে, সকল পক্ষী গান গায় না বটে, কিন্তু একটিও মূক বা বাক্‌শক্তিহীন নয়। অনুসন্ধায়ীর জানা উচিত যে, যাহা আমাদিগের কর্ণে কর্কশ লাগে, পক্ষীর কর্ণে অনেক সময়ে তাহা ভাল লাগে। ইনি আরও অনুমান করেন যে প্রাচীন সময়ে অতি অল্প গায়ক পক্ষী ছিল। শত শত বৎসরের উন্নতি দ্বারা ইহারা বর্ত্তমান গানশক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা কেবল শাবক উৎপন্ন করিবার সময় গান গাইত, এক্ষণে অন্যান্য সময়েও ইহাদিগকে গান গাইতে শুনা যায়। ইহা হইলেও ইহাদিগের পূর্ব্ব অভ্যাস এখনও বিশেষরূপে তত্ত্বানুসন্ধায়ীর দৃষ্টিগোচর হয়।

* "নিউ রিভিউ" নামে মাসিক পত্রিকায় ডাক্তার গার্ণার কর্ত্তৃক লিখিত সুচারু প্রবন্ধ দেখ।

উদাসীনের চিন্তা।

বিনয়।

বিদ্যাবিনোদপুরে সুধেন্দু বাবুর বাস। তাঁহার পুত্রের নাম বিনয়কুমার। নাম বটে বিনয় কুমার, কিন্তু বিনয় দুর্ব্বিনীতের একশেষ। বিনয়ের দুর্ব্বিনীত হইবার প্রথম কারণ এই যে তাহার পিতামহী বর্ত্তমান। সুধেন্দু বাবুর পাঁচ কন্যার পর এক পুত্র, তাই বিনয়ের আদরের সীমা নাই। পিতামহী তাহাকে মাথার মণি করিয়া রাখিয়াছেন। পিতামহী গৃহকর্ত্রী, বৌত সম্পূর্ণ তাঁহারই অধীন। পুত্র সুধেন্দু বাবু মাতৃভক্ত সন্তান। মাতৃ-আদেশ তাঁহার নিকট বেদবাক্য, সুতরাং পরিবারের সকলের উপর পিতামহীর অপরিসীম প্রভুত্ব। পিতামহী যখন বিনয়ের অধীন, তখন বিনয়ই পরিবারের রাজা। বর্ষীয়সী পিতামহী নপ্তা বা নাতীর আদেশ প্রতিপালন জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। পুত্র, পুত্রবধূ কিংবা অপর কেহ যদি নপ্তার ইচ্ছার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, অমনি পিতামহীর ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। নপ্তার পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক বিরুদ্ধাচারীকে বাক্যবাণে নির্য্যাতন করিতে থাকেন। বিনয় পিতামহী হইতে এইরূপ সাহস এবং সহানুভূতি পাইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে আপনাকে প্রভূত শক্তিশালী পুরুষ মনে করিয়া দুর্ব্বিনীত ও দুরন্ত হইয়া উঠিল। মানুষ যাঁহাদিগের নিকট অবনত হইবে, যাঁহাদিগের আদেশ শিরোধার্য্য করিবার জন্য বিধাতার বিধানানুসারে বাধ্য, যদি তাহাদিগের নিকট অবনত হইতে শিক্ষা না করে, প্রত্যুত তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তারের সুবিধা ও সুযোগ পায়, তাহাহইলে সে দুর্ব্বিনীত হইবে বিচিত্র কি? আত্মশক্তিকে ক্ষুদ্র মনে না করিতে পারিলে কেহ বিনীত হইতে পারে না। মহতী শক্তির সহিত তুলনা করিলেই মানুষ আত্মশক্তির ক্ষুদ্রতা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে পিতা মাতার শক্তির সহিত আত্মশক্তি তুলনা করিবার সুবিধা পায়। কিন্তু পিতা মাতা অথবা পিতামহ পিতামহীর নির্ব্বুদ্ধিতা ও চিত্ত-দৌর্ব্বল্য জন্য যদি কোন সন্তান আত্মশক্তিকে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া অনুভব করিবার সুবিধা পায়, তাহাহইলে কোনক্রমেই তাহার প্রাণে বিনয় স্থান পাইতে পারে না। যে ব্যক্তি পরিবারের গুরুজনদিগের নিকট বিনয়ী হইতে পারে না, সে পরিবারের বাহিরের শ্রেষ্ঠতর গুণী ব্যক্তিদিগের সহিত আত্মশক্তি তুলনা করিয়া আপনাকে নিকৃষ্ট

মনে করিবে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। বিনয়ের দুর্ব্বিনীত হইবার দ্বিতীয় কারণ পরিবারে অপরব্যক্তির দোষের সমালোচনা। সুধেন্দু বাবু এবং তাঁহার সহ- জগতে প্রশংসার উপযুক্ত লোক দেখিতেন না। কার্য্যকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যখন দম্পতী একত্র উপবেশন করিতেন, তখন প্রতিবেশী, গ্রামবাসী এবং পরিচিত ব্যক্তি মাত্রের চরিত্রের সমালোচনা আরম্ভ করিতেন। তাঁহাদের সমালোচনার বিষাক্ত বাণ হইতে কাহারও নিষ্কৃতি পাইবার সাধ্য ছিল না। যাঁহাদিগের সাধুতার সৌরভে জগৎ মুগ্ধ, সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের অতি সামান্য দোষও এই দম্পতীর দৃষ্টিসমক্ষে উদ্ভাসিত হইত। পুত্র বিনয়কুমার পিতৃ মাতৃ মুখবিনিঃসৃত সেই গরল ধারা পান করিয়া আত্মপ্রাণকে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। জনক জননী যেমন পৃথিবীতে শ্রদ্ধার পাত্র—যাঁহার সমীপে তাঁহাদিগের গর্ব্বিত মস্তক অবনত হইতে পারে এইরূপ লোক অন্বেষণ করিয়া পাইতেন না, সন্তানও তেমনি সকলের উপর আপনার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া অবজ্ঞারচক্ষে সমস্ত নরনারীকে নিরীক্ষণ করিতেন। গুণে জ্ঞানে ধনে মানে পদমর্য্যাদায় তাহার প্রতিযোগী কেহ হইতে পারে, এই বিশ্বাস তাহার ছিল না। পিতামহীর প্রশংসা, জনক জননীর সহানুভূতি, এই বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল করিয়াছিল। কল্পনার শিরে আরোহণ করিয়া বিনয়কুমার যতই আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে লাগিল, ততই অহঙ্কারে তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। জনক জননী সন্তানের এইরূপ গর্ব্বিতভাব প্রত্যক্ষ করিয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে বিনয়কুমার জগৎকে উপেক্ষা করিত বলিয়া তাঁহাদের এ ক্লেশ হয় নাই, কারণ তাঁহাদেরও স্বাভাবিক ইচ্ছা এই ছিল যে বিনয় আত্মাভিমান শিক্ষা করুক। কিন্তু বিনয় যে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিত, এ কষ্ট আর প্রাণে সহ্য হইত না। বিনয়কুমার দুর্বিনীত হইয়া পাপ পথে অগ্রসর হইতেছে ইহা যত না কষ্টের কারণ, তাঁহাদিগের আত্মাভিমান সন্তানের নিকট চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, সন্তানের অপব্যবহারের জন্য লোকনিন্দার বিষাক্ত তীর তাঁহাদিগের অভিমানের অঙ্গে সজোরে আঘাত করিতেছে এই সমস্ত দুর্ব্বিবহ যন্ত্রণায় দম্পতী অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই একদিন তাঁহাদিগের পরমাত্মীয় চন্দ্র বাবু বাড়ীতে আসিলে প্রাণের ক্লেশ সমস্ত খুলিয়া তাঁহাকে বলিলেন। চন্দ্র বাবু সুধেন্দু বাবুর পরিবারের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন যে পরিবারের অন্তরের সংবাদ কিছুই তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। যে যে কারণে বিনয় কুমারের মন দুর্বিনীত হইয়া পড়িতেছে,

তিনি সুধেন্দু বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট তাহা বর্ণন করিলেন। কিন্তু দম্পতীর যতটুকু দোষ প্রদর্শন করিলেন, তাহা তাঁহাদের মনে স্থান পাইল না। সুধেন্দুর সহধর্ম্মিণী কুসুমকুমারী সমস্ত দোষ শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিলেন। এই বিষয় লইয়া চন্দ্র বাবুর সহিত বিলক্ষণ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। চন্দ্রবাবু কোন ক্রমেই দম্পতীকে তাঁহাদের দোষ হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি নিরাশ হইয়া বলিলেন "বিনয়ের রোগ দুশ্চিকিৎস্য। প্রথমতঃ বিনয়ের বয়স অধিক হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতি যখন কোমল থাকে, তখন ইচ্ছানুরূপ তাহা গড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি কঠিন হইয়া পড়িলে আর সে অবস্থা থাকে না। তবে প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিলে কৃতকার্য্য হইবার কথঞ্চিৎ সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ যে সকল কারণে রোগোৎপত্তি হয়, সে সকল কারণ যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন রোগোপশম হইবার আশা কোথায়? সুচিকিৎসকগণ রোগের কারণ অপনোদন করিবার জন্যই সর্ব্ব প্রথমে চেষ্টা করেন। আপনাদিগের বাড়ীতে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। আমি বলিতে পারি বিনয়ের সমক্ষে যদি আপনারা লোকের নিন্দা করিতে থাকেন, তাহা হইলে কোন কালে তাহার প্রাণে বিনয়ের ভাব আসিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে আপনারা যদি কোন দোষী ব্যক্তিরও দোষের ভাগ পরিবর্জ্জন করিয়া গুণের প্রশংসা করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহা শুনিয়া বিনয়ের মন সেদিকে আকৃষ্ট হইতে পারে, এবং সেই গুণরাশির নিকট তাঁহার গর্ব্বিত মস্তক অবনত হইতে পারে। অন্যথা আপনারা বাহিরের অনেক উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, বিনয়কে শারীরিক শাস্তি প্রদানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, নানা বিধ প্রলোভন প্রদর্শনে তাহার চিত্তকে বিনীত করিবার প্রয়াস পাইতে পারেন, কিন্তু সে সকল চেষ্টা ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

চন্দ্রবাবুর যুক্তি বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতী সুদূরদর্শী এবং আত্মদোষক্ষালন-ক্ষম পুরুষ এবং মহিলার সমীপে জ্ঞানগর্ভ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু পরছিদ্রান্বেষী এবং আত্মদোষ দর্শনে সম্পূর্ণ অপারগ সুধেন্দু বাবু ও কুসুমকুমারীর সমীপে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। চন্দ্রবাবু বিদায় গ্রহণ করিলে পর তাঁহারা বসিয়া তাঁহারই কুৎসা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিনয়কুমার পার্শ্বের গৃহে উপবেশন করিয়া সেই সুখাদ্য উদরস্থ করিতে লাগিল! বিনয়ের বিনীত হওয়ার আশা চিরদিনের তরে নির্ব্বাপিত হইল। বিনয়ের বয়োবৃদ্ধির সহিত জনক জননীর দুঃখানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

যাঁহাদিগের আত্মদোষে সন্তান নষ্ট হয়, তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে আত্মশাসন করা কর্ত্তব্য। আত্মশাসনে অসমর্থ ব্যক্তির আত্মদোষে সন্তানের চরিত্র দূষিত হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শোকানলে দগ্ধীভূত হইতেই হইবে। বিধতার বিধি অলঙ্ঘ্য। যে কার্য্যের যে ফল, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। নির্ব্বোধ মানুষ তাহা না বুঝিয়া অশ্রু জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিলেও সে বিষয়ের অন্যথা হইবে না। বুদ্ধিমান্ পুরুষ এবং বুদ্ধিমতী মহিলা বিধাতার বিধি আবিষ্কার করিয়া তাহারই অনুবর্ত্তন করেন। এইরূপ করিলে তাঁহাদিগকে আর অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে হয় না। তাঁহারা বিধাতার আদেশ পালন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও শান্তি সুখ লাভের অধিকারী হন।

প্রহ্লাদের ন্যায়পরতা।

যখন পরম ধার্ম্মিক দৈত্যকুল-ভূষণ প্রহ্লাদ রাজাসনে আসীন হইয়া সুনিয়মে রাজ্য পালন করিতেছিলেন, তখন বিরোচন নামে তাঁহার একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই মহাবদান্য বলির জনক ছিলেন। বিরোচন শৈশবে পিতা মাতা কর্ত্তৃক রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া কৈশোরে উপনীত হইয়াছেন, এই সময়ে তিনি তাঁহার পিতার রাজ্যস্থ কোন সমবয়স্ক ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে কলহ করিয়া বলিলেন যে সংসারে রাজা শ্রেষ্ঠ। দ্বিজপুত্র তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "সংসারে দ্বিজই শ্রেষ্ঠ, কেন না দ্বিজগণ জ্ঞানে ও ধর্ম্মাচরণে ধরামধ্যে অদ্বিতীয়, ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রপ্রণেতা ও প্রজাপালন, রাজ্যরক্ষাদির নিয়ন্তা; যোগপরায়ণ, বিশ্বের হিতাভিলাষী, নৃপতিগণের উপদেষ্টা, নিরীহ, লোভপরিবর্জ্জিত, অভাব সঙ্কোচকারী ইত্যাদি গুণে দ্বিজগণ ধরামর বা ভূদেব বলিয়া অভিহিত। বিরোচন বলিলেন "যদি রাজা ন্যায়ানুসারে রাজ্যরক্ষণ, ও অস্ত্রধারণ করিয়া শিষ্ট পালন ও দুষ্ট দমন না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের এ সকল গুণ কোন্ কার্য্যে আসিত?„ এইরূপে দুইজনে বহুক্ষণ ধরিয়া তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল, পরে দ্বিজপুত্র বলিলেন "চল, তোমার পিতার নিকট যাইয়া ইহার মীমাংসা করি, যিনি বিচারে পরাজিত হইবেন তাঁহার জীবন পণ থাকিল।" বিরোচন বলিলেন "ভাল, তাহাই হউক।" এই বলিয়া দুইজনে মহাত্মা প্রহ্লাদের নিকট চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দুইজনের কলহের ও পরাজয়ে জীবন পণের বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া বিচার প্রার্থনা করিলেন। প্রহ্লাদ শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু সত্যের অনু-

রোষে প্রিয়তম পুত্রের জীবন উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "দ্বিজবর! ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ কেননা জ্ঞান, বিদ্যা ও ধর্ম্মই সংসারে শ্রেষ্ঠ এবং সেই সকল গুণে ভূষিত হইয়া দ্বিজগণ আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন; বিরোচনের জীবন এখন আপনার অধীন, আপনি ইচ্ছা করিলে বিরোচনের জীবন বিনাশ করিতে পারেন।" দ্বিজপুত্র প্রহ্লাদের বাক্য শুনিয়া অনন্দ সহকারে বলিলেন, "মহাত্মন্! আপনার পুত্র দীর্ঘজীবী হউন ও আপনার ন্যায় সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুসারে রাজ্য পালন করুন। সত্যপরায়ণ ব্যক্তি কখনও মনস্তাপ প্রাপ্ত হয়েন না এবং আপনার সদৃশ ব্যক্তির বংশে যে ব্রহ্মশাপ পতিত হইবে ইহাও অসম্ভব, অতএব অপনি এখন আপনার পুত্রকে নিরাপদ দর্শন করুন, আমিও আপনাকে ও আপনার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করি।

কুরুক্ষেত্র পর্য্যটন।

রেলওয়ের দ্বারা দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেরূপই হউক না বাণিজ্য ও গমনাগমনের যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা রবিবার রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া প্রভাতে মোকামা আসিলাম এবং পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে বেলা ১০টার সময় স্থানেশ্বর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

ষ্টেশন হইতে স্থানেশ্বর অর্দ্ধ ক্রোশ দূর। একা আরোহণে স্বল্পক্ষণ মধ্যেই নগরে উত্তীর্ণ হইলাম। প্রথমে কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন হ্রদ সন্দর্শন করিয়া স্থানেশ্বরে রামহ্রদে স্নান করিব সংকল্প করিলাম। নগর হইতে দ্বৈপায়ন হ্রদ অর্দ্ধ ক্রোশ দূর। একাআরোহণে গমন করিতে কিছু কষ্ট হইল বটে, কিন্তু পদব্রজে যাইতে কিছুই আয়াস নাই। পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় "একা" কি পদার্থ জানেন না। তাঁহাদিগের জন্য ইহার সটীক বিবরণ প্রকটিত করা গেল। একা—একখানি দুই চাকার গাড়ী—উপরে একটী মঞ্চ। ইহা রঙ্গিল বস্ত্র বা কাম্বিসের ঘেরা টোপে আবৃত। ইহার মধ্যে কেবল একজন মাত্র বসিতে পারে। দুই বা তিনজন কখন কখন চারিজনেও বসিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। মঞ্চের বা বসিবার আসনের নিম্নে দুইপার্শ্বে কতকগুলি খঞ্জনী বা করতাল সজ্জিত আছে, তাহা এরূপভাবে অবস্থাপিত যে শকটখানি চলিবামাত্র ঝম্‌ঝম্ করিয়া বাজিতে থাকে। কোন কোন শকটে লোহার স্প্রীং থাকে। সে গুলি অধিক

দোলে না, কিন্তু যাহাতে লোহার স্প্রীং নাই, তাহা প্রতি আন্দনে আন্দোলিত হইয়া আরোহীর যন্ত্রণার কারণ হইয়া থাকে। গো-শকটে যে প্রকার আরোহণ করিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ উঠিতে হয়। তবে সমর্থ পুরুষেরা চাকার উপর ভর দিয়াও আরোহণ করিতে পারেন। একজনের সমাবেশ হয় বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম "এক্কা" হইয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত ইহার বাহন অশ্বের বেশ ভূষাও চমৎকার। পৃষ্ঠে বিচিত্র আস্তরণ, মস্তকে কড়ী বা বীড়ের উজ্জ্বলমালা এবং গলদেশে চর্ম্মবন্ধনী মধ্যে মধ্যে ঘণ্টিকায় গ্রথিত বা সজ্জিত, চলিবার সময় তালে তালে নিনাদিত হয়। দূর হইতে শকটস্থ করতালের বাদ্যের সহিত অশ্বের কণ্ঠমালাস্থ ঘণ্টিকা নিনাদের মিশ্র আরাব শুনিতে বড়ই মধুর! যাঁহারা "একার" এই চিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাঁহারা বটতলার মুদ্রিত "রাম রাবণ বা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের" "রথ-চিত্র" সন্দর্শন করিলে কতকটা আভাস প্রাপ্ত হইবেন। আমরা এইরূপ রথারোহণে কুরুক্ষেত্র পর্য্যটন করিলাম। আমাদের রথে লোহার স্প্রীং ছিল না, সুতরাং আরোহণের যে সুখ, তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারিবে। বিশেষতঃ আমরা এক এক রথে তিন তিন জন করিয়া আরোহণ করিয়াছিলাম (কারণ ষ্টেশনে দুই খানির অতিরিক্ত শকট ছিল না), সুতরাং কষ্টের ইয়ত্তা ছিল না। যদি দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কৌতূহলের উদ্রেক না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় ক্ষণমাত্রও তদবস্থ থাকিতে পারিতাম না। যাহাহউক বেলা ১১টার সময় দ্বৈপায়ন হ্রদে সমুপস্থিত হইলাম। হ্রদটী দর্শনমাত্রই মনে এক অপূর্ব্ব ভাবোদয় হইল। দ্বৈপায়নের সঙ্গে সমগ্র মহাভারত সম্মুখে বিদ্যমান। স্মৃতি-লোচনে ভাবসংযোগে চিন্তানিমিষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্য কুরুক্ষেত্রে বিলুণ্ঠিত হইয়া অচেতন রহিয়াছে, মহারাজ দুর্য্যোধন ভগ্নোদ্যম হইয়া নৈরাশ্য অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বৈপায়ন হ্রদ আশ্রয় করিয়া লুক্কায়িত আছেন। অগ্নিশর্ম্মা ভীমসেন কূলে দণ্ডায়মান হইয়া রোষ-কষায়িত নেত্রে অগ্নিবৃষ্টি করিয়া হ্রদ শোষণ করিতেছেন। আজ কৃতকার্য্য হইলে তিনি প্রতিজ্ঞা পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, এই চিন্তায় সমাকুল হইতেছেন। সন্দেহ ও আশায় হৃদয় উদ্বেলিত, তথাপি সাহসের ক্ষুন্নতা নাই। অকুতোভয়ে জলদগম্ভীর নাদে দুর্য্যোধনের উদ্দেশে কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। মহামানী দুর্য্যোধন "জ্ঞাতি দুর্ব্বাক্য অসহ্য" বোধে লুকায়িত স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধ ভরে ভীমসেনকে আক্রমণ করিতেছেন! ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ! অদূরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি অন্য চারি ভ্রাতা দণ্ডায়মান, সম্মুখে হলায়ুধ জয়

পরাজয়ের বিচার করিতেছেন। অন্ত-রীক্ষে দেব, ঋষি ও পিতৃলোক অধিষ্ঠান করিয়া ভীম দুর্য্যোধনের ভীষণ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সন্দর্শন করিতেছেন! এই সেই মল্লদেশ দ্বৈপায়ন হ্রদ! এক্ষণে ইহা কেবল নামেই পর্য্যবসিত হইয়াছে!! ইহার আয়তন প্রায় অর্দ্ধ বর্গ ক্রোশ হইবে। পূর্ব্বে চারিদিকই "গজগিরি" করা বান্ধান ছিল; অধুনা কেবল দুই দিকে ও স্থানে স্থানে সোপানাবলী বিদ্যমান আছে। সংস্কারাভাবে অবশিষ্ট অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এ সময়ে (শ্রাবণ মাসের প্রাক্‌কালে) সমস্ত হ্রদই প্রায় শুষ্ক, কেবল একধারে সামান্য পঙ্কিল জল আছে মাত্র, তাহাও শ্বেত শতদল দলে এরূপ পরি-ব্যাপ্ত যে অতি কষ্টে সঙ্কুচিত হইয়া স্নান করিতে হয়। একে জলের অল্পতা ও পঙ্কজদামের নিবিড়তা, তাহার উপর আবার কচ্ছপের বিলক্ষণ উপদ্রব আছে। কয়েকজন যাত্রী পঙ্কি-স্নানের ন্যায় সেই কদর্য্য অল্প জলে স্নান করিতেছিল, কিন্তু আমাদিগের তাহাতে প্রবৃত্তি হইল না। হ্রদের উপর দিয়া অনতিবিস্তৃত একটী সেতু প্রস্তুত আছে। জনশ্রুতি—সেতুটী পাণ্ডবদিগের নির্ম্মিত হ্রদের অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অধুনা অল্প অংশ মাত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইটুকুই বোধ হয় নিয়মিত সংস্কার করা হয়। ইহা হ্রদমধ্যস্থিত লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরের সহিত সংযুক্ত। ঘাটের উপরেই দেবা-লয়। এখানে পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি প্রতি-ষ্ঠিত। হিন্দুদিগের সকল তীর্থ স্থানই মুসলমানেরা অপবিত্র করিয়াছে, সুতরাং এখানেও যে তাহাদিগের উপদ্রব চিহ্ন দৃষ্ট হইবে না, এরূপ কখনই হইতে পারে না। উল্লিখিত পাণ্ডব সেতুর অনতি-দূরেই একটী অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত সেতু সম্রাট্‌ অরেঙ্গজীব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা যখন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখনও বোধ হয় হ্রদ সম্পূর্ণ জলপূর্ণ ছিল না, কারণ ইহাও পরপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত নহে। অপর পারে সিদ্ধবটী। জনশ্রুতি দুর্য্যোধন এই স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন। এখানে একটী প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ আছে। ইহার সন্নিকটে হ্রদের অব্যবহিত উপরেই সমুচ্চস্থলে একটী বৌদ্ধ মঠ। মঠের অভ্যন্তরে ২টী পাদচিহ্ন ও একটী বেদিকা। স্থানটী অতীব মনোহর। ইহারই আব-রণ প্রাচীরের মধ্যে এক দেশে কয়েকটী সোপান দৃষ্ট হয়। পাণ্ডারা অজ্ঞ যাত্রী-দিগকে তন্নিম্ন স্থানে দুর্য্যোধনের লুক্কা-য়িত বাস নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন রৌদ্রে এক্কারোহণে হ্রদটী প্রদক্ষিণ করিলাম। পূর্ব্বে ইহা একটী মহা-সমৃদ্ধিশালী তীর্থ ছিল, তাহা প্রদক্ষিণ করিলেই বিলক্ষণ অনুমিত হইয়া থাকে। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্যের সহিত এস্থানেরও প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়াছে। কুরুক্ষেত্র দানস্থলী। দ্বৈপায়নহ্রদ সম্বলিত ৮ ক্রোশ স্থান দানবেদী পুণ্যস্থলী। হিন্দুধর্ম্মমতে এখানে স্নান করিলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয়

হইয়া থাকে। হরিদ্বারে বা হরদ্বারে স্নান, কুরুক্ষেত্রে দান, ও কাশীধামে বাস ইহাই পুণ্যকীর্ত্তি ও ধর্ম্মার্থী হিন্দুদিগের জীবনের লক্ষ্য।

এখান হইতে স্থানেশ্বর প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। স্থানেশ্বরেই প্রসিদ্ধ রামহ্রদ বা ব্রহ্মসর। কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মসর সত্য যুগের তীর্থ, সুতরাং ইহার মাহাত্ম্য পুরাণে বিশেষ বর্ণিত আছে। ইহার পৌরাণিক আয়তন কিরূপ তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু অধুনা ইহা একটী সামান্য কুণ্ড মাত্র। চারিধার গজগিরি বা প্রস্তরের সোপানে বান্ধান। স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের স্নানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। চারিদিকে ৪টী বৃহৎ বটবৃক্ষ ও ৪টি অশ্বথ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত থাকাতে স্থানটী ছায়াময় ও মনোহর হইয়াছে। কুণ্ডের অব্যবহিত পরেই স্থানেশ্বরের পবিত্র মন্দির। কুণ্ডের জল অপরিষ্কার, তবে দ্বৈপায়নহ্রদের ন্যায় পঙ্কিল ও কদর্য্য নহে। এখানেও কচ্ছপের সমধিক প্রাদুর্ভাব। পবিত্র রামহ্রদে স্নান করিয়া স্থানেশ্বরের মহাদেব সন্দর্শন করিলাম। অসময় নিবন্ধন যাত্রীর ভিড় ছিল না, সুতরাং দর্শনাদি অনায়াসেই সম্পন্ন হইল। শুনিলাম গত কুম্ভযোগে এখানে প্রায় তিন লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। তখন যে ইহা কিরূপ বিসদৃশ স্থান হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

মায়ের নিকট বালিকার রামায়ণ শ্রবণ।

বিধুমুখে সুধা হাসি, মায়ের সমীপে আসি
মৃদু মধু কহিছে বালিকা;
কহ মাতঃ, কৃপা করি, শুনিব শ্রবণ ভরি,
রামের বিচিত্র আখ্যায়িকা।
বলি, আকর্ণন আশে, বসিলা জননী পাশে
মেনকা সকাশে উমা যথা;
তনয়ার প্রীতি তরে, মাতা অতি সমাদরে
আরম্ভিলা পৌরণিকী কথা।
শুন বাছা, সুললিত, শ্রীরাম মঙ্গলগীত
বাল্মীকির পুরাণ-সম্মত;
যেই রূপে রঘুরাজ, লীলা কৈলা বিশ্বমাজ,
বিবরি কহিব সংক্ষেপত।
বীরত্ব ধীরত্ব ধাম, ছিলা দশরথ নাম
সার্ব্বভৌম রাজা অযোধ্যায়;
ক্রমে নৃপ মহাশয়, কৈলা তিন পরিণয়—
কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রায়।
চারি পুত্র জন্মে তাঁর, শ্রীরাম ভরত আর
লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন অভিধান;
রূপে সবে শশিসম, তেজঃ পুঞ্জে সূর্য্যোপম,
প্রভাবেতে দেবেন্দ্র সমান।
জনক, মিথিলাপতি, কন্যা তাঁর গুণবতী,
রূপে, সীতা সৌদমিনী নিভা;
স্বয়ম্বর স্থলে গিয়া, বাহুবল প্রকাশিয়া
শ্রীরাম করিলা তারে বিভা।
যুবরাজ বধূসনে, আসিলেন নিকেতনে,
রাজা চা'ন রাজ্য তাঁরে দিতে;
বিমাতা কৈকেয়ী দাম, বনবাসে গেল রাম,
সীতা আর লক্ষ্মণ সহিতে।

হ'য়ে ভগ্ন মনোরথ, পুত্র-শোকে দশরথ,
পরাণ করিলা পরিহার ;
রামের পাদুকা নিয়া; রাজাসনে প্রতিষ্ঠিয়া
ভরত লইলা রাজ্য ভা'র।
জানকী লক্ষ্মণ সনে, শ্রীরাম দণ্ডকারণ্যে
বঞ্চেন খাইয়া বনফল ;
শ্রীঅঙ্গ বাকলে ঢাকা, রাহুগ্রস্ত যেন রাকা,
নাহি শয্যা বিনা ধরাতল।
দৈব দোষে বিড়ম্বন, কোথা রাজ্য, কোথা বন,
তবু দুঃখ নহে অবসান ;
দশানন লঙ্কাপতি, ছল করি দুষ্টমতি,
সীতা হরি করিল প্রয়াণ।
হনুমান, নীল, নল, সুগ্রীবাদি মহাবল,
কপিগণে করিয়া সহায়,
সীতার উদ্ধার হেতু, সাগরে বাঁধিয়া সেতু,
দাশরথি পশিলা লঙ্কায়।
রাম-প্রেমে মুগ্ধমন, যোগ দিল বিভীষণ
রাবণের কনিষ্ঠ সোদর ;
রাক্ষসে, বানর নরে, শিলা, যষ্টি, মুষ্টি, শরে
বাঁধিল সমর ঘোরতর।
কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিত, রক্ষঃ সেনা অগণিত,
একে একে পাইল নিধন ;
মজিল রাক্ষস জাতি, লঙ্কাপুরে দিতে বাতি
বুঝি না রহিল একজন।
ক্রোধে জ্বলি দশানন, করিলা দুর্জয় রণ,
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে বিঁধিলা ;
বৈদ্যের ব্যবস্থা জানি, বিশল্যকরণী আনি,
হনুমান তাঁরে বাঁচাইলা।
তবে রাম ক্রোধ ভরে, বধিলেন লঙ্কেশ্বরে
ব্রহ্ম অস্ত্র করিয়া সন্ধানে।
ত্রিলোকে ঘুচিল শঙ্কা, বানরে সোণার লঙ্কা
বিভীষণে করিলা প্রদান।

জানকী লক্ষ্মণ সাথ, সমারোহে রঘুনাথ
উত্তরিলা অযোধ্যা নগরে ;
ভরত প্রফুল্লমন, পিতৃত্যক্ত রাজ্য ধন
সমর্পিলা অগ্রজের করে।
বেষ্টিত স্বজনগণে, সীতা সহ সিংহাসনে
রাজা হয়ে বসিলেন রাম ;
মেঘেতে বিজলী ছটা, হেরি সে সুষমা ঘটা
কৌশল্যার পূর্ণ মনস্কাম।
কাল ক্রমে সীতা সতী, পঞ্চমাস গর্ভবতী;
পুনঃ সাধ্বী পড়ে দৈব রোষে ;
দশানন দুরাচার, ছিল সীতা গৃহে তার,
দুষ্ট লোকে অপযশ ঘোষে।
প্রজা তুষ্টি হেতু রাম, বনিতারে হয়ে বাম,
বিনা দোষে বর্জিলা তাহারে ;
বাল্মীকির তপোবনে, মুনি-কন্যাগণ সনে
বঞ্চে সীতা ব্রত সদাচারে।
করে সতী সুপ্রসব, শুভলগ্নে কুশ লব
নামে দুই যমজ নন্দন ;
রূপে, তেজে, প্রতিভায়, ক্রমে দোঁহে বৃদ্ধি পায়,
শুক্লপক্ষে শুধাংশু যেমন।
অযোধ্যায় রঘুমণি, পুত্র সম মনে গণি
প্রজায় পালেন মহাভাগ ;
সীতা যেই নির্ব্বাসিতা, নির্ম্মাইয়া স্বর্ণ সীতা
আরম্ভিলা অশ্বমেধ যাগ।
যজ্ঞ দেখিবার মনে, মহর্ষি বাল্মীকি সনে
কুশ লব করে আগমন ;
মুনির ইঙ্গিত পেয়ে, রাজসভা স্থলে গিয়ে,
রামেরে শুনায় রামায়ণ।
পুত্রকৃত পরিচয়ে, সীতা আনি নিজালয়ে
পরীক্ষা করিতে রাম চায় ;

জানকী শুনি সে কথা, অন্তরে পাইয়া ব্যথা
অভিমানে ত্যজিলা পরাণ।
কাঁদে রোলে কুশ লব, কাঁদে পুরনারী সব,
মুগ্ধ রাম বনিতার শোকে ;
এইরূপে লীলা করি, জীবলোক পরিহরি
চারিভ্রাতা গেলা সুরলোকে।
ভারতে অক্ষয় ধন, ধন্য গ্রন্থ রামায়ণ,
বাল্মীকি বচন সুধারস !
ধন্য রঘুমণি রাম, হেরি যাঁর গুণগ্রাম
বনের বানর হৈল বশ।
স্নেহভক্তি অবতার ধন্য ভ্রাতৃগণ তাঁর,
ধন্যা সীতা সতীকুলেশ্বরী ;
যত্নে কর বাছাধন, নীতি রত্ন আহরণ,
এঁদের চরিত পাঠ করি। *

বানরের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব।

অনেকেই জানেন, বানরেরা সময়ে সময়ে মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিয়া মানবদিগকে চমৎকৃত করে। অল্প দিন অতীত হইল, আমরা একটী বানরের অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। ঘটনাটী যথাযথ বর্ণন করি, পাঠক পাঠিকাগণ দেখুন বানরজাতি কিরূপ প্রতিভাশালী।

একজন পথিক হাতে একটী বদ্ধমুখ হাঁড়ি ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছিল। পথিকের বেশ সাপুড়েদিগের ন্যায়। হাঁড়ির মুখে একখানি সরা, গলায় দড়ি দিয়া বাঁধা, পথিক সেই দড়িতে হাঁড়ীটী ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছিল। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যকিরণে তাহার শরীর অবসন্ন হওয়ায় পথপার্শ্বস্থ একটী বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষের তলে হাঁড়ীটী রাখিয়া বিশ্রামার্থ উপবেশন করিল। একে ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতল সুশীতল, তাহাতে আবার সেখানে শীতল বায়ুর সঞ্চার, শ্রান্তিসুলভ নিদ্রা পথিককে আক্রমণ করিলে পথিক বৃক্ষে ঠেশ দিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য অচেতনপ্রায় হইল। এই গাছে কতকগুলি বানর ছিল, ঐ অবসরে তাহারা সমবেত হইয়া যেন কি বলাবলি করিল। অল্পক্ষণ পরে একটা বানর আস্তে আস্তে নামিয়া

* পাঠক পাঠিকাগণের নিকট প্রশংসা লাভের প্রত্যাশায় প্রণোদিত হইয়া লেখক এই প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন নাই। কারণ এই মহা পৌরাণিকী কথায় নূতনত্বের অবতারণা তাঁহার ন্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দুঃসাধ্য। তবে তাঁহার যাহা উদ্দেশ্য তাহা এই:—অস্মদ্দেশে, পুত্র কন্যাগণ উপাখ্যান শুনিতে চাহিলে রমণীবৃন্দ কাহিনী (বা উপকথা) বলিয়া থাকেন। তাহাতে অনেক সময় উপকার না হইয়া বরং ভূত, প্রেত, রাক্ষস প্রভৃতির অলীক কুসংস্কার তাহাদের তরল হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। তাই লেখকের প্রার্থনা স্ব স্ব সন্তানগণ উপাখ্যান শ্রবণ করিতে চাহিলে, বিদুষী পাঠিকাগণ রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র ও সদাগরপুত্র এবং রাক্ষস ও রাজকন্যা প্রভৃতির অলীক গল্প না করিয়া রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতির পৌরাণিকী কথা দ্বারা তাহাদিগের কৌতূহল নিবারণ করেন। এই প্রবন্ধ তাহারই একটী দৃষ্টান্ত মাত্র। সঃ।

আসিয়া চট্ করিয়া পথিকের হাঁড়ীটী লইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে গাছের উপরিভাগের একটা অগ্র ডালে গিয়া বসিল। সাহসিপ্রধান বানর হাঁড়ি আনিতে পারিয়াছে দেখিয়া অন্যান্য বানরের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সকলে সমবেত হইয়া নানা প্রকার আনন্দধ্বনি প্রকাশ করিতে লাগিল।

হাঁড়ী আনয়নকারী বানর হাঁড়ীর মধ্যে না জানি কি উত্তম খাদ্য আছে ভাবিয়া আনন্দোৎফুল্ললোচনে যেমন হাঁড়ীর মুখাবরণ সরাখানি এক হস্তে উত্তোলন করিল, অমনি তন্মধ্য হইতে একটী সাপ গর্জ্জিয়া উঠিল এবং ফণা বিস্তার করিয়া হাঁড়ির উপরে ও বানরের অভিমুখে অর্দ্ধাঙ্গ দোলায়িত করিতে লাগিল। ভাগ্যের বিষয় এই যে ফণী সহসা বানরকে দংশন করিল না, কেবল দুলিতেই থাকিল। এই ঘটনায় বানর যাহা করিল, তাহা অতি অদ্ভুত। ভাবিতে গেলে বানরবুদ্ধিকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। কোন মনুষ্য সেরূপ বিপন্নকালে সেরূপ প্রত্যুৎপন্নমাত দেখাইতে পারে কি না সন্দেহ, সন্দেহ কেন, পারে না বলিয়াই বিশ্বাস।

যেমন হাঁড়ির মুখ খোলা, তেমনি সাপ বাহির হওন, তেমনি বানরের যোগাবলম্বন। বানর হাঁড়ির গলবন্ধন রজ্জু—পথিক যাহা ধরিয়া ঝুলাইয়া আনিয়াছিল সেই রজ্জু—নিজ গলদেশে দিয়া হাঁড়ি ঝুলাইয়া দিয়াছিল, পরে সরার মুখ খুলিয়াছিল। বানর আসন্ন বিপদে ধৈর্য্যভ্রষ্ট ও বুদ্ধিভ্রষ্ট না হইয়া যোগীর ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাষ্ঠের মত নিষ্পন্দ ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সাপ হাঁড়ির উপরে অর্দ্ধাঙ্গ উত্তোলিত ও ফণা বিস্তার করতঃ কেবল এদিক্ ওদিক্ ঝুঁকিতে লাগিল। বানরের সেই বুদ্ধিকৌশল ও অবস্থানভঙ্গী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। এদিকে অন্যান্য বানরেরা ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া এ ডাল ও ডাল করিতে লাগিল এবং নানা প্রকার শব্দ ও হস্ত পদাদির আন্দোলন করিতে লাগিল। তাহাদের সেই সেই ভঙ্গিমা দেখিয়া আমরা স্পষ্টই বুঝিলাম, বানরেরা যেন সেই বিপন্ন বানরের জন্য ত্রস্ত হইয়াছে এবং উপদেশ করিতেছে বা বলিয়া দিতেছে—ওটাকে ধরিয়া ছিঁড়িয়া ফেল—নখে বিদীর্ণ কর। কিন্তু বিপন্ন বানর যোগাসনে নিশ্চল নিষ্পন্দ। বানরজাতি যে তত চঞ্চল, তথাপি সে সেই উপস্থিত বিপদে কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল ও নিষ্পন্দ। মধ্যে মধ্যে দু একবার কোটরপ্রবিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু যেন মিট্ মিট্ করিতেছে।

ঐরূপে প্রায় ১০ মিনিট অতিবাহিত হইল। অন্যূন ১০ মিনিট পরে সাপ পলাইবার অভিপ্রায়ে বার কতক এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া নিকটস্থ এক পল্লবাকীর্ণ ক্ষুদ্রডাল লক্ষ্য করিয়া মস্তক অবনত করিল এবং সেই সময় তাহার ফণাও সংকুচিত হইয়া গেল। আশ্চর্য্য এই যে, সাপ যেই মাথা নোয়াইয়াছে, সতর্ক বানর সেই

সূত্রে তাহার গলদেশ এক হস্তে খুব জোরের সহিত ধরিয়া অন্য হস্তে গলার ঝুলান দড়ি ছাড়াইয়া সজোরে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অন্য এক শাখায় গিয়া বসিল। দেখিলাম সাপ ধরা পড়িয়াছে, দেখিয়া সমুদায় বানর আনন্দ নিনাদ করিতে লাগিল। এখন কোন বানর আসিয়া সাপের লেজ ধরিল, কেহ তাহার গাত্রে নখ প্রবেশ করাইল, যে গলা চাপিয়া ধরিয়াছে সে খুব জোরে সাপের মুখ ডালে ঘষিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে সাপ মরিয়া গেল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। বানরেরা তখন তাহাকে বৃক্ষতলে নিক্ষেপ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে গিয়া উপবেশন করিল।

এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছিলাম এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্ময়পূর্ণ মনে বানরের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলাম। সাপুড়ে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

বানরজাতি যে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন তাহা পূর্ব্ব হইতে শুনা ছিল, সম্প্রতি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সে কথা অধিক সত্য বলিয়া স্থির হইল। ধন্য জগদীশ্বর! তোমার সৃষ্টিকৌশল কে বুঝিতে পারে!

প্রসঙ্গক্রমে আর একটী বানরের বুদ্ধিমত্তার পুরাতন কথা স্মরণ হইল, বর্ণন করিতেছি।

যাহারা বানর খেলাইয়া বেড়ায়, তাহাদিগের অবস্থা সকলেই জানেন। নাচের বানরকে তাহারা পোষাক পরায়, পোষাকপরা বানর তাহার প্রভুর অনুসারে নানাপ্রকার ক্রীড়া করে। ইহারা কেবল বানর নাচায় এমন নহে, দুই তিনটী করিয়া রামছাগলও ইহাদের সঙ্গে থাকে। বানর সেই রামছাগলের পৃষ্ঠে সোয়ার হয় ও তাহার সহিত অনেক প্রকার কৌতুক করিয়া দর্শকদিগকে তৃপ্ত করে।

একদিন কাল্‌নার ঘাটে এক বানরনাচক বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় স্নানাহার করিবার জন্য উপস্থিত হইল। সে আহার করিবে বলিয়া বাজার হইতে দধি ও চিড়া ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। বানর ছাগল ও সেই খাদ্য উপরে রাখিয়া সে গঙ্গায় স্নান করিতে গেলে পর অবসর পাইয়া দুষ্ট বানর প্রভুর আনীত সেই দধি তাড়াতাড়ি ভক্ষণ করিল এবং দধির কিয়দংশ ছাগলের মুখে মাখাইয়া দিয়া এক পার্শ্বে গিয়া ভাল মানুষের মত (যেন কিছুই জানে না) চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বানরনাচক স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, সে দধি নাই এবং ছাগলের মুখে দৈ মাখা। তাহা দেখিয়া তাহার নিশ্চয় বোধ হইল, ছাগল তাহার দধি খাইয়াছে, অবশেষে সে ক্রোধে অধীর হইয়া ছাগলকে প্রহার করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া অনেক লোক সেখানে জমিয়া গেল, এবং আশ্চর্য্য এই যে, তন্মধ্যস্থ একজন বানরের সেই বজ্জাতি

প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, সে তাহা বানরনাচককে বলিতে উদ্যত হইলে বানর তাহার মুখ পানে চাহিয়া অতীব কাতরতা-ব্যঞ্জক মুখবিকৃতি করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বানরও যথোচিত প্রহার প্রাপ্ত হইল, কিন্তু দর্শক ও বানরনাচক তাহার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। বানর জাতির বুদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত কাহিনী শুনা যায়, আমাদের বিবেচনায় সে সকল নিতান্ত অসত্য নহে। আরও কত ইতর প্রাণীর বুদ্ধিচাতুর্য্যের কত পরিচয় পাওয়া যায়।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার লোক সংখ্যা ১৮৮১ সালে ৪৩৩২১৯ ছিল, ১৮৯১ সালের গণনায় ৬৮১৫৬০ হইয়াছে।

২। গত ৯ই ফেব্রুয়ারি পার্লেমেণ্ট মহাসভা খুলিয়াছে। মহারাণীর বক্তৃতায় তাঁহার পৌত্রের শোকে তাঁহার সুবিশাল রাজ্যের প্রজাগণ যে সহানুভূতি করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছে, ভারতের জন্য নূতন প্রণালীতে ব্যবস্থাপক সভা গঠনের উল্লেখ আছে।

৩। প্রিন্স বিক্টরের মৃত্যুতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রিন্স জর্জ ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। ইহাঁর সহিত আবার দুর্ভাগিনী রাজকুমারী মেরী টেকের বিবাহের কথা হইতেছে।

৪। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলবাসী-দিগের উন্নতি কল্পে ভিঙ্গার রাজা ১০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৫। পণ্ডিত অযোধ্যানাথের স্মরণার্থ সভা কলিকাতার টাউন হলে আহূত হয়, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা তাহার সভাপতির কার্য্য করেন।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। নবীনা জননী—শ্রীপ্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। এ এক খানি নূতন ধরণের সামাজিক উপন্যাস। মানব চরিত্রের সুখ দুঃখ আশা নিরাশার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়া সুন্দর ও সুললিত ভাষায় তাহা অঙ্কিত করিয়া উঠা সকল লেখকের শক্তিতে কুলায় না। এই জন্যই সাধারণ গল্পের বই গুলি উপন্যাস নামে পরিচিত হইয়া উপন্যাসের গলায় ছুরি চালাইয়া দিয়া থাকে। যাঁহারা গভীররূপে মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, মনুষ্য চরিত্র পশুপ্রকৃতি, মনুষ্যত্ব ও দেবভাবের আশ্চর্য্য সমাবেশ মাত্র। যে মানুষ এক সময়ে রিপুর গোলাম হইয়া সমাজের কত অমঙ্গল ঘটায়, পাপের ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইয়া সমাজের কত আতঙ্ক উপস্থিত করে, সেই মানুষ আবার যখন দেবভাবের বশীভূত হইয়া কার্য্য করে, তখন বহু

কালের সামাজিক ব্যাধি দুরীভূত হয়, সমাজ এক নূতন শ্রী ধারণ করে, মানুষ সাধারণের সম্মুখে এক নূতন আদর্শ আনিয়া মনোহর বেশে অবতীর্ণ হয়। নবীনা জননী-লেখক মানব প্রকৃতির অতি গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তাহার পরস্পর বিরোধী অসংখ্য ভাব, অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা, অসংখ্য বাসনা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং অতি সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে সে গুলি চিত্রিত করিয়াছেন, বৃদ্ধ হরি দয়াল বাবুর চরিত্র যেমন, প্রায় সকল চরিত্রই সেইরূপ গ্রন্থকার উত্তম রূপে ফুটাইয়াছেন। ললিত ও প্রতিভাকে তিনি মনুষ্যত্বের সীমাতেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন। কিন্তু হেমন্তকুমার ও নবীনা জননী উষার জীবনে নির্ম্মল ও নিষ্কাম দেবভাবের অপূর্ব্ব জ্যোতি ফলাইয়া তাঁহাদের দ্বারা আদর্শ গৃহস্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। হাস্যোদ্দীপনের ক্ষমতা গ্রন্থকারের বেশ আছে। গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে ইচ্ছাসত্বেও কতবার হাস্যসংবরণ করা অসম্ভব হইয়াছে। দুই এক স্থানে চক্ষের জলও সংবরণ করা যায় নাই। এরূপ গ্রন্থের যত আদর হয়, ততই সমাজের কল্যাণ!

২। তারা ব্রহ্মময়ী মা বা মাতৃপদাঞ্জলি স্তোত্র—শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত। ২৪টী সংস্কৃত কবিতাস্তবকে এই পুস্তিকাখানি গ্রথিত এবং তাহাতে মাতৃভাবে ঈশ্বরের স্তব করা হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতায় প্রত্যেক স্তোত্রের অনুবাদ আছে। কবিতাগুলি যেমন সুন্দর সুললিত, সেই রূপ প্রগাঢ় ভক্তিরসাত্মক ও হৃদয়স্পর্শী। ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর পক্ষে পুস্তকখানি অতি উপাদেয় হইবে, সন্দেহ নাই। মুদ্রাঙ্কণ যারপর নাই সুন্দর হইয়াছে।

৩। রঘুবংশ ১ম ভাগ শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদিত। মহাকবি কালিদাসের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ বাঙ্গালা কবিতার পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়া প্রচার করা সহজসাধ্য নহে। নবীন বাবু এ বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকি না পারি না। গ্রন্থ খানি সুপাঠ্য হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণাকারে প্রকাশিত দেখিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

বামারচনা।

প্রিয়বালা।

আয় তো আমার প্রিয়বালা,
আয় তো আমার হৃদয় বাসি!
বল্ তো কথা সুধার ভাবে,
তোল তো ও চাঁদ বদনখানি।

চাইলে তোমার মুখের পানে,
দেখ্‌লে তোমার মধুর হাসি,
আমি কি আর আমায় থাকি,
প্রাণ চলে যায় কোথায় ভাসি!

যে আলোকে, সোনালী চাঁদ
নিত্য ভাসে শ্যামল সাঁঝে।'
যে আলোকের ছড়া ছড়ি
বেলি যুথি গোলাপ মাঝে,
যে আলোক, উষার বাহার,
যে আলোকের তরুণ রবি,
যে আলোকে, ভুবন খানি
মনে হয় "কি সোণার ছবি!"
সেই আলোকে কেমন যেন
তোর মু'খানি সদাই মাখা,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে হলেম সারা
তবু দেখ্‌লে যায় না থাকা!
মনটা যেন শিউরে ওঠে,
প্রাণটা যেন বেরোয় কেঁপে,
তাইতে তোরে এম্‌নি ক'রে
বুকের প'রে ধরি চেপে।
তোমার মুখে তোমার বুকে
স্বরগ দেশের ভালবাসা,
তোমার কথা, তোমার গাথা,
ব্‌ গুলো স্বরগের ভাষা!
স্বরগ পুরে[illegible] ুরী তুমি
ভূলোক মাঝে দ্যুলোক মেয়ে,
মানুষ গুলো "অমর" হয়
তোমার গায়ের গন্ধ পেয়ে;
তোমায় দেখে বিশ্ব গলে
ব'য়ে যায় কি প্রেমের ঢেউ,
থাকে না ক' ঝগড়া ঝাটি
"পর্‌" থাকে না একটী কেউ।—
তাও ছাড়া আর্‌ কিছু আছে
তোমার মুখে মাখা মাখি,
তোরেই দেখ্‌লে মনে পড়ে—
* * * *
থা'ক্‌ থা'ক্‌ থা'ক্‌ থা'ক্‌ বাকি।

তখন আমার জগৎ খানি
শুধুই কেবল ব্রহ্মময়,
তখন আমার শব্দ গুলা
বেদ বেদান্তের কথা কয়।
"স্বরগ আছে দেবতা আছে"
তখন আমি বুঝ্‌তে জানি,
মরণ প'রে জীবন আছে—
চোখে দেখার মতন মানি।
পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল-জ্ঞান,
ঐ মুখে মোর সবই লেখা,
মনুষ্যত্ব, বিশ্বতত্ত্ব,
তোমার কাছেই আমার শেখা।
এ শুক্‌নো নীরস প্রাণে
তোমার তরেই তুফান ছোটে,
তোমার তরে এ সাহারায়
দু'চার্‌ হাজার কুসুম ফোটে।
যাবার বেলা, প্রাণটী আমার
তো'তে রেখেই চলে যাব,
আমার যা'সব রইল বাকি
তুমি পেলেই আমি পাব।
যে দিন তুমি এসেছিলে
সেদিন ছিল পীযুষ ঢালা,
তাই আমরা, তোমার নাম
রেখেছিলেম "প্রিয়-বালা"।
আজ—
গরীব আমি কাঙাল আমি
কোথায় বা কি পাব আর—
এইটী নিও, বলে তোমার
"জনম দিনের উপহার"!

শ্রীপ্রিয়প্রসন্ন আচার্য্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৬ সংখ্যা। | ফাল্গুন ১২৯৮—মার্চ্চ ১৮৯২। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বাবু ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক বিভ্রাট—১৮৮৯-৯০ এবং ৯০-৯১ এই দুই বৎসরের পারিতোষিক প্রদত্ত হইতে পারে নাই, ইহার কারণস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে, 'যথেষ্ট গুণবিশিষ্ট কোন রচনা বিচারকদিগের নিকট প্রেরিত হয় নাই।' এই জন্য ৯১-৯২ সালে "বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের শিল্পবিদ্যা" বিষয়ে রচনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে এবং এবার ৩টী পারিতোষিক একসঙ্গে বিতরিত হইবে। তেমন গুণের রচনা না মিলিলে অবশ্য আগামী বারের জন্য ৪টী পারিতোষিক জমিবে এবং ক্রমে অধিক জমিতে পারে। বিচারকেরা কি দেখিয়া গুণের বিচার করেন, আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু "বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয়ক রচনাটী পরিত্যক্তের মধ্যে একটী, তাহা বামাবোধিনীতে (গত জ্যৈষ্ঠ হইতে কয়েক সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নির্গুণ কি না সাধারণে বিচার করিতে পারেন। এরূপ চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও সুবিচার পূর্ণ রচনা বিচারকদিগের মনোনীত না হইলে কিরূপ রচনা হইবে আমরা জানি না। আর এক কথা একবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লেখার জন্য যিনি পুরস্কৃত হইয়াছেন তিনি আর কস্মিন্‌কালে পুরস্কার পাইবেন না, তাঁর ভাগ্যে রচনাটী আবার 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট' বলিয়া গ্রাহ্য হইলে তাঁর নাম গেজেটের বিজ্ঞাপনে যাইবে, এ ব্যবস্থাটীও আমাদিগের নিকট সঙ্গত বোধ হইল না। হিন্দু গৃহের স্ত্রীলোক গেজেটে নাম ছাপা দেখিবার জন্য তত ব্যস্ত

নহেন। দাতার উদ্দেশ্য সাধনে ফণ্ডের ট্রষ্টীগণ অধিকতর মনোযোগী হন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

জর্ম্মণিতে ধর্ম্মশিক্ষা— জর্ম্মণ সম্রাট সাম্রাজ্যের সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষায় বাধ্য করিয়াছেন। ভারতের অধিকাংশ স্কুল কলেজে ধর্ম্মশিক্ষার নাম গন্ধ নাই। অভিভাবকেরাও ধর্ম্মশিক্ষার অভাব অনুভব করেন না। ইহার ফলে বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ কিম্ভুত কিমাকার পদার্থ হইতেছেন।

স্ত্রীকর্ম্মচারী—বোম্বাই মিউনিসিপালিটী স্ত্রী কেরাণী নিয়োগের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকগণ শিক্ষিত হইলে তাহাদের মূল্য ও আদর ক্রমে বাড়িবে সন্দেহ নাই।

লেডী ডফ্‌রীন হাঁসপাতাল—কলিকাতার হাঁসপাতালটী নূতন বড় রাস্তার ধারে সুন্দর ও প্রশস্তাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত নগর সকলে আরও চারিটী স্ত্রী হাঁসপাতাল হইয়াছে :—ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা, গয়া ও কটক।

কুচবিহারের মহারাণী—প্রায় ৩ মাস কাল উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। বড় বড় সাহেব ডাক্তারেরা তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, পরে সুবিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। ইহাঁর সুচিকিৎসায় জীবনের আশা হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইলাম। জগদীশ্বর মহারাণী সুনীতিকে নিরাময় করুন্।

ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল—গত ২৬ এ ফেব্রুয়ারী কাশীধামে ইহার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। নির্ম্মস্তক ও বিশৃঙ্খল হিন্দুসমাজের মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও সুশাসন আনয়ন করা এই সভার উদ্দেশ্য। সভা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইলেও সুখের বিষয়।

বীরপুরুষের বীরত্বের সম্মান রক্ষা।

যখন মোগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, চারিদিকে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন মহারাষ্ট্রে মহিমান্বিত শিবজী স্বাধীনতার সম্মান রক্ষায় উদ্যত হয়েন। তাঁহার যেমন অসাধারণ সাহস, সেইরূপ লোকাতীত অধ্যবসায় ছিল। তিনি সম্রাটের নিকটে কিছুতেই অবনত-মস্তক হইলেন না, দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতিদিনই সম্রাট্ তাঁহার অনুপম তেজস্বিতায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন। তিনি এই পরাক্রান্ত বিপক্ষকে বশীভূত করিবার জন্য আপনার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দক্ষিণাপথের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র শিবজীর ক্ষমতা খর্ব্ব

হয়, তাঁহার অধিকৃত জনপদ ও তাঁহার দুর্গসকল অধিকারভুক্ত হইয়া উঠে. তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দিবার জন্য, এই নব-নিয়োজিত সুবাদারের উপর আদেশ হইল। সম্রাটের আদেশে শায়েস্তাখাঁ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আওরঙ্গাবাদ হইতে পুনার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুনা অধিকৃত হইল। শিবজী মোগল সৈন্যের আগমন সংবাদ পাইয়া, রায়গড় ছাড়িয়া. সিংহগড় নামক প্রসিদ্ধ দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে শায়েস্তাখাঁ পুনা হস্তগত করিয়া, একদল পরাক্রান্ত সৈন্য ঘাট পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি স্থান অধিকার করিতে পাঠাইলেন। কিন্তু তেজস্বী সুবাদার বিনা বাধায় মহারাষ্ট্র-রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। শিবজীর মহামন্ত্রবলে মহারাষ্ট্রীয়গণ সাহস ও বলসম্পন্ন হইয়াছিল। স্বাধীনতার গৌরবে তাহাদের বীরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, জাতীয় জীবনে তাঁহাদের একতা সাধিত হইয়াছিল, আত্মসম্মানের মহিমায় তাহাদের হৃদয়ে স্বদেশহিতৈষিতা প্রসারিত হইয়াছিল। মোগল সুবাদার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই স্বাধীনতা-প্রিয় পরাক্রান্ত জাতির স্বাধীনতার সম্মাননাশে সমর্থ হইলেন না। মহারাষ্ট্রে চকন নামে একটি ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। শিবজী ফিরঙ্গজী নামক একজন যুদ্ধবীরের হস্তে ঐ জনপদের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। তেজস্বী ফিরঙ্গজী সতর বৎসর কাল মুসলমানের অধিকারের মধ্যে চকনের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিলেন। শায়েস্তাখাঁ চকনের আয়তন অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, যে তিনি আদেশ করিবামাত্র ঐ সঙ্কীর্ণ নগরের শাসনকর্ত্তা তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন। কিন্তু ফিরঙ্গজী ক্ষুদ্র জনপদের রক্ষক হইলেও ক্ষমতায় ও তেজস্বিতায় ক্ষুদ্র ছিলেন না। তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন না, আত্মস্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিলেন না। বীরপ্রবর অসামান্য বীরত্বের সহিত তেজস্বী মোগল সৈন্যের সম্মুখে আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন। ক্রমে একমাস গেল, আর এক মাসেরও অর্দ্ধাংশ অতীত হইল, তথাপি মহাপরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মোগলের পদানত হইলেন না। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতিদিনে প্রতি সপ্তাহে ফিরঙ্গজী নবীন সাহস, নবীন উদ্যম, নবীন বীরত্বে প্রমত্ত হইয়া, স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে একমাস পঁচিশ দিন অতীত হইল। চকন শায়েস্তাখাঁর অধিকৃত হইল না। ষড়বিংশ দিনে হঠাৎ নগর প্রাচীরের এক দিকে একটি কুন্যা ফুটিয়া উঠাতে প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গেল। আক্রমণকারী সৈন্য মহোল্লাসে ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া, নগর-প্রবেশে উন্মুখ হইল।

এই সঙ্কটকালে সাহসী ফিরঙ্গজী আপনার সৈন্যের পুরোভাগে থাকিয়া

বিপক্ষের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পরাক্রম ও ক্ষমতা কিছুতেই পর্য্যুদস্ত হইল না। তিনি এমন কৌশল ও তেজস্বিতার সহিত বিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন যে, আক্রমণকারী সৈনিকদল কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না। ফিরঙ্গজী সমস্ত দিন এইরূপে আত্মরক্ষা করিলেন, সমস্ত দিন নগর প্রাচীরের ভগ্ন স্থানে দাঁড়াইয়া বহুসংখ্য সৈন্যের অধিনায়ক শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে বুক পাতিয়া শিবজীর মহামন্ত্রের গৌরব অপ্রতিহত রাখিলেন। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। অনন্ত নৈশ গগনে দুই একটি তারকাস্তবক ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতে লাগিল। রাত্রি সমাগমে মোগল সৈন্য যুদ্ধে নিরস্ত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে তেজস্বী ফিরঙ্গজী শায়েস্তাখাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শায়েস্তাখাঁ এই বীরপুরুষের সমুচিত সম্মান করিতে ত্রুটি করিলেন না। তিনি ফিরঙ্গজীর অসাধারণ সাহস ও ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে যথোচিত পারিতোষিকের সহিত মোগল সরকারে চাকরী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তেজস্বী ফিরঙ্গজী আত্মসম্মান বিক্রয় করিলেন না। তিনি শায়েস্তাখাঁর অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। শায়েস্তাখাঁ তাঁহার বীরোচিত ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ফিরঙ্গজী বীরত্বে গৌরবান্বিত হইয়া শিবজীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, মহারাষ্ট্রীয় পুরুষ সিংহ এই বীরপুরুষের সাহস ও ক্ষমতার সম্মানরক্ষায় উদাসীন হয়েন নাই। ভারতের বীরপুরুষ এক সময়ে এইরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর্য্য গৌরবে জলাঞ্জলি না দিয়া এক সময়ে এইরূপ তেজস্বিতা ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

সুনীতি ও ধ্রুবের কথোপকথন।

সুঃ। বাপ ধ্রুবরে। আজ তোর ওচাঁদ মুখ্খানি এত মলিন দেখ্‌ছি কেন? কি বল না হয়েছে কি? বাপ তোরে কি কেউ কিছু বলেছে?

ধ্রুব নিস্তব্ধ নীরব!—বিষাদ ভরে মুখখানি যেন ফেটে পড়্‌ছে! আঁখি দুটী ছলছল! মুখে আর কথা ফুট্‌ছে না।

সুঃ। আয় বাছনি, একবার কোলে আয়।—আমার হীরে মাণিক আঁচলের ধন—ননীর পুতুল—তোর এভাব দেখে বুক্ যে ফেটে যাচ্চে।—আহা! ক্ষিদে পেয়েছে—তাই বাছার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। বলি ধ্রুব কিছু খা!

ধ্রুঃ। না মা—আমি কিছু খাব না,

আমায় ওকথা আর বলোনা। না খেয়ে যদি এ প্রাণ যায় যাক্—সেও ভাল, তবু—

সুঃ। ওকি বাপ তুই এমন ক'রে কাঁদিস্ কেন? কি হয়েছে খুলে সব কথা আমায় বল্ না, আমি যেমন ক'রে হোক্, এখনি তার প্রতিবিধান করছি।

ধ্রুঃ। আজ আমায় যে কথা—(বল্‌তে না বল্‌তে দুই চোখ বেয়ে দর্ দর্ জল ধারা পড়্‌তে লাগল!)

সুঃ। কি কথা বাপ?—তবে কি-তোর বিমাতা তোরে কোন কটু কথা বলেছেন? আহা! এমন কচি ছেলে! তার প্রতি কার না দয়া হয়? নিতান্ত কঠিন প্রাণ ও পাষাণ হৃদয় নাহলে, অবোধ শিশুর প্রতি কেহ কুবাক্য প্রয়োগ কর্ত্তে পারে না!

ধ্রুঃ। মা—ওকথা আর আমায় জিজ্ঞাসা করো না, মা হয়ে আমায় যেরূপ অপমান করেছেন আর ইচ্ছা হয় না ঘরে ফিরে যাই। এই মুহূর্ত্তে গভীর গহনে গিয়ে বাঘ ভল্লুকের মুখে আত্মসমর্পণ করে জন্মের মত মনের কষ্ট দূর করি!

সুঃ। বাপ ধ্রুবরে—অমন কথা মুখে আনিস্‌নে? তোর ও চাঁদ মুখ পানে চেয়ে এতদিন জীবিত রয়েছি—অভাগিনীর তুইবিনে বাপ আর কে আছে? চির নির্ব্বাসিতা ও বনবাসিনী হয়েও তোমাধনে পেয়ে আমি কত সুখী! তুই যদি এখন বুকে শেল বিঁধে চলে যাস্, তবে এ হতভাগিনীর আর উপায় কি হবে?

ধ্রুঃ। মা—আমি যে এ কষ্ট, আর কিছুতেই সহ্য কর্ত্তে পারি না মা! বিমাতার বাক্যবাণে হৃদয়ের কলিজা ভেদ করেছে, এরূপ ঘা খেয়ে কেহ কি কখনো জীবন ধারণ কর্ত্তে পারে?

সুঃ। বাপ ধ্রুব—হলেও তিনি তোমার মা, মায়ের কথা মনে করে অযথা মনে কেন কষ্ট পাচ্ছ? ক্ষান্ত হও আর এ দুঃখিনীরে দুঃখনীরে ভাসাওনা—শুধু তোর ওই সুধামাখা মুখখানি দেখে আমি সব দুঃখ ভুলেগেছি, যদি সে মুখ খানি বিষণ্ণ ও মলিন দেখি, তবে কি আর এ অভাগীর দুঃখের সীমা থাক্‌বে?

ধ্রুঃ। মা—আমার মন যে কিছু-তেই প্রবোধ মান্‌ছে না? আমাদের কি তবে এজগতে কেও নাই? এমন কেও নাই যিনি মনে করিলে এ কষ্ট দূর কর্ত্তে পারেন?

সুঃ। (ভাবিয়া) আছেন বইকি?—কিন্তু তাঁকে পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। কত যোগী ঋষি যুগ যুগান্তর ধ্যান ধারণা করিয়াও তাঁর দেখা পান না বাপ! তুই অবোধ বালক হয়ে কেমন করে সে দুর্লভ ধনের অধিকারী হবি?

ধ্রুঃ। মা—তাঁকে লাভ কর্ত্তে হলে কি কর্ত্তে হয় বলে দেও না, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি—

সুঃ। তাঁরে পেতে হ'লে কষ্ট

সাধনের আবশ্যক নাই—কেবল সরল মনে কাতর প্রাণে ডাকতে হয়—তিনি ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে স্বয়ং তার কাছে অবতীর্ণ হন।

ধ্রু। তাঁর নাম কি—কি বলে তাঁকে ডাকতে হয়?

সুঃ। সে পবিত্র নাম কেমন করে এ পাপ মুখে গ্রহণ করিব? এমন মধুর নাম আর এজগতে নাই—ও নাম মনের সহিত একবার লইলে আজন্মের পাপরাশি ক্ষয় হয়—অমন নাম কি আর আছে?

ধ্রুঃ। মা—বলনা সে নামটী একবার শুনি—ও নামের কথা তুমি আমায় আগে বলনি কেন?

সুঃ। বাপ—সত্যই কি শুনবি? তবে শোন্ পদ্মপলাশ-লোচন হরি—তাঁর নাম—

ধ্রুঃ। হরি—হরি—হরি আহা! বাস্তবিকই কি মধুর নাম, বলতে বলতে যে মনের কষ্ট অনেক দূর হল, প্রাণটা ঠাণ্ডা বোধ হইল। কোথায় মা সেই পদ্মপলাশ-লোচন হরি?

সুঃ। আমি কি আর তাঁকে দেখেছি? কি জানি তিনি কোথায় আছেন? তবে শুনেছি তিনি জলে স্থলে ও আকাশে সর্ব্বত্র বিরাজমান—

ধ্রুঃ। মা—তবে আমি বিদায় হই, তাঁকে না পেলে আর ঘরে ফিরবনা—

সুঃ। বলিস কি বাপ!—দুখিনীর ধন তোরে ছেড়ে এ অভাগী শূন্য ঘরে কেমন করে থাকবে? আমি প্রাণান্তেও তোকে ছেড়ে দিতে পারব না। এই বাঘ ভালুক পূর্ণ গভীর গহনে প্রাণ পিঞ্জরের পোষা পাখী ছেড়ে দিয়ে মা কি কখনো নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? বাছা ধ্রুবরে কোলে আয় বাপ ও চাঁদ বদনে একবার মা বলে ডাক্, তাপিত প্রাণ শীতল হ'ক?

ধ্রুঃ। কেঁদনা মা ঘরে যাও, ধ্রুব সুনিশ্চয়
হরি ধনে ধনী হয়ে আসিবে আবার,
ধ্রুবের প্রতিজ্ঞা এই, কভু মিথ্যা নয়;
ঘুচাইবে হরিধনে হৃদয়ের ভার!

সুঃ। অবোধ বালকে হেরি হরি দয়াময়,
দুখিনীর ধনে আজ দিও দরশন,
শুনিয়াছি তব নামে যার রুচি হয়,
সে পায় দেখিতে পদ্ম পলাশলোচন!

ধ্রুঃ। বন্দিয়া চরণ মার চলিলা তনয়,
হরির উদ্দেশে ঘোর গভীর গহনে
পশিলা ব্যাকুল হয়ে! কুসুম নিচয়,
নিরখি অবোধ শিশু সতৃষ্ণ নয়নে!
জিজ্ঞাসিল কোথা মোর হরি দয়াময়,
লুকায়ে রেখেছ নাকি সাদরে অন্তরে!
হাসিতেছে কুসুমেরা কথা নাহি কয়।
দেখিয়ে ধ্রুবের ভাব থাকিয়ে অন্তরে
বালকের আর্ত্তনাদ (কম কথা নয়!)
কিসাধ্য হরির তিনি থাকিবেন স্থির?
অধিকার করিলেন ভক্তের হৃদয়,
রোমাঞ্চিত হল তার সমস্ত শরীর?

বহিল প্রেমের ধারা, মহাভাবোদয়,
পুলকে পূরিল তনু আনন্দ অপার!
দিলেন অভয়দাতা ভক্তেরে অভয়,
অবসান হ'ল তার দুঃখের আঁধার!!

(ক্রমশঃ)

পৌরাণিকী শিক্ষা

শীর্ষক পাঠ করিয়াই পাঠক পাঠিকা হয় ত মনে করিবেন, এই প্রবন্ধে বুঝি বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় কোন কথা লিখিত হইবে। বস্তুতঃ তাহা নহে। সাধারণতঃ কিরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করা উচিত তাহাও এ প্রবন্ধে অঙ্কিত হইবে না। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার প্রবাহে শিক্ষা-প্রণালী চলিতেছে, বিশেষতঃ নারীজাতি বিদ্যার উন্মুক্ত দ্বার প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকার শিক্ষা সম্বন্ধীয় সংস্কার অর্জন করিতেছেন, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ ছায়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অঙ্কিত হইবে মাত্র।

বহুকালাবধি নানা সভায়, নানা পুস্তকে, নানা সংবাদ পত্রে শিক্ষাসম্বন্ধীয় মতামত ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে অথচ এপর্য্যন্ত তাহার কোন একটা সীমাবধারণ দৃষ্ট হইলনা। সাময়িক পত্রেও এ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে বাদানুবাদ হইতে দেখা যায়। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করেন না। কেহ মনে করেন, সারবান্ প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যতীত অসার অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। অন্যে বলেন, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়িণী শিক্ষা না হওয়াতে দেশের বিস্তর অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। কাহারও মতে জ্ঞান লাভই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, আবার অন্যের মতে সংসার নির্ব্বাহ ও ধনোপার্জন, এতদুভয় বিদ্যা-শিক্ষার চরম ফল। যাহাই হউক, আমরা ঐ সকল বড় বড় কথা লইয়া আন্দোলন করিতে চাহি না। শিক্ষা-গৃহের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া অস্মদ্দেশের নারী জাতি যে প্রকার শিক্ষা-সংস্কার অর্জন করিতেছেন তাহারই কিয়দংশ লইয়া আলোচনা করিব।

"আর্ট অর্থাৎ শিল্পবিদ্যা বিশেষ উপকারী। মানব শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলে তদ্দ্বারা জীবন সুখে অতিবাহিত করা যায়, তাহাতে জগতের হিত হয়, উপকার হয়, আপনার স্বচ্ছন্দতা আইসে, ধনাগমের ও জীবিকার সহায়তাও সাধিত হয়। অতএব, শিল্প বিদ্যাই ভাল।" কথা গুলি ভাল, শুনিতে বড় ভাল, এরূপ সংস্কার আরম্ভ হওয়াও মন্দ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত কথা ও কার্য্য প্রতিপালন করিবার উপযুক্ত অধিকারী নির্ব্বাচিত হইতেছে না। কুলবধূ গার্হস্থ্য শিক্ষা ত্যাগ করিয়া উল লইয়া কার্পেট

বয়নে আনন্দিতা, তাহাই আর্ট! তাঁহার নিকট উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করা আর্ট নহে!

শারীরিক পরিশ্রম না করিলে শরীর ভাল থাকেনা, শরীরে রোগ আশ্রয় করে, ক্ষুধার হানি হয়, সুতরাং শরীরের ও মনের গ্লানি ছাড়ে না। সে জন্য মানসিক শ্রমের সমবিভাগে শারীরিক পরিশ্রম অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য প্রতিপালন সায়ংকালে এ পাড়া ও পাড়া বেড়াইয়া আসিতে পারিলেই সম্পন্ন হয়! এ বাড়ী ও বাড়ী করাই শারীরিক পরিশ্রম! সংসারের কার্য্য করা শারীরিক পরিশ্রম নহে!

প্রণয় বা ভালবাসা মানবাত্মার সার অলঙ্কার, প্রণয়হীন জীবন বৃথা, এখানকার এই পার্থিব প্রেম স্বর্গীয় ঈশ্বর প্রেমের আদর্শ, সেই কারণে প্রত্যেক মানবেরই চিত্তকে প্রণয়প্রবণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বামী ও স্বামীর বন্ধুকে ভালবাসিতে পারিলেই প্রণয়বৃত্তি চরিতার্থ হয়! শ্বশুর শাশুড়ী দেবর ভাসুরকে ভালবাসিবার আবশ্যকতা নাই!

ধর্ম্মই মানবের অদ্বিতীয় সম্বল, ধর্ম্মই মানবের পরমাশ্রয়, ধর্ম্মহীন জীবন পশু জীবন অপেক্ষা ঘৃণিত। ঈদৃশ মহোপকারী জীবনবন্ধু ধর্ম্ম অবকাশ মত দু এক বার হরি হরি বলিলে বা ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া প্রার্থনা করিলেই অর্জন করা হয়; কিন্তু সত্য, পরোপকার, দয়া, ইন্দ্রিয়সংযম, ভোগবৈমুখ্য, বিষয়াসক্তিবর্জন, এ সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না।

ইত্যাদি ইত্যাদি সংস্কার নবীন শিক্ষা হইতে প্রসূত হইতেছে, কিন্তু পৌরাণিকী শিক্ষায় এ সকল ছিল না, তাই বলিতেছিলাম, বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার প্রবাহে শিক্ষা পদ্ধতির স্রোত চলিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ ফল কি, তাহা একবার অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

"স্ত্রীলোকে নীতিশিক্ষা করুক। নীতিহীন জীবন পশুজীবন অপেক্ষাও ভীষণ। তাই স্ত্রীলোকে নীতি শিক্ষা করুক, বালক বালিকা সকলেই নীতি শিক্ষা করুক।" সভা, সমাজ, সংবাদ পত্র, সর্ব্বত্রই ঐ কথা। সর্ব্বত্রই ঐ একই কথা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সকলের অনুমোদিত হইল, অমনি রাশি রাশি পুস্তক প্রকাশিত হইল। ঘাটে, পথে, বারাণ্ডায়, গাড়ীতে বাড়িতে নীতি পুস্তক হস্তে নর নারী দেখা যাইতে লাগিল! কিছু না হউক, কাজে না হউক কথায় শিক্ষা লাভ হইল—স্ত্রীলোকের চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে হইবে।"

নবীন নীতি শিক্ষার কথা বলিলাম, এক্ষণে পৌরাণিক নীতিশিক্ষার ইতিবৃত্ত বলি। প্রাচীন কালেও এক সময়ে এই রূপ এক মহা আন্দোলন হইয়াছিল। তৎসূত্রে অনেকগুলি পুরাণ নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সে সময়ে দক্ষযজ্ঞ, দানববিজয়, সাবিত্রী সত্যবান্ কত গল্প,

কত কথা অবতারিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

"শৈলরাজ-দুহিতা উমা ভিখারী শিবের পত্নী হইয়া শিববৈভব ভস্মভূষা উত্তমতম ভাবিতেন ও ভালবাসিতেন। তাঁহার ভগিনীরা রত্নালঙ্কার ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা, অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। পত্রমালা, পুষ্পহার, রুদ্রাক্ষমালা, তাঁহার অতীব প্রিয় বস্তু ছিল। তিনি গো প্রভৃতি পশুরও নীচতম ভূত জীবের অধীশ্বরী হইয়া বিষ্ণুর ষড়ৈশ্বর্য্য তৃণ তুল্য তুচ্ছ মনে করিতেন, তাঁহার ঈর্ষা দ্বেষ, মাৎসর্য্য, ভোগ-লালসা কিছুই ছিল না। তিনি পার্থিব সুখ অতিক্রম করিয়া উচ্চ-তম অলৌকিক সুখের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার চিত্ত বিকার ছিলনা ক্লেশের লেশও ছিল না, অলৌকিক বৈভবের রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন।"

"ইনিই পূর্ব্বজন্মে দক্ষদুহিতা সতী। দক্ষ ত্রিলোকের অধিপতি, সতী তাঁহার প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যা। রাজকন্যা সতী ভিখারী শিবের পত্নী হইয়া ভিখা-রিণী হইয়াছেন। সতী ভিখারিণী হইয়া অপার্থিব ও অমানব সুখের অধি-কারিণী হইয়া বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অত বড় বাপ তাঁহার ভিখারী স্বামীকে ভিখারী বলিয়াছিলেন বলিয়া অভিমানে তদুৎপন্ন শরীর পরিত্যাগ করিতেও কষ্ট বোধ করেন নাই।"

"দানব-রাজ পুলোমার কন্যা পৌলমী দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী হইয়া ত্রিলোকের অধীশ্বরী হইয়াছিলেন। তাঁহার তাদৃশ আধিপত্য সত্ত্বেও তাঁহার ভাই ভগিনী ও মা বাপ রসাতলেও স্থান প্রাপ্ত হন নাই।

"সাবিত্রী যে দিন দরিদ্র রাজ কুমার সত্যবান্‌কে আত্ম সমর্পণ করিলেন, সেই দিনই তিনি নারদ মুখে তাঁহার অল্পায়ুষ্ক-তার সংবাদ শুনিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার চিত্ত বিচলিত হয় নাই। সেই অবধি তিনি ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুসরণে রতা ছিলেন। ইনিও রাজপুত্রী হইয়া বনবাসে বিন্দুমাত্র কাতরা হন নাই। পরে যাহা হইয়াছিল, তাহা সকলেরই বিদিত।"

কি বুঝিলে? বুঝিলাম, পৌরাণিকী শিক্ষায় আর নবীন শিক্ষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। তখন স্ত্রীলোকসকল বুঝি-য়াছিলেন, বাপের বাড়ী বাড়ী নহে, শ্বশুর বাড়ীই বাড়ী; বাপের সম্পদ সম্পদ নহে, স্বামীর সম্পদই সম্পদ; স্বামীর সুখেই আমার সুখ, আমার সুখে স্বামীর সুখ। তখনকার মা বাপ এই বুঝিত কন্যা স্বামিসহধর্ম্মিণী স্বামীর সুখদুঃখভাগিনী হউক। এই ভাব প্রতিষ্ঠিত থাকায় তখনকার সমাজ পরম সুখে নির্ব্বাহিত হইত, বড় একটা আত্ম কলহ হইত না, স্বার্থপরতা ও তজ্জনিত গৃহ বিচ্ছেদ ছিল না বলিলেও বলা যায়।

স্ত্রীজাতির আত্মায় দেবভাব ও দিব্যতেজ আবির্ভূত হইত। দিব্য তেজে তেজস্বিনী থাকায় তাহারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও ভয় করিত না। তাই তাহাদের সতী-তেজ দিগন্তব্যাপী হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

লজ্জাশীলতা।

বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে; যে ভাবেই আরম্ভ হউক ইহার ভবিষ্যৎ ফল শুভ হইবে বলিয়া আশা করি। সুবর্ণ দগ্ধ হইয়াই বিশুদ্ধ হয়, সত্য তর্ক বিতর্কেতেই পুনরুদ্দীপিত হয়। তাই এ দেশব্যাপী আন্দোলনে হতাশার কারণ দেখিতে পাই না; তবে কি না আগে—বাল্যকালে যাহা বড় নিকটে বোধ হইত এখন দেখিতেছি তাহা অনেক দূরে! মঙ্গলময় বিশ্বস্রষ্টার মঙ্গল উদ্দেশ্য সফল হউক—নিঃসন্দেহ তাহা হইবেই।

যাহাহউক এই বিরোধ ব্যবধানের মাঝখানেও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক এমন কতকগুলি জিনিস আছে যে তাহাদের প্রয়োজন সকলেই অনুভব করেন। "লজ্জাশীলতা" সেই জাতীয়। "লজ্জা রমণীর প্রধান অলঙ্কার" একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। নির্লজ্জতার অপেক্ষা সৌন্দর্য্য-নাশক পদার্থ রমণীর আর কি আছে? বেহায়া মেয়ের রূপতো নাইই, গুণও—আমার বোধ হয়—ভাল করিয়া ফুটিতে পায় না। সৌন্দর্য্য শারীরিক বস্তু নহে, আত্মার দেবত্বই সৌন্দর্য্য। সাধু পুরুষ বা সাধ্বী রমণীর মত সুন্দর কে? শারীরিক আকৃতি যাহাই হউক তথাপি তাঁহাদের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়!—ইহার কারণ তাঁহাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যেই অপরের হৃদয় আকৃষ্ট হয়। তাই আজি আমরাও বলিতেছি, লজ্জাশীলতা রমণীর প্রধান সৌন্দর্য্য—প্রধান অলঙ্কার। লজ্জাশীলা রমণীকে অন্য বসনে সাজাইতে হয় না, তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নিকট হীরা মুক্তা মলিন হইয়া পড়ে। লজ্জা রমণীর এমনই মাতৃ-দত্ত ভূষণ! এখন কথা এই প্রকৃত লজ্জা কাহাকে বলে? এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। কাহারও বিবেচনায় ঘোম্‌টা টানিয়া বেড়ানই লজ্জা, কাহারও বিবেচনায় জড় বা মূকের মত চুপ করিয়া থাকাই লজ্জা, কাহারও মতে বাহ্যিক বা আন্তরিক বিনয়ই লজ্জা ইত্যাদি মতামত প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে প্রকৃত লজ্জাশীলা রমণী কাহাকে বলিব? যে রমণী নিতান্ত নিরীহের মত মুখ বুঁজিয়া থাকেন, একটী কথার উত্তর দিতে হইলে বা বয়স্তা-দিগের সহিতও আলাপ করিতে হইলে

মৃতপ্রায়া হইয়া পড়েন, তিনি কি লজ্জাশীলা? আর যিনি মিষ্ট হাস্য ও শিষ্টালাপে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন, যাঁহার সরস সদালাপে অপরের বিষাদাকুল মনও প্রীত ও আমোদিত হইয়া থাকে, তিনি কি নির্লজ্জা? প্রথমোক্ত রমণী ব্যক্তিবিশেষের চক্ষে গৌরবান্বিতা হইলেও তাঁহার প্রকৃতি সাধারণের অনুকরণীয় নহে; আর শেষোক্ত রমণী ব্যক্তিবিশেষের নিকটে অপ্রীতিকরী হইলেও আমরা তাঁহার পদানুসরণ করিতে চাহি। "বউড়ি কে ভ্যালা চুপ" একথা সময় বিশেষেই ব্যক্তিবিশেষে প্রয়োজ্য। এজগতে সদ্ব্যবহার ও মিষ্টালাপের মত মধুর জিনিস আর কি আছে?—আর এই দুটির মত দানীয় সহজ সাধ্য জিনিসই বা মানবের আর কি আছে? অতএব এই অমূল্য সহজসাধ্য পদার্থ বিতরণ করিতে যিনি কৃপণতা করেন—প্রশংসা করা দূরে যাউক, আমরা তাঁহাকে "দুর্ভাগ্য" বলিয়া মনে করি (!)। দানীয় পদার্থের যদি "অগ্র পশ্চাৎ" থাকে, তাহা হইলে এই দু'টি জিনিস সকলেরই সর্ব্বাগ্রে দেয়। তদ্ভিন্ন ইহা দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই পরিতুষ্টি সাধন করে। এই সকল কারণে আমরা বিষণ্ণ গম্ভীর প্রকৃতির সহিত সহানুভূতি করিতে পারি না এবং নীরব নিশ্চল প্রকৃতিকেও "বাস্তবিক লজ্জাশীলতা" মনে করি না। লজ্জাশীলতা কেবল ঘোমটা টানাও নহে, কেবল বিনয়ও নহে।—আসল কথা লজ্জা কোনও "মূল পদার্থ" নহে, "যৌগিক পদার্থ" মাত্র।—কোনও একটী বৃত্তির নাম লজ্জা নহে, কতকগুলি বৃত্তি ও শক্তি একত্রিত হইয়া যাহা প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম "লজ্জা" বলা যায়। এই বৃত্তিগুলি "মূল পদার্থ" ও লজ্জার উপকরণ বলিয়া আমরা যথাসাধ্য ইহাদিগের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

লজ্জার প্রথম উপকরণ নম্রতা—নম্রতা মানব-হৃদয়ে যেমন মধুর, সেই রকম শক্তিমতী। নম্রতার কার্য্য বিনয়। বিনীত মুখের সর্ব্বত্রই জয়। হিংসাকে ভালবাসায়, শত্রুকে মিত্রে পরিণত করিবার ক্ষমতা কেবল বিনয়েরই আছে। বিনয়ীর মুখে কেমন এক সৌন্দর্য্য আছে, তাহা দেখিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও স্নেহোদ্বেলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। এ জগতে নিতান্ত নর-পিশাচ বা নরপিশাচী ভিন্ন অন্য কেহ বিনয়ীর শত্রু হইতে পারে না। বিনয়ের সংস্পর্শে মানব-হৃদয়ের অহঙ্কার চূর্ণ হয়, ঔদ্ধত্য দূর হয়, মানবহৃদয় স্বর্গবৎ প্রতীয়মান হয়। বিনীত ব্যক্তি বিশেষ কারণে কাহারও প্রতি বিরক্ত বা কুপিত হইলে, তাহাকে কর্কশ ভাবে কি রুক্ষ শাসনে ব্যথিত করিতে পারেন না, পরের অন্তরে ব্যথা দিয়া কখনও আমোদানুভব করিতে পারেন না। তিনি আত্মপ্রাধান্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক বা যশের লোভেই অন্ধ

হন না। তাঁহার আলাপ মধুর, ব্যবহার মধুর, হৃদয়খানি মধুরতায় পূর্ণ! অহঙ্কার বিনয়ের শত্রু। বিনয় দশজনের জন্য, অহঙ্কার কেবল আপনার জন্য, মানবকে নিয়োজিত করে। অহঙ্কারী আপনার ভরে আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সে যেন কেবল আপনাকে লইয়া থাকিতেই জগতে আসিয়াছে! অহঙ্কার মানবকে বাস্তবিকই এক সৃষ্টিছাড়া পদার্থ করিয়া তোলে! তাহার হৃদয় যেন একটী অরক্ষিত রাজ্যের মত যথেচ্ছচারিতায় পূর্ণ! নিজের শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়ের মুখে আত্মদোষের কথা শুনিলেও তাহার অসহ্য হয়। সে জগৎকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, জগৎও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। যাঁহার মনে অহঙ্কার আছে, তাঁহার অন্যান্য শত গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু লজ্জাশীলতা অবশ্য নাই। লজ্জাশীলের আত্মাদর আছে, নির্লজ্জ ব্যক্তিই অহঙ্কারের বোঝা বহিতেছে। নম্রতা ও অহঙ্কার, আলোক ও আঁধার। একের অভ্যুদয়ে অপর বিনষ্ট হয়। তাই বলিতেছি, এই বিশাল মানবজগতে আমি কতটুকু বস্তু? এই বিষয় যত ভাবিবে, হৃদয় ততই বিনম্র হইবে। অপর ব্যক্তিদিগের মহত্বের বিষয় যতই চিন্তা করিবে, আত্ম-হৃদয় ততই বিনম্র হইবে। এই উপায়ে রমণী অহঙ্কার পরিহার ও নম্রতা অভ্যাস করিতে পারিবেন। এজগতে নম্রতা ব্যতীত লজ্জাশীলতা গঠিত হয় না।

লজ্জাশীলতার দ্বিতীয় উপকরণ সঙ্কোচিতা—যেমন এক পক্ষীয়েরা বিনয়কে লজ্জা বলেন, সেইরূপ অপর পক্ষীয়েরা সঙ্কোচকেই লজ্জা মনে করেন। সেকালে সত্য, দ্বাপর নহে, আমাদেরই ঠাকুরমা দিদীমাদিগের সময়ে এই সঙ্কোচিতাই প্রধানতঃ লজ্জারূপে পরিগণিত ছিল। আমরাও সঙ্কোচিতাকে লজ্জার উপকরণ বলিয়া বিবেচনা করি। সঙ্কোচিতা রক্ষা করিতে বঙ্গবধূর ঘোম্‌টা, ইংলণ্ডীয় মহিলাদিগের "জাল," আরব রমণীর "মুখোস।" রমণী সর্ব্ব সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, তাঁহার অন্তরে কি এক জড় সড় ভাব উপস্থিত হইতে থাকে, তিনি আপনাআপনি আপনাকে অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এই ভাব হইতে রমণী-জীবনের স্বতন্ত্রতা। এই ভাবকে আমরা সঙ্কোচিতা বলিতেছি। সঙ্কোচিতার বাড়াবাড়িতে রমণী জীবন জড়প্রায় করা এবং সঙ্কোচিতা রক্ষা করিতে রমণী কেবল ঘরের কোণে বসিয়া দিন কাটাইবেন, ইহা অবশ্য অন্যায়। তবে এই স্বাভাবিক বৃত্তি উপযুক্তরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে দেওয়া লজ্জাশীলা রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। সঙ্কোচিতা রক্ষা করিতে রমণী, কোনও পুরুষের সহিত প্রগল্‌ভতা করিবেন না, কোনওরূপ অসংযতাবস্থায় তাঁহাদিগের নিকটে যাইবেন না, এবং হীনচরিত্র বা অজ্ঞাতচরিত্র পুরুষের সম্মুখীনা হইবেন না। সঙ্কোচিতা হইতে রমণী, পুরুষমাত্রকেই এক প্রকার সম্ভ্রম

করেন, রমণী যে কথা মা'কে বলিতে পারেন, সে কথা বাপকে বলিতে পারেন না, যে কথা প্রাপ্তবয়স্কা ভগিনীকে বলিতে পারেন, সে কথা প্রাপ্তবয়স্ক ভাইকে বলিতে পারেন না, কারণ পরস্পরের জাতীয় সম্ভ্রম। যখন একান্ত আত্মীয়দিগের নিকটে জাতীয় সম্ভ্রম আবশ্যক, তখন অপরের নিকটে যে অবশ্য কর্ত্তব্য একথা বলা বাহুল্য মাত্র। বড় দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ঘোম্‌টা টানা ভগিনীদিগের মধ্যেও জাতীয় সম্ভ্রম বা সঙ্কোচিতার বিরুদ্ধ কথা শুনিতে হয়। বাসর জাগা ও তীর্থদর্শন প্রভৃতি উপলক্ষে বঙ্গরমণীগণ যে রকম কুরুচির পরিচয় দেন, তাহা শুনিলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়*। লজ্জাশীলতার অনুরোধে বঙ্গরমণী জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কাতর হন না, আর লজ্জাশীলতার অন্তরায় স্বরূপ এই সকল কদাচার কি তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন না? যতদিন না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের লজ্জাশীলতাও সুরক্ষিত হইতে পারিবে না। আর এক কথা, সঙ্কোচিতার অনুরোধে বঙ্গরমণীর পরিচ্ছদের উৎকর্ষ সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য। লজ্জাশীলা রমণীতো পাতলা কাপড় পরিতেই পারেন না, কিন্তু পুরু কাপড় হইলেও কেবল একখানি মাত্র সাড়ী বা ধুতী হইতে সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। আত্মীয় পুরুষদিগের সম্মুখে যাইতে হইলেও কত জড় সড় হইতে হয়। আমাদের এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, এদেশে রাশীকৃত বস্ত্রাদি পরিবার আবশ্যকতা হয় না; তবে লজ্জাশীলতার অনুরোধে প্রাপ্তবয়স্কা রমণী, কুমারী হউন, সধবা হউন আর বিধবাই হউন, একটী সেমিজ পরিয়া তাহার উপরে কাপড় পরিলেই চলে। ইহাতেও যাঁহাদিগের অসুবিধা বোধ হয়, তাঁহারা একটী পুরু লংক্লথ বা জিন সিটিনের বডি গায়ে রাখিতে পারেন। হাতা ছোট হইলে গৃহকার্য্যেও অসুবিধা হয় না, লজ্জাশীলতাও রক্ষা হয়। তবে যিনি পাতলা কাপড় পরিতে বাধ্য, তিনি সেমিজ না পরিলে তাঁহার কাপড় পরার উদ্দেশ্য বিফল হয়, একথা সকলের স্মরণীয়। এতদ্ভিন্ন বিকট উচ্চ হাসি, চেঁচান প্রভৃতিও সঙ্কোচিতার অনুরোধে রমণীর পরিহার্য্য।

লজ্জাশীলতার তৃতীয় উপকরণ স্থিরতা—চাঞ্চল্য লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত জন্মায়। লজ্জাশীলা রমণী শান্তস্বভাবা। কথা, কার্য্য বা চিন্তা কোনও বিষয়ে তিনি স্থিরতা অতিক্রম করেন না। সহসা কাহাকে কটু বাক্য বলা, ঝগড়া করা, স্বার্থপরতায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হওয়া এ সকল চঞ্চল স্বভাবের লক্ষণ। শান্ত স্বভাবা রমণী কখনও এরূপ কার্য্য করেন না। তিনি সহসা বিরক্ত বা উত্তেজিত হন না; তাঁহার কর্ত্তব্য,

* বামাকুলহিতৈষী ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার লিখিত "বাঙ্গালির মেয়ের নীতিশিক্ষা" পুস্তকে এই সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গমহিলার অবশ্য পাঠ্য।

তিনি ধীরভাবেই পালন করেন *। এ জগতে মানব জীবন অসম্পূর্ণ—আদর্শ জীবন ক্বচিৎ মিলে। সেই জন্যে পরের কোনও রূপ ত্রুটিতে ক্রোধান্ধ হইয়া অভদ্রোচিত ব্যবহার করা মানব মাত্রেরই অকর্ত্তব্য। যে রমণী দাস দাসীদিগের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করেন, শ্বাশুড়ী, ননদিনী বা যাতাদিগের সহিত মুক্তকণ্ঠে বিবাদ কলহ করেন এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত সন্তানদিগের পিঠে মুক্তহস্তে চড় চাপড় প্রয়োগ করেন, তিনি কথনই শান্তস্বভাবা নহেন বা তাঁহার লজ্জাশীলতা উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট হয় নাই। তবে এ জগতে "শাসন" কথনও দোষাবহ নহে। পারিবারিক জীবনে সুশাসনের বহুল প্রয়োজন। সেই জন্যে রমণী যথন সন্তান বা দাস দাসীদিগের শাসনকর্ত্রী হইবেন, বিশেষ আবশ্যক হইলে রুক্ষ শাসনও প্রয়োজ্য—কিন্তু বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যেন স্থিরতার সীমা অতিক্রান্ত না হয়, যেন লজ্জাশীলতার হানি না হয়। শান্তস্বভাবা রমণী সুখ দুঃখে একান্ত "আত্মহারা" হইয়া পড়েন না, সংসার তরঙ্গের বিক্ষোভে হা'ল্ দাঁড় ছাড়িয়া দেন না! সুখ দুঃখ স্থির ভাবে বহন করেন। তিনিও বীরমাতা মেরি ওয়াসিংটনের মত প্রাণাধিক পুত্রের অমানুষিক কীর্ত্তিকলাপ ও দেবোচিত যশ শুনিয়া পুলকে দিশাহারা হন না, ধীরে ধীরে সংবাদদাতা (মার্কুইস্ ডি লেফেট্) কে বলিতে পারেন "জর্জ্জ খুব ভাল ছেলে, সে যে এ রকম কাজ করিবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?" !! ধন্য মেরী ওয়াসিংটন! তুমি যে দেশের লোক হওনা কেন, বঙ্গবাসিনীদিগকে আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মত দেবীর স্থৈর্য্য তাহারা গ্রহণ করিবার যোগ্যা হয়। স্থিরতা লজ্জাশীলা রমণী কুলের অবশ্য গ্রহণীয়।

লজ্জাশীলতার চতুর্থ উপকরণ সহিষ্ণুতা—লোকে রমণী জাতির সহিষ্ণুতার সহিত মা বসুমতীর সহিষ্ণুতার তুলনা করিয়া থাকেন। পৃথিবী-মূর্ত্তি সহিষ্ণুতার আদর্শ। জগতে প্রাকৃতিক নিয়মে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত বসন্তাদি যাইতেছে আসিতেছে, ঝড় জল, বজ্রাঘাত, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাত ঘটনা হইতেছে, মানবগণ আহার, পানীয় ও বাসের আশয়ে প্রতি নিয়তই বসুধা-বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে, তথাপি বসুমতী জননী অকাতরে সকলই সহ্য করিতেছেন। এই জড় সহিষ্ণুতার ন্যায় জীবন্ত সহিষ্ণুতা রমণী-হৃদয়ে সম্ভবে। যে জাতি মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, কন্যা ও গৃহিণীরূপে নরনারীগণের পরিচর্য্যা করিতে নিরতা, সে জাতির, সহিষ্ণুতা তো স্বাভাবিক সম্পত্তি। এই স্বাভাবিক সম্পত্তি হারা হইলে রমণী নিতান্ত দীনা হইয়া পড়েন। তাঁহাদের লজ্জাশীলতাও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। যে কর্ণধার প্রবল তুফানে নৌকা রক্ষা

* অব্যবস্থিত চিত্ত বা বদমেজাজি রমণীর বড় কলঙ্ক। জাহা চাঃ

করিতে পারেন তিনি যেরূপ প্রশংসনীয়, যে ব্যক্তি সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে নিজের সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারেন, তিনিও সেইরূপ প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে প্রাচীনা মহিলাগণ সহিষ্ণুতার জীবন্ত মূর্ত্তি স্বরূপ। তাঁহাদিগের সহিষ্ণুতার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। এমন কথাও শুনিয়াছি, তাঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়া হইলেও আত্মীয়দিগের নিকটে সে কথা প্রকাশ করিতেন না, গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইলেও স্বামী প্রভৃতির কর্ণগোচর করিতে দিতেন না! আমি এরূপ সহিষ্ণুতাকে সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু ভরসা করি বামাবোধিনী পাঠিকাদিগের মধ্যে এরূপ সহিষ্ণুতা কেহই অবলম্বন করিবেন না। প্রকৃত সীমা অতিক্রম করিলে অমৃতও বিষে পরিণত হয়, বাড়াবাড়ি সকল বিষয়েই অনর্থকর। তবে যেখানে সহিষ্ণুতা আবশ্যক, সে থানে অসহিষ্ণু হইলে রমণীর বড় নিন্দার কথা। কমলার জ্বর হইয়াছে, চিকিৎসাও হইতেছে; কিন্তু জ্বরের অনেক জ্বালা, মাথাধরা, গায়ের জ্বালা, হাত পা কামড়ানি ইত্যাদি; কমলা যদি ধীর ভাবে এই যন্ত্রণা গুলা সহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিষ্ণুতার গৌরব—তাঁহার লজ্জাশীলার প্রশংসা; নচেৎ তিনি যদি অসহিষ্ণুতার জন্য "বাবারে, মারে গেলুম রে!" ইত্যাদি রবে চীৎকার করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিষ্ণুতা শক্তি নিস্তেজ বলিতে হয় এবং লজ্জাশীলতারও ত্রুটি অনুভূত হয়। এইরূপ গৃহকর্ম্ম, আত্মীয়গণের সেবা শুশ্রূষা, দুঃখ, বিপদ প্রভৃতি হইতে সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট বড় সকল বিষয়েই যিনি সহিষ্ণুতা-পরায়ণা, তাঁহার লজ্জাশীলতাই গৌরবান্বিত।

লজ্জাশীলতার পঞ্চম উপকরণ পবিত্রতা—আমরা এতক্ষণ যে সকল বৃত্তি ও শক্তির কথা বলিলাম, সে গুলি লজ্জাশীলতার অস্থি, চর্ম্ম, রক্ত ও মাংসাদি স্বরূপ, আর পবিত্রতাই লজ্জাশীতার প্রাণ। লজ্জাশীলতার মুখ্য উদ্দেশ্য পবিত্রতা। সেই জন্যে পবিত্রতার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইলেও লজ্জাশীলার দারুণ অবনতি হয়। মন্দ চিন্তা করিলে, মন্দ পুস্তক পড়িলে, মন্দ কথা বলিলে এবং মন্দ লোকের সহিত বেড়াইলে মানুষ মন্দ কাজে অভ্যস্ত হয়; এই সকল দোষের একটী মাত্রও চরিত্র স্পর্শ করিলে পবিত্রতার ক্ষতি হয়। পবিত্রতাহীন হইলে রমণী জীবন রাক্ষসী জীবনে পরিণত হয়। অতএব রমণী প্রাণপণ চেষ্টায় চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিবেন। ফুলের গাছ অনেক যত্নে বাড়াইতে হয়, কাঁটা গাছ আপনা হইতেই বাড়ে। উদ্যান-রক্ষক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে উৎপাটন করে। মানবের সদ্বৃত্তিগুলি এই ফুলের গাছের মত; সদ্বিষয় আলোচনা কর, সচ্চিন্তায় মনোনিবেশ কর, সজ্জনের সঙ্গ গ্রহণ কর, তাহা হইলেই

সাধুতা অভ্যাস হইবে, ফুল ফুটিয়া—সৎভাব পারিজাত ফুটিয়া তোমার হৃদয়কে নন্দন বন করিবে। অসদ্বৃত্তিগুলি কাঁটা গাছের মত, তাহাদের বিষয়ে মানব একটু অলস বা অন্যমনস্ক হইলেই তাহারা নন্দন বন কণ্টকাকীর্ণ করিতে চায়! আমরা যদি বিবেককে সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখি, যদি বিবেক আমাদের উদ্যানরক্ষক রূপে সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন, তাহাহইলে কাঁটা গাছগুলা আমাদের ফুল বনে কখনও জন্মিবে না; তাহারা যে উদ্দেশ্যে জন্মিয়াছে, তাহাই সাধন করিবে (১), আমাদের পবিত্রতার বিকাশের পক্ষে বাধা দিতে পারিবে না। আত্মসংযম, সংযতেন্দ্রিয়তা ও সদ্বৃত্তির অনুশীলনের ফলই পবিত্রতা। একজন পুণ্যবান বা পুণ্যবতীর সহিত পাপাত্মা বা পাপীয়সীর তুলনায় কত দূর পার্থক্য অনুভূত হয়! আলোকে আঁধারে, ভালবাসা হিংসায়, স্বর্গে ও নরকে যেরূপ প্রভেদ, ইহাদিগের পরস্পরেও সেইরূপ প্রভেদ! ইহার কারণ একজন পবিত্র অপরে অপবিত্র! একজন দেবতা আর একজন নারকী! এই পবিত্রতারূপ স্বর্গীয় জ্যোৎস্না হৃদয়ে প্রতিভাত করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা এই স্বর্গীয় পদার্থকে হৃদয়ের হার করিতে শিখিব কবে?

(১) "নিকৃষ্ট বৃত্তি" অর্থে কার্য্যসাধিনী বৃত্তি। তবে ইহাদিগের দ্বারা যে মানবের ক্ষতি হয়, সে মানবের দোষে। একথা ভবিষ্যতে বলিতে ইচ্ছুক রহিলাম। প্রঃ লেঃ।

পবিত্রতার অনুরোধে রমণী অপবিত্র চক্ষের সম্মুখে প্রকাশিত হইবেন না। পবিত্রতার ক্ষতিকর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইবেন না। আমোদ প্রমোদের সময়ে বয়স্যাদিগের প্রতি কোনও বিশ্রী ঠাট্টা তামাসা করিবেন না। জগতে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের শত শত জিনিস আছে; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সুন্দর শিল্প, সুরুচিসম্পন্ন সুমধুর কবিতা ও সঙ্গীতাদি, হাস্যরস-পূর্ণ বিশুদ্ধ গল্প ও তামাসা, এই সকল হইতে লোকে যেরূপ প্রীত হন, তাঁহাদের হৃদয়ও সেইরূপ উন্নত হয়। তাই বলিতেছি দেশীয় ভগিনী এই সকল পবিত্র আমোদ উপভোগ করিয়া আপনার রুচি অধিকতর পবিত্র করিবেন।

পবিত্রতা সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিতে বাকি; কথা কি না ধর্ম্ম ও সত্য পবিত্রতার জীবনী। ধর্ম্মই পবিত্র, সত্যই পবিত্র। যিনি পবিত্রতা লাভ করিতে চাহেন, তিনি ধর্ম্ম ও সত্যে আত্মসমর্পণ করিবেন। অধর্ম্ম ও অসত্যের নাম অপবিত্রতা।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ পবিত্রতার সনাতন ক্ষেত্র। গৌতমী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী হইতে খনা, লীলাবতী, রাণী ভবানী, রাণী শরৎসুন্দরী পর্য্যন্ত পবিত্র-প্রাণা দেবীগণ এইখানে বিরাজ করিয়াছেন। ভারত-ভাণ্ডারে ধন নাই তাতে বড় দুঃখ ভাবি না, যদি ভারত কন্যার হৃদয়ে পবিত্রতা রত্ন—তাঁহাদিগের জাতীয়

সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে এসকল দুঃখেও সুখের বিষয় আছে, সৌভাগ্যও আছে! এরূপ দুঃখই আমাদের প্রার্থনীয়।

পবিত্রতা হৃদয়োদ্যানে লজ্জাবতী লতা। লজ্জাবতী মানব-কর স্পর্শে যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, পবিত্রতা অপবিত্রতার বাতাস বহিলেই সেইরূপ সঙ্কুচিত হয়। পবিত্রতাকে স্বাভাবিক শক্তিতে বাড়িতে দেওয়াই রমণীর কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না, লজ্জাশীলতা জীবন্ত রূপে রমণী হৃদয়ে বিরাজ করিতে পারিবে।

লজ্জাশীলতা রমণীর প্রথম শিক্ষণীয়। আগে রমণীকে লজ্জাশীলতা তার পরে অন্য শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। এ শিক্ষায় অর্থব্যয়ও করিতে হয় না, গুরুতর শ্রমও করিতে হয় না। জগদীশ্বর মানব-হৃদয়ে যে নম্রতা, সঙ্কোচিতা, স্থিরতা, সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতা-পিপাসা দিয়াছেন, তাহাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই মিলিয়া মিশিয়া রমণীর প্রধান অলঙ্কার লজ্জাশীলতা রূপে পরিণত হয়। ইহার জন্যে আমাদের ইচ্ছা, চেষ্টা ও যত্ন আবশ্যক। লজ্জাশীলতা শিক্ষাকে "বিকল্পে" নীতি শিক্ষা বলা যায়।

শ্রীমাঃ।

রিপু-পরাজয়।

(১)

পরিখা বেষ্টিত দুর্গে কিবা প্রয়োজন?
কামান বন্দুকে কিবা হইবে সাধন?
বর্ম্ম চর্ম্ম নাহি চাই, অসিতে কি হবে ভাই!
কি কাজ করিবে তীক্ষ্ণ শর শরাসন?

(২)

মুষল মুদ্গরে আর কি হবে উদ্ধার?
হানাহানি কাটাকাটি মারামারি সার!
নাহি চাই রণ-তরী, নাশিতে দুর্জ্জয় অরি,
তুরি ভেরী জয়ঢাকে কি হবে আমার?
এ সব দস্যুর কাজ দস্যু-ব্যবহার!

(৩)

দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী, সিপাই,
আন্‌কোরা জাহাজীগোরা কি করিবে ভাই?
বীর ব্লেক্, নেলসন্, নেপোলীন, ওলিংটন,
কি করিবে এরা সবে ভাবিয়া না পাই,
এত রণ-সজ্জা মোর কিছুই না চাই।

(৪)

চাই আমি ভালবাসা হৃদয়ের বাণ,
তাই দিয়া রিপুগণে পূরিব সন্ধান;
দেখিব কেমন অরি, জিতি কিম্বা হারি মরি,
আজকে নহেত মোর কম্পিত পরাণ,
সরল সাহসে তাই ডাকি ভগবান্।

(৫)

বিনা রক্তপাতে রিপু হবে পরাজয়,
এর চেয়ে সুখ কিবা মানুষের হয়?
একদিনে নাহি পারি, দশদিন মারি মারি,
রিপুরে ভূতলশায়ী করিব নিশ্চয়,
অব্যর্থ আমার বাণ ফিরিবার নয়।

বিশ্বসেবা ব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা।*

যে বিধাতার বিধানে এই অনন্ত বিশাল বিশ্বসংসারে মানবের পদার্থ জ্ঞান জন্মিবার জন্য এবং যাবতীয় পদার্থ কার্য্যকারী হইবার নিমিত্ত আলোক অন্ধকার, উত্তাপ শৈত্য, কঠিন তরল, সুদৃঢ় সুকোমল, সুখ, দুঃখ, শান্তি, অশান্তি প্রভৃতি বিপরীতধর্ম্মী পদার্থ ও ভাব সমূহ বিদ্যমান, সেই বিধাতারই বিধানে স্ত্রী-প্রকৃতি ও পুরুষ-প্রকৃতিও অনেকটা বিপরীতধর্ম্মী ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এ বিশ্বের মূল নিয়মই এই যে, দুই বিপরীত ধর্ম্ম একত্র কাজ করিবে। শুধু আকর্ষণে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক নিমেষের তরেও তিষ্ঠিত কি? কেবলই উত্তাপ—অশেষ গুণাধার হইলেও অনন্ত উদ্ভিদ ও অনন্ত প্রাণিপুঞ্জময় জগৎকে জীবিত রাখিতে সক্ষম হইত কি? কেবল মাত্র কঠিন উপাদান সমূহের সংমিশ্রণে গগণস্পর্শী মহা সৌধ নির্ম্মিত হয় কি? নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি মনুষ্যকে সুখ শান্তি প্রদান করিতে পারে কি? শুধু জ্ঞান হৃদয়কে সুখময় ও শোভান্বিত করে কি? কেবল মাত্র ভাবরাশি জীবনকে ঠিক্ পথে চালাইতে পারে কি? তবে কেন বিশ্বসেবারূপ মহান্ ব্রত সাধনের সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে?

বিশ্ব সেবার ন্যায় মহাব্রত কেবল পুরুষজাতি কিম্বা কেবল স্ত্রীজাতির দ্বারা কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও মনোহর ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। এ মহাব্রত সংসাধনের পথে এমন অনেক স্থল উপস্থিত হয়, যেখানে বিশ্ব-সেবক নারী প্রকৃতির সহায়তা ব্যতীত অগ্রসর হইতে পারেন না। এমন অনেক অবস্থার সংঘটন হয়, যখন পুরুষ-প্রকৃতি বিশ্ব-সেবক অপেক্ষাও নারী-প্রকৃতিময়ী বিশ্ব-সেবকের আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভূত হয়। হে বিশ্বসেবাব্রতধারী! জীবন্ত-বিশ্বাস, একান্ত অধ্যবসায় ও অনন্ত-উৎসাহ ভরে সত্যপূর্ণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রচার করিতে গিয়া, যখন তুমি তীক্ষ্ণধার জ্ঞান অস্ত্রে কুসংস্কার ও কুনীতির মস্তক ছেদন এবং সুসংস্কার ও সুনীতির রাজসিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অতুল সাহসে অগ্রসর হইয়া কত শত লোকের অপমান, নির্যাতন ও প্রতিবন্ধকতাচরণে ক্লিষ্ট, ম্রিয়মাণ, অধৈর্য্য ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িবে; তখন কি পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের মুখের উৎসাহের জ্যোতি, স্ত্রীলোকের আশ্বাসবাক্য, স্ত্রীলোকের ধৈর্য্য ও সহকারিতা তোমাকে ব্রত সাধনের জন্য অধিকতর নব বল, নব উৎসাহ, নব অনুরাগে অগ্রসর করিবে না? আর এক কথা এই যে, স্ত্রীলোকের হৃদয়ে সুসংস্কার ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত ও চির অঙ্কিত করিয়া দিতে স্ত্রীলোকের যেমন কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা, তোমার

* বামাবোধিনী জুবিলী উপলক্ষে শ্রীমতী

সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই; কেননা স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকেরই অনুকরণ করিয়া থাকে, আর তাই করাই, অর্থাৎ ভাল স্ত্রীলোকের অনুকরণ করাই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। একটী সুশিক্ষিতা সুন্দরহৃদয়া স্ত্রীর আদর্শ সম্মুখে থাকিলে নিকটস্থ অনেকগুলি স্ত্রী-হৃদয় সুন্দর হইয়া যায়। যখন তুমি দেশব্যাপী মহামারী কিম্বা দুর্ভিক্ষপীড়িত জনপদ সমূহের দুঃখ শোকে কাতরহৃদয় হইয়া তাহাদের কল্যাণ সাধনার্থ মনোযোগী হইবে, যখন তুমি অনাহারে বুভুক্ষিত রোগ শোক মৃত্যুর হুহুঙ্কারে ভীত প্রপীড়িত ধূলায় বিলুণ্ঠিত অসহায় নর নারী ও শিশু-সন্তানগণের দিকে আকুল হৃদয়ে ছুটিয়া যাইবে তখন কাহার ধর্ম্মনীতির সমুজ্জল প্রভা—কাহার নিঃস্বার্থ দয়াপূর্ণ কাতরোক্তি—কাহার নয়ন যুগলের বারিধারা তোমাকে প্রাণপণে কার্য্য করিতে প্রোৎসাহিত করিবে! যখন তুমি বিশ্বসেবার তরে তোমার জ্ঞান বুদ্ধির ফলস্বরূপ উত্তম উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে বসিবে, তখন সহকারিণী স্ত্রীলোক কি কতকগুলি এমন ভাব গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া দিবে না যাহা তোমার নিজের কিম্বা অন্য কোন পুরুষের নিকট পাইবার সম্ভাবনা অল্প, যাহা দেখিয়া তুমি মোহিত, চমৎকৃত, উপকৃত ও পরম সুখী হইবে।

যেমন দুই হস্তের কার্য্য এক হস্তে কথনও সহজে সম্পন্ন ও সম্পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত হইতে পারে না, পারিলেও তদ্রূপ সুন্দর হয় না, তেমনি বিশ্বসেবা ব্রতে স্ত্রীলোক সহকারিণী না থাকিলে ব্রত যে কেবল অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিবে তা নয়, তাহার সৌন্দর্য্যেরও বিলক্ষণ হানির সম্ভাবনা। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গৌরবান্বিত দুই পদার্থ একত্র কার্য্য না করিলে জগতে কিছুরই ত শোভা নাই! যখন অনন্ত নীলাকাশে স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত হয়, তখন সে সুগভীর শোভা দর্শনে মন কতই না মোহিত হয়! যখন সু-বিস্তীর্ণ রমণীয় সরসীর মাঝে মনোহারিণী সরোজিনী প্রস্ফুটিত হয়, তখন সে মনোরম সৌন্দর্য্যে কাহার চিত্ত না পুলকিত হয়! যখন নয়নরঞ্জন হরিৎবর্ণ পত্রের ঘন সন্নিবেশের মধ্যে সুন্দর লোহিতবর্ণ ফুল ফুটিয়া দুলিতে থাকে, তখন সে সুষমাছটায় কে না মুগ্ধ হয়! যখন নানা দেশজাত বিবিধ ফল পুষ্পের বৃক্ষ লতাময় সুদৃশ্য সুরম্য উদ্যানে কলকণ্ঠ বিহঙ্গম সুস্বর লহরী ছড়াইতে থাকে, তখন কাহার মনঃপ্রাণ কাড়িয়া না লয়! শুধু জড় পদার্থই বা কেন, মনুষ্য-হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেও ঐ নিয়মই দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ভক্তির সহিত নম্রতা, শ্রদ্ধার সহিত কৃতজ্ঞতা, প্রীতির সহিত পবিত্রতা, সাধুতার সহিত উদারতা, স্নেহ করুণার সহিত অনুকূলতা, প্রভৃতি একত্র কার্য্য করে, তখন তাহার কতই না মহিমা—কতই না গরিমা—কতই না সুষমা প্রকাশিত হয়। এসব বিচিত্র শোভার মূল

কারণ যিনি, নর নারীর দেহ মন ও প্রকৃতিবৈচিত্র্যেরও মূল কারণ তিনি। যখন উন্নতমন ধর্ম্মাত্মা নর নারী অপার্থিবভাবে মিলিত হইয়া বিশ্ব-সেবাব্রত পালন করিতে থাকিবেন, তখন তাহারা কি স্বর্গীয়—কি অনির্ব্বচনীয়—কি অবর্ণনীয় শোভাই না ধারণ করিবেন।

স্ত্রীলোক সহকারিণী থাকিলে পরম পবিত্র বিশ্ব-সেবাব্রত সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইতে পারিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে সহকারিণী স্ত্রীলোক কেমন স্ত্রীলোক? বিশ্বসেবাব্রত কি উচ্চতম ব্রত? ইহার কার্য্য কত অসীম, এ ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া কে শেষ করিতে পারে? ইহার পুণ্যফলে যে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহার তুলনা কোথায়! এ ব্রত সম্যক্ প্রকারে পালন করিতে পারা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত নয়। এ ব্রতধারী হইতে হইলে আপনাকে অসাধারণ গুণভূষণে ভূষিত করিতে হয়, এ ব্রত যথোপযুক্ত রূপে পালন করিতে হইলে কতখানি উচ্চ জ্ঞান, কত খানি উন্নত চরিত্র, কতখানি ধৈর্য্য ক্ষমা, কত খানি উদারতা ও কতখানি বিমল নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রয়োজন, তাহা বিশ্ব-প্রেম-তরঙ্গে তরঙ্গিত হৃদয় বিশ্বসেবক সন্ন্যাসী ও মহাত্মাগণের জীবনচরিতে কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে জ্ঞান জগতের নিকট সুজ্ঞান নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, যে জ্ঞান প্রকৃতির প্রত্যেক রাজ্য খণ্ডে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, যে জ্ঞান অনন্ত আকাশে বিলম্বিত অসীম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকলের মূলে মূল শক্তিকে দেখিয়া তাঁহার প্রেমে অনুরঞ্জিত হইতেছে, যে জ্ঞান বর্ত্তমান জ্ঞানের সীমান্তপ্রদেশে পৌঁছিয়াও আবার বিশ্ব-সেবার জন্য নূতন ২ জ্ঞানের বিষয় আবিষ্কার করিবার জন্য লালায়িত, সেই বিশাল জ্ঞান বিশ্বসেবার উপযুক্ত। যে প্রেম ছোট বড় ভাল মন্দ সকলকেই ভালবাসিতে শিখিয়াছে, যে প্রেমের নিকট কীটানুকীটও পরিত্যাজ্য নয়, যে প্রেম বিশ্বময় আপনার ভালবাসা স্থাপন করিয়া সকলের মঙ্গল কামনায় নিজের মহত্তর উদারতা ও প্রশস্ততা সাধনে নিয়ত তৎপর, সেই প্রেম বিশ্বসেবার উপযোগী ক্ষত বিক্ষত অঙ্গে রুধিরধারা মুছিতে ২ যে হৃদয় বলিয়াছিল "অরে মেরেছিস আমার কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না?" সেই হৃদয় আর যে হৃদয় যে সময়ে ভয়ানক ক্রুশে বিদ্ধ শরীর-নিঃসৃত শোণিতে ধরাতল সিক্ত হইতেছিল, যে সময়কার অসহনীয় কষ্টে প্রাণের চির প্রিয়তম ঈশ্বরের দয়ার প্রতিও একটু খানি অবিশ্বাসের ছায়া আসিয়া পড়িতেছিল সে সময়েও বলিয়াছিল "পিতা! এদের প্রতি ক্ষমা কর।" সেই হৃদয় বিশ্ব সেবার প্রকৃত আদর্শ স্থল সন্দেহ নাই। নিঃস্বার্থ প্রেম এ জগতে এক অতুল্য অমূল্য পদার্থ। যিনি বিশ্ব শক্তির প্রতিই

কি, আর বিশ্বের প্রতিই কি নিঃস্বার্থ প্রেম স্থাপন করিতে পারিয়াছেন তিনি দেবতা, তাঁহার হৃদয় চির আনন্দের আগার, তাঁহাকে কখনও তিলমাত্র মনস্তাপ কি পরিতাপ প্রাপ্ত হইতে হইবে না। সমস্ত অনিত্য বিষয়ে নিস্পৃহতাই সুখ। যাঁহাদের ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম নাই, কি নর নারীর প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম নাই, তাঁহাদের হৃদয়ে প্রীতির সহিত স্পৃহা রহিয়া যায়, সুতরাং তাঁহারা কখনও অনাবিল সুখে সুখী হইতে পারেন না। যিনি কখনও নিঃস্বার্থ প্রীতির সুধাময় ভাবের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই জানেন ইহা কি পদার্থ!!। নিঃস্বার্থ প্রীতির সহিত যেন অতুলন আনন্দ, চিরশান্তি, অনন্ত সুখ মিশ্রিত রহিয়াছে; এহেন অমূল্য রত্নে যিনি হৃদয় বিভূষিত করিয়াছেন তিনিই বিশ্বসেবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। যে ধৈর্য্য—সহস্র সহস্র লোকের মধ্য দিয়া বন্ধন করিয়া লইয়া গেলেও অপমানিত এবং এক বিন্দু বিচলিত হয় না, যে ধৈর্য্য—দুঃখ কষ্ট ভয়ের আগার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেও বিশ্বসেবকের মুখের সাহসের ও শান্তির সু-প্রসন্ন জ্যোতি ম্লান হইতে দেয় না, যে ধৈর্য্য—ঘাতকের ভয়াবহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মুখের ঘৃণাকর ভীষণ ভাব, জীবনলীলা সমাপ্তকারী তীক্ষ্ণ তরবারী দৃষ্টেও আপনার চির সহবাসী শান্তিকে লইয়া স্বস্থান পরিত্যাগ করে না, সেই ধৈর্য্যই বিশ্বসেবা মহাব্রত পালনে সম্যক্ প্রকারে সমর্থ। যে চরিত্র—দেবতার ন্যায় সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে, যে চরিত্র—মহাপাপে নিমগ্ন মহাপাতকীরও অন্তরে অন্যায় অসত্যে ঘৃণা জন্মাইয়া ভয়ানক অনুতাপাগ্নি জ্বালাইয়া দেয়, যে চরিত্রের অনুকরণে সহস্র সহস্র নর নারীর হৃদয় মনের উন্নতির চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়—সেই চরিত্র, আর যে উদার হৃদয় আপনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র থাকিয়াও অন্যায় অধর্ম্মে চিরদিন অন্তরের অন্তরে ঘৃণা পোষণ করিয়াও অন্যায় অধর্ম্মাচারী দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিগণকে উদার চক্ষে দর্শন করিতে পারেন, সেই উদারতা বিশ্বসেবকের জন্য একান্ত প্রার্থনীয়। তাই বলিতেছিলাম যিনি বিশ্বসেবাব্রতের সহকারিণী হইবেন, তিনি কেমন স্ত্রীলোক! যিনি অশিক্ষার অন্ধকারে স্থূল স্থূল বিষয় ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, যিনি কুশিক্ষার অস্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনে আপনার হৃদয়ের গঠন ও ভাব ও শোণিত বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন, যিনি সু-জ্ঞান ও সত্য ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইতে পারেন নাই, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন? যাঁহার প্রেম অতিমাত্র সংকীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে, যাঁহার প্রেম কেবলমাত্র হৃদয়ের অনুরাগভাজন স্বামী ও সন্তানগণের মঙ্গলকামনায় পরিসমাপ্ত হয়, যাঁহার প্রেম চতুঃপ্রাচীরের অভ্যন্তর ব্যতীত আর একটু প্রসরতা লাভ করিতে পারে নাই, তিনি কেমন করিয়া বিশ্ব-

সেবার সহকারিণী হইবেন! যিনি, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির ও কাতর দীন দরিদ্রের কাকুতি মিনতি শ্রবণ করিতে করিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিতে পারেন, যিনি জীবিকার উপায়হীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত দুঃখীর শীতে প্রপীড়িত অভাগা সন্তানগণের দুঃখের কথা না ভাবিয়া আপনার সন্তান সন্ততিকে বহুমূল্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাজাইতে পারেন, যিনি দুর্ভিক্ষে কোন দেশ উৎসন্ন যাইতেছে শুনিয়াও নিজের গৃহ সজ্জা ও ভূষণভার পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন? যিনি দাস দাসী কিম্বা সন্তানগণের সামান্য বিরক্তিকর কার্য্যেই একবারে অধৈর্য্য ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়েন, যিনি লোকের সামান্য নিন্দাবাদ বা অপমানও সহ্য ও অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, যিনি একটী সামান্য পার্থিব বাসনাও চরিতার্থ না হইলে আপনার মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারেন না, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন? যাঁহার জ্যোতির্ম্ময় অত্যুজ্জ্বল চরিত্রের প্রভা দর্শনে মহাপাতকী নর নারীর ধর্ম্মে প্রীতি ও অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত না হয়, যাঁহার অকলঙ্ক চরিত্রের অনুকরণে লক্ষ লক্ষ নর নারীর হৃদয়ে সুনীতির বীজ রোপিত হইয়া সুফল প্রসবে সমর্থ না হইতে পারে, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন! হে শ্রদ্ধাভাজন বিশ্ব সেবা ব্রতধারী? তুমি প্রথমে সহকারিণী স্ত্রীলোকক্কে জ্ঞান ধর্ম্মে অলঙ্কৃতা হইতে দাও, তৎপরে উপযুক্তা দেখিলে তোমার সহকারিতা পদে অভিষিক্ত কর; নতুবা বিফলমনোরথ হইতে হইবে সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।*

(২৬৫ সংখ্যা ৩১৫ পৃষ্ঠার পর)

দ

১। দয়ার চেয়ে ধর্ম্ম নাই,
হিংসার চেয়ে পাপ নাই।

২। দরদী বিনা দরদ বোঝে না

৩। দর্পণে মুখ দেখা।

৪। দর্পহারী ভগবান্।

৫। দশচক্রে ভগবান্ ভূত।

৬। দশের লাঠী একের বোঝা।

৭। দশে মিলে করি কাজ,
হারি জিতি নাই লাজ।

---

* ১২৯৩ সালের বামাবোধিনীতে অ হইতে থ পর্য্যন্ত আদ্যক্ষরযুক্ত প্রবচন প্রকাশিত হয়। পরে কোন কারণে অনাবশ্যক বিবেচনায় প্রচারে ক্ষান্ত হওয়া যায়। এখন কোন কোন বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে আমাদের সংগৃহীত প্রবচনের অবশিষ্ট গুলি প্রকাশ করিতেছি, আশা করি পাঠক পাঠিকার নিকট অপ্রীতিকর হইবে না। বা. বো. স।

৮। দাতার খেয়ে বখিল ভাগ।

৯। দাতার চেয়ে বখিল ভাল
ত্বরিত জবাব দেয়।

১০। দাদা বই পাক নাই,
দিদী বই ডাক নাই।

১১। দানের উচিত পাত্র দরিদ্র দুর্ব্বল,
ধনীকে করিলে দান নাই তত ফল।

১২। দাঁত থাকৃতে দাঁতের মর্য্যাদা
জানা যায় না।

১৩। দিন যায়ত ক্ষণ যায় না।

১৪। দু নৌকায় পা দেওয়া।

১৫। দুঃখ বিনা সুখ হয় না।

১৬। দুঃখের অন্ন সুখ করে খাওয়া।

১৭। দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষা।

১৮। দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিঠে না।

১৯। দুর্জনেরে পরিহরি,
দূরে থেকে নমস্কার করি।

২০। দুর্ব্বলস্য বলং রাজা।

২১। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য
গোয়াল ভাল।

২২। দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা ঘনায়ে
বসে কাছে,
কথা দিয়ে কথা নেয়,
প্রাণ বধে পাছে।

২৩। দেখ্‌ছি কত দেখ্‌ব আর,
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

২৪। দেখ্‌তে পেলে কে শুন্‌তে চায়?

২৫। দেখে শেখে আর ঠেকে শেখে।

২৬। দেনার চেয়ে পাপ নাই।

২৭। দেবতার বেলা লীলা খেলা,
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।

২৮। দেবো ধন, বুঝ্‌বো মন,
হরে নিতে কত ক্ষণ?

২৯। দৈ খাবে মেধো,
কড়ী দেবে সেধো।

৩০। দৈত্যের হাসি।

৩১। দৈত্য কুলে প্রহ্লাদ।

৩২। দো মিলে মেড়া হারে।

সতী ও শান্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রাদ্ধ বাড়ীতে আজ্‌ কুটুম্বের মেয়ে ধরে না। মাসী, পিসী ভাইঝী, বোনঝী, মামী, মামাশাশুড়ী, শাশুড়ী, দিদিশাশুড়ী দিদি শাশুড়ীর গঙ্গাজলের বোনঝীর মেয়ে, বড় পিসীর মামাত ভগিনীর খুড়্‌ শাশুড়ীর ছোট বোনের বকুলফুল এইরূপ দূর, অদূর, পরিচিতা অপরিচিতা বালিকা যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, জরাগ্রস্তা-এইরূপ নানাবর্ণের, নানা আকৃতির, নানা প্রকৃতির বহুসংখ্যক রমণী আজ্‌ একত্রিতা। শ্রাদ্ধ বাড়ীটিকে আজ্‌ "হাটের পুরী" বলিলেও বলা যাইতে পারে। দেয়ে—নেয়ে—খায়ে—গেলোয়ে—মলোয়ে—পালায়ে কেবল এই রব। বাটীর গৃহিণী আসিয়া কোন স্ত্রীলোককে বলিতেছেন "ও কিরণের মা, তুমি মা তোমার ছোট

ছেলেটিকে একটু দুধ্ খাওয়াও; তোমার মেয়ে দুটী গেল কোথা, তাহাদের কি খিদে লাগে নি? ও চন্নরের মা, চন্নরের মা, এদিকে আয় মা এদিকে আয়; মাছ ক'খানা ধুয়ে আন্ মা।" চন্নরের মার এদিকে মহা বিভ্রাট উপস্থিত। শুলের শামুকটি হারাইয়াছে, কাজে মন লাগে কি? ভারি কষ্ট। এদিকে চন্নন আর কেষ্ট দুজনে মাছের পট্‌কা নিয়ে মহা গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। ওদিকে বিলেসদিদির নাতিনীটিকে ডাইনে খাইয়াছে, সে দুধ্ তোলাইতেছে, অতএব তাহার জন্য ডাইন ছাড়ান ওঝা ডাকার বন্দোবস্ত হইতেছে।

আজ আবার পৌষ সংক্রান্তি। বড়পিসী পিঠে ভাজিতেছেন, রামদাদার ছেলে দাঁড়াইয়া পিটে ভাজা দেখিতেছে, হঠাৎ তার কি কুমতি হইল, সে বলিয়া ফেলিল ঠাকু মা, কড়ায় তেল ঢেলে দেবো?" ঠাকুর মা অমনি তলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন, মারিতে তাড়া করিলেন, বলিলেন, সর্ব্বনেশে, মুকপোড়া, লক্ষ্মীছাড়া, কি কল্লি, সর্ব্বনাশ কল্লি, সব্ পিটে কাঁচা থাক্‌বে। এই বলিয়া যেমন মারতে তাড়া করিলেন, অমনি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। কিয়দ্দূর গিয়া এমন একটি আছাড় খাইল, যে তাহাতে বেচারীর সম্মুখের দুটী দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে বড়পিসী বহুকাল হইতে হৃদয়ে একটি কুসংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছেন, যে পিটে ভাজার সময়ে তেলকে তেল বলা উচিত নয়, জল বলা উচিত। তাহা না হইলে পিটে কাঁচা থাকে। তাই আজ রামদাদার ছেলের এই নিগ্রহ। অনেকগুলি মেয়ে তাহাকে ঘিরিয়া কেহ বলিতেছেন, মাথায় জল দাও, কেহ বলিতেছেন, "বাতাস কর", কেহ বলিতেছেন হায় হায়, ছেলে আর নাই! বদন ডাক্তারকে ডাক। এই লইয়া সেখানে একটা মহা গণ্ডগোল। মহামারী কাণ্ড। এদিকে আবার আর এক জায়গায় পিটে ভাজা হইতেছে। এখানে ঠাকুরমার গঙ্গাজল মুখ ভার করিয়া কি বিড়ির্ বিড়ির্ করিতেছেন। কাছে নিধিরাম নামক একটি ছেলে দাঁড়াইয়া ছিল, ঠাকুরমার গঙ্গাজল তাহাকে বলিলেন, দেখ্‌তো ভাই একখানা পিটে চেখে, ভেতরে কাঁচা আছে কি না? নিধিরাম ভাঙ্গিয়া বলিল, "হ্যা গো দিদি, ভেতরে আস্তো কাঁচা।" তাই তিনি বিড়ির্ বিড়ির্ করিয়া বলিতেছেন এ ঠিক্ পদীর কাজ্। পদী পাশের বাড়ীর ঝি। সে আজ্ কার্য্যার্থে নিমন্ত্রিতা। পাড়ার মেয়েদের বিশ্বাস পদী ডাইনী। সে ডাইন্-মন্ত্র জানে, ঠাকুরমার গঙ্গাজল মেয়েদের মুখে কথা-প্রসঙ্গে আগে এ সংবাদ রাখিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ আগে পদীর সঙ্গে ঠাকুরমার গঙ্গাজলের "শুলের শামুক" লইয়া কি সামান্য একটা বচসা হয়। তাহাতে তাঁহার মনে সন্দেহ কেন,

একবারেই তিনি ঠিক করিয়াছেন যে পদী মন্ত্রদ্বারা পিঠে "ভেরেছে"। তাই তিনি বলিতেছিলেন "এ ঠিক পদীর কাজ।" পদীর কাজ, পদীকে ডাক্ পড়িল। পদী আসিল, ঠাকুর-মার গঙ্গাজল তাহাকে বলিলেন, "কেমনরে সদীর বেটী পদী, তুই পিঠে ভেরেছিস্ কেন? এখনি যদি "কাটান-মন্তর" দিস্ তো ভাল, তা না হলে তোর ভাল হবে না বল্‌চি।' পদী একেবারে হতভম্ব, এত মেয়ের মাঝখানে তাহাকে এই কথা! এ অপমান আর তাহার সহ্য হইল না। সে কাঁদিয়া ফেলিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে পাশের একটি মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, মা, আমার কোনও পুরুষে মন্তর তন্তর জানে না, আজ কিনা ইনি আমাকে দাগা দিতে চান। পাশের মেয়েটি বলিলেন, "আঃ, দেনা মা কাটান মন্তরটা; এমন সময় কি আর ওরকম করা ভাল? নয় উনি "গুলের শামুকের" জন্যে তোকে দুকথা বলেছেন, তা ব'লে কি আর পিঠে "ভার্‌তে হয়?" পদী আর একটি মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি ও সব মন্তর তন্তর মনে জ্ঞানে জানি নি,মা।" পাশের মেয়েটি বলিলেন, "বাতাসটি না হ'লে কি পাতাটি নড়ে বাছা? তুই ওসব না জান্‌লে কি আর লোকে মিছে কথা বলে?" পদীর আর দাঁড়াইবার স্থল নাই। যাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দুকথা বলিবার চেষ্টা করে, তিনি মুখ বাঁকাইয়া তাহার সহিত সহানুভূতি করিতে নারাজ হন। সুতরাং এখন উপায় কি? এখানে মেয়েদের ভারি ভিড় দেখিয়া এবং গোলমাল শুনিয়া, কি ব্যাপার জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া, তথায় শান্তি আসিলেন। আসিয়া ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে, ঠাকুর মা?" ঠাকুর মা বলিলেন, "ঐ সদীর বেটি পদী পিঠে ভেরেছে।" এই কথা শুনিয়া শান্তি ঈষৎ হাস্য করিলেন। কিন্তু পদীর মুখের দিকে তাকাইতে শান্তির সেই মৃদু হাস্যটুকু যেন ফুট্‌তে ফুট্‌তে শুকিয়ে গেল। তিনি বলিলেন, "কৈ দেখি কি হ'য়েছে?" এই বলিয়া একখানি ফুলরি লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন ভিতরে কাঁচা রহিয়াছে। কেন কাঁচা রহিয়াছে, তিনি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে পদ্মকে দোষ দিচ্ছ, আর তোমাদের এই যে গলদ্ রয়েছে? কলা যে বেশী পড়েছে। তাই ভিতরে কাঁচা থাক্‌ছে।" এই বলিয়া তিনি কিছু আটা মিশাইয়া দিলেন। ঠাকুরমার গঙ্গাজলকে বলিলেন, "এবার ভাজ দেখি"। তিনি ভাজিলেন আর কাঁচা রহিল না। সব ঠিক্ হইয়া গেল। তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। এদিকে মেয়ে মহলে খুব একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, "শান্তি যা হ'ক ধন্যি মেয়ে!" কেহ বলিলেন, আর সীতে, ধন্যি হবে

না কেন? "কালীর আকরের" এম্‌নি গুণ! কেহ বলিতে লাগিলেন, শাস্তি ভূত, পেরেত, বেহ্মদত্যি, ডাকিনী, শাঁকিনী এ সব কিছু মানে না—ডা'ন্ মন্তর—ভূতছাড়ান মন্তর, বাণ মারা মন্তর, বাটীচালা, ডাইনে খাওয়া, ভূতে পাওয়া এসব কিছুই বিশ্বাস করে না।" বিলেসের মা বলিলেন, "আমাদের কেশব ঐ রকম। সে বলে ভূত নেই, পেরেত নেই, মন্তর টন্তর কিছু নয়, ওসব বোকা লোককে ঠকিয়ে পয়সা নেবার কল।"

টোডাজাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

টোডাজাতি নীলগিরি পর্ব্বতে বাস করে। কথিত আছে ইহারা মহিসুর প্রদেশ হইতে আসিয়া এখানে বাস স্থাপন করে। পশুচারণই ইহাদের ব্যবসায়। ইহারা এপর্য্যন্ত কাহারও দাসত্ব স্বীকার করে নাই। ইহাদের বাসস্থান ও বাসগৃহ দেখিতে পরিষ্কার ও রমণীয়। যে স্থানে বৃক্ষ ও নিকটে নির্ঝর আছে, এরূপ স্থানে ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। মহিষ পালন করাই ইহাদের কার্য্য এবং ইহারা মহিষের দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

টোডাজাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অতি অদ্ভুত ব্যাপার। ইহা দুইবার হইয়া থাকে। প্রথম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে হইয়া থাকে। শবদেহ খাটিয়াতে করিয়া শ্মশানে বাদ্যগীত সহকারে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ স্থানে তৃণ পল্লব নির্ম্মিত একটী নূতন কুটীরে শবদেহ প্রথমে স্থাপন করিয়া আত্মীয়গণ ক্রন্দন করিতে থাকে। শবকে নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লালবর্ণ সূত্র দ্বারা বন্ধন করা হয় এবং চারিটী যষ্ঠিতে কপর্দ্দক (কড়ী) বন্ধন করিয়া ঐ যষ্ঠিগুলি তাহার গাত্রে স্থাপিত করা হয়। তদনন্তর মৃতদেহ কুটীরের বাহিরে আনয়ন করা হয় এবং তাহার নিকটে একটী চক্র নির্ম্মাণ করা হয়। পরে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ আপনাদের মস্তক আবৃত করিয়া ঐ চক্রের বাহিরে এক গাছি বেত দ্বারা মৃত্তিকা খনন করে এবং তিন মুষ্ঠি মৃত্তিকা ঐ চক্রের মধ্যে এবং তিন মুষ্ঠি মৃতদেহে নিক্ষেপ করিতে থাকে। এই ক্রিয়াটী শেষ হইলে মৃত দেহকে পুনর্ব্বার ঐ কুটীরে লইয়া যাওয়া হয়। তদনন্তর মৃত ব্যক্তির মহিষ সকল ঐ কুটীরের সম্মুখে আনয়ন করা হয় এবং তন্মধ্যে দুইটী জন্তুকে বাদ্যভাণ্ড সহকারে ঐ কুটীর মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। অনন্তর মৃত দেহকে তিনবার ঐ মহিষদ্বয়ের নিকট উত্থিত করিলে পর তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ নির্দ্দয়রূপে বধ করা হয়। পরে যখন মৃত মহিষদেহ শবদেহের উভয় পার্শ্বে রাখিয়া

মৃত ব্যক্তির প্রত্যেক হস্ত প্রত্যেক মহিষের এক একটী শৃঙ্গের উপর রাখা হয়, তখন তাহার আত্মীয়গণ পরস্পরের হস্ত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। ইতিমধ্যে চিতাগ্নি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারা গৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন করে না, কিন্তু দুই খণ্ড কাষ্ঠ পরস্পর সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি প্রস্তুত করে। চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে পর মৃত ব্যক্তির বস্ত্রে কিঞ্চিৎ শস্য, গুড় এবং পয়সা বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে তিনবার চিতাগ্নি স্পর্শ করাইয়া অধোমুখ করত চিতাতে নিক্ষেপ করে। চিতাশায়ী করিবার পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তির মস্তক হইতে কেশ এবং এক খণ্ড অস্থি এবং একটী নখ কাটিয়া লওয়া হয়। এই কয়েকটী মৃত দেহাংশ লইয়া কিয়দ্দিবস পরে পুনর্ব্বার দ্বিতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সময়েও মহিষ বধ করা হইয়া থাকে। এই ব্যাপার দেখিবার জন্য নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে লোকের জনতা হয়, বোধ হয় যেন একটী মেলা হইতেছে। মহিষ গুলি আনয়ন করিলে পর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা ও অপরাপর লোকেরাও তাহাদিগের সহিত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করে এবং মহিষ গুলিকে ক্রমে ক্রমে বধ করে। পরে প্রথম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় মৃত দেহের যে সমস্ত অংশ রক্ষা করা হইয়াছিল, তাহা নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া শ্মশান ভূমিতে আনয়ন করা হয়। প্রথমবারের ন্যায় এবারও প্রস্তর দ্বারা একটী চক্র নির্ম্মাণ এবং ঐ চক্রের বাহিরে একটী গহ্বর খনন করা হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা ঐ গহ্বর হইতে মৃত্তিকা লইয়া তিন মুষ্টি ঐ মৃতাবশেষের উপর এবং তিন মুষ্টি ঐ চক্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে পর ঐ দেহাবশেষ ও তাহার সঙ্গে বিবিধ খাদ্য সামগ্রী, রৌপ্য মুদ্রা, এবং কুড়ুল, ধনুক, তীর ছুরি, ছাতা প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বস্তু ঐ চক্রের মধ্যে ভস্মসাৎ করা হয়।

কৃষি তত্ত্ব।

ভূমির সার।

যে বস্তু মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাহাকে সার বলা যায়। ধাতু, উদ্ভিদ, জন্তু ইত্যাদি নানাবিধ বস্তু বিকৃত হইয়া সাররূপে পরিণত হয়, এই নিমিত্ত সার নানা প্রকার।

উদ্ভিদবেত্তা ইয়ং সাহেব সারের বিষয় এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লিখিয়াছেন। যথা—

১ম—সারের প্রকৃতি।

২য়—তাহার গুণ।

৩য়—তাহার সংগ্রহ।

৪র্থ—তাহার প্রস্তুত করণ।

৫ম—ভূমির অবস্থা প্রভেদে প্রয়োগ।

৬ষ্ঠ—প্রয়োগ বিধি।

৭ম—প্রয়োগের কাল নির্ণয়।

৮ম—প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয়।

৯ম—প্রয়োগের ভূমি নির্ণয়।

পরে তিনি সারকে দুই প্রকারে ভাগ করিয়াছেন, প্রথমতঃ যাহা ক্ষেত্রের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া তোলা অথবা ক্ষেত্রের মৃত্তিকার উপর প্রস্তুত করা যায়; দ্বিতীয়তঃ, যাহা ভিন্ন স্থান হইতে আনীত হয়। এই দ্বিতীয় প্রকারকে পুনরায় তিন প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন, যথা—জৈব, ঔদ্ভিদ ও খনিজ। যে সকল সার মৃত্তিকা হইতে খুঁড়িয়া পাওয়া যায়, তাহা ধাত্বংশ মৃত্তিকা, কর্দ্দম ও মাটি।

ধাত্বংশ মৃত্তিকা—কর্দ্দম, প্রস্তর ও কড়ির মাটি এই কয় পদার্থে সংসৃষ্ট। ধাত্বংশ মৃত্তিকা ইংলণ্ড প্রদেশে সচরাচর পাওয়া যায়। শুক্ল, লোহিত, নীল, কালীয় প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা ইহাদের পরস্পরের প্রভেদ জানা যায়। কিন্তু ঐ সকল বর্ণের প্রতি লক্ষ্য করিবার আর কোন আবশ্যকতা নাই, তাহার দ্বারা শুদ্ধ লৌহের অংশ নির্ণয় করা যাইতে পারে।

ঐ সমস্ত মৃত্তিকা প্রায়ই বালুকা, কর্দ্দম ও ধাতু মিশ্রিত মাটিতে উৎপন্ন হয়। যে সকল মৃত্তিকার বর্ণ লোহিত এবং কালীয়, তাহাতে লৌহের ভাগ অতি অল্প। চেসায়ারের কোন স্থানের মৃত্তিকাতে শতকরা ১০০ পরিমাণে লৌহ ছিল।

ধাতু মিশ্রিত মাটিতে শতকরা ২৫ অবধি ৮০ পর্য্যন্ত লৌহাংশ থাকে। কোন উৎকৃষ্ট কর্দ্দম মাটিতে, ধাতু মিশ্রিত মাটির ভাগ ৪০, কর্দ্দমের ৫০ ও বালুকার ৮ হইতে ১০ দেখা গিয়াছিল, এবং শারীরিক সকল দ্রব্যের বিনাশ হইলেও অঙ্গান বায়ু থাকে। সকল ধাতু মিশ্রিত মাটি হইতে ফস্‌ফোরস্ পাওয়া যায়।

যে মৃত্তিকা ধাতু মিশ্রিত, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান; কিন্তু কোন্ মৃত্তিকাতে কত পরিমাণে ধাতু মিশ্রিত থাকা উচিত, তাহা অদ্যাপি জানা নাই। এই সকল বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তিরা নানা প্রকার সারের পরীক্ষা করিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্টতম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতে শতকরা ২ অবধি ৩০ পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়াছে। ইয়ং সাহেব অনেক অত্যুর্ব্বরা মৃত্তিকার পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনিও ৯ অবধি ২০ পর্য্যন্ত ধাত্বংশ দেখিয়াছেন। কিন্তু অনেক অকর্ম্মণ্য মৃত্তিকাতেও উর্ব্বরা মৃত্তিকার সমান পরিমাণে ধাতু মিশ্রিত মাটি থাকে, তাহাতে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মৃত্তিকায় শারীরিক দ্রব্যের যে অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া অঙ্গানবায়ুতে পরিণত হইতে পারে, তাহার যে পরিমাণে অভাব থাকিবে, সেই পরিমাণে অধিক ধাতু মিশ্রিত মাটি থাকা আবশ্যক,

অর্থাৎ তাহা হইলে উর্ব্বরতা সাধন হয়। যদি কোন কৃষক পরীক্ষা দ্বারা কিম্বা অন্য প্রকারে এমন জানিতে পারেন, যে তাঁহার ক্ষেত্রে অতি অল্প ঐ শারীরিক পদার্থ আছে, তাহা হইলে তাহাতে শতকরা ২০ অংশ ধাতু মিশ্রিত মাটী যোগ করা উচিত। কিন্তু যদি শারীরিক পদার্থ যথেষ্ট থাকে, তাহা হইলে ধাত্বংশ মৃত্তিকায় ক্ষেত্র আঠালিয়া ও কঠিন করে, এই প্রকার ক্ষেত্রে কর্দ্দম মৃত্তিকার সংযোগ উত্তম কল্প। কোন কোন মৃত্তিকাতে অম্লের (Acid) অণু সকল থাকে, ইহাতে অপকারের সম্ভাবনা। ধাতু মিশ্রিত মাটির দ্বারা ঐ অম্লের দোষ বিনষ্ট হয়।

উদ্ভিজ্জে যে মাটী দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই ধাতুমিশ্রিত, এই কারণে বোধ হয় যে ঐ মাটীতে সার হয়।

ধাত্বংশ মৃত্তিকা সচরাচর খুঁড়িয়া পাওয়া যায়, এবং নদীর থাড়ি হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। শুভ্রবর্ণ কড়ির মাটী এবং আর এক প্রকার পাতলা শুভ্র জাতীয় পঙ্কের ভিতর এবং বিলের তলা হইতে পাওয়া যায়। যেস্থলে এই মাটী থাকে, যদি তাহার উপরিভাগ হইতে তাহা প্রতীত না হয়, তাহা হইলে সেই স্থান বিদ্ধ করিয়া নীচে হইতে মাটী তুলিয়া পরীক্ষা করা উচিত।

এই মাটীতে কিছু পাট করিতে হয় না, কেবল ছড়াইয়া দিলেই হয়, এবং যত অধিক দিন পরে তাহার উপর হল প্রচালিত হয়, ততই ভাল। মটরের চাষ অগভীর হইলে উত্তম, শালগামের পক্ষে কিঞ্চিৎ মন্দ। এই মাটী যে মাঠে দেওয়া হয়, তাহার উপর গোল আলুর ফসল প্রথমবার উত্তম হয় না। যে জমীতে পূর্ব্বে চাষ হইয়াছিল, তাহাতেও এই মাটী দিলে উত্তম হয়। এই সকল দিবার সময় কৃষক বিবেচনা করিবেন; যদি ক্ষেত্র আর্দ্র হয়, তাহা হইলে গ্রীষ্মকালে এবং যদি ক্ষেত্র শুষ্ক হয়, তাহা হইলে শীতকালে দিবেন।

সার কি পরিমাণে দিতে হইবে, এবিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। যদি অনুর্ব্বর বলিয়া মাটীর উপর অধিক পরিমাণে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে জমি অনেক কালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু অল্প পরিমাণে দিলে বিশেষ উপকারিতা আছে। এই সার বরং দুইবার করিয়া দেওয়া ভাল, তথাচ একবারে অধিক দেওয়া কিছু নয়। অনুর্ব্বর কর্দ্দম অথবা কশকা মাটীতে অধিক পরিমাণে দিলে হানি হয় না।

জাপানে ভূমিকম্প।

গত অক্টোবর মাসের শেষে জাপানে ভূমিকম্প হইয়া ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে। * প্রায় ৩১টী জেলা ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হয়, তাহাতে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইজোজি, মিনো এবং ওয়ারি জেলায় ৩৪০০ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, ৪৩০০০বাটী ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং অনেক নগর ও গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে। গিফু নগরে ভূমিকম্পের সময় দুই খানি রেলের গাড়ী তত্রত্য ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়। আরোহীরা শকট মধ্যে বিষম ক্লেশ সহ্য করে। রেলপথ কেবল দোলে নাই, স্থানে স্থানে একেবারে স্খলিত হইয়া ভয়ঙ্কর গহ্বর সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে প্রভূত পরিমাণে উষ্ণ জল ও ধাতব পদার্থ সকল নির্গত হইয়া নিকটস্থ জনগণের বিপদের কারণ হইয়াছে। আরোহীরা শকট হইতে নামিয়া কে যে কোথায় যাইবেন স্থির করিতে পারেন নাই। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন যে গিফু নগরের প্রায় সমস্ত প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে, অসংখ্য প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছে। নগরের চতুর্দ্দিকে অনেক স্থল জলে পরিণত হইয়াছে এবং রাত্রিতে সহসা অগ্নি কাণ্ড হইয়া অবশিষ্ট গৃহ সকল ভস্ম করিয়াছে। অগ্নি পর দিন পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত থাকিয়া ভীষণ কাণ্ড সম্পূর্ণ করিয়াছিল। গবো নগরে একটী বৌদ্ধ মন্দির উপাসনার সময় একবারে বসিয়া যায় এবং পঞ্চাশৎ উপাসক তৎসঙ্গে প্রোথিত হন। ২৬এ অক্টোবর প্রাতঃকালে একটী স্কুলবাটী পতিত হইয়া আশ্রিত অনেক লোকের মৃত্যু সংঘটন করে; পতিত গৃহ চাপে পথ ঘাট সকল একবারে বন্দ হইয়াছিল এবং পথিকদিগের ভিড়েও অল্প ব্যক্তির মৃত্যু হয় নাই। একটী সূতার কল বিনষ্ট হইয়া শত শত লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। প্রথম (বোধ হয় ২৫শে) হইতে ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত অন্যূন ৩৬৮ বার ভূমিকম্প হয়। অনেক স্থলে ২ পাদ বিস্তৃত ও অনেক পাদ গভীর গর্ত্ত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। রেলের পথ সকল বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, লৌহ-সেতু ও নদীর পোস্তান বাঁধ সকল একবারে ভাসিয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থান সহসা ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছে।

গিফু জেলার প্রায় ৩৫০ মাইল নদীর পোস্তান একবারে বিনষ্ট হইয়াছে। অনেক জেলা একবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বকার চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হয় না।

হকুসন পর্ব্বতের তলে ৬০০ গজ দীর্ঘ এবং ৬০ গজ প্রস্থ একটী প্রকাণ্ড হ্রদ দেখা দিয়াছে এবং নিকটস্থ স্থান

* ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে আমরা ইহার সংবাদ মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, অদ্য তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে।

সমূহে ভূরি ভূরি গহ্বর উৎপন্ন হইয়াছে, এই সকল গহ্বর হইতে বেগে জল বহির্গত হইয়া নির্ঝর আকার ধারণ করিয়াছে। সমতলের কূপসকল শুষ্ক হইয়া গিয়াচে। কোথাও বা কূপোদক ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণে বিকৃত ও বিস্বাদ হইয়া পানের অযোগ্য হইয়াছে। গিফু নগরে প্রায় ৭০০ দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তৃতীয়াংশেরও অধিক ভূমিসাৎ বা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে এবং অবশিষ্টের অনেক গুলিও আংশিক ভগ্ন হইয়াছে। নগরের কোন কোন অংশে ভয়ঙ্কর গহ্বর সকল উৎপন্ন হইয়া দুই ঘণ্টারও অধিক কাল ধরিয়া অনবরত উষ্ণ কর্দ্দম স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে। পবিত্র ফিউজি-য়ামা পর্ব্বত শিখর বিদীর্ণ হইয়া এক প্রকাণ্ড গহ্বর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ১২০০ পাদ বিস্তৃত ও ৬০০ পাদ গভীর। এপর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রায় ৩০০০০ লোক মৃত, ৯০০০০ গৃহ পতিত এবং ২ লক্ষ মনুষ্য গৃহশূন্য হইয়াছে!

নূতন সংবাদ।

১। গত ১২ই মার্চ্চ বেথুন কলেজের পরিতোষিক বিতরণ অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ছোটলাট পত্নী স্বহস্তে পরিতোষিক বিতরণ করেন এবং ছোটলাট বক্তৃতা করেন। বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ১৪৯, ইহার মধ্যে কলেজের ছাত্রী ২০ জন। প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দু গৃহের ছাত্রী ৬০ জন মাত্র আছে, অবশিষ্ট ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান। হিন্দু ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

২। ভদ্র হিন্দু বিধবাদিগের ভরণ পোষণের সাহায্যার্থ মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর লক্ষ টাকায় সংস্থান করি-য়াছেন, ইহার সুদে ব্যয়নির্ব্বাহ হইবে। মহারাজার বদান্যতাকে ধন্যবাদ।

৩। দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। হাইদ্রাবাদের নিজাম ও মহীশূর মহারাজা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ বিস্তৃত কার্য্য ক্ষেত্র খুলিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। জীবন সোপান, প্রথম ভাগ— শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।/০ মাত্র। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন দ্বারা যাহাতে মানবজীবন পূর্ণভাবে সংগঠিত হইতে পারে, গ্রন্থকার এই পুস্তকে তাহারই প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থখানি সুপ্রণালীবদ্ধ এবং অনেক গুলি সার সার উপদেশ ও ইঙ্গিতে পূর্ণ। উপদেশের সহিত দৃষ্টান্তও যথেষ্ট আছে। পুস্তকখানি প্রণয়নে গ্রন্থকার আপনার চিন্তাশীলতা ও ভাবগ্রাহিতার সুন্দর পরিচয় দিয়া-ছেন। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

বামারচনা।

অভিমানে

অভাগা অধম আমি
জগতে মিলে না ঠাঁই,
কাঁদিব কাহার কাছে!
তুমি তো জগতে নাই। ১
কেউ না আদর করে
কেউ নাহি ভাল বাসে;
কেঁদে কেঁদে মরে গেলে,
কেউ না হাসাতে আসে।২
নিতি আসে উষা রাণী
নিতি পথ চেয়ে রই,
সবারে মমতা করে,
আমি যেন কেউ নই।৩
উজল তরুণ রবি
সবারে সে দেয় আলো;
আমি তার "পর পর"
আমারে বাসে না ভাল। ৪
বাতাস সবারি সাথে
করে সোহাগের খেলা,
আমারে গরিব বলি
শুধু ঘৃণা, অবহেলা। ৫
অমৃত জ্যোছনা হাসি
সোণা মুখে হাসে চাঁদ,
চায় না আমারি পানে,
বোঝে না আমারি সাধ! ৬
সরসে মৃদুল ঢেউ
বয়ে যায় তর তর,
ক'য়ে যায় মোরে তারা
"হেথা হতে সর সর"। ৭
কোকিলা, পাপিয়া, শ্যামা,
চাহিলে আমার মুখে,
নিভায় মধুর গীতি
কত শোক যেন বুকে! ৮
বসন্ত শরৎ তারা
আজো আসে পা'য় পা'য়,
তফাতে তফাতে থাকে
পাছে মোরে যায়! ৯
সবে চায় রাঙা চোখে
সবে করে "দূর্, ছাই"
কাঁদিব কাহার কাছে
তুমি তো জগতে নাই! ১০
সে কালের সাথী গুলি
আর তো আসে না কাছে,
লাগে বা তাদের গা'য়
আমার বাতাস পাছে! ১১
আগে তো মল্লিকা জাতি
দেখা হ'লে দি'ত হাসি,
ফুরায়েছে সে সুদিন
গেছে ভালবাসাবাসি। ১২
আগে ছিল এই বাড়ী
ফুলে ফুলে ফুলময়,
আজি শুধু মরুভূমি
কেমনে পরাণে সয়! ১৩
"আহা" "উহু" দুটি কথা
নাই আর মোর তরে,
নিঠুর পিশাচ দেশে
থাকিব কেমন করে? ১৪
সেই ছিল—এই ঘর
অলকা অমরাপুরী,
আজি খালি চিতাময়,
শ্মশানে শ্মশানে ঘুরি! ১৫
আগুণ জ্বেলেছে এরা
আমারে করিতে ছাই—
লুকা'ব কাহার কাছে
তুমি তো জগতে নাই! ১৬
সংসারের পদ-চাপে
মুখ দিয়া রক্ত উঠে,
আগুণে গলিয়া প্রাণ
বুকে বুকে ঢেউ ছোটে! ১৭
এমন করিয়া আর
কত র'ব, ভাবি তাই,
কাঁদিব কাহার কাছে
তুমিতো জগতে নাই! ১৮

(প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী)

বামাবোধিনী পত্রিকা

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৭ সংখ্যা। | চৈত্র ১২৯৮—এপ্রেল ১৮৯২। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারতের লোকসংখ্যা—১৮৯১ সালের গণনানুসারে স্থিরীকৃত হইয়াছে, সমগ্র ভারতের অধিবাসিসংখ্যা ২৮৮ কোটী, তন্মধ্যে হিন্দু প্রায় ২০ কোটী ৭৬ লক্ষ, মুসলমান ৫ কোটী ৭৩ লক্ষ, খৃষ্টান ২২ লক্ষ, ৮৪ হাজার, জৈন ১৪ লক্ষ, ব্রাহ্ম ৩৪০১, বৌদ্ধ ৭১ লক্ষ, পারসী ৮৯,৮৮৭, ইহুদী ১৭৮৯, জড়োপাসক ৯৩ লক্ষ, ৫০ লক্ষেরও অধিক ব্যক্তির ধর্ম্ম জানা যায় নাই। ১৮৮১ সালের গণনার উপর সর্ব্বশুদ্ধ ৩ কোটী ৫০ লক্ষ লোক বাড়িয়াছে।

বিধবাবিবাহে পূর্ব্ব স্বামিধনে স্বত্বলোপ—ঢাকার ৺ ভগবান্ চন্দ্র রায়ের বিধবা বামাসুন্দরী ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে পুনর্বিবাহিত হন। তিনি স্বামীর ধন ত্যাগ করিয়াই আসেন, কিন্তু তাঁহার সপত্নী-কন্যা মাতঙ্গিনী পিতৃত্যক্ত সমুদায় সম্পত্তির দাবী করাতে তাঁহার দেবরেরা তাঁহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার প্রয়াস পান। ঢাকার সব জজ তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী দেন, আপীলে জজ সাহেব সে ডিক্রী খণ্ডন করেন। হাইকোর্টে আপীল হয়। জজ প্রিন্সেপ ও বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারে বসিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। জজ উইলসন তাহাদের সঙ্গে বসিয়াও মীমাংসায় আসিতে পারেন নাই। পরে চিফজষ্টিস, প্রিন্সেপ, উইলসন, পিগট ও চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় ফুল বেঞ্চে বসেন। প্রিন্সেপ সাহেব ব্যতীত আর সকলেই বামাসুন্দরীর বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন।

রাজপ্রতিনিধির শৈলযাত্রা—গবর্ণর জেনারল আগামী ২৮এ মার্চ

কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বোম্বাই প্রভৃতি পরিদর্শন পূর্ব্বক ২১এ এপ্রেল সিমলায় পৌঁছিবেন।

কুমারী ভান টাসেলের মৃত্যু— ঢাকায় বেলুন হইতে নামিতে গিয়া ইনি সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন, পরদিন প্রাতে তাহাতেই মৃত্যু হয়। ইনি ৩৬ বার বেলুন প্রদর্শনী দ্বারা দর্শকদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। ঢাকা তাঁহার কাল হইল।

উদাসীনের চিন্তা।

বসন্তকাল ফাল্গুন মাস, সূর্য্যোত্তাপ ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। শীতের প্রকোপ তত নাই। শীতল সমীরণ দক্ষিণ দিক্ হইতে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। উদ্যানের নব শোভা। বৃক্ষলতা নব মুকুলে সুসজ্জিত, পুষ্পগন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। উদ্যানে বৃক্ষ শাখোপরি উপবেশন করিয়া পিককুল সুমধুর সঙ্গীত লহরীতে সকলের মন মুগ্ধ করিকরিতেছে। এমন সময় একদিন অপরাহ্ণ সময়ে সরোজিনী ও তাহার দাদা সুশীলকুমার উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছে, ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্তি বোধ হইল। শ্রান্তিদূর করিবার জন্য উভয়ে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে উপবেশনার্থ গমন করিল। এমন সময়ে দূর হইতে উদ্যানের মালী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "মশায়! ওদিকে যাবেন না, ঐ গাছের তলে একটা বড় কেউটে সাপ।" এই কথা শুনিয়া ভাই ভগিনী গতিরোধ করিল ও অন্য দিকে পাদবিক্ষেপ করিতে লাগিল। পথ চলিতে চলিতে সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! ঐ মালীর ত কোন স্বার্থ নাই, তবে এ আমাদের সাবধান ক'রে দিল কেন? ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, ও আমাদের চিনে না, কোন লাভের আশা নাই, তবে কেন ও আমাদের এই বকুল তলে যেতে নিষেধ কল্লে। আমাদের সাপে কাম্ড়ালে ওর ত কোন কষ্টই হবার কথা নাই।"

সুশীল—তুমি কি মনে কর মানুষের সকল কাজই স্বার্থ থেকে হয়? ভাল এই যে দেশের অবলা বান্ধবগণ তোমাদের অবস্থা ভাল করিবার জন্য এত চেষ্টা কচ্চেন তাঁহাদের এতে কি স্বার্থ? বরং দেশের লোক তাঁদের ঘৃণা করে, কতজন কত কথা বলছে, কই তাঁরাত তাতে কান দিচ্ছেন না।

সরোজিনী—তাঁরা পৃথিবীর স্বার্থ না খুজতে পারেন, কিন্তু তাঁরাত পরকালের স্বার্থ খুজছেন। এ কাজ কল্লে ঈশ্বর প্রীত হবেন, পরকালে তাঁহাদের সুখ হবে এই

উদ্দেশ্যেত তাঁরা একাজ কচ্ছেন। একি স্বার্থ নয়?

সুশীল—ঠিক তাঁরা কোন উদ্দেশ্য করে একাজ করেন, এ আমার বোধ হয় না। মানুষের প্রতি তাঁদের যে স্বাভাবিক ভালবাসা আছে, সেই ভাল বাসাই তাঁদের একাজে প্রবর্ত্তক। তাঁরা একাজ না করে থাক্‌তে পাচ্চেন না। ঐ মালীর বিষয় ভাবলে এবিষয়টা একটু ভাল করে বুঝতে পার্‌বে। ঐ মালী পৃথিবীর কোন স্বার্থ সাধন জন্যও কাজ করে নাই। পরকালে সুখে থাকবে কি ঈশ্বর ওকে ভাল বাসবে এভাব ও ওর মনে হয় নাই। ঈশ্বর কি, পর কাল কি হয়ত এবিষয়ে ওর পরিষ্কার জ্ঞানও নাই। মানবের প্রতি যে এর স্বাভাবিক ভাল বাসা আছে, তাহাই ইহাকে একাজে প্রবৃত্ত করিয়াছে, মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই স্বাভাবিক অকৃ-ত্রিম ভালবাসাকে সহানুভূতি বলি-য়াছেন।

সরোজিনী—এর কোন পার্থিব স্বার্থ নাই একথা ঠিক, কিন্তু পারমার্থিক স্বার্থ সম্বন্ধে যাহা বলিলে, তাহা ঠিক্ কি না বলিতে পারি না, চল একবার গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করি?

সুশীল—জিজ্ঞেস কর্ব্বার কোন দর-কার নাই। তবু তোমার সন্দেহ ভাঙ্গবার জন্য চল যাই। এই বলিয়া ভাই ভগিনী সেই মালী যেখানে কাজ করিতেছিল, সেই দিকে চলিয়া গেল মালী আপনার মনে আপনি কাজে ব্যস্ত। সুশীল জিজ্ঞাসা করিল—ভাল মালী তুমি আমাদের বকুল তলে যেতে নিষেধ কল্লে কেন?

মালী—কেন কি? ওখানে যে একটা বড় সাপ।

সরোজিনী—তাতে কি? আমাদের সাপে কামড়ালে তোমার কি?

মালী—তোমাদের কথা যে আমি বুঝলেম না। তোমাদের সাপে কামড়াবে আর আমি জেনে শুনে চুপ ক'রে থাক্‌বে?

সরোজিনী—ভাল তুমি কি এটা পুণ্য কার্য্য মনে করে সাবধান করেছ।

মালী—এতে আবার পুণ্য কি, এত সকলেই করে, এ আর ত আমি একটা দান ধ্যানের কাজ করিনি।

সুশীল—সরোজ এখন বুঝলে যে মালী এটাকে সাধুকাজ মনে করে করেনি। মানুষের এটা স্বভাব যে এক মানুষ আর এক মানুষের কষ্ট দেখিয়া ক্লিষ্ট হয়, সুখ দেখিয়া সুখী হয়।

সরোজ—কোথায় সকলেত হয় না। চোর ডাকাত-এরা অপরের কষ্ট দেখিয়া ক্লিষ্ট হওয়া দূরে থাক, এরাত ইচ্ছাকরে অপ-রকে কষ্ট দেয়। এমন ও লোক দেখিতে পাওয়া যায় যারা পরের সুখ দেখিলে সুখী না হইয়া কষ্ট পায় এদেরইত পরশ্রীকাতর বলে।

সুশীল—তুমি ঠিক্ বলেছ, সকলের প্রাণে সহানুভূতি নাই। কিন্তু এদের

এ অবস্থা স্বাভাবিক নহে, ইহা বিকৃত অবস্থা।

সরোজ—আচ্ছা, তবে জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা চলে যায় কেন?

সুশীল—স্বার্থপরতাই ইহার কারণ। সুখলালসা সহানুভূতিকে ডুবিয়ে দেয়, আর সে উঠতে পারে না। ঐ মালীর কথা দিয়া আবার আমি তোমাকে এইটী বুঝাইতেছি। ঐ মালী স্বভাবতঃ আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ও যদি অত্যন্ত সুখের জন্য লালায়িত হইত, আর অল্প অর্থে সে সুখ না পাইত, তাহা হইলে সুখ লাভের জন্য ওর অর্থপিপাসা বাড়িয়া যাইত এবং সুযোগ পাইলে অসদুপায়ে অর্থ লাভের জন্য ব্যাকুল হইত। আমার সঙ্গে যে ঘড়ী চেন আছে, আমাদের সাপে কামড়াইলে অচেতন হয়ে পড়্‌ব, তখন সে অনায়াসে ঘড়ী চেন আত্মসাৎ কর্ত্তে পার্ব্বে আশাতেও আমাদের সাবধান কর্ত্ত না! অর্থলোভ তাহার এই যে সহানুভূতির ভাবকে গ্রাস করে ফেলত, যেখানে দেখবে সহানুভূতির অভাব যেখানে কোন না কোন স্বার্থ লুকায়ে রয়েছে।

সরোজিনী—ভাল, আমাদের বাড়ীর বুড়ী দিদি যে পর নিন্দা করে বেড়ায় ইহা কি সহানুভূতির অভাব জন্য নহে? কোথায় একাজের কষ্ট দেখে সে দুঃখ কর্ব্বেন তা না করে যাতে তাকে সকল লোক ঘৃণা করে, যাতে তাকে কষ্ট পেতে হয় এরই জন্য বাড়ী বাড়ী তার নিন্দা-গেয়ে বেড়াচ্চে। ভাল এতে ওর কি স্বার্থ?

সুশীল—ভাল বুড়ী দিদি চায় কি জান? সে চায় সকলের প্রশংসা, তাই দেশ শুদ্ধ লোকের নিন্দা করে তাদের ছোট কর্ত্তে চায়। আর দেশ শুদ্ধ লোক মন্দ হলে কাজেই লোকে বুড়ী দিদিকেই ভাল বলবে এই তাহার ভিতরে ভিতরে বিশ্বাস। বুড়ী দিদি এটা টের পায়না। প্রশংসা-প্রিয়তাই বুড়ী দিদির সহানুভূতির মাথা খেয়ে দিয়েছে!

সরোজিনী—ভাল এটাত বুঝলেম। কিন্তু উপরে যে পরশ্রীকাতর লোক-দিগের কথা বল্লেম, তাদের পরের সুখে দুঃখী হওয়ার কি স্বার্থ? অন্যের সুখ দেখে জলে পুড়ে কেন খাক হয়ে যায়?

সুশীল—স্বার্থ আছে বই কি? তারা চায় সকল লোক তাদের সমান হয়। সমান না হইলে যে তাহাদিগকে এদের কাছে একটু নীচু হতে হয়। এই নীচু হওয়া তারা সহ্য কর্ত্তে পারে না। অথচ যে উপায় অবলম্বন কল্লে আপনার উন্নতি করিয়া উচুদের সমান হওয়া যায়, সে উপায় অবলম্বনের প্রবৃত্তি নাই। তাই বড়কে ছোট করিয়া যাঁরা উচুতে আছেন তাদের নীচে নাবাইয়া সমান কর্ত্তে ইচ্ছা করে থাকে। এইরূপে সহানুভূতি স্বার্থের কবলে মারা পড়ে।

সরোজিনী—দাদা আজ তোমার নিকট অনেক কথা শিখলেম। দাদা আমার মনে আস্তে আস্তে পরশ্রী কাতরতা প্রবেশ কচ্ছিল। কেহ আমার সমবয়স্কাদিগকে প্রশংসা কল্লে আমার যেন একটু অসহ্য হত। অথচ তাদের মত হবার জন্য আমার চেষ্টা ছিল না। আজ হইতে এ খারাপ ভাব প্রাণ হতে তাড়িয়ে দিব এবং যাতে আপনার উন্নতি কর্ত্তে পারি তারই চেষ্টা কর্ব্বো, দাদা আজ সন্ধ্যা হয়েচে চল ঘরে ফিরে যাই। আর এক দিন এবিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবো।

সতী ও শান্তি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দীননাথ ত্রিবেদী ওরফে দিনু ওঝা উপস্থিত। বিলেসদিদির নাতিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করিয়া বলিল "এক খানা আর্‌সি আন দেখি!" আর্‌সি আনিয়া দিলে পর, দিনু ওঝা আর্‌সি "পড়িয়া" সেই মেয়েটার মুখের কাছে ধরিল। কিছুক্ষণ তাহার মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বলিল, হ্যাঁ চিনেছি; আচ্ছা দেখি বাবা, কার কত গুরুবল। এই বলিয়া দিনু ওঝা "ফুঁ" দিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ অনবরত ভ্রমরের মত শব্দ করিতে করিতে যখন হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল, "হাড়ীর ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে, শীগ্‌গির ছাড়," অমনি একটি ছেলে ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সে মনে করিল, "বুঝি আমাকে ধরে"। এইরূপ কিয়ৎ কাল হুঙ্কার ছাড়িয়া শেষে "জল পড়া" দিল। এমন সময় এক বৃদ্ধা বলিলেন, হ্যাঁ গো, "গুনিনের পো," আর্‌সির ভেতর কা'কে দেখ্‌লে?" দিনু ওঝা বলিল, থাক্, আর নাম কর্ব্বো না; করে ফেলেছে এক কাজ।" বৃদ্ধা তাহার হাতে একটা টাকা দিয়া বলিলেন, "অসন্তুষ্ট হইও না, ভাল হ'লে তখন খুসী কর্ব্বো।" দীনু ওঝা "তথাস্তু" বলিয়া টাকাটি পকেটস্থ করিল। এমন সময় দিনু ওঝা, কেশবকে আসিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, কিহে ভাই রায়ের পো, এস ভায়া এস, তার পর, আছ কেমন?

কেশব। "দাঁতাল মাতাল শিঙেল বৈতেল" কখন যে কাকে কি বলে, কিছুই ঠিক্ নাই। কি দিনু দাদা, গাঁজার মাত্রাটা আজ কিছু বেড়েছে বুঝি, তাই বল্‌ছ "ভাই রায়ের পো"।

দিনু ওঝা—আঃ খুড়ি, কি জান ভাই, "মনীনঞ্চ মতিভ্রমং"।

কেশব—গাঁজা খোরের হাতে পড়ে সংস্কৃত ভাষাটাও মারা যায় দেখ্‌ছি !

দিনু ওঝা—হা—হা, "গাঁজাকা গুঁজি মহাদেওকা পুঁজি। যে বলে গাঁজা মন্দ, তার ধরুক্ পঞ্চানন্দ।" ভায়া, গাঁজার মজা তুমি কি বুঝবেহে ? এক বোঝেন শিবু খুড়ো, আর বোঝেন শম্মা-রাম। তা, যাউক, ভায়া, আছ কেমন বল। অনেক দিন দেখা হয় নি। আমি তোমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বো মনে কচ্চি, আর তুমি এসে পড়েছ। তা যাই হ'ক তুমি অনেক দিন বাঁচবে।

কেশব—আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য এত আগ্রহ কেন ? আমাকে কি ডাইনে খেয়েছে, না ভুতে পেয়েছে ?

দিনু—ওহে ভায়া, আমি যত দিন বেঁচে আছি, ভূতের বাবার সাধ্যি কি যে তোমাকে ছোঁয়। দেখ ভায়া, তোমাকে আমি বড় ভাল বাসি। যাই হ'ক তোমাকে শীগ্‌গির আমি এক খানি কবচ দিচ্ছি। তোমার কিছুই খরচ হবে না। অন্য কেহ হলে বিশ টাকার কমে হতো না। তা যা হ'ক আমি তোমাকে অমনি দিচ্ছি। দেখ ভায়া,ভাল বাসায় কি না হয়, লোকে কথায় বলে "ভাল বাসায় বাঘের দুধ মেলে।" যা হ'ক এসব উপ-কার মনে রেখো।

কেশব—দিনু দাদা, আমার সঙ্গেও চালাকি। তোমার বিদ্যাবুদ্ধি আমি সব জানি। কেবল বোকা লোককে ঠকিয়ে পয়সা নেবে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জেনো, যে ইহা কখনও ধর্ম্মে সবে না।

দিনু—ওহে কেশব, কি জান, তুমি ছেলে মানুষ, আর কিছু ইংরাজী গর্ব্যরস পেটে পড়েছে কিনা, তাই তুমি অমন কথা বলছো। যেমন পাপ কখন লুকায় না, সাগর কখন শুকায় না, তেমমি "মুনিবার্ক্য" কখন লঙ্ঘন হয় না। মন্তর তন্তর এ সব যদি মিথ্যে হয়, তা হইলে সমস্ত জগৎ মিথ্যে। তুমিও মিথ্যে, আমিও মিথ্যে, রামও মিথ্যে, রহিমও মিথ্যে ; আর "হাড়ীর ঝী চণ্ডীর আজ্ঞে"ও মিথ্যে, "মামীর মার গুণে শীগ্‌গির লাগ্যে" ও মিথ্যে।

কেশব—দিনু দাদা, তুমি যে ইংরাজী গব্যরসের কথা বল্লে, বাস্তবিক ইহা প্রকৃত গব্যরস। এই গব্যরস পান করে অনেক গবচন্দ্র উদ্ধার হয়ে গেল তোমাদের হাত হ'তে। "সাগর কখন শুকোয় না" যে বলছ তাহা ঠিক্ নয়। তুমি যদি কখন ভূবিদ্যা পড়্‌তে, তাহলে কখনও ও কথা বিশ্বাস করতে না। সাহারা মরুভূমি আগে সাগর ছিল, তার পর শুকিয়ে মরুভূমি হয়েগেছে। আর পাপ যে কখন লুকোয় না বল্‌ছ, ইহা অতি সত্য কথা। দিনু দাদা, নিশ্চয়ই জেনো পাপ কখনই লুকোয় না। প্রতারণা প্রবঞ্চনা দ্বারা লোককে ঠকিয়ে তোমরা যে পাপ সঞ্চয় করছ, এ পাপ কখন লুকোবে না। এ পাপের শাস্তি নিশ্চয়ই ভোগ করতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিলেস্‌দিদির নাতিনীর আজি ভারি বেগতিক। বাঁচে কিনা সন্দেহ। দিনু-ওঝা "ফুঁক্ ফাঁক্" করে গেল "জল পড়া" দিয়ে গেল; তাহাতে কিছুই হইল না। বরং তাহার অসুখ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। মেয়েটীর মা মেয়েটীকে কোলে লইয়া চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতেছেন। বিছানার পাশে অনেক গুলি স্ত্রীলোক তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। যাঁহার যাহা মনে উঠিতেছে, তিনি তাহাই বলিতেছেন। কোন মেয়ে বলিতেছেন, "দিনুওঝার মন্তর ভাল নয়"। অন্য এক জন বলিতেছেন, "শ্যামীর মার মন্তর ভাল, সে বেশ ভাল জলপড়া জানে"। আর এক জন বলিতেছেন, শ্যামীর মার মন্তর ভাল বটে, কিন্তু তার একটু দোষ আছে; সে সব্ সময় লোভ সাম্‌লাতে পারে না। সে দিন ওঁদের খোকাকে খেয়েছিল।" এই রূপে নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল পরে তথায় শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তি বলিলেন মাসী মা তুমি অমন ক'রে কাঁদ্‌চো কেন? কাঁদলে কি হবে? তোমার মন এরূপ উদ্বিগ্ন হলে ছেলের অসুখ বাড়বে বৈ কমবে না। কেশব দাদা গেল কোথায় ঠাকুর মা, তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে সরোজিনী দিদিকে আন্‌লে হয় না? তিনি শিশু চিকিৎসায় খুব ভাল।" ঠাকুর মা বলিলেন, সেই ভাল। তাঁকে আনা উচিত। নতুবা ছেলের যেরূপ অবস্থা এতে বড় একটা ভালর আশা দেখ্‌ছি না!" অবিলম্বে কেশব সরোজিনীকে আনিবার জন্য চলিয়া গেলেন। প্রায় বেলা ৪টার সময় সরোজিনীকে লইয়া আসিতেছেন, পথিমধ্যে অদূরে কান্নাগোল শুনিতে পাইলেন। বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় কে একজন বলিল খুঁকী আর নাই,তার মা উন্মাদিনী হয়ে আছাড় পাছাড় খাচ্চে, ৪।৫ জন মেয়ে তাঁকে ধরে রাখ্‌তে পাচ্চে না।" এমন সময় কেশব ও সরোজিনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সরোজিনী আসিয়া খুকীর বিছানার পাশে বসিলেন। খুকীর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন বুক্ ধুক্ ধুক্ করিতেছে, তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এখনও আশা আছে, রীতিমত চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা হলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। তিনি (থারমোমিটার) তাপমান যন্ত্র দ্বারা তাহার শরীরের তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তিনি ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া কেশবকে দিয়া বলিলেন "তুমি রমেশবাবুর ডিস্‌পেনসারি হ'তে শীগ্‌গির এই ঔষধটী আনিয়ে দাও।" কেশব ঔষধ আনাইয়া দিলেন। দুইবার ঔষধ খাওয়াইবার পর মেয়েটী যেন কতকটা বল পাইল, চক্ষু মেলিল, হাত পা নাড়িল, তখন সকলে মনে করিল, এ যাত্রা মেয়েটী রক্ষা পাইল।

এদিকে সরোজিনীকে জল খাওয়াইবার জন্য শান্তি তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। মেয়েটীর মা তাঁহার মেয়ের অবস্থা এখন ভাল দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। সরোজিনী তাঁহার মেয়েটীকে বাঁচাইয়া দিলেন, সুতরাং মনে মনে তাঁহাকে কত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, কতবার তাঁহার পাকা মাথায় সিঁদুর পরাইতে লাগিলেন, কত ঠাকুর দেবতার "ছলন" মানত করিতে লাগিলেন, কত পীরের "সিরণী" দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ফল কথা তিনি আজি তাঁহার মেয়ের অবস্থা ভাল দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিতা হইয়াছেন। হাজার হউক, মায়ের প্রাণ ত, সন্তানের মঙ্গল কামনায় মায়ের প্রাণ যে কিরূপ হয়, তাহা মা ব্যতীত আর কে জানিবে ?

আমি কে ?

আমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছি ? কোথায় যাইব ? কেন আসিয়াছি? কেন যাইব ? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার স্রষ্টা ব্যতীত আর কেহ সক্ষম নহেন। নিজ নিজ বিশ্বাস মত যিনি যেরূপ বলুন, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সেই অনাদি—অজ—জগৎস্রষ্টাই সক্ষম। আমি কোথা হইতে আসিয়াছি ? কোথায় যাইব ? কেন আসিলাম ? কেন যাইব ? আমি না আসলে জগতের কি কোন ক্ষতি হইত ? আমার আগমনে জগতের কোন উপকার কিম্বা অভাব পূরণ হইয়াছে কি ? বুদ্ধি ও তর্কের দ্বারা এই প্রশ্ন সমূহের উত্তর দেওয়া অন্ধকারে ঢিল মারা। যৌগিক, ভৌতিক ও প্রাকৃতিক সকল ঘটনার কারণ যখন সেই বিশ্বস্রষ্টা, তখন এই সব কূট প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর তিনি ব্যতীত আর কেহ কখনও দিতে সক্ষম নহে। আমরা "আমাকে" জানি না—চিনি না। অথচ "আমাকে" লইয়াই ব্যস্ত—এত ব্যস্ত যে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইতেও বিরক্তি বোধ করি। কেহ যদি আমার নিকট আমার কোন সুপরিচিত ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে—"ওহে ! তুমি অমুক ব্যক্তিকে চেন কি ?" আমি অমনি তাঁহার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বলি—"হাঁ আমি তাঁহাকে বেশ চিনি।" কিন্তু সে কি রকম চেনা ? নামমাত্র চেনা—চেহারা মাত্র চেনা। আমি যখন আমাকে চিনি না, তখন তোমাকে চেনা যে আরও কঠিন। যদিও আমরা "আমিত্ব" লইয়া ব্যস্ত থাকি, তবুও কি আমাকে জানি ? জানিব কি করে ?

আমি কি করিয়াছি, কি করিতেছি ও কি করিব যখন জানিনা, তখন "আমাকে" চেনা ত সহজ কথা নয়।

আমি কি করিয়াছি? আমি কি করিয়াছি তাহা আমি জানি না, সম্ভবতঃ আমাদ্বারা সদসৎ উভয় কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। অতএব আমি কি করিয়াছি তাহা যদি জানিতাম তবে আমাদ্বারা অসৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে কেন? এমন লোক অতি বিরল যাঁহাদ্বারা জীবনে একটীও অসৎ কার্য্য করা হয় নাই, এমন কি আমরা অনেক সময় এমন ভুলে পড়ি যে সৎ কার্য্য করিতেছি মনে করিয়া অসৎ কার্য্যের ফল গ্রহণ করি। মনুষ্য-জীবনে সুখশান্তি লাভ করা প্রায়ই ঘটে না, (ব্রহ্মজ্ঞানী, যোগী বা তত্তুল্য মহৎ ব্যক্তিগণের কথা বলিতেছি না) জগৎ সুখের জন্য ব্যস্ত —নিজের উন্নতির জন্য ব্যস্ত—জীবনের জন্য ব্যস্ত, সম্মানের জন্য ব্যস্ত, এক কথায় আমাকে লইয়াই ব্যস্ত।

"উন্নত হইব বলি নত হও আগে।
দুঃখের শৃঙ্খল পর সুখ অনুরাগে।
সম্মান রক্ষার হেতু হও হতমান।
জীবন রক্ষার হেতু দিতে চাও প্রাণ।"

এ উপদেশটীত সারগর্ভ, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারি কই? বাল্যাবধি ত তোতার মত পড়িয়াছি—গরুর মত শুনিয়াছি যে—কাহাকে কুবাক্য কহিও না, মিথ্যা কথা বলিওনা. ইত্যাদি, কিন্তু সে সমস্ত গ্রহণ করি কই? পরিহাস ছলেও ত দশটি মিথ্যা কথা না বলিলে দিনটী যায় না, শিক্ষা ও সঙ্গ জন্ম ইহার কমী বেশী হইতে পারে, কিন্তু একেবারে নির্ম্মূল হওয়া সুকঠিন। বাস্তবিক সর্ব্বপ্রকারে জিতেন্দ্রিয় না হইলে কেহ সত্যকে সম্যক্ রূপে আয়ত্ত করিতে পারেন না। নিসর্গের নিয়ম এই যে যে যাহা চায় সে তাহা পায় না, যে যাহা না চায় সে তাহা পায়। ইহার কারণ বোধ হয় অতি সহজেই মীমাংসিত হইতে পারে, কারণ যাহার যাহাতে অভাব সে তাহা চায়,আর যাহার যাহাতে অভাব নাই সে তাহা চায় না; ইহাই বোধ হয় "যে যাহা চায় সে তাহা পায়-নার" কারণ। ব্যাস, বাল্মীকি বশিষ্ট, পরাশর, কণাদ, পাতঞ্জল, বিষ্ণু, অত্রি প্রভৃতি মহাত্মাগণ যোগ, প্রচুর বিদ্যা, প্রভূত চিন্তাশীলতা, নির্জ্জন বাস ও দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়াও যখন সংসারের কূট প্রহেলিকার মীমাংসায় সম্যকরূপে উপনীত হইতে পারেন নাই, তখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তোমার আমার কা কথা? সংসারের কূট প্রহেলিকা আমরা জানিনা, বুঝিনা যখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল, তখন "আমি কি করিয়াছি" তাহাও জানিনা। আমরা যাহা করিয়াছি, যদিও তাহার ফল সেই কার্য্যের গুণ বাহির করিয়া দেয়, কিন্তু আবার অনেক সময় সেই ফল গা ঢাকা দিয়া অন্য কার্য্য দ্বারা প্রকাশ পাইয়া পূর্ব্ব কার্য্যকে সম্পূর্ণ গোপনে রাখে। অতিপরিশ্রম,

অলসতা, অতি ভোজন, অস্বাস্থ্যকর আহার, অথবা পিতৃ মাতৃ দোষের জন্য কাহারও শরীরটা একটু একটু করিয়া ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল, এমত সময় সেই ব্যক্তি একদিন অম্লরস একটু অধিক খাইয়া জ্বরগ্রস্ত হইলেন এবং সেই জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইল। এ স্থলে অম্লরস খাওয়াই তাঁহার জ্বর ও মৃত্যুর কারণ নির্দ্দিষ্ট হইবে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যে সকল কারণে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া মৃত্যু নিকটে আসিতেছিল, তাহা এ স্থলে ঢাকা থাকিবে, এই সকল ও অন্যান্য দুর্জ্ঞেয় কারণ সমূহের জন্যই বোধ হয় আমরা কি করিয়াছি তাহা জানি না।

আমি কি করিতেছি তাহাও জানি না, কেননা যখন—"জানামি ধর্ম্মং নতুমে প্রবৃত্তিঃ। জানাম্যধর্ম্মং নতুমে নিবৃত্তিঃ॥" আমি ধর্ম্ম জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, আমি অধর্ম্মও জানি, তাহাতে আমার নিবৃত্তি নাই। কিন্তু তার পর আবার সংসার সমুদ্রের ঘটনা-স্রোতে যে মনুষ্যকে কখন কোন্ দিকে লইয়া ফেলে, তাহাও মনুষ্যের দুর্জ্ঞেয়। যখন পলাশীক্ষেত্রে সিরাজের ও ক্লাইবের সৈন্য গণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে, তখন কি সিরাজ কল্পনায়ও বিদেশী বণিক ক্লাইবের জয় হইবে ভাবিয়াছিলেন —যখন রাজস্থানের রাজদল পরস্পর শত্রুতা করিয়া নিঃস্ব ও তেজোহীন হইতেছিলেন, তখনও সিন্ধিয়া ও হলকার মহারাষ্ট্রীদ্বয়ের তেজে রাজস্থান পুড়িতেছিল এবং ঐ বীরদ্বয় ইচ্ছা করিলে ভারত সাম্রাজ্য তাঁহাদেরই হইত, কিন্তু সমুদ্র পার হইতে ইংরেজ আসিয়া সেই ভারত রাজ্য অধিকার করিলেন! নেপোলিয়ন বোনাপার্টি এত যুদ্ধ জয় করিয়া—এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অবশেষে সেণ্ট-হেলেনায় বন্দীভাবে মানবলীলা শেষ করিবেন এ কথা কি তাঁহার শত্রুগণও পুর্ব্বে কল্পনায় আনিয়াছিলেন? মহারাজ অজিত সিংহ যিনি স্বীয় বাহুবলে শত্রু কুলের বিজেতা, তিনি তাঁহার বালক পুত্র নরাধম ভক্তের হস্তে প্রাণ হারাইবেন, তাহা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন? একদিন তাঁহার মহিষী ভক্তের নিকট অজিতকে সাবধান থাকিতে বলায় তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "মহিষি! ভক্ত আমার পুত্র, তায় আবার বালক; যে আমার একটী চপেটাঘাতে প্রাণ হারাইতে পারে, সে আমার কি করিবে?" এ কথাগুলি মহারাজ অজিত সিংহের বীরত্বের, নির্ভীকতার ও উদারতার যেমন উপযুক্ত, সম্ভব পক্ষেও তেমনি সত্য। এই সকল সম্ভব সত্যকে ঘটনা অসম্ভব ও বিপরীত আকারে পরিণত করে, মনুষ্যের সহস্র চেষ্টা এবং প্রাণগত যত্নও সে ঘটনা স্রোতকে রোধ করিতে পারে না। অতএব মনুষ্যের ইচ্ছা, চেষ্টা, ও যত্নেও যখন অনেক সময় বিপরীত ফল দাঁড়ায়,

তখন আমি করিতেছি তাহা কি করিয়া জানিব ?

আমি কি করিব ! তাহাও আমি জানিনা, জানা মনুষ্যের সাধ্যও নয়। মনুষ্যকে ঘটনা-স্রোত কোথায় কি কার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহা সামুদ্রিক বিদ্যাসম্পন্ন ভবিষ্যৎদর্শীরাও বুঝিতে পারেন না। কথিত আছে পণ্ডিতবর বরাহ ১০০ শত বৎসর পরমায়ু পুত্রকে ১০ বৎসর বাঁচিবে বলিয়া তাম্রের হাঁড়িতে করিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, রাজা দশরথ অভিষেকের জন্য সমস্ত আয়োজন করিলেন, ফল দাঁড়াইল সেই পুত্রের বনেবাস ও নিজের মৃত্যু। অতএব কি যে করিব, তাহাত ভবিষ্যতের গর্ভবাসে নিহিত। তাই যখন আমি কি করিয়াছি, কি করিতেছি ও কি করিব তাহা জানিনা, তখন আমি কে ? ইহার উত্তর বিশ্বপাতা ব্যতীত কে দিবেন ? আমি ইচ্ছামত কিম্বা কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুকূলে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি বা না পারি, বিশ্বাস করিতে হইবে যে—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥" কেননা "আমি ইহা করিয়াছি" "উহা করি নাই" এরূপ ভাবিবার আমি কে ? "I am the straw in the hands of my Maker. He does his will witha straw as with a mountain." আমি সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তে একগাছি তৃণ, তিনি পর্ব্বতকে লইয়া যেমন তৃণকে লইয়াও সেইরূপ ইচ্ছামত ব্যবহার করেন।

কুঃ রা।

দ্বাদশকন্যা (পারিবারিক গল্প)

একদা সে শয়তান—নরকাধিপতি
বিবাহ করিতে তার উপজিল মতি।
অপার সাম্রাজ্য—নাহি রাজ্যে অভিলাষ,
বড় সাধ ভার্য্যা লয়ে করে সুখে বাস !
দেখিল স্বরাজ্য খুঁজি রাজলক্ষ্মী তার
নাহি মিলে,যোগ্য পাত্রী কোথা পাবে আর?
অবশেষে নরলোকে করি আগমন,
লভিলা মনের মত রমণী-রতন !
মনুজ-দুহিতা মাঝে অধর্ম্ম রূপসী
লভিয়া নরকনাথ কতই না খুসি !
মহাসুখে বহুকাল করিয়া কর্ত্তন,
পত্নীসহ দেশে যেতে করিল মনন।
স্বদেশে, না গেলে নয়-বড় অমঙ্গল !
কে সাধিবে রাজা বিনে রাজ্যের কুশল ?

। ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

দুহিতার সদুপায় না করি, ভবনে—
যাইবে সুবিজ্ঞ পিতা সম্ভবে কেমনে ?
বারটী বালিকা রাজা বড় ভাগ্যবান,
একে একে সকলের করিলা সংস্থান।
প্রথম তনয়া দুষ্টা আকাঙ্ক্ষা প্রবল,
ধনীর সন্তানে বরি বাসনা সফল।
দ্বিতীয় তনয়া তার-ধনলিপ্সা নাম,
কৃপণেরে বরি বামা পূর্ণ মনস্কাম।
তৃতীয় তনয়া নাম-পাশব প্রকৃতি
মদ্যপ ইতরাচারী হন প্রাণপতি।
চতুর্থ তনয়া হিংসা-মধুরভাষিণী,
শিল্পীরে সঁপিলা প্রাণ-চাতুরী বাখানি !
পঞ্চম তনয়া কিবা রূপসী-ছলনা,
চাটুকার বিনা কারে বরিবে ললনা ?
ষষ্ঠ কন্যা বিলাসিতা-পরমারূপসী,
সাজ সজ্জা দেখে শুনে সেনার প্রেয়সী।
সপ্তম তনয়া তার-দরিদ্রতা নাম,
কেরাণীর গৃহলক্ষ্মী ছাড়েনা সে ধাম।
অষ্টম তনয়া নাম অন্যায়-বিচার,
বিচারকে বরি সদা আনন্দ অপার !
নবম তনয়া নাম-অমিত আচার,
বরিলা যুবকে যেবা লুটায় সংসার,
বিপুল পৈতৃক ধনে হয়ে অধিকারী ;
সম্বৎসরে সর্ব্বস্বান্ত পথের ভিখারী!
দশম তনয়া তার নিষ্ঠুরতা নাম,
বরিলা পুরুষজাতি-কারে হবে বাম ?
বৃথা গর্ব্ব প্রতিহিংসা অবশিষ্ট দুটী,
নিরুপায় একি দায় কোথা পাবে যুটী ?
নাহি মিলে বর-পিতা ভাবি চিন্তি পরে
সঁপে দিলা রক্ষণার্থ রমণীর করে !
বহুদিন গত নিজ প্রণয় ভাজন—
অযোগ্য বলিয়া কেহ করেনি বর্জ্জন ;
অথবা ভোলেনি কেহ 'আদিম স্বভাব'
যে যে গুণ পিতা হতে করিয়াছে লাভ ॥

প্রশ্নোত্তর।

আমার কোনও শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয় আমাকে নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি নিজজ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিলাম, তাহাই উত্তর লিখিলাম।

১ম প্রশ্ন। ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম ?

১ম উত্তর। আমি যে ধর্ম্মে বিশ্বাসী আমার কাছে সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম ; সেই রূপ যিনি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহার কাছে সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম।*

২য় প্র। কোন্ নীতি সর্ব্বাগ্রে শিক্ষণীয় ?

২য় উ। ইন্দ্রিয়সংযম।

* এই প্রশ্নটীর প্রকৃত সদুত্তর দেওয়া কঠিন। লেখিকা বিশ্বাসের সম্মান করিয়া তাহার সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সুবিচারের নিকটে এ মত রক্ষা পাইবে কি না, সন্দেহ। নরহত্যা, পরস্বাপহরণ, ব্যভিচার প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়াও সময় সময় লোকে ধর্ম্ম বিশ্বাসে ও ধর্ম্মের নামে করে, সেগুলি কুসংস্কার ও বিশ্বাসের বিকার। যে ধর্ম্মে সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের সত্যভাব জীবনে যত পরিস্ফুট হয়, সেই ধর্ম্মকেই তত শ্রেষ্ঠ বলা যায়। শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম খৃষ্টের কথায় "ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হওয়া", প্রাচীন ঋষির কথায় "আত্মক্রীড় আত্মারতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।"

বা, বো, স।

৩য় প্র। প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা তাহার পিতার সহিত কিরূপে কথা বার্ত্তা বলিবে ?

৩য় উ। মেয়ে বড় হইলে বাবার কাছে হাসিবে, গল্প করিবে, যাহা শিখিতে ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করিবে ; বাবার কাছে দাঁড়াইলে মেয়ের হৃদয়ে যে ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে, তাহারই শক্তিতে মেয়ে যে রকম ইচ্ছা সেই রকম কথা বলিবে। নয় তো কেবল হেঁট মুখে যোড়হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলে—ছিছি, মনে হইবে "বাবা উঠিয়া গেলেই বাঁচি" !

৪র্থ প্র। পিতা যদি কোনও অন্যায় কাজ করেন, সন্তান তাহার প্রতিবাদ করিবে কিনা ?—যদি প্রতিবাদ করিতে হয়, তাহা হইলে কি ভাবে করা যায় ?

৪র্থ উ। বাবা কোনও অন্যায় কাজ করিতেছেন, আমি সন্তান তাহা বুঝিয়াও যদি দুটো গালির ভয়ে তাহা না বলি, আমার স্বার্থপরতার জন্যে যদি বাবার নৈতিক ক্ষতি দেখিয়া তাঁহাকে সতর্ক না করি, তবে আমার সন্তানত্বে শতধিক্ ! "দোষাবাচ্যা গুরোরপি"—কিন্তু সে প্রতিবাদের ধরণটা স্বতন্ত্র। আমি গলায় কাপড় দিয়া বাবার পদতলে বসিয়া দু হাত যোড় করিয়া বলিব "বাবা, একাজ ভাল হয় নাই, এরকম কাজের ফল এই রকম মন্দ হইতেছে" তার পর বাবা যাহাই বলুন। বাবা দৃষ্টান্ত, গুরুজন মাত্রেরই প্রতি এইরূপ ব্যবহার প্রযোজ্য।

৫ম প্র। যাহাকে ভালবাস, সে কিরূপ ব্যবহার করিলে তোমার হৃদয় ভগ্ন হয় ?

৫ম উ। কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিলে।

৬ষ্ঠ প্র। বন্ধুত্বের প্রধান উপকরণ কি ?

৬ষ্ঠ উ। সরলতা ও বিশ্বাস।

৭ম প্র। সৌন্দর্য্য কি ?

৭ম উ। প্রীতি।

৮ম প্র। সর্ব্বাপেক্ষা শত্রু কে ?

৮ম উ। কপট বন্ধু।

৯ম প্র। সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল কে ?

৯ম উ। যে কুপ্রবৃত্তি কর্ত্তৃক চালিত হয়।

১০ম প্র। কোন্ কোন্ ঋতু সর্ব্বাপেক্ষা মধুর।

১০ম উ। ঘরে থাকিতে হইলে বর্ষা, বাহিরে যাইতে হইলে বসন্ত।

১১শ প্র। মানবের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য কি ?

১১শ উ। শরীর, মন ও আত্মার উন্নতি সাধন।

১২শ প্র। বিধবা রমণীর ব্রহ্মচর্য্য সুসাধিত হয় কিসে ?

১২শ উ। আত্মসংযম অভ্যাস করিতে পারিলে।

১৩শ প্র। পুরুষ, ভার্য্যার বন্ধ্যাত্ব ঘটিলে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবে কি

না? না করিলে জনসমাজ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইবে কি না?

১৩শ উ। স্ত্রী জীবিতা থাকিতে কোনও ক্রমে পুরুষ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবেন না। কেবল সন্তান হওয়াই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। দম্পতীর কর্ত্তব্য অনেক উপরে। বন্ধ্যাত্ব ক্বচিৎ ঘটে, বালিকা বিধবাদিগের পুনঃসংস্কারের দ্বারা লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। বালিকা বিধবা ক্বচিৎ ঘটে না।

১৪শ প্র। দাম্পত্য "শাসন" কাহাকে বলে?

১৪শ উ। "আমি কখনই কোনও মন্দ কাজ করিতে পারিব না, তাঁহার প্রাণে বাজিবে" স্বামী স্ত্রী এই কথা ভাবিয়া বিন্দু মাত্র অন্যায় হইতেও প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার নাম "দাম্পত্য শাসন"।

১৫শ প্র। দাম্পত্য সম্মান কিরূপ?

১৫শ উ। "সকল রমণীর মধ্যে আমার ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতম" আর "সকল পুরুষের মধ্যে আমার স্বামী শ্রেষ্ঠতম" দম্পতী এই রকম মনে করেন; ইহাকেই "দাম্পত্য সম্মান" বলা যায়।

১৬ প্র। কিরূপ লোকের নিকটে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য?

১৬শ উ। হিংসুক এবং নিন্দুক।

১৭শ প্র। বিধবা রমণীর জীবনের নেতা কে?

১৭শ উ। প্রথম ঈশ্বর, দ্বিতীয় বিবেক, তৃতীয় ইশ্বরের বিশ্বাসী সন্তান, এই তিন জনই বিধবা রমণীর জীবনের নেতা।

১৮শ প্র। সপত্নীভাব ভগ্নীভাবে পরিণত হইতে পারে কিসে?

১৮শ উ। প্রধানতঃ * তিন উপায়ে। সপত্নীরা উভয়ে দাম্পত্য প্রণয়ে অনভিজ্ঞা হইলে। কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত স্বামীর পত্নী হইলে। আর (জগদীশ্বর না করেন) বৈধব্য উপস্থিত হইলে।

১৯ প্র। স্বামী যদি দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেন, তাহা হইলে প্রথমা স্ত্রী কি করিবে?

১৯ উ। নদীতে গিয়া কলসী সহযোগে বৈতরণী পার হইবে—তাহার ইহাই ব্যবস্থা—অন্ততঃ আমার শাস্ত্রে। আমি যদি মনু পরাশর প্রভৃতির সময়ে জন্মিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ত দিয়া হিন্দু শাস্ত্রে এই কথাই লিখাইয়া রাখিতাম। বহুবিবাহ পক্ষসমর্থনকারী মহাত্মারা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন।

* বলা বাহুল্য শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবুর দেবী চৌধুরাণী সহজ প্রাপ্য নহে।

পড়িয়া ছড়ায়ে।

পড়িয়া ছড়ায়ে জগতের মাঝে,
দিবানিশি ঘুরি সদা মিছে কাজে,
ওগো, আপনে আনিতে আপনার মাঝে,
কি করে পারিব হায়!
দেখ, হইল রজনী আসে বিহঙ্গম,
আপনার নীড়ে নাহি ব্যতিক্রম,
এ, জীবন তামসী ফিরি দশদিশি,
কেন আবাসে মন না চায়!
কাঁদিছে 'দ্বিদল' শূন্য 'শতদল'
না জানি কি গুণ ধরে ভূমণ্ডল।
হায়, নীর ত্যজে ক্ষীর, জিবেনা মরাল,
নাজানি কি তবে চায়!
(সদা শূন্য সরসীতে ধায়!)

বেদনা বা দুঃখ।

জমাট অশ্রুর স্তুপাকার!
প্রাণের নীরব হাহাকার!
যৌবনের অতৃপ্ত বাসনা!
স্বরচিত কবির কল্পনা।
বিরহীর মৃত প্রিয় স্মৃতি!
প্রতিদানে নিরাশিত প্রীতি!
জ্ঞানকৃত পাপের স্মরণ!
হত্যাকারী আত্মসংগোপন।
অজ্ঞানের প্রাণহীন তাপ!
প্রকৃত বন্ধুতা অপলাপ!

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

সংরক্ষিত ফল।

আমেরিকানেরা এক অপূর্ব্বকৌশলে পক্ক ফল সকল টিনের পাত্রে অবিকৃত রাখিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র রপ্তানি করিতেছে। আধারে নিহিত ফল যতদিন ইচ্ছা অবিকৃত থাকে, ইহাতে স্বাদের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। কথিত আছে যে যে প্রক্রিয়াযোগে এরূপে ফল সংরক্ষিত হয়, আমেরিকাবাসিরা তাহা পম্পে নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে শিক্ষা করিয়াছে। বহুদিবস হইল একদা প্রথিত পম্পে নগরের স্থান বিশেষ খনন করিতে করিতে কতকগুলি বৃহৎ জালা আবিষ্কৃত হয়। তাহাদের মুখ একেবারে আবদ্ধ ছিল। খুলিয়া ফেলিলে উত্তম 'ফিগ' ফল সকল দৃষ্ট হইল। ইহা অবিকৃত ও তাজা রহিয়াছে। পম্পে নগর অনেক শতাব্দি পূর্ব্বে ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু ফলগুলি অদ্যাপিও অবিকৃত আছে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। এই সময় সিনসিনাটী বাসী কয়েক জন

আমেরিকান উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা জালাসকল পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে ফল সকল উত্তপ্ত জালা মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ধূম উদ্গমনের একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রও দৃষ্ট হইল। ঐ ছিদ্র দিয়া সমস্ত ধূম নির্গত হইলে তাহা গালাদিয়া একবারে বদ্ধ করা হইয়াছিল। সুতরাং ফল অবিকৃত ও তাজা আছে। সিনসিনাটীর লোকেরা ইহা দেখিয়া স্বদেশে এরূপ কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে। তদবধি আমেরিকানেরা এইরূপে ফল সংরক্ষিত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবসায় চালাইতেছে।

পার্শিজাতির উপাস্য দেবতা।

পার্শিরা সকলেই অগ্নিপূজক, তাহাদিগের উপাস্য দেবতা ভেদে তাহারা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী বিহিরাম, দ্বিতীয় শ্রেণী অদরণ, তৃতীয় শ্রেণী দদগণ নামে অভিহিত। দদগণের পূজায় যে ব্যয় হয়, বিহিরামের পূজায় তদপেক্ষা ত্রিশগুণ ব্যয় ও আয়োজন হইয়া থাকে। বলসারের নিকটবর্ত্তী উদয়াদা গ্রামে বিহিরাম অগ্নি দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। দ্বাদশ শতাব্দ অতিবাহিত হইল, যখন পার্শিরা প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, সেই ঘটনা স্মরণার্থ এই অগ্নি সংরক্ষিত হয়। পুরোহিতেরা বলেন এই অগ্নি রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া পার্শিরা নির্ব্বিঘ্নে ভারতবর্ষে পৌছিয়াছিল। দিবারাত্রিতে পাঁচবার নিয়মিত সময়ে ইহাতে সচন্দন ইন্ধন প্রদত্ত হইয়া থাকে। হোমের ন্যায় মন্ত্র সমেত আহুতি প্রদান করিতে হয়। বিহিরামের অব্যবহিত নিম্নেই অদরণ অগ্নি। ১৭৩৩ খৃষ্টঅব্দে মাণিকজী নোরেজি অনেক অর্থ ব্যয়ে বোম্বাই নগরে ইহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরটি পুরাতন হওয়াতে পূর্ণ সংস্কারের প্রয়োজন হয়। কিছুদিন হইল জলভাই আদিসিয়ার লক্ষটাকা ব্যয়ে ইহার সংস্কার কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। ইহার অগ্নি একটী প্রকাণ্ড রৌপ্যাধারে সংরক্ষিত, তাহার মূল্য প্রায় ৭০০০ টাকা। মন্দিরের যে কক্ষে ইহা প্রতিষ্ঠিত, তথায় যাজক বা তাহার সহকারি ব্যতীত কাহারও যাইবার অধিকার নাই। মন্দিরের সংস্কার সময়ে ইহা স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও অপর ব্যক্তির নিকটে যাইবার অনুমতি ছিল না। বংশ পরম্পরা পুরোহিতগণ কেবল ইহার যাজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। জলভাই, মাণিকজীর অষ্টম পুরুষজাত। সংস্কারান্তে মন্দিরের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দিবসে নিয়মিত পূজা হোম অন্তে পার্শিদিগের মধ্যে মহাভোজ হইয়াছিল। রজনীতে মন্দিরটী আলোক-মালায় পরিশোভিত হয়।

বিশ্বসেবাব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

রোগীর সুস্থতার জন্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষা দুইই আবশ্যক বটে, এবং উক্ত দুই কার্য্য একের দ্বারা সুসম্পন্ন হইবারও সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু যেমন শুশ্রূষাকারিণী জ্ঞানবুদ্ধিহীন, স্নেহমমতাশূন্যা, অধৈর্য্যা ও নিন্দনীয় চরিত্রের হইলে সুচিকিৎসকেরও চিকিৎসার সমূহ ব্যাঘাত হয়—এমন কি সময় সময় তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়; তেমনি তুমিও অসুস্থদেহ, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য যতই কেন প্রাণপণে চিকিৎসা কর না, তোমার সহকারিণী বিশ্বের শুশ্রূষাকারিণী যদি গুণহীনা হয়েন, তাহা হইলে তোমার কার্য্যও অত্যন্ত প্রতিবন্ধকময় ও নিতান্ত বিফল হইবে সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি অগ্রে সহকারিণীকে উপযুক্ত কর, তৎপরে বিমল সুখকর বিশ্বসেবাব্রতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এক্ষণে কথা হইতেছে কোন্ অবস্থায় স্ত্রীলোকগণ বিশ্বসেবা ব্রতের সহকারিণী হইবার বিশেষ উপযুক্তা? আমরা বলি এদেশীয় অবীরা বালিকাগণ ও সকল দেশীয় চিরকুমারীগণই বিশ্বসেবা ব্রতের প্রকৃত সহকারিণী হইবার যোগ্যা। এদেশীয় বিধবা বালিকাগণ যদি আপনারা সম্যক্ প্রকারে উপযুক্ত হইয়া বিশ্বসেবাব্রতের সহকারিণী হইতে পারেন, তাহাহইলে যে তাঁহাদের হৃদয় পুণ্যময় হইয়া এক উচ্চতর বিমল আনন্দে পরিপূরিত এবং তাঁহাদের জীবন সংসারাতীত স্বর্গীয় ভাবের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্থল হইয়া সহস্র সহস্র সংসারাসক্ত নরনারীর প্রাণকে চমকিত, বিলোড়িত ও উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাঁদিগকে সহকারিণী করিলে—সার্থক-জন্মা বিশ্বসেবা ব্রতধারীও আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিয়া মনোবাসনা সিদ্ধ করিতে পারিবেন।

আবার বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতা মহিলাগণ পূর্ব্ব প্রচলিত ব্রত নিয়মাদি কুসংস্কারসংসৃষ্ট বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এ সময়ে যদি তাঁহারা বিশ্বসেবাব্রত অবলম্বিনী কিম্বা বিশ্বসেবা ব্রতের সহকারিণী না হইবেন, তবে তাঁহারা কি হিতানুষ্ঠান লইয়া মনুষ্যজীবন সার্থক করিবেন? মার্জ্জিতবুদ্ধি সুশিক্ষিত নর নারীর কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা কোন মন্দ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সেই শূন্য স্থান ভাল বিষয় দ্বারা শীঘ্র পূর্ণ করিয়া ফেলেন, নতুবা সেই শূন্যস্থান নৈসর্গিক নিয়মানুসারে অচিরে আর একপ্রকার মন্দ বিষয়ে পূর্ণ হইয়া পরিতাপের কারণ হইবে। কেবল অসত্যকে

তাহাইলে কি হইবে, যদি না সত্যের রাজসিংহাসন চিরদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পার! প্রাচীনারা আহ্নিক পূজা ও ব্রতাদি নিয়মের অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিয়া কেমন সাত্ত্বিক ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন! বর্ত্তমানের শিক্ষিতা মহিলাগণ যদি ভূমা ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা ও মনুষ্য জীবনের মহৎ কর্ত্তব্য-বিশ্বসেবাব্রত পালন না করিয়া কেবল বিলাসিতা এবং বসন ভূষণের অভিনবতর ফ্যাসন উদ্ভাবনের প্রসঙ্গ লইয়াই জীবনের অধিকাংশ সময়টা কাটাইয়া দেন, তাহা হইলে নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। মনুষ্য জীবনে হিতানুষ্ঠান নিতান্তই আবশ্যক। হিতানুষ্ঠানবিহীন জীবন কি—জলহীন নদী, ফলহীন তরু, মাতৃহীন শিশু, সন্তানহীন নারীক্রোড়ের ন্যায় শোচনীয় নহে? যথাসাধ্য বিশ্বসেবাব্রত পালন না করিলে ধর্ম্ম সাধন সম্পূর্ণ হয় না, কেবল মাত্র ঈশ্বরারাধনায় ধর্ম্মের অর্দ্ধাঙ্গমাত্র সাধিত হয়। হিতব্রতশূন্য হৃদয় সত্যশূন্য জ্ঞান, নিঃস্বার্থতাশূন্য প্রেম, কর্ম্মশূন্য দেহ, উন্নতচিন্তাশূন্য মনের ন্যায় একান্ত সৌন্দর্য্যবিহীন ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও অসার্থক। তাই সানুনয়ে বলিতেছি—হে বিশ্বসেবাব্রত পথের পথিক মহাত্মগণ! নারীগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না, বিশেষ পবিত্রহৃদয়া দুঃখিনী বালবিধবা ও পূতচরিত্রা নিঃস্বার্থহৃদয়া কুমারীগণকে কখনই পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। শ্রদ্ধাসহকারে ঐকান্তিক ইচ্ছার সহিত তাঁহাদিগকে সহকারিণী নিযুক্ত করিবেন।

বিশ্বসেবার ন্যায় শান্তি রসাস্পদ পুণ্যময় আত্মপ্রসাদজনন কার্য্য আর কি আছে? এ পৃথিবীতে নিজের জন্য চিন্তা ও পরিশ্রম সকলেই করিয়া থাকে, কিন্তু এই চিন্তা ও পরিশ্রমের ব্যাপকতানুসারে তাহারা গৌরবান্বিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিঃস্বার্থ ভাবে যিনি যত বেশী লোকের জন্য শারীরিক কিম্বা মানসিক শ্রম করেন, তাঁহার শ্রমের মূল্য তত অধিক। যাঁহার যতটুকু শারীরিক কিম্বা মানসিক শ্রমের ব্যাপ্তি, তাঁহার ততটুকু বিশ্বসেবাব্রত পালন করা হয়। নর নারীর মধ্যে যিনি প্রাকৃতিক জ্ঞানে ভূষিত হইয়া হৃদয়কে উচ্চতর ও প্রগাঢ়তর ঈশ্বরপ্রীতির আধার করিয়াছেন, এবং যথাসাধ্য বিশ্বসেবারূপ মহাব্রত সাধন করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হওয়া যাঁহার স্থির সংকল্প, তিনিই ধন্য, তাঁহারই জীবন সফল, তিনিই বিমল শান্তিতে পূর্ণ হইয়া সুখে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিবেন।

নারীগণকে বিশ্বসেবার সহকারিণী পদে নিযুক্ত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং স্ত্রীলোকেরও সহকারিতা করিতে প্রস্তুত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, কিন্তু হে

বিশ্ব-সেবক মহাত্মাগণ! তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে উপযুক্ত না দেখিলেও পবিত্র মহৎ কার্য্যের অনধিকারিণী মনে করিবেন না। সূর্য্য প্রথমে সলিলকণা সকলকে উচ্চ বিমান পথে লইয়া যায় বলিয়াই তাহারা অসীম আকাশ ও মুক্ত বায়ুর সহযোগে সম্যক্ প্রকারে প্রশস্ততা ও নির্ম্মলতা লাভ করিয়া শেষে জড় উদ্ভিদ্ এবং প্রাণিরাজ্যের অশেষ মঙ্গল সাধনের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। নারীগণকে যদি না প্রথমে জ্ঞান ধর্ম্মের উচ্চ প্রদেশে লইয়া যাওয়া হয়, তাঁহারা কখনই সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে আনন্দমনে বিশ্বসেবায় মনোযোগিনী হইতে পারিবেন না। কিন্তু যদি তাঁহাদিগকে প্রথমে জ্ঞানরূপ বিশালতাময় আকাশ মার্গে, ধর্ম্মনীতিরূপ সুশীতল প্রমুক্ত মারুতহিল্লোলে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই হৃদয়ের নীচতা ও সংকীর্ণতা দূর করিতে পারিবেন; এবং হৃদয়ের প্রসরতা ও গভীরতা লাভ করত মনুষ্যের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতি প্রণোদিত হইয়া অনায়াসেই বিশ্বসেবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হইবেন। তখন বিশ্বজনীন প্রেমে পূতহৃদয় হইয়া বিশ্বের কল্যাণের জন্য আনন্দিত চিত্তে ধন জন মন সকলই সমর্পণ করিবেন—এমন কি আবশ্যক হইলে দুর্ল্লভ জীবন পর্য্যন্তও অকাতরে বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ধন্য সেই দেহ মন, ধন্য সেই ধন জন, ধন্য সেই প্রিয় জীবন, যাহা পর হিতের জন্য অকাতরে ব্যয়িত হয়!!

বাঙ্গালা প্রবচন।

(৩২৬ সংখ্যা ৩৪৩ পৃষ্ঠার পর)

ধ

১। ধন জন গৌরবের গর্ব্ব কর মন,
   জাননা নিমেষে কাল করিবে হরণ

২। ধন দিয়ে মন বুঝে,
   যৌবন দিয়ে আক্কেল বুঝে।

৩। ধনে সুখ নয় কিন্তু সুখ হয় মনে।

৪। ধর কাছি ত ধরে আছি।

৫। ধরাকে সরা জ্ঞান।

৬। ধরে মাছ না ছোঁয় পানি।

৭। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

৮। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ।

৯। ধর্ম্মের কল বাতাসে চলে।

১০। ধর্ম্মের ঘরে কুটের অভাব নাই।

১১। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।

১২। ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে।

১৩। ধর্ম্মের ঘরে পাপ সয় না।

১৪। ধর্ম্মের ষাঁড়।

১৫। ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।

১৬। ধান্ ভান্তে শিবের গীত।

১৭। ধার ক'রে হাতী কেনা।

১৮। ধাইয়ের কাছে কোঁক ছাপা।

১৯। ধারে কাটে, আর ভারে কাটে।

২০। ধুবড়ীর ভিতর খাসা চাল।

২১। ধূলা মুটা ধর্ তে কড়ী মুটা (বা সোণামুটা) হয়।

২২। ধোবার গাধা ভাতের কাটি বয় না।

প্যানেমার খাল।

১৫১৩ খৃষ্টাব্দের ২৫এ সেপ্টেম্বর তারিখে ভাস্কো নিউনেজ ডিবল বোয়া প্রথমে প্রশান্ত সমুদ্র ভ্রমণে যাত্রা করেন। সেই সময় হইতে এই খাল কাটিবার কথা হয়। অনেকে ভাবেন ইহা একটি নূতন কথা। ডি লেসেপ্ সোএজ খাল কাটিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, প্যানেমার খাল কাটার প্রস্তাব তিনিই প্রথমে উত্থাপন করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী হইতে যখন কথা চলিতেছে, তখন কেমন করিয়াই বা প্রস্তাবটিকে নূতন বলি? আণ্টনিও গ্যানভাজ নামে পর্ত্তুগিজ নাবিক নিকারেগুয়া হ্রদ দিয়া একটি ও প্যানেমা দিয়া আর একটি খাল কাটিবার কথা তুলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে স্পেনরাজ তৃতীয় চার্লস যোজক দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশার্থে ম্যানুএল গ্যালিসট্রো নামক কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে কতিপয় পোতসহ প্রেরণ করেন। এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্যারণ হমবোল্ট স্থানটি পরিদর্শন করিয়া খাল কাটার ব্যাপারটি সাধ্যায়ত্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। ১৮২৬ সালে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যই এ বিষয় প্রথমে যত্ন ও মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করেন। সে যাহাহউক এখন বিবেচিতব্য, কোন্ ব্যক্তি কার্য্যতঃ প্যানেমার খাল কাটিবার প্রথম উদ্‌যোগ করেন? ইনি সম্ভবতঃ ফরাসী নাবিক লেপ্‌টেনেণ্ট লুসিয়ান নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট ওয়াইজ। ইনি যোজক দর্শন-পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া মুসে কার্ডিস্তাল্ড ডি লেসেপের সহিত যোগদান করিয়া এক কোম্পানী সংগঠন করেন। খালে বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া তাঁহার মত লোক এমত দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। নানা প্রকার প্রতিবন্ধক হইতেছে, লোকে এমন কি হাস্য পরিহাসও করিতেছেন, কিন্তু লেসেপের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবার নয়; প্রত্যুত বাধা পাইয়া ইহা উত্তরোত্তর আরও প্রোৎসাহিত হইতেছে। খাল কাটা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত

প্রতিবন্ধক গুলি উপলব্ধি করিতে হইতেছে ;—(১) বর্ষাকালে বন্যা ; (২) বড় বড় দুর্ভেদ্য শিলাময় শৈলরাজি ; (৩) যোজকের জলবায়ুর অপকারিতা ; (৪) সমুদ্রসমতলের পার্থক্য। সাড়ে একুশ (২১½) ক্রোশ কাটিতে হইবে, তাহাতে আবার এই সকল প্রতিবন্ধক। মে হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এখানে ভয়ানক বৃষ্টি হইতে থাকে। গড়ে বৎসরে ১১৯ ইঞ্চ বৃষ্টি পড়ে। স্থানটি অতিশয় অস্বাস্থ্যকর, এখানে যাহারা কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে চীন বেশী, য়ুরোপীয় তদপেক্ষা কম, সর্ব্বাপেক্ষা কম নিগ্রো। হাঁসপাতাল সংস্থাপিত হইয়াছে, তথাপি পীড়ার বিশেষতঃ ম্যাবা জ্বরের প্রাদুর্ভাব কমে নাই। কতদূর কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পাঠক পাঠিকাবর্গকে জ্ঞাত করিতে হইলে সংক্ষেপে বোধ হয় এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এ পর্য্যন্ত ১৮০ ভাগের একভাগ মাত্র কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং তুলনা করিয়া বলিতে হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কার্য্য কিছুই হয় নাই। কিন্তু লেসেপের প্রতিজ্ঞা পরাভূত হইবার নয়, তিনি যে কার্য্যে হাত দিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। একার্য্য যে তাঁহা-দ্বারা সংসাধিত হইবে, ইহাতে আমাদের বিশ্বাস আছে।

কুরুক্ষেত্র পর্য্যটন।

(৩২৫ সংখ্যা ৩১৩ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রামহ্রদ অতি প্রাচীন তীর্থ। সত্যযুগে ইহাকে ব্রহ্মসর বলা হইত। ভগবান্ পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া যখন কৃত কর্ম্মের আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন আপনাকে নরঘাতী ভীষণ পাপাত্মা জানিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ব্যবস্থাপ্রার্থী হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মসরে স্নান করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইল। তিনি তদনুসারে এই সরে স্নান করিয়া নরহত্যাদি মহাপাতক হইতে মুক্তি পান। তিনি, পাপ ভার স্খলিত হইলে, মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় নামে সরের নাম পরিবর্ত্তিত করিলেন। তদবধিই ইহাকে রামহ্রদ বলা হইয়া থাকে। এখানে স্নান করিলে সপ্তপাপ ধৌত হয়, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন স্নানের মাহাত্ম্য পুরাণে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে নাই—অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় ও সশরীরে স্বর্গ লাভ। আমাদের ভাগ্যে শেষোক্তটী ঘটে নাই, বোধ হয় কিছু অধিকক্ষণ থাকিলে জলের

গুণে ও কচ্ছপের অনুগ্রহে সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। তবে দারুণ আষাঢ় শ্রাবণ মাসের বেলা দ্বিপ্রহরে পঞ্জাবের প্রচণ্ড রৌদ্রে কুরুক্ষেত্র মহাপ্রান্তরে যে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা নিশ্চয়ই প্রথমটীর ফলে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মসর, রামহ্রদ ব্যতীত ইহার আরও দশটী নাম আছে। তাহাদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এ স্থলে অনাবশ্যক বোধে উপেক্ষিত হইল। হ্রদের বা কুণ্ডের এক কোণে নানকপন্থীদিগের একটী মঠ আছে। গুরুগোবিন্দের শিষ্য গোঁড়া জাঠেরা পঞ্জাবে প্রধান প্রধান হিন্দুতীর্থের নিকট আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সদুপদেশ দ্বারা প্রমাদী নর নারীদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। বৃন্দাবন ও মথুরার ন্যায় এখানেও কচ্ছপের যেমন, সেইরূপ বানরেরও উপদ্রব অল্প নহে। আমাদিগকে বস্ত্র ও উপানৎ বহু সতর্কে রক্ষা করিতে হইয়াছিল। স্নানাদি সমাপন করিয়া নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। নিকটেই সেখ জিল্লির মোকবরা। হিন্দু তীর্থের নিকট মুসলমানের মসজিদ সংক্রামক।

স্থানেশ্বর ইতিপূর্ব্বে একটী জনপূর্ণ মহানগর ছিল। এখানে প্রায় ৩০ সহস্র লোকের বসতি ছিল। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিলে ইহার অতীত গৌরবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষণে ছয় সহস্র লোকের অধিক বসতি নাই। অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা লোক ও সংস্কারাভাবে পতিতপ্রায়। স্থানে স্থানে প্রশস্ত রাজপথ ও সুন্দর সুন্দর উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে সরকারী কার্য্যালয় সকল থাকাতে কতকটা জনপূর্ণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা স্থানান্তরিত হওয়াতে লোক সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে—প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়াই এখনও জনশূন্য হয় নাই। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেনকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে। ইহা স্মৃত্যুক্ত যজ্ঞীয় দেশের অন্তর্গত। আদিম আর্য্য জাতি প্রথমেই এই স্থানকে বসতির উপযুক্ত বোধে মনোনীত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর্য্যাবর্ত্ত, মধ্যদেশ ও ব্রহ্মবর্ত্তও তাঁহাদিগের বাসস্থান ছিল, সুতরাং এই সকল দেশ কেবল যজ্ঞীয় দেশ নামে অভিহিত হইত। যজ্ঞীয় দেশের প্রধান লক্ষণ-যথায় যজ্ঞের উপযোগী কৃষ্ণসার মৃগ সকল বিচরণ করে। ইহার বহির্ভাগস্থ সমস্ত দেশই ম্লেচ্ছ দেশ। এক্ষণে সেই যাগযজ্ঞপরায়ণ আর্য্যজাতি নাই, যজ্ঞীয় দেশও নাই। ভারতের সর্ব্বত্রই ম্লেচ্ছসংশ্লিষ্ট ম্লেচ্ছ দেশ।

নগরের দুরবস্থা দর্শন করিতে করিতে ক্রমে আমাদের রথ পাণ্ডবের নিকেতনে আসিয়া পৌঁছিল। তখন বেলা প্রায় ১টা। পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে অন্ন প্রস্তুত ছিল, সুতরাং পরিতোষপূর্ব্বক আহার

সম্পন্ন হইল। সমভিব্যাহারী বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্রামার্থ শয্যাশায়ী হইলেন। একে এক্কার ধাক্কা, তাহাতে পঞ্জাবের মধ্যাহ্ন রৌদ্র ও অসময়ে আহার, সুতরাং শরীর অবসন্ন হইয়া শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আমি এই রৌদ্রোপভোগে ও এক্কারোহণে তৃপ্ত হইতে পারি নাই, সুতরাং বিশ্রাম ভোগে বিরত হইলাম। শীঘ্রই অন্যরথে (কারণ আমাদিগের পূর্ব্বরথের অশ্বসকল আমার মত ভ্রমণ-প্রিয় ছিল না, তাহারা ক্ষণিক রৌদ্রোপ-ভোগ করিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িয়া-ছিল) আরোহণ করিয়া পথ প্রদর্শকের সহিত পুনর্ব্বার ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। পূর্ব্বাহ্নে রথারোহণ ও রৌদ্রসেবন সুখ অল্পই ভোগ করিয়াছিলাম, কিন্তু এবার আর সে আক্ষেপ রহিল না। আজি শ্রাবণ মাসের দক্ষিণায়ন সংক্রান্তির পূর্ব্ব-দিন। প্রদীপ্ত নভোমণ্ডল মেঘস্পর্শ-শূন্য। মার্ত্তণ্ড দেব অগ্নি বিকীর্ণ করিতে করিতে বিষুব রেখা অতিক্রম করিতে-ছেন। উত্তপ্ত বায়ুরাশি বাষ্পাকারে উর্দ্ধোত্থিত হইতেছে। রাজপথে লোকের গমনাগমন বিরল হইলেও ধূলিরাশির প্রাদুর্ভাব অল্প ছিল না। একে এক্কার কষ্টসাধ্য ব্যায়াম ও রৌদ্রে অর্দ্ধদগ্ধ গলদ্বর্ম্ম বপু, তাহাতে অগ্নিকণানিভ ধূলিরাশি-মণিকাঞ্চন যোগ। ক্রমে নগর অতিক্রম করিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদকূলে উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য যে হ্রদের এই প্রদেশ কেবল জনশূন্য নহে, প্রচণ্ড রৌদ্রে তলদেশ সম্যক বিদীর্ণ হইয়া ভয়ঙ্করাকার ধারণ করিয়াছে। স্থানে স্থানে ঘাট বান্ধা আছে বটে, কিন্তু তাহা বৃক্ষ ও ছায়াভাবে পথিকের দ্বিগুণ যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। শুধু মৃত্তিকার উত্তাপেই রক্ষা নাই, তাহার উপর ইষ্টক ও পাষাণ উত্তপ্ত হইলে যে কি কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী লোকেই বিল-ক্ষণ বুঝিতে পারে। অশ্বদ্বয়ও উত্তপ্ত বালুকায় যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছিল। ক্রমে হ্রদের দুই দিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা সিদ্ধবটীতে উপস্থিত হইলাম। প্রচণ্ড রৌদ্রের পর বটচ্ছায়া যে কি তৃপ্তিকর, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। সিদ্ধবটী সমুচ্চ হ্রদকূলে প্রতিষ্ঠিত, শাখা প্রশাখা ও ঝুরি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া তলস্থ মঠের আত-পত্র স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ ছায়াতলে বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তিদূর করিলাম। যে বায়ু প্রান্তরে ও ছায়ার বহির্ভাগে অনল হল্কা বহন করিতে-ছিল, তাহা যে কিরূপে এখানে শৈত্যগুণ প্রাপ্ত হইল ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারি-লাম না। পিপাসায়ও শুষ্কতালু হইয়া-ছিলাম,মাঠের বহির্ভাগস্থ কূপ হইতে জল তুলিয়া আচমনাদি করিলাম। কূপোদক, সুতরাং শীতল, কিন্তু বিস্বাদ হেতু পান করিতে পারিলাম না; তথাপি আচমনেই পিপাসা দূর হইল। বটতলাটি পরি-ষ্কার ও পবিত্র, নানা জাতীয় পক্ষী

শাখাশ্রয় করিয়া সুখে কলকাকলি করিতেছে। শাখামৃগেরও অভাব ছিল না। স্থানটী সমুচ্চ বলিয়া সমস্ত দ্বৈপায়ন হ্রদ ও নগরের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। নগর এখান হইতে অনধিক এক ক্রোশ হইবে। মঠস্থ দর্শনীয় পদার্থ সকল (যাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে) দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার রথোপরি উপবিষ্ট হইলাম। এবারে আমরা বনপথে ধাবিত হইলাম, এখন পথ ছায়াময়।

পৃথিবীর ছাদ।

এই অপূর্ব্ব নাম শুনিয়া অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিতে পারেন। কবি নক্ষত্রখচিত সুনীল চন্দ্রাতপশোভিত নভোমণ্ডলকে, বৈজ্ঞানিক নিথর বায়ুমণ্ডলকে এবং স্থূলদর্শী শূন্যকেই ছাদরূপে গ্রহণ করিবেন। কোন কোন প্রখর স্মৃতিশক্তি-বিশিষ্টা পাঠিকা পিতামহীর উপকথা-বর্ণিত "বুড়ির সম্মার্জ্জনী-তাড়িত আকাশ" কেও পৃথিবীর ছাদ বলিতে পারেন। কিন্তু আমাদিগের প্রস্তাবিত ছাদ ইহার একটীও নহে। ইহা প্রকৃত পৃথিবীর ছাদ কিনা তাহা একজন প্রসিদ্ধ পর্য্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে আমরা যাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকটিত করিলাম, তাহা পাঠ করিলেই বোধগম্য হইবে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে পর্য্যটক কাশ্মীর হইয়া উত্তর খণ্ডে গমন করেন। কিছুদিন ইয়র্কখণ্ডে অবস্থান পূর্ব্বক পামির প্রদেশ প্রদক্ষিণ করিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি বলেন যে "কাশগেরিয়ার সমতলক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইলেই একটী অপূর্ব্ব স্থান দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তত্রত্য লোকেরা ইহাকে বামই দুনিয়া বা পৃথিবীর ছাদ বলিয়া থাকে। "পামির পার্ব্বতীয় প্রদেশ, সমতলক্ষেত্র হইতে সহসা উর্দ্ধোত্থিত হইয়াছে। মূলদেশ সিন্ধুসমতল হইতে ৪০০০ পাদ উচ্চ এবং শৃঙ্গ সকল ২৫। ২৬ হাজার পাদ গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। মূলদেশ হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত শুভ্র তুষারাবরণে চির আবৃত। উপত্যকা ও অধিত্যকা হিমশিলার নিত্য লীলাস্থলী। চতুর্দ্দিকে উন্নত নগমালা প্রাকারের ন্যায় স্থাপিত, উপরে অনন্ত নিহাররাশি ছাদ রূপে উত্তরোত্তর উত্থিত হইতেছে এবং চূড়াকারে শৃঙ্গ সকল অম্বরে বিলীন হইতেছে।" পর্য্যটক "বাম-ই-দুনিয়াকে এতদবস্থ দেখিয়া" "পৃথিবীর ছাদ" না বলিয়া "পৃথিবীর দ্বিতলগৃহ" বলিতে চান। তুরাণীয় গৃহ সকলের ছাদ আমাদের ইষ্টকালয়ের ছাদের ন্যায় সমতল। বাসিন্দারা বাহির হইতে প্রাচীরের উপর উঠিয়া তদুপরি উপ-

বেশন ও আরামাদি করিয়া থাকে। এই ছাদ এক প্রকার বৈঠকখানারও কার্য্য করে। তাঁহার মতে এই পর্ব্বত অঞ্চলেরও এই "পামির" বা ছাদ নামকরণ হইয়াছে। একবার পার্ব্বতীয় পথানুসরণ করিয়া অধিত্যকায় উঠিতে পারিলেই এই ভাব হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। নিম্নে সমতল ভূমি, অনুচ্চ নগরাজী ও প্রকাণ্ড উপত্যকা—তথা হইতে শৃঙ্গ সকল স্তম্ভাকারে উত্থিত হইয়াছে। হিমালয়ের ও হিন্দুকুশের উপত্যকাসকল যেমন গভীর, অপ্রশস্ত ও বদ্ধ, এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অনবরত শিলা-পাতে খাদ সকল সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, তদুপরি আবার হিমশিলার প্রাদুর্ভাব। যে পরিমাণে বৃষ্টিধারা-বেগে তুষার সকল প্রবাহিত হইতেছে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে হিমশিলা জমিয়া যাইতেছে। এই সকল উপত্যকাই পামির নামে প্রসিদ্ধ। তত্রত্য অধি-বাসীরা উপত্যকা বিশেষকেও পামির নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এখান-কার এক একটী উপত্যকার তলদেশ দুই তিন ক্রোশ বিস্তৃত ও প্রায় সমতল ক্ষেত্র, কিন্তু সিন্ধুর সমতল হইতে অনেক উচ্চ। তাগ-দুম-বাস পামির ১০৩০০ হইতে ১৫০০০ পাদেরও অধিক উচ্চ। অন্য অন্য পামির ১২০০০ হইতে১৪০০০ পাদ উচ্চ। পর্য্যটক বলেন এই সকল পামির উপত্যকার সর্ব্ব নিম্ন স্থান ইয়ুরোপের আল্‌পস পর্ব্বতের উচ্চ-তম শিখরের সমান। বড় পামির, ছোট-পামির, আলিচর পামির প্রভৃতি আরও কয়েকটী পামির আছে। সকল স্থানেই তুষার ও হিমশিলার রাজত্ব। ছোট পামিরের কোন কোন স্থান গ্রীষ্ম কালে তুষারশূন্য হয় বটে, কিন্তু বড় পামিরের সহিত যেখানে সংযুক্ত, তথায় চিরনিহার বিরাজমান। এখানে প্রাচীন হিমশিলারও ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তুষার নগরাজী ছায়ার ন্যায় রূপান্তরিত হইয়া ক্রমে বিলীন হইতেছে, কোন কোনটা স্থূল শুভ্র প্রস্তরময় প্রতীয়মান হইলেও মুহূর্ত্তে বাষ্পাবৃত হইয়া মেঘের ন্যায় আকার সকল প্রদ-র্শন করিতে করিতে ক্রমে অদৃশ্য হই-তেছে, কিন্তু অধিকাংশ শিলাপিণ্ড জমিয়া পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত নির্ম্মাণ করি-তেছে। পর্য্যটক এই স্থানে আর একটী চমৎকার দৃশ্য অবলোকন করিয়াছেন। এক-কেই তাল উপত্যকার নিকট রাং-কুল নামে একটী হ্রদ আছে। এই হ্রদের উপকূলেই একটী সমুচ্চ নগ অধি-ষ্ঠিত। এই নগ মধ্যে একটী প্রকাণ্ড গুহা বিদ্যমান্। এই গুহার উপরিভাগ চির-আলোকে সমুজ্জ্বল। তত্রত্য বাসী-ন্দারা ইহাকে "চেরাগ-তাস" অর্থাৎ "প্রদীপ"বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস যে গুহাভ্যন্তরে এক পক্ষ বিশিষ্ট মহাসর্প (Dragon) বাস করে, তাহারই নেত্রজ্যোতি দ্বারা গুহা

এরূপ আলোকিত। ভয়ে কেহই গুহার সন্নিকটে গমন করে না। নিম্নস্থান হইতে এই আলোক স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, বোধ হয় যেন কোন তাপহীন জ্যোতিষ্মান্ বস্তু হইতে আলোক নিঃসৃত হইতেছে। রহস্য ভেদে কৃতসংকল্প হইয়া পর্য্যটক অকুতোভয়ে গুহা সন্নিধানে গমন করিলেন। স্থানটী সমুচ্চ ও দুর্গম, সুতরাং গমনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। উপানৎ খুলিয়া হামাগুড়ি দিয়া বিড়ালের ন্যায় কষ্টে সৃষ্টে তথায় উঠিয়াছিলেন। নিকটে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। আলোক মহাসর্পের নেত্রজ্যোতি বা জ্যোতিষ্মান্ বস্তুজাত নহে, কিন্তু সাধারণ ভোগ্য দিবাকর সূর্য্য দেবের কিরণ-জাত আলোক। গুহাটী নগের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সুড়ঙ্গাকারে গঠিত। প্রকাণ্ড ছিদ্রের ন্যায় ইহার উভয় দিক্ হইতে আলোক দেখা যায়। পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে সুড়ঙ্গটী দেখা যায় না, কেবল গুহাটীর উপরিভাগ মাত্র দৃষ্ট হয়। গুহার উপরিভাগে এক প্রকার চূর্ণ-নিভ পদার্থে আবৃত, তদুপরি সূর্য্যবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া এই অপূর্ব্ব আলোক উৎপন্ন করে। পর্য্যটক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বাসিন্দাদিগের ভ্রম ভঞ্জনার্থ ইহা ব্যক্ত করিলে কেহই তাঁহার বাক্যে প্রত্যয় করিল না। মহাসর্পের নেত্রজ্যোতির কথা তাহারা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহাই তাহাদিগের সংস্কার। রাংকুলের জল নীলবর্ণ এবং দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু এমন লবণাক্ত যে পান করিবার যো নাই।

সুনীতি ও ধ্রুবের কথোপকথন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সু। আমার হারানিধি বুকজুড়ানো ধন কোথায়? এই যে—একবার কোলে আয় বাপ—তোর ওই চাঁদমুখখানি দেখে আমি সকল দুঃখ ভুলে যাই, তাপিত প্রাণ শীতল করি! দেবদুর্লভ হরিধনে ধনী হয়ে ঘরে ফিরে আস্‌বে, সেই আশায় এতদিন জীবিত রয়েছি, নতুবা তোর অদর্শনে প্রাণবায়ু কবে দেহ হইতে বহির্গত হত। ভাল ধ্রুব—বলি তুমি কি পেয়েছ—দুঃখিনী মায়ের জন্যে কি এনেছ—একবার দেখাও দেখি?

ধ্রু। জননীগো প্রণাম হই—হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন! আমি এক মনে—এক প্রাণে তাঁকে ডেকেছি। ডাকৃতে ডাকৃতে গলা ভেঙ্গে গিয়েছে, তবু ডাকৃতে ছাড়িনি। গভীর গহনে একাকী বসে অনাহারে ও অনিদ্রায় দিন যামিনী অতিবাহিত করেছি—কেমন

করে সেদিন কেটে গেছে তা টের পাইনি —তিনি কি আর সহজে আমায় দেখা দিয়াছেন! কিন্তু মা,—তোমায় কি বল্‌ব—আমার সকল কষ্ট দূর হয়েছে—সেই ভুবনমোহন রূপ দেখে আমি একেবারে মোহিত হয়ে গেছি—আহা! কি অপরূপ রূপ!—ওরূপ দেখ্‌লে আর ইচ্ছা হয় না যে চোখ ফিরাই—একবার দেখ যদি।

সু। বাপ তোর কথা শুনে মনটা যে কেমন হয়ে গেল! বড় সাধ মনে—তোর হরিকে দেখি! তিনি কি আর এ দুঃখিনীরে দেখা দিবেন?

ধ্রু। মা আমি তারও উপায় করে এসেছি। আমি তাঁকে বল্লুম—হরি—আমার মা যখন আমায় জিজ্ঞাস্‌ করবেন—বাপরে তোর দুঃখিনী মায়ের জন্যে কি এনেছিস্‌—তখন আমি তাঁরে কি উত্তর দিব? হরি! তোমার ও ভুবনমোহন রূপ আমার দুঃখিনী মা'কেও দেখাতে হবে—তিনি বল্লেন সেকি কখন হ'তে পরে? আমারে যে ডাকে, সে পায়—ভক্ত বিনা আমি আর কাহাকেও দেখা দিই না—আমি ভক্তের চির অনুগত।

সু। সে ত ঠিক্‌ কথা—আমি ত আর তাঁকে না খেয়ে না ঘুমিয়ে ডাকিনি! আমায় কেন তিনি দেখা দিবেন? তিনি ভক্তবৎসল, তাই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন! আমি অসাধনে কেমন করে সেই দেব-আরাধ্য ও যোগী ঋষির সাধনের ধন হরিকে দেখ্‌তে পাব?

ধ্রু। আমি কি আর তাঁকে অমনি ছেড়ে দিয়েছি, তিনি তোমাকে নিশ্চয় দেখা দিবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন—ফাঁকি দিবার যো নাই—তুমি এস না—আমি এখনি দেখাচ্ছি। ঐ যে হরি দাঁড়িয়ে আছেন, ওগো আমার দুঃখিনী মাকে দেখা দেও—তিনি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছেন।

সু। বাপ ধ্রুবরে—তোরে গর্ভে ধরে সুনীতির জীবন আজ ধন্য হ'ল। আমি বাস্তবিকই রত্নগর্ভা—এমন রতন গর্ভে ধরেছি বলেই না আজ হরির দর্শন পেলুম। হরিহে তোমার লীলা খেলা কে বুঝ্‌তে পারে? সাধে কি ভক্তেরা তোমাকে লীলাময় হরি বলে, সম্বোধন করেন? দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তুমি ধ্রুব লোকের অধিকারী কর্‌বে কে মনে করেছিল? আহা! বালকের মুখে হরিনাম কত মধুর! বাপ ধ্রুবরে—তোর ওই চাঁদমুখে একবার হরিনাম শুনা দেখি?

ধ্রু। এমন মধুর নাম লইতে রসনা
অলসে থেকনা আর—বল অবিরাম,
প্রাণারাম হেন আর কি আছে বলনা?
হরিনাম সাধনেতে হও সিদ্ধকাম।
হরিভক্ত হরিময় দেখে এ সংসার।
হরিধ্যানে হরিজ্ঞানে শয়নে স্বপনে
হরি সার—হরি তাঁর আহারে বিহারে,
হরিনাম জপমালা জীবনে মরণে।
হরিদাস চাহেনা সে তুচ্ছ রাজ্য ধন,
অসার অনিত্য সুখে সদা বীতরাগ,

যাগ যজ্ঞে মন্ত্র তন্ত্রে নাহি লয় মন,
কেবল নামেতে রুচি—শুদ্ধ অনুরাগ।
হরিগুণ গানে মত্ত—ভাবেতে বিহ্বল।
অবিরল ঝরে তাঁর প্রেমাশ্রু নয়নে,
নামামৃত পান করি প্রেমে ঢল ঢল
কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিকাশে বদনে
মর্ত্ত্যে থাকি ভক্ত করে স্বর্গ সুখ ভোগ
ভাবযোগে হৃদয়েতে মহা ভাবোদয়,
ভক্ত বিনা কার ভাগ্যে এমন সুযোগ
ঘটে বল, শুভাদৃষ্ট সহজে কি হয় ?
পরীক্ষা পাঠান হরি ভক্তের কারণ,
পরীক্ষাতে পাড়লেই ব্যাকুলতা আসে,
(তাই) ভক্তির আধারে ভক্ত করে অন্বেষণ,
পাগল হইয়ে ছুটে পাইবার আশে।
অটল বিশ্বাস হেরি হরি দয়াময়—
নারেন থাকিতে স্থির,—টলে সিংহাসন,
আয়ত্ত করেন এসে ভক্তের হৃদয়,
উৎসারিত হয় তাঁর ভক্তি প্রস্রবণ।

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

নূতন সংবাদ।

১। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে—মান্দ্রাজ, রাজপুতানা ও ব্রহ্মদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বোধ হয়, বোম্বাই, মহীশূর, কুর্গ এবং বঙ্গদেশেও হাহাকার উঠিয়াছে। রিলিফ কার্য্যে নানাস্থানে ১লক্ষ, ৪২ হাজার ৮৮৩ জনকে খাটান হইতেছে এবং ৮৩৪১ জনকে দাতব্য সাহায্য দেওয়া হইতেছে। ভবিষ্যতে কি হয়, অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয়।

২। বরাহনগর মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি বাবু বিনোদলাল ঘোষ বরাহনগরে একটী স্ত্রী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১০,০০০ টাকা দিয়াছেন ও এক বিঘা ভূমির মূল্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। মুক্তাগছার শ্রীমতী বিদ্যাময়ী দেবী নিজনামে স্থানীয় হাঁসপাতালে এক (ওয়ার্ড) কক্ষ নির্ম্মাণার্থ ৪০০০ টাকা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট উভয় দান গ্রহণ করিয়া দাতা ও দাত্রীকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

৩। পামীর ভ্রমণকারী কাপ্তেন ইয়ং হজ্‌বাণ্ড কাশ্মীরের সহকারী রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। ইনি ইংরাজ ও রুষ সীমান্ত অনেক স্থল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

৪। ফরাসী ভাষায় বাবু কেশবচন্দ্র সেনের একখানি সুন্দর জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার লেখক চার্লস বাইসী।

৫। যুবরাজের দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স জর্জ এখন ইংলণ্ডের ভাবী রাজ্যেশ্বর। তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি বাড়াইয়া ১৫০০০ পাউণ্ড করা হইয়াছে।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। সাধনা—এই নামে একখানি নূতন মাসিক পত্রিকার কয়েক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু সুধীন্দ্র নাথ ঠাকুর ইহার সম্পাদক। পত্রিকা খানিতে বিবিধ সুপাঠ্য হিতকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। ইহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

২। নব-সীমন্তিনী—শ্রীবসন্ত কুমারী নাথ প্রণীত, আগামী বারে সমালোচ্য।

১২৯৮ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচিপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতি।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

৪। ইতিহাস ও দেশভ্রমণ।

৫। বিজ্ঞান।

৬। আশ্চর্য্য বিবরণ।

৭। পদ্য।

৭। বিবিধ

৮। বামারচনা।

৯। সাময়িক প্রসঙ্গ।

১০। পুস্তকাদি সমালোচনা।

১১। নূতন সংবাদ।

বামারচনা।

আমি যাব না।

ডেকনা ডেকনা আর আমি ঘরে যা'বনা
শ্মশানের নামে আর ভয়াকুলা হ'বনা;
যতদিন প্রাণ আছে,এই শ্মশানের মাঝে
বসিয়া করিব আমি ইষ্টদেবে সাধনা,
কি হইবে ঘরে গিয়া কেহ মোরে চায়না--
স্নেহ, ভক্তি, যত্ন আমি দিলে কেহ লয়না,
আমার প্রতিও কারো স্নেহস্রোত ব'য়না।
ঘরেতে রয়েছে যারা স্বার্থভরে মাতোয়ারা
মম দত্ত স্নেহ ভক্তি চরণে দলিতে চায়,
বিশ্বাসের মাথা তারা আগে চিবাইয়া খায়,
আশা ও নিরাশা দুটী ঘরের দ্বারেতে বাঁধা
দেখিলেই তাহাদের মোর চোকে লাগেধাঁধাঁ
ঘরের প্রাঙ্গণে যাই, তিলেক দাঁড়াতে চাই.
অমনি আসিয়া স্বার্থ কট মট চোকে চায়,
আসক্তি সত্বর এসে শৃঙ্খল বাঁধয়ে পায়।
কোথা থেকে পাপগুলা ধেয়েএসে সর্প পারা
ঘিরে ফেলে মারে ছোঁ প্রাণেতেই আধ মরা।
ক্রোধ,দ্বেষ হিংসাগুলি,বুকেতেমারয়েগুলি,
থাক সব অট্টালিকা অমরাকে দিক লাজ,
আমার সেখানে যেয়ে কিছুমাত্র নাইকাজ।
দেবেনা নেবেনা যারা, সুধু তাহাদের তরে
এতটা আপদ লয়ে কেনবা রহিব ঘরে?
ডাকিওনা ওসংসার! ঘরে না যাইব আর,
এখানে থাকিব ভাল বেশ বেশ এ শ্মশান,
এখানেই মৃত্যুঞ্জয়ী শিবের সমাধিস্থান,
এই খানে মানুষের স্নেহ, ভক্তি ভালবাসা,
পরাণের সুখ, সাধ মিটে যায় সব আশা।
গম্ভীর মূরতি ধরি বৈরাগ্যকে কোলে করি
এখানে প্রকৃতি দেবী করিছেন অবস্থান,
থাকিব এখানে আমি ভাল,ভাল এই স্থান।
এখানে থাকিব আমি শুনিব সিন্ধুগামিনী
তটিনীর কুল, কুল, কুল, কুল সুসঙ্গীত
আমিও ধরিব তান সেই নদীর সহিত,
আমিও তাহার সহ জীবন সঙ্গীত গা'ব,
আমিও তাহার মত মৃত্যু-সিন্ধু পানে ধা'ব।
তাহার হৃদয় পরে ধরিবে সে শশধরে,
আমার হৃদয় পরে ইষ্টদেবে ধ'রে মম
নাচাইব নদীবক্ষে তরঙ্গের শশি সম,
আমিও উহার মত জ্যোছনা মাখিয়া গা'য়
স্বন স্বনে প্রভঞ্জন শুনিব কি বলে যায়।
সুন্দরী বেতসলতা, নোয়ায়ে মস্তক তথা,
কালের কৌটিল্য কথা কহিবে নদীর সনে,
শুনিব সেসব আমি একাকিনী একমনে।
নিশার শিশির বিন্দু পড়িবে মস্তকে মোর,
ভাঙ্গিয়া যাইবে তায় আশার নেশার ঘোর।
সুখ দুঃখ মানামান সকলে সমান জ্ঞান
হইবে এখানে ভয়ে পলাইবে অহঙ্কার,
ডেকনা আমারে আমি ঘরে যাইবনা আর,
ক্ষুধা হলে আহার করিব বন্য বৃক্ষ ফল
তৃষ্ণায় করিব পান তটিনীর স্রোতোজল,
মাথা রেখে বাহুপরে রহিব শয়ন করে,
সর্প, শিবা, ব্যাঘ্র আদি ভূত ও পেতিনীগণ
হইবে তাহারা মম সঙ্গী আর পরিজন।
আদরে ডাকিয়া মোরে সঙ্গে লয়ে যাইবে।
ঘরে গিয়া পরে বুঝি গলা চেপে মারিবে?
না না না তাহবে না তুমি আর ডাকিও না
গৃহে বাঁধা দেহ্কার শ্মশানের হরিবোল,
শ্মশানে থাকিলে নাহি পরাণে বাধাবে গোল
এখানে করিব আমি ইষ্ট দেবে সাধনা,
না না না ওসংসার! ঘরে আমি যাবনা।

শ্রীকুমুদিনী রায়।